প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স

(প্রকাশন বিভাগ)
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

PRATHAM KADAM PHOOL
A Bengali Novel
By ACHINTYAKUMAR SENGUPTA

প্রকাশক : অজিতকুমার জানা
প্রযত্নে অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৬৭

প্রচ্ছদ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বর্ণগ্রন্থন : পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কলকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রাকর ঃ

ও' নিল অফসেট

বেলেঘাটা

কলকাতা-৭০০ ০১৫

প্রথম কদম ফুল

এক

খাঁচার দরজাটা খুলে দিতেই ব্যস্ত পায়ে ঢুকে পড়ল কাকলি। আর তক্ষুনি কোত্থেকে হন্তদন্ত হয়ে হাজির সুকান্ত।

লিফ্‌টম্যান এক পলক তাকাল আগন্তুকের দিকে। কিন্তু সুকান্ত তাকে দ্বিধা করতে দিল না এতটুকু। অবধারিতের মত ঢুকে পড়ল।

উপায় নেই, প্রায় গা ঘেঁষেই দাঁড়াল কাকলির।

অন্তত, একে প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়ানোই বলে। একটা চারকোনা বাক্স, জায়গা কম, এ কে না জানে। তবু এরই মধ্যে বরাদ্দ দূরত্ব রাখা অসম্ভব ছিল না, শালীন দূরত্ব। লিফ্‌টম্যানের ওপাশের দেয়ালের দিকে হেলতে পারত অনায়াসে। এ যেন হৃৎপিণ্ডে মারবে বলে ছুরি উঁচিয়ে এসেছে। কিংবা শাড়ির বুনটটা হাতে নিয়ে উদাসীন মমতায় দেখবে পরখ করে। দাম জিজ্ঞেস করবে।

বিরক্ত মুখে কাকলি বললে, 'আপনি! আপনাদের—'

'হ্যাঁ, আমাদের, ছেলেদের বারণ। তবে যারা রুগ্ন, যাদের হার্ট দুর্বল—'

'আপনি কি রুগ্ন?'

কাকলির চোখে একটু বা প্রশংসার রঙ মাখা।

'না।' হাসি-হাসি মুখে সুকান্ত বললে, 'তবে, বলতে বাধা নেই, হৃদয় বড় দুর্বল।'

'হার্টের মানে বুঝি হৃদয়?' বলবে না ভেবেছিল তবু কথার পিঠে বলে ফেলল কাকলি।

'আরো একটা মানে করা যায়।' বললে সুকান্ত : 'আঘাত। প্রহার। যন্ত্রণা।'

কথা বললেই কথা বাড়ে, চুপ করে রইল কাকলি। কয়েক সেকেণ্ডের তো মামলা। এখুনি উঠে আসবে তেতলা। বারোটা চল্লিশে তার ক্লাস।

'কিন্তু এখন হার্টের যে অবস্থা, মানে যে রকম বুক কাঁপছে, সহজেই ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে, সিঁড়ি ভাঙা বিপজ্জনক, লিফট্‌ই প্রশস্ত।' বুক-ফুলিয়ে নিশ্বাস নিল সুকান্ত : 'তবে ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ না করলে কিছু হবার নয়।'

কাকলি চোখ নিচু করে রইল।

কিন্তু, এ কি, লিফট্‌ হঠাৎ আটকে গেল মাঝখানে। দোতলা আর তেতলার মধ্যে। ঘোর-ঘোর আধছায়ার রাজ্যে।

'কি সর্বনাশ!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল কাকলি।

'কারেন্ট অফ হয়ে গিয়েছে বোধ হয়।' লিফট্‌ম্যানের হয়েই যেন বললে সুকান্ত।

তার কথা কে গ্রাহ্য করে? সে তো চালাচ্ছে না। সে কলকব্জার জানে কি!

'কারেন্ট অফ হয়ে গিয়েছে?' চোখ কপালে তুলে লিফ্‌টম্যানকে জিজ্ঞেস করলে কাকলি।

'কল বিগড়ে গিয়েছে।' নিশ্চেতনের মত বললে লিফ্‌টম্যান।

এ যেন তেমনি একটা নিস্পৃহ-নিশ্চল থাকবারই অবস্থা। দু'হাতের মুঠি তুলে অস্থিরের মত কাকলি বললে, 'তা হলে কী হবে?'

'যতক্ষণ না কারেন্ট আসে অপেক্ষা করতে হবে।' বললে সুকান্ত।

'আর যদি অন্য কোনো গোলমাল হয়?' কাকলির মুখ আতঙ্কে প্রায় সাদা।

'যতক্ষণ মিস্ত্রি না আসে—'

'বলেন কি। ততক্ষণ ঝুলব ত্রিশঙ্কুর মত?' কাঠ-কাঠ গলায় বললে কাকলি।

'কিন্তু নিঃশঙ্ক হয়ে।' যেন খুব একটা আনন্দের ব্যাপার, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে আগা-পাশ-তলা মুখস্থ জানা উত্তর—এমনি উৎসাহ সুকান্তর ভঙ্গিতে।

'নিঃশঙ্ক হয়ে?' ভিতরে-ভিতরে মৃদু-মৃদু কাঁপছে যেন কাকলি : 'বলতে চান কোন ভয় নেই?'

'না, কিসের ভয়?' যেন এক পা এগিয়ে এল সুকান্ত : 'আমিই তো আছি।'

ইঙ্গিতটা বুঝি লিফ্‌টম্যানকে। মানে লিফ্‌টম্যান যদি অশোভন কোনো আচরণ করে তবে প্রতিকর্তা স্বয়ং সুকান্ত। যেন সুকান্তের থেকে কোনো ভয় নেই। সে যেন বনে বাঘ নয়, ঘরে কালসাপ নয়। সে এক দেবশিশু।

আর সত্যি, লিফ্‌টম্যানের ব্যবহারকেও বলিহারি। কলকব্জা যদি কোন খারাপ হয়ে থাকে, তবে হাতের যন্ত্রপাতি নিয়ে কিছুটা নাড়াচাড়া করবে তো, বুঝুক বা না বুঝুক, কোথাও করবে তো একটু তদন্ত-তদারক। তা নয়, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে অনড় পুতুলের মত। লক্ষ্য নিজের দিকে নয়, অন্য দুই আরোহীর দিকে।

চেঁচাবে? শুনতে পাবে কেউ? শুনলেই বা উদ্ধার করবে কে ? কে করবে সাহায্যের তোড়জোড় ?

ছটফট করতে লাগল কাকলি।

'আপনি অত নার্ভাস হচ্ছেন কেন?' সুকান্ত বললে, 'বসুন সিটটায়। বিশ্রাম করুন।'

ঝলসে উঠল কাকলি : 'এটা এখন বিশ্রাম করবার সময়?'

'উপায় কি। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন দু পায়ে?' বললে সুকান্ত। 'পা ধরে গেলে এক সময় বসতে তো হবেই।'

'এখনো ধরে নি।'

'আমার উপরে অকারণ চটছেন। আমি ভালো কথাই বলছি। কখন মেরামত হয়ে লিফ্‌ট আবার চালু হয় ঠিক নেই। চাই কি এই সিটটায় বসে ঘুমুতেও হতে পারে—'

'ঘুমুব এখানে?' করুণ কান্নার মত করে বললে কাকলি। 'আর আপনি?'

'যদি জায়গা দেন—'

'এখানে জায়গা কোথায়?' কাকলি দেয়ালের কোণ ঘেঁষে দাঁড়াল।

'জায়গা নেই, জায়গা নেই এই তো এই যুগের হাহাকার।' আরো কিছুটা যেন এগিয়ে এল সুকান্ত : 'সেটা তো স্থানের দিক থেকে, প্রাণের দিক থেকে নয়। কেননা, যদি হৃদয়ে জায়গা থাকে তা হলে ঘরে কেন, খাঁচায়ও জায়গা আছে। ঐ যে কি বলে, যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় দু'জন—দু'জন নয় ন'জন। কথাটা হয়তো ঠিক তা নয়। কথাটা হচ্ছে, আমি যাব কোথায়? যতই কেননা রাগ করুন, এই মুহূর্তে আমাকে ফেলবারও তো কোন জায়গা নেই। সুতরাং—'

আরো কি এক চুল এগিয়ে এল নাকি সুকান্ত ? আপনার শাড়ির উপর এ কি একটা ছারপোকা না ডেঁয়ো পিঁপড়ে এই অছিলায় গায়ে হঠাৎ হাত দিয়ে ফেলবে নাকি ? কাকলি আরো কুঁকড়ে গেল, শিটিয়ে গেল।

'সুতরাং, আসুন সিটটায় বসি।' সুকান্ত সরে দাঁড়াবার ভঙ্গি করল।

'আপনিও বসবেন?'

'বাধা কি। এটা তো আর ট্রাম বাস-এর লেডিজ সিট নয়! এখানে সবাই পাশাপাশি, সবাই সমান-সমান।'

'আপনি বসুন। আমি দাঁড়িয়ে থাকব।'

'কিন্তু কতক্ষণ থাকবেন!' সুকান্ত দার্শনিক হবার ভান করল, মানুষ কখনো কোনো অবস্থায়ই খুশি নয়। কেবলই সে ভোল বদলাচ্ছে, ভঙ্গি বদলাচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছেন—দাঁড়িয়ে আছেন, মনে হবে কতক্ষণে একটু বসতে পাব। বসে আছেন—বসে আছেন, মনে হবে কতক্ষণে একটু পা টান করে শুতে পাব। শুয়ে আছেন—শুয়ে আছেন, মনে হবে, আর নয়, এবার উঠে পড়ি। উঠে পড়েছেন কি, আবার সেই বসে পড়ার, শুয়ে পড়ার জন্যে কান্না। সুতরাং যতই কেননা দাঁড়ান, দাঁড়িয়ে থাকুন, বসতে ইচ্ছে করবেই আপনার এক সময়, আর যখন বসবেনই শেষ পর্যন্ত—'

'তখন কেন না শুয়ে পড়ব!' কাকলির রাগের স্বরটা কৌতুকের মত শোনাল।

'আশ্চর্য হবার কিছু নেই।' এতটুকুও কি বিচলিত হবে না সুকান্ত? 'বলা যায় না ক'ঘণ্টা ক'রাত্তির

এমনি বন্দী থাকতে হয় আমাদের।'

'ক'রাত্তির!'

'তা ছাড়া আবার কি। কিছুই তো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না কোথাও। আর সবই যখন অন্ধকার, নিশ্চল নিঃশব্দ, তখন রাত ছাড়া আর কি। প্রত্যেকটি মুহূর্তই এক গহন রাত্রি। কথাটা তা নয়—'

'তা নয়?' চোখ তুলল কাকলি।

'না। আপনি যদি নিতান্ত শুয়েই পড়েন আমি না হয় এই মেঝেতেই কুকুরকুণ্ডলী হব, নিরীহের মত ঘুমুব শান্তিতে।'

'ঘুমুবেন? পারবেন ঘুমুতে?'

'দেখুন না পারি কিনা।' হাসতে লাগল সুকান্ত।

'আপনার এতটুকু ভয় করছে না?'

'কেন করবে? কিসের ভয়? সঙ্গী যদি ভালো হয় মানে সৎ, কি বলে, সুন্দর হয়, তা হলে ভয় থাকে না। সেই কারণে আপনিও নির্ভয় হতে পারেন হয়তো। পারেন না?'

'কিন্তু আপনি কি সুন্দর?'

'সুন্দর ভাবলেই সুন্দর।' একটু লাজুক হবার ভঙ্গি করল সুকান্ত : 'সুন্দর না হই, সৎ তো বটে। ভালো মানে ইউনিভার্সিটির ভালো ছেলে নই। ভালো মানে ভালোবাসার ভালো ছেলে। কিন্তু কথাটা তা নয়—'

'তা নয়?' কাকলির চোখে কে গাঢ় করে কালো রেখা টেনে দিল।

'না। আমি বলছিলাম আপনার বসবার কথা। বলছিলাম, যখন শেষ পর্যন্ত আপনাকে বসতে হবেই, তখন আগেভাগেই বসে পড়ুন। আমার দরকারি কথাটা সেরে নিই।'

'দরকারি কথা!' একটু বা চমকাল কাকলি। বললে, 'এই বিপদে কারু আবার দরকারি কথা থাকে নাকি? থাকলেও মনে পড়ে নাকি?'

'পড়ে। কে জানে হয়তো ঐ দরকারি কথার জন্যেই এই বিপদ।' ঢোক গিলল সুকান্ত : 'কথাটা আর কিছু নয়, আপনার বাড়ির ঠিকানাটা ভুলে গেছি—'

'ভুলে গেছেন মানে?' চমকে উঠল কাকলি, 'কোনোদিন জানতেন নাকি?'

'জানতাম।'

'কি করে? কে বললে?'

'কেউ বলে নি।'

'তবে?'

চোখের উপর স্থির চোখ রাখল সুকান্ত, 'আপনিই লিখেছিলেন।'

'আমি?' চোখের পলক ফেলল না কাকলি, 'আপনাকে?'

'হ্যাঁ, আমাকেই। আর কাকে!'

লিফ্‌টটা ফের চলতে শুরু করল নাকি? যেন একটু দুলে উঠেছিল, নিজেকে সামলাল কাকলি। দেখল লিফ্‌টের নয়, হৃৎপিণ্ডের দোলা।

'কী লিখেছিলাম? চিঠি?'

'তা তাকে চিঠি ছাড়া আর কী বলে?'

'বাঃ, আমি আপনার ঠিকানা জানলাম কি করে?' কাকলি প্রায় ঝংকার দিয়ে উঠল।

'সে চিঠি আমার বাড়িতে পোস্টে পাঠান নি। তাই আমার বাড়ির ঠিকানা না জানলেও চলে। সেটা আমাকে কলেজেই পৌঁছে দিয়েছেন এবং বেয়ারা মারফৎ। কি, মনে পড়ে?'

খুব একটা নির্দোষ ব্যাপার, এমনি হালকা হওয়ার ঢেউ তুলে কাকলি বললে, 'কলেজ সেমিনারে কোনো বক্তৃতা ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে অনুরোধ। মনে পড়েছে। কি, তাই না?'

'হ্যাঁ তাই।' গর্বের নিশ্বাস ফেলে সুকান্ত বললে, 'আমাদের গলিতে থাকেন এক বিখ্যাত সাহিত্যিক, তাঁকে সেমিনারে ধরে নিয়ে এসে কিছু বলাবার জন্যে প্রার্থনা—'

'প্রার্থনা!' বাক্যের নির্বাচনে আপত্তি কাকলির।

'নয়তো বলুন আদেশ। আপনি যখন সেমিনারের সেক্রেটারি তখন আপনার বলাই হুকুম করা। কিন্তু,' একটু কান চুলকোল সুকান্ত : 'কোথাও একটু মিনতিও হয়তো ছিল। নচেৎ, কোনো দরকার নেই, ঐ চিরকুট চিঠিতে ফলাও করে আপনি আপনার বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন কেন?'

'দিয়েছিলাম বুঝি?' চোখের কোলের কাছটিতে লজ্জার রেখা ফোটাল কাকলি : 'ওটা কেমন হাতের টানে অভ্যেসের বশে এসে গিয়েছিল।'

'তাই হবে। কিন্তু কী বিচ্ছিরি ঠিকানা। বাড়ির নম্বর নয় তো ধারাপাতের অঙ্ক। ধারাপাতের অঙ্ক বলা ভুল হল, কেননা তাতে একটা শৃঙ্খলা থাকে। আপনাদের নম্বরটা তো অঙ্ক নয়, আতঙ্ক। কোনো ছিরিছাঁদ বা নিয়মকানুন নেই। তিন শ তিয়াত্তর না ছ শ সাতাত্তরের সতেরো, তার আবার বাই—সাতাশ না সাতাশি। কখনো এমন বিদঘুটে নম্বর হয় শুনেছেন?' মুখচোখ গম্ভীর করল সুকান্ত : 'সতেরোর সাতাশ না সাতাশের সতেরো এই ঠিক করতেই প্রাণান্ত। তারপর ঐ তিন শ তিয়াত্তর —আচ্ছা, বলুন, অমন কখনো নম্বর হয়?'

এত বিপদেও মানুষে হাসে! দিব্যি হাসি বেরুল কাকলির। বললে, 'মোটেই তিন শ তিয়াত্তর নয়।'

'নয়! তবেই দেখুন কিরকম অসম্ভব গোলমেলে ব্যাপার, কারু সাধ্যি আছে তা মনে রাখে!'

'মনে রাখবার কী দরকার! চিরকুটটা দেখে নিলেই পারেন।'

'চিরকুট বলতে আপনার লেগেছে বুঝি। চিরকুট বলুন বা গেট-পাশ বলুন, দলিলটা হারিয়ে গেছে।' মুখ অবিশ্বাস্য করুণ করল সুকান্ত : 'আমার সব জিনিস খালি হারায়।'

'তাই দেখছি। স্মৃতি-শক্তি ধৃতি-শক্তি দুই-ই।' মুখ টিপে একটু হাসল কাকলি।

'ধৃতি-শক্তি মানে?'

'ধরে রাখবার শক্তি। না পারলেন ঠিকানাটা মনে রাখতে, না বা চিরকুটটা ধরে রাখতে। অতএব আপনাকে ঠিকানা দিয়ে লাভ কি।'

'আর না দিলেই বা ক্ষতি কি।' নৈরাশ্যে মুখ ধূসর করল সুকান্ত : 'কে জানে এই পিঞ্জরই হয়তো আমাদের শেষ ঠিকানা।'

'তাই যদি হবে, এই পিঞ্জরই যদি আমার শেষ বাড়ি,' বেশ সরল হতে পারছে কাকলি, 'তবে ঘটা করে প্রাক্তন বাড়ির খোঁজ করছিলেন কেন?'

'বুঝতে পারছি, অনর্থক করছিলুম। সুতরাং,' সুকান্ত সিটের দিকে ইঙ্গিত করল, 'আসুন, হতাশ হয়ে বসে পড়ি।'

'না, হতাশ হবার তো কিছু দেখছি না।' সহাস্য নির্ভয়ে বলতে পারল কাকলি, 'খাঁচার বাইরে কোথাও এক আকাশ আছে। সমস্ত জনতার মধ্যেও আছে এক নির্জনতা।'

এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে নাকি কেউ? কাকলির চোখের মধ্যে তাকিয়ে রইল সুকান্ত।

কথাটা শেষ করেনি কাকলি। জের টেনে বললে, 'সমস্ত ঠিকানার বাইরে মানুষের আরেক বাসস্থান।'

'হ্যাঁ,' উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুকান্ত, 'মানুষের সে আবাস স্থানে নয়, কি বলেন—'

'হ্যাঁ, মনে।'

লাফিয়ে উঠল সুকান্ত। 'তার মানেই হৃদয়ে। তার মানেই—' স্থির হয়ে তাকাল লিফ্‌টম্যানের দিকে। বললে, 'ঠিক আছে।' চোখের ইঙ্গিত করলে।

লিফ্‌ট উঠতে শুরু করল।

ব্যস্ত হয়ে কাকলি বললে, 'চট করে আপনার ঠিকানাটা বলুন এবার।'

'আমার ঠিকানা?' লিফ্‌ট কি বাড়ি ছাড়িয়ে শূন্যে উঠে যাচ্ছে নাকি? এমনি হতচেতন চেহারা করল সুকান্ত।

'আপনার ঠিকানা না পেলে আমার ঠিকানা আপনাকে জানাব কি করে? কি, বলছেন না কেন? খুব কঠিন? মনে রাখতে পারব না?' ঠিক আঁচল বেঠিক করে আবার ঠিক করল কাকলি।

'না, একটুও কঠিন নয়, খুব সোজা। দু' নম্বর কাঁটালতলা লেন।'

লিফ্‌ট থামল তেতলায়। এক দঙ্গল লোক দাঁড়িয়ে আছে, সবাই হৈ-হৈ করে উঠল।

যান্ত্রিক গোলমাল। কিছু বলবার নেই। স্বয়ং লিফ্‌টম্যানই তার প্রবক্তা। আর এ দু'জনকে যে একসঙ্গে দেখছ এও যান্ত্রিক গোলযোগ ছাড়া আর কিছু নয়।

দু'জন বেরিয়ে এসে দু দিকে পালাল। একটা দুর্ঘটনার বেশি কিছু নয় এমনি ভাব দেখিয়ে একসঙ্গে হাঁটল কয়েক পা। যা দৈবের ব্যাপার, অপ্রতিকার্য, তার সম্পর্কে অভিযোগ করে লাভ নেই।

ফাঁকায় এসে, চলতে চলতে ব্যবধান কত বড় হয়ে গিয়েছে সেটা লক্ষ্য করে গলার স্বর চড়া করল কাকলি। বললে, 'অমন বিচ্ছিরি গলির নাম এখনো আছে নাকি? আপনাদের অঞ্চলে কোনো গ্রেট ম্যান হয় নি?'

'গ্রেট ম্যান মানে?'

'কোনো মন্ত্রী-টন্ত্রী?' নিদেন কোনো কাউন্সিলর—'

'গলিটা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।' উপর-ঠোঁটের উপর দুটো আঙুল বুলোল সুকান্ত।

'আর আপনি অপেক্ষা করাবার জিনিস পেলেন না? একটা হতচ্ছাড়া গলি—'

'গলিটা বিচ্ছিরি হতে পারে, কিন্তু যাই বলুন, বাড়ির নম্বরটা ভালো।'

'নম্বরটা?'

'নম্বরটা দুই। ভুলে গেলেন এরই মধ্যে? খুব ভালো নম্বর। কিছুতেই ভোলা যায় না। দুই। দ্বৈত, দুঁহুঁ। এক আর দুই।' সুকান্ত আঙুল দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে পরে লক্ষ্য করল কাকলিকে : 'আমি আর আপনি।'

'কি বুদ্ধি!' শব্দ করে হেসে উঠল কাকলি, 'দুইয়ে বুঝি আমি আর আপনি হয়? দুইয়ে আমি আর তুমি।'

ক্লাসে ঢুকে পড়ল কাকলি।

দুই

কত রাত কে জানে, সুকান্তর ঘুম ভেঙে গেল। বুকে-পিঠে অসহ্য ব্যথা। এ কি, কী হয়েছে তার? যেন ঠিকমত নিশ্বাস নিতে পারছে না। পারছে না পাশ ফিরতে। মনে পড়ল, দুঃস্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। দুঃস্বপ্ন দেখছিল, যেন সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষা দিতে এসে শুনছে, পরীক্ষা দিতে পারবে না। এ কী ভয়ংকর কথা। দু বেলা টিউশানি, কত কষ্ট করে ফী জোগাড় করা, বাবার ঐ তো প্র্যাকটিস্, পরীক্ষা বন্ধ করে দিলেই হল? এক বছর ড্রপ করার মত গতরও নেই, রসদও নেই। কিন্তু কেন, কী হয়েছে, পরীক্ষা নামঞ্জুর কেন? অঙ্কের পেপারে তোমার পার্সেন্টেজ নেই। অঙ্ক কী মশাই? এম-এ দিচ্ছি হিস্ট্রিতে, একমাত্র সাল-তারিখ ছাড়া সেখানে আর অঙ্ক কোথায়? অঙ্ক তো স্কুল থেকেই পলাতক। ওসব শুনছি না, অঙ্কে পাশ নেই বলে বি-এই নাকচ হয়ে গিয়েছে। কী সর্বনাশ! বি-এ বাতিল হয়ে গেলে চাকরি পাব কি করে, খাব কি, দাঁড়াবে কোথায় সংসার? তা জানি না। অঙ্কে আগে বসতে হবে, বেরিয়ে আসতে হবে বেড়া টপকে। এই নাও কোশ্চেন পেপার, বসো, শুধু ফলটা মিলিয়ে দাও। কী অঙ্ক? পারব তো? খুব সোজা, সামান্য যোগ-বিয়োগ। এ আবার কে না পারে? দিন, দেখি। খাতাপত্র নিয়ে বসে পড়ল সুকান্ত। কিন্তু এ কি, কলম আনে নি তো? লিখবে কি দিয়ে? এ-পকেট ও-পকেট পাগলের মত হাটকাতে লাগল। এই যে, কী আশ্চর্য, একটা কলম বেরিয়েছে। কিন্তু, শুকনো, খড়ের মতো শুকনো, এক ফোঁটা কালি নেই। তবে আর কি, হল থেকে বেরিয়ে যাও, নেমে যাও অন্ধকারে, নিরালায়। তাই নামতে লাগল সুকান্ত। সিঁড়ি নেই, লিফ্‌ট নেই, তবু নামতে লাগল। নামতে নামতে পা ঠেকল এসে শোবার ঘরে, তক্তপোশে।

এমন আজগুবি স্বপ্নও হয়! না, ভয় পাবার কিছু নেই, হতাশ হবার কিছু নেই, নিজের ঘরে

তক্তপোশেই সে ঠিকঠাক শুয়ে আছে। পাশে আলাদা তক্তপোশে শুয়ে আছে ছোট ভাই সুবীর। জ্বর হয়ে ছটফট করছিল প্রথম রাতে, এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তার আলো এসে পড়েছে মশারির উপর। খুটখাট ইঁদুরের শব্দ হচ্ছে এখানে ওখানে, ওষুধের শিশিটা বুঝি ফেলল কাত করে। রাস্তায় কাকে দেখে ক'টা কুকুর উঠেছে হল্লা করে, আর, একবার আওয়াজ তুললে, সে লোকটা থাক বা চলে যাক, কিছুতেই যেন আর ঠাণ্ডা হবার নাম নেই। হুস করে একটা মোটর বেরিয়ে গেল। হর্ন দিচ্ছে কেন? পথ জুড়ে গরু শুয়ে আছে বোধ হয়। না কি রাস্তার মাঝখানে এক রিকশাওয়ালার সঙ্গে এক মাতালের ঝগড়া?

মামুলি, মুখস্থ পরিবেশ। একেবারে হুবহু। কিছুই সুকান্তর খোয়া যায় নি, না পার্সেন্টেজ, না বা কলমের কালি। তার বি-এ পাশ বহাল আছে, অঙ্ক কিছুতেই ঘটাতে পারে নি গ৯.মিল। সব তার মজুত আছে, নিখুঁত আছে, কিছুই হয় নি তছরূপ। চোখবোজা অন্ধকারে চারদিক সে ভালো করে চেয়ে দেখল। সব যে-কে সে।

শুধু তাই? শুধুই পূর্বাবস্থা? শুধুই একটা বাসি, পুরোনো হিসেবের মিটমাট ? নতুন কিছুই হয় নি? নতুন কিছুই আসে নি জমার ঘরে?

কী যেন এসেছে, কী যেন হয়েছে, কী যেন পেয়েছে—আশ্চর্য, মনে করতে পারছে না। টিক-টিক-টিক-টিক, টেবিলের উপরে টাইম-পিস ঘড়িটার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে—এক, দুই, তিন, চার—তবু ভাবনার শ্লেটে স্মৃতির দাগ পড়ছে না। কী যেন একটা ভালো খবর, পথে কুড়িয়ে-পাওয়া কিছু টাকা, একটা হয়তো বা শাঁসালো টিউশানি, নয়তো বা পরীক্ষার ক'টা নির্ঘাত ফাঁস প্রশ্ন—সৌভাগ্যের চেহারাটা কল্পনায় কিছুতেই দাঁড় করাতে পারছে না। হাতড়ে-হাতড়ে মরছে।

অস্থির-অস্থির লাগছে। কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে।

হবেই তো, বুকে অসহ্য ব্যথা। পাশ ফিরতে পারছে না।

যন্ত্রণাটা কি রকম, সমস্ত চেতনা ঘন করে, একত্র করে অনুভব করতে চাইল সুকান্ত। কী অদ্ভুত, ব্যথা কোথায়? এ যে সুখ। উত্তাল সুখ। এ যে সৌরভের সমুদ্র।

সুখ যখন খুব বেশি হয় তখন বুঝি ব্যথার মতই লাগে।

আশ্চর্য, বুকের কত কাছে দাঁড়িয়েছিল কাকলি।

কত কাছে! প্রায় নিশ্বাসের নাগালের মধ্যে। এক ফুঁয়ে ধুলো উড়িয়ে দেবার কাছাকাছি।

পাশ ফিরতে কষ্ট হচ্ছে নাকি সুকান্তর? কোথায় কষ্ট ? এ তো গভীর আরামের ঢেউ। দিব্যি পাশ ফিরল। উপুড় হল। আপ্রান্ত বিস্তৃত হল। ঘুমের নবনীর মধ্যে ধীরে-ধীরে নেমে যেতে লাগল, ডুবে যেতে লাগল।

এত কাছে, তবু তাকে একটুও ছুঁতে পারল না। গহ্বরে নেমেও ধরতে পারল না বিগ্রহ।

কাঙালের মত ক'টি কৃপণ আঙুল ধরলে হত কী! উঃ, সে কতকেলে পুরোনো কবিতার ঢং। তার চেয়ে দস্যুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্জয় দুই বাহুর মধ্যে সেই এক তাল কোমল ভয়কে পারত লুফে নিতে ? কই, পারল কই? কেউ পারে?

কেউ পারে না। ভাবতেও পারে না।

চুপ করে ঘুম যাও। কল্পিতার সামনে অন্ধকারে এখন সাহস দেখাচ্ছ কিন্তু সাধ্য নেই দিনের বেলায় ছোঁও সেই বাস্তবী তনু। সাধ্য নেই তার এক তন্তু বসনকে বিশৃঙ্খল করো। কষ্ট করে পাহাড়ের চুড়োয় উঠলেই ধরা যায় না চন্দ্রমা।

যে সমস্ত জোরকে স্থগিত রাখে, তটস্থ রাখে, দাঁড় করিয়ে রাখে একটা ধারালো ক্ষুরের উপর, তারই শক্তি অসীম।

আর যে তুঙ্গতম শৃঙ্গে উঠেও নিচের অন্ধকার গুহায় ঝাঁপ দেয় না, পুরদ্বারে উপনীত হয়েও ফিরে দাঁড়ায়, হায়, তার কোনো শক্তি নেই!

আগুনের উপশম জলে, ক্লান্তির উপশম ঘুমে, খিদের উপশম আহারে। কিন্তু যন্ত্রণার উপশম যন্ত্রণায়।

পাহাড়ের চুড়ো যত উঁচুই হোক পায় না চাঁদকে। কিন্তু সমুদ্র, যে অনেক নিচে প'ড়ে, তারই উদ্বেল

বুকে শত-কোটি অজস্র হয়ে ভেঙে পড়ে চাঁদ।

আহাহা, যাবার সময় কী না জানি বললে। কান খাড়া করল সুকান্ত।

পাশের ঘরে সেন্টু কেঁদে উঠেছে বুঝি। ওর মা ওকে ধমকাচ্ছে। যত ধমক খাচ্ছে তত চড়ছে তার চিৎকার। কী চাইছে ছেলেটা? যেমন অবুঝ মা, তেমনি অবুঝ ছেলে। উঠে ওকে নিয়ে এলে হয় এ-ঘরে। সুকান্তর কোল পেলে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়বে নিশ্চিন্তে। সকাল হতে আর কত বাকি? সকাল হলেই দরজা খোলা পেয়ে ঠিক চলে আসবে গুটি গুটি। মশারি তুলে মুখ বাড়াবে। ডাকবে দুগ্‌গা-দুগ্‌গা বলে। কবে আর ভোরের সূর্য দেখেছে সুকান্ত, রোজ দেখেছে এই শিশুর মুখ। প্রত্যহের একটি পরিচ্ছন্ন আরম্ভ।

মাকে হারিয়ে দিয়েছে সেন্টু। যা আদায় করবার করে নিজের থেকেই শান্ত হয়েছে।

আহাহা, কী যেন কথাটা, কেমন করে না জানি বলেছিল! সঙ্গে ছিল কি একটু হাসি, একটু বা হাসির অতিরিক্ত ইশারা?

হাসির শব্দটা মনে-মনে নির্মাণ করতে পেরেছে সুকান্ত।

হাসি কোথায়, থমথমে জমাট আকাশে মেঘ ডাকছে। ঝেঁপে বৃষ্টি এল, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল রাস্তাময় মানুষের শোরগোল। ছাদহারা ঘুমহারা মানুষ। যার যা কাঁথা-ন্যাতা চট-মাদুর সব গুটিয়ে নিয়ে উঠে এসে বসেছে উবু হয়ে। যারা মাথার উপরে ঝুলবারান্দা পায় নি তারা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। তোড় বেশি হলে বা বেশিক্ষণ ঝরলে এ বিরাট বিনিদ্র জনতা কোথায় গিয়ে মাথা রাখবে কে জানে। আহা, বৃষ্টিটা ধরুক, ফুটপাত শুকিয়ে যাক দেখতে-দেখতে। ওদের আবার নতুন করে ঘুম আসুক। ওরা জেগে আছে জানলে এই বাকি রাতটুকু বুকের মধ্যে বৃষ্টির শব্দ নিয়ে, হাসির শব্দ নিয়ে, সে ঘুমোয় কি করে?

কিন্তু কাকলি জেগে আছে জানলে?

আমি আর তুমি। আমি আর তুমি। সূর্য আর সোম। নাদ আর বিন্দু। প্রাণ আর মন।

ছোট-ছোট হাতে বন্ধ দরজায় কে ধাক্কা মারছে। ভোর হয়ে গিয়েছে বুঝি। অন্য দিন হলে সুবীরই আগে থেকে উঠে দরজা খুলে দিত, ধাক্কা মারবার দরকারও হত না সেন্টুর, টক করে ঢুকে পড়ত, আর তাকে নিয়ে বিছানায় আরো খানিকটা গড়িমসি করতে পারত সুকান্ত। কিন্তু আজ যে সুবীরের জ্বর। তাই সুকান্তকেই উঠতে হল উদ্যোগ করে। কিন্তু, আশ্চর্য, বিরক্ত হল না। কেন বিরক্ত হল না? খোলা জানলা দিয়ে উনুনের ধোঁয়া আসছে, তবু না। ও! কী যেন তার হয়েছে, কী যেন তার এসেছে—মনে করতে পারছে না। দাঁড়া, খুলছি। তার আগে ছোঁড়াটাকে একটু দেখি। সুবীরের বিছানায় গিয়ে তার ঘুমন্ত কপালে হাত রাখল সুকান্ত। ঠাণ্ডা, জ্বর নেই। সুবীর চোখ চাইল। এ কি, তুমি? এ যেন সুবীর ভাবতেও পারত না—ধড়মড় করে উঠে বসল। অপরাধীর মত মুখ করে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, দরজাটা খুলে রাখতে ভুলে গিয়েছি।'

'না, তোর উঠতে হবে না। আমিই খুলছি।' সুকান্তর হাতে-কণ্ঠে মমতা ঝরে পড়ছে : 'তোর শরীর দুর্বল, সারা রাত তোর জ্বর গিয়েছে। তুই শুয়ে থাক চুপ করে।'

বাধ্য ছেলের মত সুবীর শুয়ে পড়ল।

নিজেই দরজা খুলল সুকান্ত। আর তার বাড়ানো দুই হাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেন্টু।

'কতক্ষণ তোমাকে ডাকছে।' ঘুম-খসা শাড়ির আঁচলটা মেঝেতে লুটোচ্ছে, এলোমেলো পায়ে এগিয়ে আসতে-আসতে বললে বন্দনা।

এখন সেন্টুকে গল্প বলো—অন্ধকার-দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে তাকে ধরে হটিয়ে দিয়ে গায়ে রক্ত মেখে কেমন করে পাহাড়ের উপর উঠে এল সূয্যিমামা, কেমন করে আলোর বাণ ছুঁড়ে ছুঁড়ে জাগিয়ে দেয় পাখিদের, ফুলদের, শিশুদের—ঝন্টু-সেন্টুদের—কত হাসি ফোটায়, গান ফোটায়, রঙ মাখায়—

'আমাকেও জাগিয়ে দেয়?' চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করে সেন্টু।

'তোমাকেও।'

'কিন্তু রাত্রে যখন জাগি?'

'তখন তো অন্ধকারের দত্যিটা আসে। তখন তো তুমি কাঁদো—'

'দত্যিটা তো খারাপ। আমার ভয় করে। আর, শোনো কাকা', সুকান্তর চিবুক ধরে মুখটা নিজের দিকে পুরোপুরি ঘুরিয়ে নেয় সেন্টু : 'সুয্যিমামা খুব ভালো। তার বাণে একটুও ব্যথা নেই।'

'কি করে থাকবে। তার বাণ যে আলোর বাণ। চুমুর মত মিষ্টি। ছোট-ছোট কচি আঙুলের মত।'

'সুড়সুড়ি দেয়, তাই না?' বলতে-বলতেই চিবুকের নিচে কাকার প্রত্যাশিত আঙুলের আদর পেয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে সেন্টু।

মৃণালিনী ঘুম থেকে উঠেই সংসারবন্দনা শুরু করে দিয়েছে। প্রথমেই চাকরধোলাই। এত দেরি ক'রে উনুনে আগুন দিয়েছে কেন? আর ধোঁয়ার পরিমাণ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, কত বেশি খোরাক পোরা হয়েছে গহ্বরে। চারদিক থেকে এমনি যদি অপচয় চলে, তা হলে ভরাডুবির আর বাকি কি।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে বিজয়া। খরখরে গলায় পালটা জবাব দেবার লোভ সে সামলাতে পারে না : 'হরিপদ কোথায়। ভোর রাতে কয়লাঘর থেকে ঘুঁটে আনতে গিয়ে তার হাতে বিছে কামড়েছে। তাই আমিই আগুন দিয়েছি।'

'সেই যখন দিলে ঠিক টাইমে দিলেই হত।' কথার পিঠে কথা বলতে কখনো নিবৃত্ত নয় মৃণালিনী : 'চায়ের পাট উঠবে, তারপরে প্রশান্তর আফিসের ভাত। দুটো ঠিকঠাক আজ খেয়ে যেতে পারলে হয়।'

'কেন, প্রশান্তর বউ কি করে?' ঝামটা দিয়ে উঠল বিজয়া।

'সে তো রাঁধবেই এ-বেলা। শুধু উনুন ধরিয়ে চায়ের জলটা গরম করে রাখা।'

'কিন্তু যার তা করবার কথা সেই চাকরের যদি কোনো বিপদ হয় তা হলে দেরি তো একটু হবেই।' মৃণালিনীর মুখ আবার কুটকুট করে উঠছে দেখে বিজয়া দাবড়ে উঠল : 'একটা লোক কষ্টের মধ্যে পড়লে তাকে একটু দেখতে-শুনতে হয় তো! সেই বিছেটাকে মেরে ঘষে দিতে হয় তো সেই যন্ত্রণার জায়গায়। আমি তো আর উপরতলার বাসিন্দে নই যে, নিচেরতলার লোকের কান্না শুনব না। যান না, দেখুন না কেমন ছটফট করছে হরিপদ।'

সে পরে দেখা যাবে। এখন এই উপরনিচ বলে খোঁটা দেবার মানেটা কি! কে থাকতে বলছে নিচে! সোজা বেরিয়ে গিয়ে তেতলার ফ্ল্যাট নিয়ে থাকলেই তো হয় আলাদা। মৃণালিনী মারমুখো হয়ে উঠল।

বিজয়াও মরিয়া হতে জানে। বললে, 'তা হলে মাস মাস গুনে গুনে এক মুঠো টাকা পেতে হত না। সংসারের তলা ফুটো হয়ে যেত।'

'সংসারটা ছিল বলেই, গায়ে লাগে না তো, চলছে বরফট্টাই।' কাটান ঝাড়ল মৃণালিনী : 'ঐ যে কি না বলে, উপরে চিকনচাকন ভেতরে খ্যাড়।'

মূল নেই তুমুল শুরু হয়ে গেল। চটি পায়ে ভূপেন নেমে এল উপর থেকে। পিছু-পিছু বন্দনা। নিচের ঘর থেকে বেরিয়ে এল হেমেন।

'ভালো করে এখনো কাক ডাকে নি, আর তোমাদের ডাক এরই মধ্যে তারস্বর হয়ে উঠেছে।' ভূপেন সালিশির ভঙ্গিতে বললে, 'এদিকে চাকরটা যে যন্ত্রণায় মারা যাচ্ছে তার খেয়াল করলে না? একজন ডাক্তার ডাকতে হয় তো!'

দু পক্ষ চুপ করল। শোনা গেল হরিপদর গোঙানি।

'গান থামে তো বাজনা থামে না। আমার ঘুমের পরিশিষ্টটা এখনো বাকি।' হেমেন ফিরে গেল নিজের ঘরে। নিজের মনে বললে, 'ঘুমের পরিশিষ্ট মানে বিছানায় শুয়ে আড়মোড়া ভাঙা। আর বেড-টি'র জন্যে অপেক্ষা করা।'

'বেড-টি! ব্যাড টি-ও জুটবে না আর এখানে।' বিজয়া ঝাঁজিয়ে উঠল।

যেন ভয় পেয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে বিছানায় আবার ঢুকে পড়ল হেমেন।

'ও কি, আবার শুচ্ছ যে।'

'তখন সেটা ঠিক ওঠা হয় নি, ছোটা হয়েছে।' ভয়ে-ভয়ে হাসতে চাইল হেমেন : 'ঘুম থেকে ওঠা আর বিছানা ছেড়ে ছোটা দুটো আলাদা জিনিস। তোমাদের ঝগড়া শুনে আমি তখন বিছানা ছেড়ে ছুটে এসেছি, ঘুম থেকে উঠে আসি নি। আমার ঘুম তাই একটু বাকি আছে। কীর্তনের পরে বাতাসা। ঘুমের পরে ঘুমো-ঘুমো একটু আলস্য করা—'

গজগজ করতে লাগল বিজয়া।

যত খুশি বকো আর ঝকো রাজি আছি, দয়া করে কাঁদতে বোসো না।

এ বাড়িতে কাকে আর বলবে, ভূপেন নিজেই গেল ডাক্তারকে খবর দিতে।

প্রশান্তও উঠেছে, একটা সিগারেট ধরিয়ে বসেছে জানলায়। সংসারের বাঁধিগতের ঐকতান শুনে এতটুকুও সে বিচলিত হচ্ছে না। শুধু ভাবছে, বন্দনা না তার কাঁসিটা জুড়ে দেয় এর সঙ্গে।

পেস্ট দিয়ে সেন্টুর দাঁত মেজে দিচ্ছে সুকান্ত। বলছে, 'ওরা-ওরা ঝগড়া করুক, আমরা কোনোদিন ঝগড়া করব না।'

'এক মুখ ওথলানো পেস্ট নিয়ে সেন্টু বললে, 'না।'

'আমরা সব সময়ে মিলে-মিশে থাকব, মিষ্টি করে কথা কইব।'

মুখ খোলসা করে নিয়ে সেন্টু বললে, 'কইব।'

'আমরা খারাপ জিনিস দেখব না, খারাপ কথা কইব না, খারাপ কথা শুনব না—'

'আমরা, না কাকা?'

'হ্যাঁ, আমরা।'

'আমি আর তুমি—খুব মিষ্টি—না, কাকা?'

'ভীষণ মিষ্টি। ভয়ংকর মিষ্টি।' অবোধ শিশুটাকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে চেপে ধরল সুকান্ত : 'আমি আর তুমি। জগৎসংসার উচ্ছন্নে যাক, ভেসে যাক প্রলয়ের জলে, তবু আমাদের ছাড়াছাড়ি নেই।'

মৃণালিনী বাজারে পাঠাবার লোক খুঁজছে।

'তুই ছাড়া আর লোক নেই।' পড়ার টেবিলে বসে কি লিখছিল সুকান্ত, মৃণালিনী আর্জি পেশ করল।

'আমি? আমি বাজারে যাব?' যেন নাড়ী ছেড়ে গিয়েছে এমনি মুখ করল সুকান্ত।

'উপায় নেই।' গাম্ভীর্যে মুখ কঠিন করল মৃণালিনী : 'হরিপদ অচল। সুবীরের জ্বর। কাজে কাজেই—'

কাজে কাজেই? আমি যাব ঐ চটের থলে নিয়ে, এমনি লুঙ্গি পরে, গেঞ্জি-গায়ে, লক্ষ্মীছাড়া চেহারায়? আর কোন বেশবাস বা মিল খাবে ঐ থলের সঙ্গে? জলকাদার মধ্যে বাজার ঘুরে-ঘুরে জিনিসের দর করব, নেড়ে-চেড়ে, টিপে-টুপে উলটিয়ে-পালটিয়ে? তারপর ঠকে আসব? থলের মুখ দিয়ে আনাজপাতি বেরিয়ে থাকবে আর তাই বয়ে নিয়ে আসব অশালীনের মত? আমি কি উদ্‌ভ্রান্ত না মতিচ্ছন্ন?

'বাবাকে বলো।' উদাসীনের মত বললে সুতান্ত, 'বাইরের ঘরে নিশ্চয়ই বসে আছেন নিশ্চিন্ত হয়ে। মক্কেল নেই—'

'তোরও তো আক্কেল নেই।' আর্জি নয়, ফরমাশ জারি করল মৃণালিনী : 'ওঠ বলছি। প্রশান্তর আফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে—'

'সে আফিস আর কদ্দিন!' একটা নাটুকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুকান্ত।

'উঠলি?' টেবিলের কাছ ঘেঁষে মুখিয়ে এল মৃণালিনী। বোধহয় গায়ের জোরে টেনে তুলবে হাত ধরে।

'বাঃ, আমার এ বছর শেষ পরীক্ষা না? নোটগুলো তুলে না নিলে চলবে কেন? যার নোট তাকে তার খাতা বিকেলের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। তোমরা কি চাও আমি একটা থাড্‌ডো ক্লাস নিয়ে বেরিয়ে আসি? এরই জন্যে আমি সকালের টিউশানিটা পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম—'

'তাই বলে বাজার ছেড়ে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া, তুই নোট টুকছিস কোথায়?' লেখাটার উপর মৃণালিনী উপুড় হ'য়ে পড়ল : 'এ তো বাঙলা লেখা। নীল কাগজের প্যাড়, এ তো তুই কাকে চিঠি লিখছিস—'

অসম্ভব। কতগুলো বইখাতা দিয়ে লেখার কাগজটা চাপা দিয়ে উঠে পড়ল সুকান্ত। এম-এ পরীক্ষার্থী ছেলের লেখাপড়ায় আড়ি পাততে আসে, কী দুর্ধর্ষ মা দেখ একবার! 'দাও, টাকা দাও, ফর্দ দাও।' হাত বাড়ায় সুকান্ত : 'দরে যদি ঠকে আসি কিছু বলতে পারবে না কিন্তু। খুঁত ধরতে পারবে না। যা আনব তাই গিলতে হবে।'

মৃণালিনীর চোখ তখনো নীল কাগজটা খুঁজে বেড়াচ্ছে : 'কিন্তু কাকে চিঠি লিখছিলি?'

'কাকে আবার চিঠি লিখব? আমার কি কোনো লোক আছে, না কারু আমি ঠিকানা জানি? আমি অমনি শুধু একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম। এক লাইব্রেরিতে একটা এসে-কম্পিটিশন হচ্ছে—ক্যাশ প্রাইজ আছে, ভাবছি পাঠালে হয় একটা রচনা। তারই একটু মক্স করছি। দাও, দাও, আর দেরি কোরো না। দাদার আবার ন'টায় হাজিরা।'

মৃণালিনী একটু আড়াল হতেই প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে পুরল সুকান্ত। নইলে মা'র যখন একবার নজর পড়েছে তখন আর ওটাকে বাঁচানো যাবে না।

মনে-মনে একটা চিঠি লিখছিল কাকলিকে। নিভৃতে-নেপথ্যে এ লেখাটুকুই মনে মনে লেখা। যদি লেখবার অধিকার থাকত, যদি ঠিক মুখস্থ থাকত ঠিকানা, তা হলে কিভাবে লিখত তারই নির্জন নিদর্শন।

আপনি মনেও ভাববেন না, আমি লিফ্‌টম্যানকে হাত করে আপনাকে খাঁচায় পুরে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। দুর্ঘটনায় কত কি বিপরীত কাণ্ড ঘটে কেউ অনুমানও করতে পারে না। একটা জাহাজডুবির পর দেখতে পারি শুধু আমি আর আপনিই বেঁচে আছি, আর শুধু বেঁচে আছি নয়, পাশাপাশি বসে আছি সমুদ্রতীরে। সবই দৈবের ব্যবস্থা।

না, না, এভাবে লিখলে ভারি বিসদৃশ শোনাবে। তার চেয়ে মনের কথা সোজাসুজি লিখে ফেলাই ভালো। প্রাণ যাতে জল হয় সেই প্রাঞ্জল কান্নায়।

মৌটুসকি—বলো, এছাড়া আর কী বলে তোমাকে সম্বোধন করতে পারি? তোমার নাম কাকলি, আদর করে সম্বোধন করতে হলে কাক বা কাকু বলে ডাকতে হয়—দুইই ভয়াবহ। তার চেয়ে তোমাকে মধুমুখী, তাচ্ছিল্যে মুড়কিমুখী ডাকা অনেক মিষ্টি। শোনো, তোমার জন্যে কত কিছু করতে পারি, এ তো সামান্য একটু কৌশল। এ কি তুমি মার্জনা করে নেবে না? এটুকু না করলে কি করে পাই তোমার সান্নিধ্যের সৌরভ, তোমার উষ্ণতার স্বীকৃতি? বলো, আমার কি খুব অপরাধ হয়ে গিয়েছে? তুমি কি উপরওয়ালার কাছে আমার নামে নালিশ করবে? এনকোয়ারি বসাবে? একটা গরিব লিফ্‌টম্যানের চাকরি খাবে?

না, না, তুমি তো বুঝতে-পারা টলটলে চোখ মেলে হাসলে, আমি-তুমি বললে। ঐটুকু নৈকট্য না হলে এতটুকু কি হত?

কী সুন্দর তোমার চোখ, তোমার দাঁড়াবার ভঙ্গি, তোমার নাকের ঠিক নিচে আর উপর-ঠোঁটের ঠিক উপরে ছোট্ট এক তিল ঢেউ, তোমার ঘননিবদ্ধ লাবণ্যের দুটি স্তূপ—

ছি, অমনি করে কি লেখা যায়?

বাঃ, এ তো মনে-মনে লেখা। এ তো কেউ পড়বে না, কেউ দেখবে না। যে জানলে খুশি হত সেই কাকলিও নয়।

চিঠির কাগজটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে টুকরোগুলো পকেটের মধ্যেই রাখল সুকান্ত। রাস্তায় জায়গায়-জায়গায়, এখানে-ওখানে কিছু-কিছু করে ছড়িয়ে দেবে। নইলে, বাড়িতে টেবিলের নিচে ঝুড়ির মধ্যে ফেললে, মা'র যা উৎসাহ, কে জানে, হয়তো বা ভাঙা প্রাণ জোড়া দিতে বসবেন। ধরা পড়ে গেলে কিছুতেই তাঁর কাছে আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই। টিউশানির মাইনের পর্যন্ত চুলচেরা হিসেব নেবেন। তার মানে অগুন্তি মিথ্যে কথা বলাবেন। কদাচিৎ একটা পয়সা এদিক-ওদিক হলে ভিখিরিকে

দিয়েছি বলে পার পেতে দেবেন না। ছাড়া পাঞ্জাবির পকেটে, এমন-কি ঘড়ির পকেটেও, হাত ঢোকাবেন লুকিয়ে।

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, স্বাধীনতার চেয়েও সতর্কতা।

বাজারের থলে আর টাকা নিয়ে এল মৃণালিনী। সুকান্ত বললে, 'একটা ফর্দ লিখে দাও।'

'নিত্যিকার বাজারে আবার ফর্দ কি। যা বলছি তাই মনে করে নিয়ে আসবি। নইলে মাথাওয়ালা ছাত্র হয়েছিস কি করতে?' মৃণালিনী বিস্তৃত ফিরিস্তি মেলে বসল।

'কার কি দর?' অন্ধকার দেখল সুকান্ত।

'নিজে দেখে-শুনে দেখে নিবি, ঘুরে-ঘুরে—'

হরিপদকে দেখতে গেল সুকান্ত। এতক্ষণে সুস্থ হয়েছে খানিকটা। তাকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করে জেনে নিল দরাদর।

হরিপদর বাজারদরের সঙ্গে সমতা রাখতে গিয়ে সুকান্ত দেখল নিট বারো আনা পকেটে।

তুমি আমার এ মূর্তিটা দেখো না। আমি থলে হাতে বাজার করে ফিরছি, আমি চোর, আমি মিথ্যেবাদী, এ আমার পরিচয় নয়। তুমি কোন না একদিন কোমরে শাড়ি জড়িয়ে ঝাঁটা হাতে করে তোমার শ্যাওলা-পড়া নোংরা উঠোন পরিষ্কার করবে, কোন না দুটো মিছে কথা বলবে, খরচ-বাঁচা টাকা দুটোর একটা কোন না সরাবে এদিক-ওদিক। তবু সেই তোমার পরিচয় নয়। আমি চাকর নই, তুমিও দাসী নও। আমি আসলে রাজা, তুমি আসলে সম্রাজ্ঞী।

তিন

তারপর একটা চিঠি এল।

যেন কী একটা তুচ্ছ অকেজো জিনিস এমনি অবহেলায় পিওন ছুঁড়ে দিয়ে গেছে জানলা দিয়ে। কান্নার মতন উপুড় হয়ে রয়েছে মেঝের উপর। আফিস-কাছারি টাইমের তাথৈ চলছে, গিন্নিবান্নিরা দিতে-থুতে ব্যস্ত, চাকরটা ছুঁচো-বাজির মত এখানে-ওখানে ছুটছে, ঠিক এ সময়টাতেই জমাদার আসে। যাতে খোলা নর্দমার মুখে ভর্তি-জল বালতি-সমেত চাকরের সঙ্গে না মুখোমুখি দেখা হয়। যাতে ঝাঁটাগাছটা শিল্পীর তুলির মত এখানে-ওখানে এক-আধটু বুলিয়েই পালিয়ে যেতে পারে। যদি গোলমেলে হাওয়া উঠত আর চিঠিটা ঘুরে-ঘুরে উড়ে চলে যেত বারান্দায় তা হলে জমাদারের হাত থেকে তাকে আর বাঁচানো যেত না। গ্যাসপোস্টের নিচে যেখানে আবর্জনা জমা তারই উপর মাতৃহীন শিশুর মত পড়ে থাকত। আর ঐ যে নোংরা বস্তা হাতে কাগজকুড়োনো লোকটা আসে. দেখতে আধপাগল, সে ছোঁ মেরে কেড়ে নিত—জানতেও পারত না কী সে কুড়িয়েছে।

ভাগ্যিস হঠাৎ এদিকে এসে পড়েছিল সুকান্ত।

একটা সাদা খামে কালো কালির অক্ষর। মেঝের দিকে তাকাতেই নিজের নামটা স্পষ্ট চোখে পড়ল। স্ট্যাম্প দেখা যাচ্ছে না। স্ট্যাম্প বুঝি ওপিঠে সাঁটা। সেটাই বুঝি সম্ভ্রান্ত। ঠিকানার পিঠটা নিটুট রাখা। আর যেখানেই স্ট্যাম্প, সেখানেই সীল। যেখানে উৎপত্তি সেখানেই নিবৃত্তি। কে জানে কী চিঠি! হয়তো হাতে করে তুলে নিয়ে পৃষ্ঠা ওলটালে দেখবে একটা বুকভাঙা বুক-পোস্ট! মুখটা পেটের মধ্যে ঢোকানো। তার নামে আবার সুস্থ-মস্ত খামের চিঠি এল কবে? যে দু-একটা এসেছে ঐ আজে-বাজে বুকপোস্ট ছাড়া আর কী! হয় কোনো বিজ্ঞাপনের হ্যাণ্ডবিল, নয়তো কোনো বারোয়ারির নিমন্ত্রণ। আর কখনো-সখনো পোস্টকার্ড। পোস্টকার্ড তো নয় থান ইট। লাইব্রেরির বইয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে—শিগগির ফেরত দিয়ে যাও, নয়তো কোনো ক্লাবের মেম্বার হয়ে চাঁদা বাকি ফেলেছে, তার এক আহ্নিক হৃৎকম্প।

নিচু হয়ে সুকান্ত তুলল চিঠিটা। চোখ বুজল। লাগ ভেলকি লাগ, যেন বুকপোস্ট হয়—তা হলেই উলটোটা হবে। চোখ বুজে ওলটাল খামটা—ধীরে ধীরে চোখ মেলল—না, আশ্চর্য, আগাপাশতলা

মোড়া পরিপূর্ণ মাশুল চাপানো আস্ত-সুস্থ সুরক্ষিত চিঠি। আঠার আহ্লাদ একেবারে খামের সীমা পেরিয়ে বাইরে চলে এসেছে; তার মানে খুব সতর্ক হয়ে নিবিষ্ট যত্নে এঁটে-সেঁটে দিয়েছে, যাতে সহসা না কেউ মুক্ত করতে পারে, আলগা করতে পারে প্রাণ-ভ্রমরের কৌটো। কিন্তু কে লিখেছে এ চিঠি ?

আর কে!

হাওয়ায়-আসা গলার স্বর শুনে মেয়ে বলা যায়, বলা যায় জুতো দেখে, আরো একটু সূক্ষ্মে গেলে, তেলের বা সাবানের গন্ধে, তেমনি বলা যায় হয়তো হস্তাক্ষরে। এবং আর একটু গভীর গবেষণা করলে বলেও দেওয়া যায় কত বয়সের হস্তাক্ষর। গায়ে যদি নতুন যৌবনের গর্ব থাকে সাধ্য কি অক্ষরে সেই গোলালো গরিমা না আনো। সাধ্য কি না ফোটাও একটু ছিমছাম টানটোন। তা ইংরেজিতেই লেখো বা বাংলাতেই লেখো। মেয়ে ভাবতেই অত উৎসাহিত হবার আছে কী? মাসিমা-ফাসিমার তো হতে পারে, কিংবা পিসিমা-টিসিমা। কার কী দরকার পড়েছে, চিঠিতে লিখতে তো বাধে না, ফরমাশ করে পাঠিয়েছে। চিঠিটা ওজনে বেশ ভারি, হয়তো কারু ছেলেমেয়ের বইয়ের ফিরিস্তি, ওল্ড বুকশপ থেকে কিনে দেবার বায়না। ভাগ্যের ভাণ্ডারে কত রসিকতাই আছে। হালকা একটা ইচ্ছেকে হোঁচট খাওয়াবার জন্যে পথচলতি কত নিষ্ঠুরতার ইট। কিন্তু যাই বলো, বনগাঁবাসী মাসিপিসিরা কেউ নয়, স্ট্যাম্পের কালি ধেবড়ে গেলেও টি-টি-এ পড়া যায়। কলকাতা ছাড়া অমন নামের ঘটা-ছটা আর কার। গড়বেতা বরপেটা দীনহাটা হরিণঘাটা যাই ভাবো, যাই বলো, সব একটা টি। শুধু কলকাতাতেই ডবল টি।

সন্দেহ কি, কাকলির চিঠি। কলকাতায় কাকলি ছাড়া আর মেয়ে কই? বেশ তো, স্থির হলে, এখন খুলে দেখলেই তো হয় কে লিখেছে! অচল-অনড় হয়ে আছে সে কী করে? আহা, কী লিখেছে সে কি আর জানে না? নেহাতই মামুলি নীরস ক'টা কথা, পড়া-পরীক্ষা নিয়ে নিষ্প্রাণ এক-আধটা প্রশ্ন এবং শেষকালে 'শুভেচ্ছা' ও নামসই। জানে, জানে, ওদিক থেকে গাছে উঠে মই খোয়াবার তার ভয় নেই। হয়তো বা তার ব্যবহারের ত্রুটিতে আপত্তি করে পাঠিয়েছে। ফৌজদারিতে কাসুন্দি পুরোনো হয় না, অপরাধের তামাদি নেই। আর যদি কিছু লেখেও ভাষার টানে, দেখবে, ইচ্ছে করেই ঠিকানাটা উল্লেখ করেনি। যাতে ছটফট করলেও উত্তরে উপশম না পায় কোনোদিন।

জানে, জানে, সব সুকান্তর জানা। আরো জানে, যা লিখেছে দু' লাইন, সামান্য একটা পোস্টকার্ডেও তা লিখতে পারত অকপটে। কিন্তু ন্যাড়া পোস্টকার্ড না পাঠিয়ে সজ্জিত ও আবৃত যে একটি খাম পাঠিয়েছে তাইতেই সুকান্ত ভরপুর। খামের মধ্যে চিঠিতে লিখিত তেমন কিছুই নেই, না থাক, কিন্তু চিঠির অতিরিক্ত, অলিখিত কিছু আছে, সেইটিই মহৎ। কাকলি জানুক আর না জানুক, খামের মধ্যে সে শুধু চিঠির কাগজই ভরে নি, ভরে দিয়েছে একটি প্রতীক্ষা বা একটি আকাঙ্ক্ষার কস্তুরি। চিঠির আর মূল্য কি, চিঠির মূল্য আমি তার মধ্যে কী পড়ছি তাতে নয়, কী অলিখিত উদ্ধার করবার আশা করে আছি তাতে। কী লিখেছে তার চেয়ে কে লিখেছে সেই আমার অনেক। এ সামান্যটিই অমূল্যের পোশাক পরতে পারে শুধু আমার দেখবার গুণে, একান্ত করে আমার কাছে। ধানের শিষে শিশিরটিকেই দেখি না দেখি সেই হাসিখুশি সূর্য, গগন ছাড়া যার স্থান নেই। তাই চিঠি কে দেখে! এক মুহূর্তের জন্যে তাকে দেখি। তার নত একটি দৃষ্টি, নম্র একটি পৃথুলতা, নিবিড় একটি নিভৃতি, নিটোল একটি বিন্দুর মত মন। তোমরা তট দেখ আমি তল দেখি।

চিঠিটা রাখবে কোথায়, লুকোবে কোথায়? ছি ছি, এ তার কী পোশাক, গায়ে গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি। লোকে ঠিক রকবাজ হামলাবাজ মনে না করলেও বাউণ্ডুলে ভাববে। কে জানবে তার ভিতরের কথা। সাধে কি আর মানুষে নেমপ্লেট লাগায়, পদবীর পদ্মবনে ঘুরে মরে! আমার ভীষণ ভূষণে দরকার নেই, গায়ে একটা শুধু জামা থাকলেই আমার এখন চলে যেত, চিঠিটা অপ্রকট করতে পারতাম। খামের চিঠি প্রকাশ্যে কেউ খুলবে না, তা ঠিক, কিন্তু কৌতূহলী তো হবে। আর মেয়েদের কৌতূহল গলাকাটা ছুরির চেয়ে বেশি।

তাকের থেকে বাবার একটা আইনের বই তুলে নিল সুকান্ত। তার মধ্যে গুঁজল চিঠিটা। কি একটা আইনের বই দরকার এমনি ভাব দেখিয়ে তাড়াতাড়ি উঠল উপরের দিকে।

বাবা খাচ্ছেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নিলি?'

'এই বইটা।' কনট্রাক্টের বইটা দেখাল কাত করে।

'লাগবে বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'আবার ফিরিয়ে দিস মনে করে। যে বই সরে সে বই আর ফেরে না।'

একেক লাফে দু-তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে সুকান্ত চলে এল তার নিজের ঘরে। বইটা টেবিলের উপর রেখে পোশাক বদলাতে লাগল। চোখ রাখল নিষ্কম্প, শেষকালে না ভুলে যায়। ষাঁড় ফেলে ভাঁড় নিয়ে না বেরিয়ে পড়ে। একবার একটা দশ টাকার নোট এমনি বইয়ের মধ্যে গুঁজে রেখে কী কেলেঙ্কারি, কোন বই আর মনে করতে পারছে না। বই সরে গেলে আর ফেরে না, যে নিয়েছে দশ টাকা বেশি নিয়েছে। বোঝা তো নিয়েইছে, শাকের আঁটিটাও নিয়েছে।

সে ভুল যেন না হয়!

লুঙ্গি ছেড়ে পরল ট্রাউজার্স, গেঞ্জির উপরে শার্ট। বইটা তুলে নিল। না, অটুট আছে চিঠি, উড়ে যায় নি অবাস্তব হয়ে। না, বাড়িতে বসে পড়বে না—পরে আরো এক শ সাতবার না হয় পড়বে, যদি পড়ার মত কিছু থাকে —প্রথমবার পড়বে নির্মল একটি নির্জনে। চিঠিটা বুকপকেটে রাখল। আর নিল ছুরিটা। অপারেশন করার ছুরি।

বইটা হাতে নিয়েই নামল নিচে। বাবা আঁচাচ্ছেন মানে মুখ আর দাঁত আলাদা করে ধুচ্ছেন, দেখতে পেলেন। বললেন, 'কি, হয়ে গেল পড়া?'

'একটা সেকশান একটু দেখে নিলাম—'

কোন সেকশান জিজ্ঞেস না করলে হয়। তাড়াতাড়ি বইটা রেখে কেটে পড়ছিল, মা ধরলেন : 'পড়া-টড়া ছেড়ে এখন চললি কোথায়?'

'একজন ছাত্রের কাছে যাচ্ছি প্রফেসারের নোট আনবার জন্যে।' বেমালুম বললে সুকান্ত।

দোহাই ওরকম ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিও না। খামটা যে পকেটের থেকে ঢ্যাঙা এ মা'র নজরে পড়লেই হয়েছে! অবশ্য পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে কিন্তু মা'র চোখে সন্দেহের সাপ মরবে না। সসর্প ঘরে কি বাস করা যায় শান্তিতে ?

তার চেয়ে চিঠিটাকে ভাঁজ করে ছোট করে নিলেই হত। ও বাবা, চিঠিটা তা হ'লে দুমড়ে দাগি হয়ে যেত যে। যে দাগি তার কি আর দীপ্তি আছে?

'ফিরতে দেরি করিস নে যেন।' মা মনে করিয়ে দিল।

'না, যাব আর আসব।' সুকান্ত বাইরের রকে দাঁড়াল এক পা : 'আর যদি দেরি হয় তোমরা খেয়ে নিও, বসে থেকো না।'

'তার মানেই হচ্ছে', বউদি টিপ্পনি কাটল : 'ভাত নিয়ে বসে থাকবার লোক ঠিক করে দাও।'

'মন্দ কি, পরীক্ষার পর সুকুর এবার বিয়ে দিয়ে দি।' বললে কাকিমা।

'বিয়ে দি!' মা উঠল ঝামটা দিয়ে : 'বউ নিয়ে উঠবে তার ঘর কোথায়?'

কাকিমাও ধনুকে ছিলা চড়াল : 'আমাকে বলছ তো? বেশ তো, তুমি বিয়ে দাও, বউ আসবার আগের দিনই আমি ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।'

'আমি সেই কথা বললাম!' মা তুড়ুং ঠুকল। : 'বউ-বরণের সময় তুই বাড়ি থাকবি না?'

'নেমন্তন্ন করে গাড়ি পাঠালে থাকতেও পারি বা—' কাকিমা ছাড়বার পাত্রী নয় : 'তবে কতদূরে ঘর পাই, কি রকম সুবিধে-অসুবিধে হয় কে জানে।'

ঠাণ্ডা লড়াই। বারুদ বিদীর্ণ হয় বুঝি। তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে পথে বেরুল সুকান্ত। অনেক ভিড়, অনেক গাড়ি-লরি, ট্রাম-বাস, রিকশা-ট্যাক্সি, হ্যানো-ত্যানো, ঠেলাঠুলি-ঝুলাঝুলি, অনেক গিজগিজ-গমগম—সব পেরিয়ে এগুতে লাগল ফাঁকায়-ফাঁকায়। হাঁটাপথে জায়গায়-জায়গায় অনেক নিরিবিলি, ঐ গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে অনায়াসে পড়ে নেওয়া যায়। কিংবা ঐ বিজ্ঞাপনের বাক্সটার আড়ালে।

কী যে মানুষের কথা! এ কি একটা খবর যে এক ঢোঁকে গিলে নেবে? মাথা উঁচু করে এক চমক

দেখে নেবে কী হচ্ছে ভিড়ের মধ্যে? এ কি শুধু চিঠি পড়া? এ একজনকে পাশে নিয়ে বসা। তাই মাঠ বা ছায়া বা একটি জলের ধার পেলে ভালো হত। সুন্দর সবুজ ঘাস, নয়তো ঝিলিমিলি-ছায়া গাছ, নয়তো ঝিকিমিকি-আলো জল।

কিংবা কে জানে ডাক্তারের নির্জন চেম্বার আর একাকিনী রুগিণী।

আরো খানিকদূর এগিয়ে একটা পার্কে ঢুকল সুকান্ত। এখন আর লোক কোথায়! ঝোপের কোলে একটা বেঞ্চি বেছে নিয়ে বসল সন্তর্পণে। চারদিকে চেয়ে দেখল ধারে-পারে কেউ কোথাও নেই। এ যেন কাকে ও একটু আদর করবে। অন্যে না দেখে, অন্যের চোখে পড়ে আদর না তার কদর হারায়।

চিঠিটা বার করল পকেট থেকে। খুলে ফেললেই তো খোলসা। এক শক্তিশেলেই লক্ষ্মণপতন। প্রতীক্ষার রথ ভেঙে পড়া। আশার বাসা ছাড়া। স্বপ্নের মহাপ্রয়াণ।

তবু খুলতে তো হবে। রুগীর যন্ত্রণায় ডাক্তারের রোগ। পকেট থেকে ছুরি বার করল সুকান্ত। কত বাঁধনেই যে বেঁধেছে। সর্বত্র দড়ির দারোয়ানি। চুলে, বুকে, কোমরে—পায়েও হয়তো। সূক্ষ্ম নৈপুণ্যে শল্য প্রয়োগ করল সুকান্ত। খামের মাথার দিকে ছুরি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ঋজুরেখায় দীর্ণ করতে লাগল। একটুকু কোথাও এবড়োখেবড়ো না হয়, সাদা একটি সুতোর মত পরিচ্ছন্ন ধার থাকে তারই জন্যে ধারালো মনোযোগ।

আবরণ সরে গেছে, দু আঙুলে আলতো করে বার করল চিঠিটা। ধীরে ধীরে মেলে ধরল পায়ের দিক—ইতিতে কী আছে দেখি। পরে মাথার দিক, সম্বোধন দেখব। ইতিতে কাকলী। ঈ-কার দিয়ে লিখেছে। হ্রস্বদীর্ঘ ছেড়ে দিয়ে প্রায় ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে ওঠবার মত। কিন্তু সম্বোধন? সপ্তমীর বহুবচনওয়ালা গালভরা কিছু একটা থাকবে নির্ঘাত—তা কাকলির দোষ কী, বাঙলা ভাষার কার্পণ্য। প্রীতিভাজনেষু, ঠিকানা? ঠিকানাটা দিয়েছে তো? আঃ, যেন হার্ডল রেসের সব বেড়া ডিঙিয়ে এসে শেষ বেড়ায় পড়তে পড়তে লাফিয়ে গিয়ে ফার্স্ট হওয়া। দিয়েছে, বেশ বিস্তীর্ণ ভাবেই দিয়েছে। দেশ, কাল, সম্বন্ধ ঠিকই আছে, এখন বস্তু কী? বক্তব্য কী?

কিচ্ছু না। পরীক্ষার আগে ক্লাস ভেঙে গিয়েছে, ছোট-ছোট ক্লাস এখনো হচ্ছে, কিন্তু কাকলি যেতে পাচ্ছে না। তার বাবা বলছেন, যা পড়েছ তাতেই হবে। কিন্তু আপনি বলুন, যা দিয়ে কি তা হয়?

আপনি নিশ্চয়ই যাচ্ছেন। যদি কিছু দরকারি হতে পারে বলে মনে করেন চিঠি লিখে জানাবেন দয়া করে। বাড়ি ভীষণ প্রাচীনপন্থী, কিন্তু চিঠির উপরে স্বাধীনতা আছে এই যা সোয়াস্তি।

তারপরে শেষদিকটাতেই অশেষ।

কি, ভালোবাসা জানিয়েছে? দূর! অন্য কিছু? আষাঢ়ে গল্প! তবে, প্রীতি-শুভেচ্ছা? গাঁজার কলকে। তবে, শ্রদ্ধা? গলায় দড়ি।

তবে কী।

লিখেছে : 'আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?'

আমি ভালো আছি—এ কেউ লেখে? শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে বাপকে লেখে, নয়তো প্রবাসী স্বামী স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে। কি রকম সাদাসিধে বোকাসোকা মেয়েটা। মনে-মুখে ভালো-ভালো গন্ধ। আর, আপনি কেমন আছেন? এ আবার একটা প্রশ্ন? সাধু, সরল, বিশ্বাসী—ভাবখানা এই, যেহেতু উনি ভালো আছেন সেহেতু আমিও ভালো থাকব এইটেই শুনতে চায়।

আসলে আপনিটা আর্য প্রয়োগ। আপনি কেমন আছেন না, তুমি কেমন আছ? আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছ—এ কথার কোনো মানে নেই। ওটা কোনো বিবৃতি নয়, প্রশ্ন নয়—ও হচ্ছে শাশ্বত একটি শ্লোকের দুটি ঘনিষ্ঠ চরণ। সুধা-সমুদ্রের পাশাপাশি দুটি ঢেউ।

শুধু এতেই খুশি?

না, তারপরে আরো একটু আছে।

একটি 'তারপর' আছে।

মানে?

পড়ছি, পড়ে শোনাচ্ছি। সুকান্ত আবার পড়ল : 'আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?

তারপর—? ইতি কাকলি।'

'তারপর? তারপর?

লাফিয়ে উঠল সুকান্ত। গাছপালা ঘাস-ফুল পর-ঘর লোকজন সবাই তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল—তারপর? একটি অনন্তকালের প্রশ্ন জড়ে প্রাণে মনে সর্বত্র সর্বদা দুলতে লাগল চোখের উপর : তারপর? তারপর?

এক কবি লিখেছিল কে যেন রোদ হয়ে গিয়েছে। তখন কথাটা বোঝে নি সুকান্ত। আজ মনে হল সে যেন সত্যি রোদ হয়ে গিয়েছে, আলো হয়ে গিয়েছে, তারপর হয়ে গিয়েছে।

ঈশ্বরের স্রষ্টা কে? ঈশ্বর। তার স্রষ্টা কে? ঈশ্বর। যদি শেষ স্রষ্টা কল্পনা করতে পারো সেই ঈশ্বর।

তার পরের পরে কী? তার পরে? তার পরে? তার পরের শেষ সংহর্তা তারপর। ঈশ্বরের জন্ম নেই। তারপরের মৃত্যু নেই।

এখন যাই কোথায়?

একবার দীপঙ্করের কাছে যাই।

পকেট ফাঁকা মাঠ, হেঁটেই যাই। হাঁটতেই ভালো লাগছে। দিবারাত্র কত নালিশ করেছে ঘরে-পরে, ভালো লাগে না। এই মেয়েলি কান্নাই তো জীবনের নিশ্বাসবায়ু হয়ে আছে, কিন্তু, আশ্চর্য, এখন যেন অভাব বলে কিছু নেই, অভিযোগও দেশান্তরী। এই রোদ এই পথ এই চলবার ইচ্ছে, চলতে পারার শক্তি এই অনেকানেক। দীপঙ্করও তাই বলে। বলে, চাকরি-বাকরি নেই, ধারে-ভারে দুঃখে-কষ্টে আছি, তবু এত সত্ত্বেও নিজেকে অসুখী বলে ভাবতে লজ্জা করে। একেক সময় মনে হয়, আমি তো রাজা। কখন জানিস?

'যখন কবিতা লিখি।'

'সত্যি?'

'একটা গোটা রাত কেটে যায় কখনো। একটা কবিতাকে মেলতে-ঢালতে সাজাতে-গোজাতে, ভাঙতে-চুরতে। সে যে কী সুখ কাকে বোঝাই। ভাবি, কত লোকের এ আনন্দে অধিকার নেই। কত লোক কবিতা পড়ে একটুও রোমাঞ্চিত হতে জানো না, এক আকাশ তারা বা এক মাঠ মানুষ কোনোই অর্থ আনে না তাদের কাছে। ভাবি, ওদের চেয়ে আমার পাল্লা কি ভারি নয় ওজনে? আমার এই যোঝবার মত মন বোঝবার মত মন এ কি আমার একটা সম্পদ নয়? না-এর মধ্যেও কি হ্যাঁ নেই?'

'সাধে কি আর তোকে কবি বলি?'

'কিন্তু যখন চাকরি পাব, প্রাচুর্যের ঘরে আসব, তখন কে জানে এই মন থাকবে কিনা, এতখানি থাকবে কিনা। তখন কে জানে, নরুন পাব নাক খোয়াব। কত লোক জানি আরাম পেয়ে অভিরামকে হারিয়েছে। স্থূল পেয়ে সূক্ষ্মকে। স্ত্রী পেয়ে প্রেয়সীকে।'

'তবু দরকার তো উদর আর স্ত্রী আর টাকা—'

'এক শ বার দরকার। শুধু দরকার নয় ফুল আর তারা, প্রেম আর শ্রী, ধর্ম আর কবিতা—'

'আমরা তোমাকে এমন স্টেট দেব যেখানে তুমি আরামে থাকবে আর কবিতা লিখবে।'

'কে জানে স্বচ্ছন্দে থাকলে ছন্দ বাজবে কিনা। যন্ত্রণা না থাকলে হবে কিনা সৃষ্টি। আর যদি সংগ্রামই না থাকে থাকবে কিনা ভালোবাসা।'

'কী বলছ তুমি? সংগ্রাম তো ঘৃণায়, আক্রোশে।'

'না, যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি তাদের প্রতি ঘৃণা নয়, ক্রোধ নয়; যাদের জন্যে সংগ্রাম করছি তাদের প্রতি ভালোবাসা। এই ভালোবাসা কাজ করছে না বলেই কিছু হচ্ছে না।'

তাই ভালোবাসি বলো, জীবনকে ভালোবাসি। কোনো কিছু কেটে-ছেঁটে নয়, বাদ-সাদ দিয়ে নয়, না মাথার দিকে, না পায়ের দিকে। বিরাটের বার্তাবহ মানুষ, তার পা পাতালে, মাথা আকাশে।

আজ যদি এসব কথা বলে দীপঙ্কর, তবে সুকান্ত বলবে, 'তারপর?'

তাকে স্তব্ধ করে দেবে।

'দীপঙ্কর কোথায়?' ঘর খালি দেখে থমকে দাঁড়াল সুকান্ত।

'আফিসে। চাকরি পেয়েছে যে।' মেসের বাসিন্দে একজন বললে।

'চাকরি পেয়েছে?' উৎফুল্ল হল সুকান্ত : 'কোথায়?'

'ধীরেন এন্ড সন্‌সে।'

'ও, আমাদের বরেনদের ফার্মে।' এ যেন আরো খুশির খবর।

কিন্তু—তারপর?

বুকপকেট থেকে চিঠিটা আবার বার করল সুকান্ত। একটা একসারসাইজ খাতার মাঝখান থেকে ডবল পৃষ্ঠার আস্ত পাতা ছিঁড়ে প্রথম পৃষ্ঠায় লিখে দ্বিতীয়টা সাদা রেখেছে। তবে, তারপরে কি শূন্যতা, শুভ্রতা, নিশ্চিহ্নতা?

তবুও থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন। তারপর?

চার

সকলের আগে যাবে আর সকলের শেষে ফিরবে, এই ছিল ভূপেনের গুরু-মন্ত্র : আর কখনো হাকিমের সঙ্গে ঝগড়া করবে না। তোমার আইন না-জানা থাকলেও চলবে, হাকিমকে জানো, লোকচরিত্রে বুৎপন্ন হও। হাকিম যদি ত্যাড়া হয় তাকে খোশামোদের ঘি ডলে নরম করো, যদি অগামারা হয় তুমি তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে নাও, আর যদি তুখোড় হয় তুমি বোকা সাজো। নইলে তুমি কিসের উকিল? কিসের তোমার কথাবেচা পেশা? কিসের তবে তোমার তুকতাক, উচাটন-বশীকরণ? যেমন তরবার তেমন দরবার। যে ব্রতে যে কথা। শনিপুজোয় নারকেল, হরির লুটে বাতাসা, সত্যনারায়ণে সিন্নি। হাকিম যদি স্তব্ধ হয়, যদি সাত চড়েও রা না কাড়ে তা হলেই গেছ। যদি শতং লিখ মা বদ এই মন্ত্র ধরে, বলে, বলব না, শুধু লিখব তা হলেই কঠিন। এখন তাকে তোয়াজ করো, যা করে পারো কথা কওয়াও। যে বউ হাসে না কাঁদে না কথা কয় না তাকে নিয়ে ঘর করবে কি করে? তবে তুমি উকিল, তোমার অসাধ্য বলতে কিছু নেই, হয় তুমি তাকে হাসাও, নয় রাগাও, নয়তো পিছনে লেগে তাকে কাঁদিয়ে ছাড়ো। বোবার শত্রু নেই ভেবেছ, কিন্তু উকিল কারু মিত্র নয়, এমন-কি নিজের মক্কেলেরও নয়।

'এত সকালে যাচ্ছ কি, কোর্টে গিয়ে ঝাঁট দেবে নাকি?' মৃণালিনী গোড়ায় গোড়ায় বিদ্রূপ করত : 'এখন তো লাইব্রেরিও খোলে নি।'

'উকিলের লাইব্রেরি কি ঘর নাকি? উকিলের লাইব্রেরি তো সমস্ত বটতলা।'

'বটতলা?'

'ভূসংসারে এমন কোনো আদালত পাবে যেখানে বটগাছ নেই? বটতলার বই কথাটা চলেছে শুনতে পাই, কেন চলেছে জানি না। আসলে কথাটা হবে বটতলার বউ, মানে উকিলের স্ত্রী—'

এমনি সকাল সকাল গিয়েই এক মক্কেল গেঁথেছিল ভূপেন। কে একটা লোক দূর মফস্বল থেকে এসেছে বোধ হয়, ফ্যাফ্যা করে ঘুরছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে ভ্যালভ্যাল করে। ভূপেনের খপ্পরে পড়ে গেল। ভূপেন তাকে একটাও মিথ্যা কথা বলল না, একটুও বাকতাল্লা মারল না, ভুল পথ বা ঘুর পথ দেখাল না—ফেলল না খরচের নর্দমার মধ্যে—মোলায়েম কথায় তার বিশ্বাস জন্মিয়ে সম্বন্ধ পাকা করে নিল। পরে দেখা গেল শাঁসালো মক্কেল—ক্ষীরের বাটি—হাত লাগাতে না লাগাতেই ডুবে যায় কব্জি পর্যন্ত।

'আশেপাশের সমস্ত বাবুরা কখন বন্ধ হতে না হতেই ফিরে আসে। তোমারই আর দেখা নেই।' মৃণালিনীর এ অনেক অভিযোগ।

'ওদের অফিস, আমার আদালত। কর্তব্য শেষ হয় ধর্তব্য শেষ হয় না, মানে কখন কাকে ধরা যাবে কেউ বলতে পারে না।'

তেমনি সন্ধের দিকে বেশ খানিকক্ষণ বসে ভূপেন ধরেছিল আরেক মক্কেল। হাকিমরা চলে যায় বটে, কিন্তু আমলারা থাকে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে, সরকারি আলো জ্বালিয়ে কাজ করে। আর যতক্ষণ আমলা ততক্ষণ হামলা। এ নথি ঘাঁটো এ নথি হাটকাও। এর থেকে চোরাই নকল নাও, ওর থেকে সিল খুলে দলিল দেখ। ঘুষ দেওয়া অপরাধ হতে পারে, কিন্তু ধুলো দেওয়া তো অপরাধ নয়। অনেকে আছে হাত পেতে ঘুষ নেবে না, কিন্তু চোখ পেতে ধুলো নেবে না এমন চোখ কার। স্বয়ং বটবৃক্ষকেই ধুলো দিতে পারো এ তো তৃণগুল্ম। আর ধুলো দিয়ে দলিল সরাও, কাটাকুটি করো, তোলাপাঠ মারো কিংবা টিপটাপ ধেবড়ে দাও। আর এই সব কৌশলের কার্তিক, যে যাই বলো, উকিলই। আমলার ঘরও যদি বন্ধ হয়, আছে খাবারের দোকান, পানের দোকান, অবশেষে বারান্দা। উকিলের সেরেস্তা ট্রামস্টপ পর্যন্ত প্রসারিত।

তেমনি একদিন অনেকক্ষণ থেকে, শেষ পর্যন্ত থেকে, এক সাহেব ধরেছিল ভূপেন। রেল কোম্পানির সাহেব।

আসতে আসতে দেরি করে ফেলেছে। বিদেশী মানুষ, কায়দাকানুন কিছু জানে না, জানে না অন্ধিসন্ধি, চার্ধদিক কালো দেখছে। তার মধ্যে আরেক কালো, কালোর কালো দেখে উৎফুল্ল হল।

হ্যালো ব্ল্যাক—হাত তুলে ভূপেনকে ডাকল সাহেব।

ভূপেন বুঝল, ব্ল্যাক মানে এখানে কালো নয়, ব্ল্যাক মানে এখানে কালো কোট।

এত বড় সম্মান তাকে আর কে দিয়েছে? এতখানি আসান?

সাহেব জিজ্ঞেস করলে, তুমি উকিল?

হ্যাঁ।

সিভিল না ক্রিমিন্যাল?

চেহারায় নিঃসন্দেহে সিভিল, চরিত্রে কিরূপ, মাথা চুলকে ভূপেন বললে, তুমি বলবে।

আমাকে উপশম দিতে পারো?

উকিল উপশম করতে জন্মায় নি। তবে আইন যতদূর সিঁড়ি ফেলে রেখেছে ততদূর নিয়ে যেতে পারে উকিল—এই পর্যন্ত।

ভূপেনকে ভালো লাগল সাহেবের। ভূপেনের জুটল আরেক কাঁকুড়ের খেত।

কয়েকটা বছর নথিতে নাক ডুবিয়ে প্র্যাকটিস করেছিল ভূপেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার কেমন বেসুরো লাগতে লাগল। সে দেখল সত্যের স্থান খুবই সংকীর্ণ আদালতে—শুধু স্থান কেন, সম্মানও। যার মামলা নিরাবরণ সত্য তাকেও মিথ্যের গয়না পরাতে হয়—গয়না না-পরা থাকলে কোনো মামলাই পাবে না ছাড়পত্র। আর যার মামলা ডাহা মিথ্যা, নির্বনেদ, বন্ধ্যাপুত্রের মত বানানো, সে শুধু টাকার জোরে, সাক্ষীর জোরে, উকিল-ব্যারিস্টারের চোপার জোরে ঠিক জিতে নেবে মামলা। পর-পর ক'টা মিথ্যে মামলা জিতে হতাশ হয়ে গেল ভূপেন।

জিতবে না কেন? আইনকে যেখানে ভাষায় বেঁধেছে, আর ভাষা যখন বহু ক্ষেত্রে প্রকাশের উপায় না হয়ে প্রকাশের বাধা, তখন সেখানে বিচার সূক্ষ্মে চলে গিয়েছে, চলে গিয়েছে কমায়-সেমিকোলনে, স্রেফ ভাষাতত্ত্বে। সত্য সূক্ষ্ম হতে জানে না, মিথ্যেরই সূক্ষ্ম হবার নৈপুণ্য। মানুষেব সোজাসুজি বিচার নয়, আঁকিবুঁকি বিচার। বিচার ভাবগ্রাহী নয়, ভাষাগ্রাহী। তাই কারুকার্যের জয়, আঙ্গিকের জয়। বস্তুর জয় নয়, শিল্পের জয়। স্বাস্থ্যের জয় নয়, চাকচিক্যের জয়, পারিপাট্যের জয়। আর সে-ই হারবে যে গরিব, যে দুর্বল, যে মুর্খ। তবে আজকাল গরিবও জালসাজ, দুর্বলও দুষ্ট আর যে মূর্খ সে আসলে দুর্যোধনের মাতুল।

যতই এগুতে লাগল ততই বিতৃষ্ণা ধরল ভূপেনের। এফিডেভিট, যাকে গাঁয়ের লোকেরা বলে এপিঠ-ওপিঠ, এপিঠ-ওপিঠই মিথ্যে। উপায় কি, একটা সাক্ষীরও পুরো সত্য কথা বলার স্বাধীনতা নেই। মামলার যেভাবে স্বরলিপি করা হয়েছে সেভাবেই তাকে তাল মান রেখে গাইতে হবে। স্বাধীন সুর দিয়েছ কি মামলা ফানুস হয়ে গেছে। হলফ দেওয়া কেন? সত্যের পাকা গোঁফে মিথ্যের কলপ দেওয়ার জন্যে।

'আইন যদি এ চালাকি করতে দেয় আপনি করবেন না কেন?' সহযোগীরা কেউ বলে : 'আমরা তো আইনেরই খিদমৎ করতে এসেছি।'

'মানুষের জন্যে আইন, আইনের জন্যে মানুষ নয়।' ভূপেন বলে : 'চালাকির জোরে আরেকজনের ন্যায্য দাবি ভণ্ডুল হয়ে যাবে তাতে আমি নেই।'

এ উকিলের পসার হয় কি করে?

'আপনি তো দোষ করেছেন, গিলটি প্লিড করুন, দোষ স্বীকার করুন।'

'বাঃ, আমি বাঁচবার চেষ্টা করব না?'

'তার মানে আইনকে কলা দেখাবেন?'

'দেখালামই বা। আইন যদি কলা দেখাবার জন্যে বাজার বসায় আমি ছাড়ি কেন? আমার কলাই যে পণ্য।'

'ওসবের মধ্যে আমি নেই।' ভূপেন কাঠখোট্টা : 'মিথ্যে ডিফেন্স আমি নিতে পারব না।'

'কিন্তু ও পক্ষের তো প্রমাণ করতে হবে। সেইখানে আপনি লড়ুন। ওদের প্রমাণের পাহাড়ে চিড় ধরিয়ে দিন।'

'অত শত আমি বুঝি না। দোষ করেছেন যখন, তখন পরুন হাতকড়া। নয়তো অন্য উকিল দেখুন।' ভূপেন মুখ ফেরাল।

'আপনি আমাকে, ব্যক্তিটাকে দেখছেন কেন? আপনি মক্কেলকে দেখুন। আইনের ফল বিচার, অবস্থার ফল মক্কেল। বিশেষ অবস্থায় পড়ে মক্কেল যদি অনাচার কিছু করে থাকে তবে তার পক্ষে বলবার বা ধরবার কিছুই থাকবে না? সে নিজের থেকে গলা বাড়িয়ে কোপ নেবে?'

'না, কোপ নেবে কেন? গলা বাড়িয়ে মালা নেবে। রেপ কেসের আসামী, তাকে গলায় ফুলের মালা দেবে। নিয়ে যাবে মিছিল করে।'

ক্রমে ক্রমে প্র্যাকটিস আরো পড়ে গেল ভূপেনের। সংসারে দেখা দিল অনটন। পেন্টালুন ছোট হতে শুরু করল। জ্বলে গেল কালো কোট।

যেটা সত্যি-মামলা বুঝব সেটা নেব। তেমন আর ক'টা? এ প্রায় শিশিরের আশায় চাষ করা। ভূপেনের যদিও সৎ উকিল বলে সুনাম, সৎ মামলার ইনাম পাবার সুনাম নেই। তা হারলে হারব, সত্য প্রতিষ্ঠা করতে লড়ছি এই আমার তৃপ্তি। কারু তৃপ্তি টাকায়, কারু তৃপ্তি সাধুতায়।

'সাধু, সাধু হয়েছেন!' মৃণালিনী কত গঞ্জনা দিয়েছে। 'সত্যপীর এসেছেন চেরাগ জ্বেলে!'

উকিল উকিল, তার মধ্যে সাধু-অসাধু কি। টাকা টাকা, তার মধ্যে ভিতরি-উপরি কি। প্রেম প্রেম, তার মধ্যে বৈধ-অবৈধ কি!

কোর্টে যাওয়া ছাড়ে নি ভূপেন। তার এখন প্রধান কাজ হচ্ছে বই লেখা। গল্প-উপন্যাস নয়, গীতা-ভাগবতের ব্যাখ্যা-ভাষ্য নয়, লিখছে আইনের বই। স্ট্যাম্প অ্যাক্ট, রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, কোর্ট-ফিজ অ্যাক্ট। সব বই-ই বাজারে চালু, নাম-দামও যথেষ্ট কিন্তু ঢালাঢালি টাকা কই? প্রকাশকরা ঠিকমত হিসেব দেয় না আর দিলেও বেশি ছাপিয়ে কম দেখায়।

হ্যাঁ, বিদ্যাই তৃপ্তি; বিদ্যাই সকল অভাবের ভরণপূরণ।

উন্নতির সরু ডগায় এসে উঠলেও সকল উন্নতেরই যে বুদ্ধির ডগা সরু নয় তাই তার বইয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে ভূপেন। যারা নজির সৃষ্টি করছে তাদের নজর যে নির্ভুল নয়, বহু জায়গায় তাই প্রতিপন্ন হয়েছে। আর আজকাল হাকিমদের রায়ের কি ছিরি! না আছে রস না আছে গন্ধ। বলে আইনে আবার রস কি। আইন নীরস হোক, আইনে যে কাহিনীটি আছে তাকে দেখার গুণে লেখার গুণে সরস করা যায়। কাঠঠোকরা পর্যন্ত শুকনো কাঠের মধ্য থেকে চিনির বাসা আবিষ্কার করে।

বড় কর্তাদের অশুদ্ধি আর শৈথিল্য শাসন করছেন, ওঁরটা করে কে। দিবারাত্র গজগজ করে মৃণালিনী। তবু যদি বুঝতাম লিখেই, ঘর ভরা দূরে থাক, পেট ভরছে। টাকা এক দিক দিয়ে এলেই হয়, ঘোড়ায়, নয় তাসে, নই বইয়ে। আর সে বই প্রসিদ্ধই হোক কি নিষিদ্ধই হোক। রোজগার দিয়ে কথা। হালালিতে না পারো দালালিতে। কাঁচি দিয়ে পকেট মেরে নয়তো কলম দিয়ে। এ জাতও গেল, পেটও

ভরল না।

'সুকু।' ডাক দিল ভূপেন।

শনিবারে জজকোর্ট খোলা থাকে কিন্তু মুৎফরাক্কা মামলায় সেদিন তো সমস্ত আদালত বোঝাই। তিনটের মধ্যেই বাড়ি চলে আসে কে? বার-লাইব্রেরিতে দিব্যি ফরাশ আছে, গড়গড়া আছে; আড্ডা আছে, কেচ্ছা আছে, ওসব ছেড়েছুড়ে অসময়ে কে প্রত্যাবৃত্ত হয়! তারপর যা একখানা হাঁক দিয়েছেন, নিশ্চয়ই ফরমায়েশের হাঁক। কী বিপদে ফেলেন না জানি!

'কেন?' কাছে এসে দাঁড়াল সুকান্ত।

'শোন, একবার প্রেসে যাবি। এই অর্ডার প্রুফগুলি দিয়ে আসবি। আর নতুন প্রুফ যা হয়েছে নিয়ে আসবি। সাত ফর্মা পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। যদি আরো কিছু ছাপা হয়ে গিয়ে থাকে নিয়ে আসবি ফাইল-কপি।'

'এ কি রকম প্রেস!' গলার কাছে বালি-বালি লাগতে লাগল সুকান্তর : 'ওদের লোক দেওয়া-নেওয়া করতে পারে না?'

'তাই তো করে। তবে এ প্রুফগুলি ভারি জরুরি। ওদের লোকের জন্যে বসে থাকলে ভীষণ দেরি হয়ে যাবে। বইটা খুব শিগ্‌গির বার করে দেওয়া দরকার।'

'বাঃ, আমার পড়া নেই?'

'শুধু যাবি আর আসবি। কতক্ষণের বা মামলা।' একটু যেন অপরাধী শোনাল ভূপেন : 'পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটার মধ্যে ফেরা যাবে।'

'তারপর ফেরবার সময় বাসন্তীকে একবার দেখে আসিস।' বললে মৃণালিনী, 'কাছেই তো বাড়ি। আর যদি আসতে চায়—'

'নিয়ে আসিস—' ভেঙচে উঠল সুকান্ত।

বিজয়া এসেছে উপরে।

'কি, তোমার জন্যে ফ্ল্যাট কোথাও দেখে আসতে হবে?' সুকান্ত মুখিয়ে উঠল।

'না, তুমি যদি বলো তো তোমার সঙ্গে যাই। আমার বোনপোর ছেলেটার কি অসুখ শুনেছি।' বললে বিজয়া, 'আমাকে সেখানে রেখে প্রেসে যাবে আর ফেরবার সময় নিয়ে আসবে।'

'তোমার বোনপো থাকে তো সেই কারবালায়। ভারতবর্ষের বাইরে।'

'না, না, বাসন্তী যদি আসতে চায় তা হলে বাসে ট্রামে দু-জনকে সামলাবে কি করে?' বললে মৃণালিনী, 'বাসন্তী এলে তার আণ্ডাবাচ্চা কোন-না নিয়ে আসবে!'

'কেন যে তোমাদের চন্দনদার লাগে কাকিমা—'

'ট্রাম-বাস লাগবে না। ট্যাক্সি নেবে।' ঝলক দিল বিজয়া : 'এপিঠ-ওপিঠ দু পিঠেরই না হয় ভাড়া দেব।'

বন্দনা বেরুচ্ছে ঘর থেকে।

'তোমার কিছু ফরমায়েশ?' সুকান্ত তাকাল চোখ তুলে।

'আমার কথা তুমি কত শোনো।' মুখ ভার করল বন্দনা।

'তোমার কথাটা দাদার কথা বলে এলে না শোনে সাধ্য কার।'

'তোমার দাদা বলছিল—'

'ঐ তো—'

'তোমার দাদা বলছিল', হাসতে-হাসতে গম্ভীর হল বন্দনা : 'তোমার দাদা বলছিল, যদি ওঁর ওষুধটা একবার খোঁজ করো।'

'কেউ পায় না খেতে, কেউ আবার পারে না হজম করতে।' দার্শনিক হবার ভাব করল সুকান্ত : 'শুধু খাবার হলেই চলে না, আবার হজম করবার ওষুধ চাই।'

'তা তো বটেই।' বন্দনা ফোড়ন দিল : 'শুধু পরীক্ষা পাশ করলেই চলে না, তারপর আবার চাকরি চাই।'

'শুধু চাকরি পেলেই চলে না, মাসান্তে আবার মাইনে চাই। তুমি চটছ কেন?' একটু মোলায়েম হল সুকান্ত : 'তুমিই বলো কখন খোঁজ করব ওষুধ।'

'তা জানি না—'. হলকা ছুটিয়ে চলে গেল বন্দনা।

'কেন, প্রেসে যাবার পথেই না হয় খোঁজ করলি।' মৃণালিনী বললে, 'একটু আগে না হয় বেরো—'

'একটা লোক আর সতেরো গণ্ডা ফরমাশ।' বিজয়ার দিকে তাকাল সুকান্ত : 'তাই তো বলি কাকিমা, যদি শান্তি চাও, একটা ফ্যালেট নাও, নয়তো হোটেলে গিয়ে ওঠো—'

'অতশত কাজের বোঝা দিও না ওকে।' ভূপেন হাঁক দিল : 'আমার প্রুফ ঠিক আনা চাই।'

নিজের ঘরে ফিরে এল সুকান্ত। এরা কী জানে কত কী কাণ্ড হয়ে গেছে এর মধ্যে এই তারপরের পৃথিবীতে। আজ কি সমস্ত দুপুরটা পথে-পার্কে ঘুরে ঘুরে এখানে-ওখানে ছোটখাট আড্ডা দিয়ে চলন্ত মানুষের মুখ দেখে-দেখে কাটাবার মতন নয়? কাকলি যেহেতু ছ'টার সময় দেখা করতে বলেছে, ঠিক ঘড়ি ধরে সাড়ে পাঁচটার সময়ই সে বেরুবে ঠিক করেছিল। এমন লগ্নকেও সে আনতে চেয়েছিল হিসেবের মধ্যে, বাঁধতে চেয়েছিল ঘড়িঘণ্টায়? বেশ হয়েছে। কাজলের ঘরে থাকা মানেই গায়ে কালি লাগানো। সংসারে বসবাস করা মানেই পাঁচজনের ফরমাশ খাটা।

কত জল চলে গেল গঙ্গায়। কত হাওয়া বয়ে গেল মাঠ দিয়ে। কত মেঘ ভেসে গেল আকাশে-আকাশে।

কত মুহূর্ত তার দিনরাত্রির সবুজে ঝরে পড়ল সোনার শিশিরের মত।

তারপর?

তারপরের পাপড়ি মেলতে-মেলতে এটুকু পর্যন্ত খুলেছে। এটুকু রঙ এটুকু রস এটুকু সুগন্ধ।

'তোমাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। বিপন্নের চোখে নয়, বিস্মিতের চোখে নয়, আত্মীয়ের চোখে। আত্মীয় কথাটার মানে কমে গিয়েছে অভিধানে, তাই না?

তোমাকে বাড়িতে ডাকি সাহস নেই। কিন্তু যদি ডাকতে পারতাম, ছাদে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারতাম দেয়াল-ঘেঁষা রাস্তার কদমগাছে কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে। দেখেছ কদমফুল? ছুঁয়েছ? ধরেছ? শুঁকেছ?

তাই বলছি, 'স্বাতী' সিনেমার সামনে আগামী বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে দেখা করতে এসো। আমি থাকব। এসো কিন্তু। কাকলি।'

পায়ের কদাকার কাবলিটার দিকে তাকাল সুকান্ত, স্যাণ্ডেলটা আরো রোমহর্ষক। কে তাকাবে পায়ের দিকে? ধুতি আর শার্ট একেবারেই বিদখুট্টি। কে দেখবে ধুতি-শার্ট? আর পকেট তো গগন-ললাট। কে উঁকি মারবে পকেটে?

সুকান্তর কত দুশ্চিন্তা কত ক্লেশ। পড়ে কিছুই মনে থাকছে না, রাত জাগতে পারছে না। কী খাতা না জানি রেখে আসে সে পরীক্ষায়। টিউশানি ছেড়ে দিয়েছে, দাড়ি কামাবার তুচ্ছ যে ব্লেড তাও ঠিক দিনে কিনতে পাচ্ছে না। তবু, এত সব সত্ত্বেও, তার সুখ কেন? তার তো এখন দেয়ালে মাথা কোটা উচিত, যাতে পরীক্ষাটা মানে-মানে উত্তরে যায়, যাতে একটা চলনসই চাকরি হয়, মা'র মেজাজটা একটু বশে আসা, বাবা একটু ছেলে নিয়ে গর্ব করতে পারেন, দাদাকে খাটতে না হয় ওভারটাইম, বউদি নিজেকে একটু কম দুঃখী বলে মনে করে, কাকিমার অহংকারটা একটু নরম হয়, সুবীরের একটা মাস্টার জোটে আর বাসন্তীর নির্যাতন-নিবারণের পথ মেলে—তার কত সমস্যা, কত অভাব, কত দায়িত্ব, কত যন্ত্রণা, কত সংগ্রামের ভূমিকা—তবু, তবু তার সুখ কেন? এত কালো বর্ষায়ও আকাশ আবার নীল কেন? কেন না চাইলেও সুখ আসে? এত এত সুখ। কেন সুখকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না? কেন বলা যায় না, আমি সংগ্রামী, আমার সময় নেই, তুমি চলে যাও? বললেও যায় না কেন? মাটি চায় না তবু কেন আসে বন্যা? মরাকাঠ চায় না তবু কেন মঞ্জরীরঞ্জন?

'শোন, সতেরো-আঠারো এ দুটোর অর্ডার গেল।' ভূপেন বলছে যখন সুকান্ত বেরুচ্ছে, 'আর পরের গ্যালিপ্রুফ যেন মেক-আপ করে দেয়। উনিশ-কুড়ি যা দেয় নিয়ে আসবি। শোন দেখে যা—'

তুমি কি এখনো গ্যালিপ্রুফ না মেক-আপ?

পাঁচ

কিন্তু কোথায় নীলাকাশ?

দেখতে দেখতে মেঘ করে এল পশ্চিমে। বাসের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল একবার সুকান্ত। চোখ-জুড়ানো কিন্তু হৃদয়-জ্বালানো কালো। মনে হল যেমনি আছে তেমনি লেগে থাক আকাশে, চিত্রার্পিতের মত। আর যেন না ছড়িয়ে পড়ে। যেন আর না জমাট বাঁধে।

বাসে একজন সোয়ারি তার পাশের বন্ধুকে বললে, 'কী সুন্দর মেঘ করেছে দেখেছিস? এবার ঝরবে।'

ওদিক থেকে আরেকজন টিটকিরি দিয়ে উঠল : 'তাকাবেন না মশাই। নজর দেবেন না।'

'হ্যাঁ', প্রথমোক্তর বন্ধু বললে, 'নজর দিয়েছেন কি লজ্জায় সরে গেছে নববধূ।'

সুকান্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তার দৃষ্টির কি কোনো শক্তি আছে, সম্মোহনী কি উচাটনী? সে কি ভস্মলোচন? তার চোখের দৃষ্টিতে মেঘ কি ভস্ম হয়ে যাবে? চলে যাবে দূরান্তরে?

কত মেঘ তো আসে আবার চলে যায়। এও যেমনি এসেছে তেমনি চলে যেতে পারে না? একবেলা দেরি করে ঝরলে কলকাতা কী এমন অশুদ্ধ হবে?

'ঝরুক মশাই ঝরুক। প্রাণ ভরে ঝরুক। হাড়মাস সেদ্ধ হয়ে গেল।'

'ফ্যানের হাওয়া খেতে খেতে বাত ধরে গেল শরীরে।'

'কী ঘাম আর ঘামাচি রে বাবা। মশা-মাছি তো গা-সওয়া। এ রাম আর সুগ্রীব একসঙ্গে। ঘাম আর ঘামাচি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।'

সবাই খুশি। তাই যে যার মনে টীকা-টিপ্পনী কাটছে।

প্রথমোক্ত বললে, 'মাইরি যদি বৃষ্টি নামে তা হলে কাজটা হবে না। ঠিক বলবে, বৃষ্টির জন্যে দেখছেন না বিক্রিবাটার অবস্থা। মাইরি দেবে না টাকা।'

'বাঃ, তুই তো বৃষ্টির আগেই গিয়ে পড়বি।'

'জানি না পারব কিনা পৌঁছুতে যে রকম তোড়জোড় চালিয়েছে। বৃষ্টির আগে পৌঁছুতে পারলেই বা কি। বলবে, মেঘ দেখেই খদ্দেররা হাঁটা-চলা বন্ধ করে দিয়েছে। মাইরি, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

'তবু নামুক বৃষ্টি। সব ভণ্ডুল হয়ে যাক।'

'তোর কী—'

'কারুরই কিচ্ছু না। আকাশের খেয়াল। বৃষ্টি হলে আমি মাইরি গান ধরব।'

'আমি মশাই ভিজব গা খুলে।'

'খুব তো উৎসাহ দেখাচ্ছেন, তারপর যখন খানিক ঝরার পর রাস্তাঘাট এক হাঁটু কি এক কোমর হবে, ট্রাম-বাস বন্ধ হবে তখন কী করবেন?' বললে আরেকজন।

'হ্যাঁ, সে কথা কেউ ভেবে দেখে না।' বলে ফেলল সুকান্ত। 'তখন কী?'

'যে মুখে প্রশস্তি করেছি সেই মুখেই গালাগাল দেব।'

'দোষ বৃষ্টির কী মশাই। দোষ করপোরেশানের।'

'করপোরেশান নয় মশাই পারফোরেশান। টালা থেকে টালি আর ট্যাংরা থেকে খ্যাংরা এফোঁড়-ওফোঁড়।'

'শহরে লহর খেলে।'

'আহাহা, তবু আসুক। মাটি ঠাণ্ডা হোক। ঘাস-পাতা সবুজ হোক।'

'বলুন না ব্যাঙ ডাকুক, সাপ বেরোক, পিঁপড়ের পাখা গজাক, বাদলা-পোকারা ফরফর করুক।'

'চাষারা আশা করে বসে আছে।'

'তা চাষার মাঠেই ঝরুক না। কে বারণ করছে?' বললে সুকান্ত। 'কলকাতা যেখানে ঝরলেই সমুদ্র, সেখানে এ উৎপাত কেন?'

'বেশ রাত্রে খেয়েদেয়ে ঘুমুব, ঘুম আসবার আগমুহূর্তে বৃষ্টি নামবে, থামবে ভোররাত্রে। উঠে দেখব

রাস্তাঘাট জলে ডোবা। স্বপ্নের মত লাগবে।'

'আফিস দেরি করে যাব।'

'কিংবা যাবই না। বৃষ্টির অজুহাত দেব। বৃষ্টি কল্যাণকারিণী।'

'আগে বৃষ্টি নেই বৃষ্টি নেই বলে হাহাকার, পরে বেশি বৃষ্টি বেশি বৃষ্টি বলে আর্তনাদ।'

'সব জিনিসেই তাই। আগে কাজী পরে পাজি।'

'তারপরেই বন্যা।' যার যা মনে আসছে বলে যাচ্ছে : 'সব মুখস্থ মশাই। তার পরেই বন্যাত্রাণ। উপশমের ঢেউ। তারপরেই ভোট। বন্যাতে তাই কারু কারু পিঠের পৌষমাস।'

'তেমনি আগুনেও।' বৃষ্টির সম্ভাবনায় সকলেই প্রায় প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে। বললে আরেকজন : 'আগুন লেগে বস্তি ছাই হয়ে গেল। তার পরেই নিয়ে এস খাদ্য-বস্ত্র, গৃহস্থালির সরঞ্জাম। তার পরেই ভোট।'

'দুষ্ট লোকে বলে ভোট পাবার জন্যে নিজেই নাকি আগুন লাগিয়েছিল। যাতে উপশমে ভুলিয়ে ভোট-কুসুম তুলতে পারে।'

'সব মুখস্থ মশাই, সব মুখস্থ। তারই জন্যে প্রতি বছরে বন্যা, প্রতি বছরেই ধস।'

কে একজন কবি-কবি ছিল, বলে উঠল, 'নতুনত্বের মধ্যে শুধু এই নীল মেঘ।'

এক দল লোক বৃষ্টি চায়, আরেক দল লোক চায় না। বৃষ্টি আর না-বৃষ্টি কোনো দিকেই সুকান্ত নেই। তার শুধু এক ইচ্ছে, ছোট্ট এক ইচ্ছে, কাকলির সঙ্গে দেখা হোক। বৃষ্টি হলে ও আসবে কি করে? ফিরবে কি করে? ওর বাড়ি ফিরে যাবার পর বৃষ্টি হোক, যত পারুক ঢালুক আকাশ। তার এক সমুদ্র স্নেহ ঢেলে দিক পৃথিবীর হৃদয়ে। প্রলয় নামুক। কলকাতার ভদ্রতার বেশটা ঝড়ের তাড়নায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক। যত ইচ্ছে তার নিজের কষ্ট হোক, অসুবিধে হোক, অসুখ হোক, শুধু যেন সাক্ষাৎটা নির্বিঘ্ন হয়।

কত সামান্য প্রার্থনা। সুকান্ত তাকাল আকাশের দিকে। নির্বোধ নিশ্ছিদ্র আকাশ। তার শুনতে তো ভারি মাথাব্যথা পড়েছে। কিন্তু কত সময় তো মেঘ শুধু জমাটই বেঁধে থাকে, বর্ষায় না। কত ব্যথা পুঞ্জিত হয়ে থাকে, বলা হয় না। কত ভাব সঞ্চিত হয়ে থাকে, লেখা হয় না। যন্ত্রে কত তারের বন্ধনের পরেও আর বাজনা নেই, কান্না নেই।

তার ক্ষুদ্র একটা অভিলাষকে ধুয়ে মুছে দেবার জন্যে নিষ্ঠুর ভাগ্য এক আকাশ অভিযানের আয়োজন করেছে। যে অল্পবল তারই উপর নিয়তির ভ্রূকুটি।

সেই মেয়ে-বাপের গল্পের কথা মনে পড়ল সুকান্তর। বাপ মুমূর্ষু, সেবামগ্ন মেয়ে রাত-দিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, বাবাকে নিও না, বাবা ছাড়া আমার কেউ নেই। কত কাঁদছে মেয়ে, কত মাথামুড় খুঁড়ছে, বাবাকে বাঁচাও। তবু কিছুতেই কিছু হল না, টলল না ভগবান। বাপ মারা গেল। স্বপ্নে মেয়েকে দর্শন দিল ভগবান। মেয়ে নানা কথা বলে ভগবানকে গঞ্জনা দিতে লাগল, নিষ্ঠুর, একচোখো, খামখেয়ালী। ভগবান বললে, 'আমি করি কি, আমি কার প্রার্থনা শুনি? তুমি বলছ, বাবাকে বাঁচাও, আর বাবা বলছে আমাকে নাও। আর সইতে পাচ্ছি না এ ভবদাহ। নিচুকূলে জন্মেছি আমাকে উচ্চকূলে পুনর্জন্ম দাও। আমি কাকে লই, কাকে থুই?'

তেমনি কত লোক হয়তো প্রার্থনা করছে, আজ, এই লগ্নে বৃষ্টি হোক। হয়তো কেউ তার মনের মানুষের থেকে বিদায় নিয়ে যাবে, বৃষ্টির জন্যে আটকে গেল, সঙ্গটা দীর্ঘতর মনোহরতর করবার সুযোগ পেল। তার প্রার্থনা শুনল অন্তরীক্ষ। হয়তো কত রুগী কষ্ট পাচ্ছে গরমে, বৃষ্টি তাদের আরাম দেবে, ঘুম দেবে। কত বিচ্ছিন্নকে তাপতৃপ্ত সান্নিধ্য দেবে। কত মনে পড়িয়ে দেবে জন্মান্তরের সুহৃদের কথা।

বৃষ্টি যারা চায় তাদেরই দল ভারি। আর, সুকান্ত দেখল তাদের প্রার্থনাই ন্যায্য।

বাস থেকে নেমেছে, অমনি ঝড় উঠল। সতর্ক-অসতর্ক সকলকে মুহূর্তে নাজেহাল করবার জন্যে এসেছে উড়নচণ্ডী। এসেছে বেহিসেবী। ঝরাপাতা, ধুলো তো বটেই, উড়তে লাগল টুপি, উড়তে লাগল ছাতা, দোকানের ঝাঁপ, চালের টিন, সাইনবোর্ড। ভাঙতে লাগল গাছের ডাল, তছনছ তছনছ —

বাবা, এত মারণমূর্তি কেন? বৃষ্টি নামাও। শান্ত হও প্রভঞ্জন।

কি আশ্চর্য, কখন সুকান্ত বৃষ্টির জন্যেই প্রার্থনা করে বসেছে। ঝড়ের প্রেক্ষিতে বৃষ্টিই বুঝি কামনীয়। ছুটতে ছুটতে ভিজতে ভিজতে ঢুকে পড়ল সে ছাপাখানায়।

'দিন মশাই, বাকি প্রুফটা দিয়ে দিন।' ম্যানেজারের সামনের টেবিলের উপর প্রুফের তাড়া রেখে মূর্তিমন্ত ঝড়ের মত দাঁড়াল সুকান্ত।

'বসুন।' বললে ম্যানেজার।

'বসবার সময় নেই। দিন তাড়াতাড়ি।'

কথাবার্তা বলে ম্যানেজার বুঝল, কিসের প্রুফ কী বৃত্তান্ত —

'না বসে উপায় কী। এত বৃষ্টিতে যাবেন কোথায়? বৃষ্টিটা ধরবে তবে তো যাবেন।'

নিরুপায় চেয়ার টেনে বসল সুকান্ত। বৃষ্টি হচ্ছে, যেন গলানো সিসে ঢেলে দিচ্ছে। হাতঘড়ি নেই, সুকান্ত জিজ্ঞেস করলে, 'ক'টা বেজেছে বলতে পারেন?'

প্রশ্ন নিরর্থক। সামনে দেয়ালেই ঘড়ি। তাকিয়ে দেখল পাঁচটা দশ।

আধ ঘণ্টা বসা যায় বোধ হয়। এখান থেকে স্বাতী সিনেমায় আধ ঘণ্টায় যাওয়া যাবে। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তার কী অবস্থা হবে কে জানে। সঙ্গে একটা ছাতা নেই যে, মাথা ঢেকে চলে যাবে হাঁটু ডুবিয়ে। এদিকে বাস-ট্রাম কোথায়? থাকলেও হয় মরেছে, নয় নাভিশ্বাস উঠেছে। একটা রিকশা লাগবে, কী বীভৎস ভাড়া চায় তা কে জানে। অত পয়সা কোথায় পাবে? সবচেয়ে অনিশ্চিত, রিকশা পাবে কিনা।

'দিন না, দয়া করে বাকি প্রুফটা তুলে দিন না—'

'দিচ্ছি—ওরে—' ডাক ছাড়ল ম্যানেজার। তারপর সুকান্তকে লক্ষ্য করে বললে, 'অত তাড়া কিসের?' এই অঝোর বৃষ্টিতে যাবেন কি করে?'

'যেতেই হবে। আমার একটি ছাত্রীর মরণাপন্ন অসুখ।' বলে ফেলল সুকান্ত।

'খুব খারাপ অবস্থা? থাকে কোথায়?'

'এই কাছাকাছি।' বলে ফেলল সুকান্ত।

সমস্ত পাড়া নখদর্পণে, জিজ্ঞেস করলে ম্যানেজার, 'কোন বাড়ি?'

'নম্বরটম্বর জানি না।'

'কার বাড়ি?'

'তাও না। শুধু এইটুকু জানি মেয়েটির নাম আশা। ডাক-নাম আশা, পোশাকি নাম প্রতীক্ষা। আমার অদর্শনে তার যদি আজ মৃত্যু হয়—'

ত্বরান্বিত হল ম্যানেজার। ভিতরে নিজেই গেল খোঁজ নিতে। ফিরে এসে বললে, 'আধ ঘণ্টাটাক দেরি হবে। তা এক কাজ করুন না। আপনি চলে যান। প্রুফ কাল পাঠিয়ে দেব।'

'না, আমি যে এসেছি তার প্রুফ দেখাতে হবে বাবাকে।'

'তা হলে একটু না বসলে তো চলে না।' অপরাধীর মত মুখ করল ম্যানেজার।

'বসছি। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। এরই মধ্যে ধরে যেতে পারে বৃষ্টি, কি বলেন?'

বৃষ্টি-ধরার নাম নেই। অচ্ছিন্ন ঝরে চলেছে।

ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যেই তুলে দিল প্রুফ।

'যাবেন যে, প্রুফ সব ভিজে যাবে।' বললে ম্যানেজার।

'প্রুফ ভিজলে কী হয়? তবু প্রমাণ গরম থাকবে। প্রমাণ ভিজে গেলেই মুশকিল।'

'যাবেন কী করে? একটা রিকশা ডেকে দি।' দারোয়ানকে পঠিয়ে দিল ম্যানেজার। বললে, 'বলবে ভীষণ জরুরি। একজন রুগী মরতে চলেছে—'

কোথায় দারোয়ান! কোথায় রিকশা! পৌনে ছ'টা প্রায় হল।'

আর কি, নিজেই বসে বসে এখন প্রুফ দেখি। ভাবল সুকান্ত। 'ম'-কে কেটে দন্ত্য 'স' করি। প্রেমকে কেটে প্রেস করি।

এসেছে রিকশা। কিছু দরদস্তুর না করেই উঠেই পড়ল সুকান্ত। ঘেরাটোপের মধ্যে বন্ধ হল।

রিকশাওলা জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় যাবেন?'

'স্বাতী সিনেমা।'

'দু'টাকা লাগবে।'

এ কী জুলুমবাজি! এমনিতে পাঁচ আনা ছ'আনা বড় জোর। আজ মৌকা পেয়েই হামলাদার হয়ে উঠেছে।

'বলুন দু'টাকা দেবেন কিনা। নয়তো নেমে যান। কিংবা বলুন আমি গাড়ি ছেড়ে দিই। কি রকম জল!'

ঝগড়া-বচসা করে লাভ নেই। পকেটে কুড়িয়ে-জড়িয়ে দুটো টাকাই হয়তো আছে। নে, চল, তাই দেব।

ঝপরঝপ ঝপরঝপ চলেছে রিকশা। উপরে সমুদ্র নিচে সমুদ্র, মাঝখানে ডুবুডুবু পানসি।

কোথায় চলেছে কে জানে। সমস্ত অবাস্তব মনে হচ্ছে সুকান্তর, সমস্ত বিদেশ। যেন শহর-পসার নয়, পাথর-দেয়াল নয়, অনাদ্যন্ত জল। জলের মরুভূমি।

গাড়িবারান্দার নিচে কতগুলি লোক দাঁড়িয়ে ছিল ভিড় করে, তার মধ্য থেকে একটা লোক সোজা রিকশার দিকে ধাওয়া করলে।

'আমি দেখেছি রিকশায় শুধু একজন আছেন।' লোকটা বললে আকুল হয়ে, 'আমাকে দয়া করে তুলে নিন মশাই। ভীষণ জরুরি।'

সত্যি হয়তো কেউ মরতে বসেছে।

প্রায় জোর করে রিকশা নামিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল আগন্তুক।

গাঁইগুঁই করে লাভ নেই। সুকান্ত বললে, 'কদ্দূর যাবেন?'

'ঐ বাজার পর্যন্ত। ভয় নেই আপনার ভাড়ার শেয়ার দেব। আপনি কোথায়?'

'স্বাতী সিনেমা।'

'বই দেখতে? কী হচ্ছে ওখানে?' এক মুহূর্ত চিন্তা করল আগন্তুক। বললে, 'হ্যাঁ, হাওয়া-দিয়ে-যাই। বইয়ের শেষটা মাইরি—কী প্যাথেটিক! মাঠ দিয়ে নায়িকা মাইলখানেক প্রায় ছুটছে, মাঠ পেরিয়ে এসে পলকে নায়কের বুকের উপর—ধুস—'

রিকশাটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল হোঁচট খেয়ে। সামলেছে।

'কত ভাড়া হয়েছে?'

'দু'টাকা।'

'বেশ, এক টাকা আমি দেব। আমাকে বাজারে নামিয়ে দিয়েই আপনি চলে যাবেন স্বাতীতে। ছ'টায় শো আরম্ভ। তা ছ'টা এখন বেজে গেছে। তা আজে-বাজেতে আধ ঘণ্টা। সাড়ে ছ'টাতে ঢুকলেই চলবে। কী বৃষ্টি মশাই, কী বৃষ্টি।'

যাক এক টাকা সুরাহা হল। স্বস্তির মুখ দেখল সুকান্ত। পকেটে একটাও টাকা না থাকলে কি বকম! যদি দেখা হয় কাকলির সঙ্গে, যদি আবার একটা রিকশা করতে হয় তাকে নিয়ে।

বাজার আসতেই নেমে গেল আগন্তুক। একটু দাঁড়ান, টাকাটা নিয়ে আসি। গেল আর এল না। গলে গেল, মিলিয়ে গেল।

চলল আবার রিকশাওলা।

নৈরাশ্যের মতই জল চারদিকে। কী হবে স্বাতীতে গিয়ে? এত বৃষ্টিতে যে কাকলি আসে নি, কোনো মেয়েই যে আসতে পারে না, আসে না, সে তো জানা কথা। আর ও তো প্রাচীনপন্থীদের মেয়ে। তবে সুকান্ত যাচ্ছে কেন? যাচ্ছে, সে যে কথা রেখেছে শুধু সেই প্রমাণের আনন্দে। সে যে তার কথা রেখেছে এইটুকুই তার তৃপ্তি, এইটুকুই তার প্রাপ্তি। বলতে পারবে চিঠিতে, আমি গিয়েছিলাম কিন্তু তোমার দেখা পাই নি।

স্বাতীতে পৌঁছে দিল রিকশা। কিন্তু কাকলি কই?

শো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তবু লবিতে অনেক লোক। সব বৃষ্টির ভয়ে আশ্রয় নিয়েছে। দারোয়ান হটিয়ে দিতে চাইছে, বলছে, টিকিটওলাদের ঢুকতে দিন, কিন্তু কেউই হটছে না। সকলেরই বৃষ্টির টিকিট।

'এ কী, সুকু যে! এ তোর কী চেহারা! ভিজে একেবারে ঢোল হয়েছিস যে।'

ওর কলেজের ছাত্র অনিমেষ।

'তুই এ পাড়ায় কেন? এ হাউসে বই দেখতে এসেছিস? রাবিশ বই। যৌন ছাড়া আর সবই এর গৌণ। সেন্সর কি ঘুমোয়, না কি সেন্সই ঐ রকম?'

'ভাই, চার আনা পয়সা দিতে পারিস? সত্যি বাসভাড়া নেই।'

একটা সিকি দিল অনিমেষ।

ভাগ্যিস কাকলি আসে নি। দেখে নি তার এই দৈন্যের চেহারা। এই হাত পাতা।

'যা, দেরি করিস নে। যখন পুরোপুরি ভিজেছিস তখন আর দাঁড়ানো কিসের জন্যে। সোজা বাড়ি চলে যা। নইলে অসুখ করবে। যেমন চেহারা করেছিস না বাসেও জায়গা দিলে হয়।'

'না হয় হেঁটেই চলে যাব। কিন্তু জলে জুতোর স্ট্র্যাপটাও ছিঁড়ে গেছে দেখছি।' সুকান্ত নিচু হয়ে তাকাল জুতোর দিকে। বললে, খালি পায়েই মেরে দেব ঠিক।'

ভাগ্যিস কাকলি আসে নি। দেখে নি তার এই কাতরতার মূর্তি।

তবু একবার তাকাল এদিক-ওদিক। ওদিক-এদিক। কোথায় কাকলি। তার তন্তুলেশও নেই। বৃষ্টির জলে তার মুখ যেন মুছে গেছে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না সুকান্ত। তবু যদি কেউ দেখবার থাকে, সে দেখেছে আমি এসেছি, আমি কথা রেখেছি। সত্যের মত সুখ নেই। সর্বাঙ্গে তো জল নয়, সুকান্তর মনে হল, সত্যের শান্তি।

বাড়ি ফিরে এলে সেন্টু বলে উঠল, 'এ তুমি কী হয়ে এসেছ কাকা! কোথায় গিয়েছিলে?'

'একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।' বললে সুকান্ত।

'দেখা পেলে?'

'তারও সেখানে আসবার কথা, কিন্তু জানিস', মুখে ব্যথা আঁকল সুকান্ত, 'সে এল না।'

'এল না? দেখা হল না তার সঙ্গে?'

'না, না, দেখা হল বৈ কি।'

'সে কি কথা কাকা? এল না অথচ দেখা হল?' অবাক মানল সেন্টু।

'জানিস সেন্টু, জীবনে এমন লোকও আছে যে আসে না অথচ তার সঙ্গে দেখা হয়।'

দু'দিন পরে খামে চিঠি এল কাকলির :

'সেদিন স্বাতীতে দেখলাম আপনাকে, কী চেহারা নিয়ে নামলেন রিকশা থেকে। কাছে যেতে সাহস হল না। কে এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। আপনি আমাকে দেখেন নি। না দেখে ভালোই করেছেন। দেখতে পেলেই ভিজে কাপড়ে আটকে থাকতেন অনেকক্ষণ। আপনার বন্ধুর কাছে আমিও ধরা পড়তাম। সত্যি কোথাও জায়গা নেই যে একটু নিরিবিলি দেখা হয়।

থোকা থোকা আরও কদমফুল ফুটেছে। আপনাকে যদি পারতাম দেখাতে।

বাসাটা চিনে নিতে কতক্ষণ! এক সন্ধ্যায় ঠিক হাজির হল সুকান্ত। এই তো সেই বিস্তীর্ণশয়ান ঠিকানা।

বাইরে সদরে চাকর বসে।

'আচ্ছা, এ বাড়িতে কাকলি থাকে?'

'কে, এম-এর দিদিমণি? হ্যাঁ, থাকে?'

'কোথায় আছেন এখন?'

একবার আকাশের দিকে তাকাল চাকর। বললে, 'বোধ হয় ছাদে বেড়াচ্ছেন।'

'বাবুরা কোথায়?'

'বড়বাবুর অসুখ, ঘরের মধ্যে শোয়া। মা তাঁর কাছে। দাদাবাবু বেরিয়ে গেলেন।'

'তোমার দিদিমণির সঙ্গে দেখা হয়?'

'কেন হবে না? আপনি কোনো আত্মীয়?'

'হ্যাঁ, নিকট আত্মীয়।'

'তবে সোজা উঠে যান উপরে। ছাদেই হয়তো পাবেন। নয়তো বারান্দায়। সারা দিন ঘুরছেন আর পড়ছেন।'

সুকান্ত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। যাই না চলে ভিতরে। কী হবে? যা হবার তাই হবে। তবু একটা কিছু হোক। সেদিনের বৃষ্টির পর নদীর জল কি একটুও বাড়ে নি? ঘাস কি হয়নি একটুও ঘনশ্যাম? কদম অনেক উঁচুতে, মাটির কাছাকাছি কি ফোটে নি দোপাটি? লাল মেজেন্টা সাদা সোনালি!

পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ল সুকান্ত।

ছয়

একটু এগিয়ে আসতেই সিঁড়ি। নিচেটা ফাঁকা। কেউ নেই কি কোথাও? এ কখনো হতে পারে? এ-দিক ও-দিক একটু উঁকিঝুঁকি মারল সুকান্ত। দুটো টিকটিকি একসঙ্গে পড়ে গেল মাটিতে। ঝগড়া করছিল নাকি? কী দেখেছে বাইরে, একটা কালো বেড়াল বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে।

কেমন যেন থমথম করছে চারদিক। নিজের নিশ্বাস নিজে শুনতে পাচ্ছে।

দরকার নেই, ফিরে যাই।

বাড়িটা, রাস্তাটা দেখে গেলাম—আজ এই পর্যন্ত থাক। কিন্তু কী আশ্চর্য, কদম গাছটা তো দেখি নি। কোন দিকে গাছটা? ফুল কি গাছ ভরে ফুটে আছে, নাকি একটি দুটি? নিজের মনেই হাসল একটু সুকান্ত। গাছের চেয়েও আর কিছু জীবন্ত আর কিছু ফুলন্ত দেখবারই বুঝি তাড়া ছিল। কই তেমন তো কিছু বুঝি নি সজ্ঞানে। কে যেন টেনে এনে খোলা দরজা দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঢুকিয়ে দিয়েছে তো থামিয়ে দিচ্ছে কেন?

যাক, ফিরে যাই। যাবার সময় দেখে যাব'খন গাছটা। গলা তুলে দেখে নেব'খন কত উঁচুয় তার ফুল ধরা।

এতদূর এসে, শুধু এসে নয়, এতটা ঢুকে পড়ে, ফিরে যাবার কোনো মানে হয়? চোর হয়ে এলে বরং সহজ ছিল। এতক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকতে হত না, দোনামনা করতে হত না। টেবলের উপর টেবল ক্লথটা আছে, তাতে ঐ কটা বাসন-কোসন আর কাপড়চোপড় জড়িয়ে নিয়ে গলির মুখে খিড়কির দরজাটা খুলে সটকান দিলেই চলে যেত। আর যদি উপরে যাবার, ছাদে যাবার দরকার হত তা হলে সিঁড়িটা লাগত না। বাইরে থেকে গাছে চড়েই, গাছ বেয়েই, পারত হাজির হতে।

বাড়িটা অবশ্য ছোট, তাই বলে নিচে, কাছে-পিঠে, একটিও লোক থাকবে না? লোক থাকলেই বা তার কী এমন সম্পদ বাড়ত? যদি সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলত, ও মশাই, শুনছেন, কাকলি দেবীকে ডেকে দিন, তা হলে কি সিঁড়িটা সুগম হত? সভাস্থলে বেদীতে ওঠবার আগে লাটবেলাটদের জন্যে যে ঘাসের উপর লাল শালু পড়ে তেমনি শালু পড়ত সিঁড়িতে? যদি জিজ্ঞেস করত, কে আপনি, একটা চলনসই উত্তর না হয় দেওয়া যেত, কিন্তু যদি নিরস্ত না হয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করত. কী দরকার, তা হলেই গলার কাছে দলা পাকাত। বরং এই ভালো হয়েছে, কাছেপিঠে কেউ কোথাও নেই। খালি মাঠে বল ফাঁকায়-ফাঁকায় এগিয়ে শেষ মুহূর্তে বলটা গোলকিপারের হাতে তুলে দেবার মত। আমি তো স্কোর করতে চাই না। ধরা পড়তেই চাই।

সিঁড়িটা যেন স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে গেছে। হয়তো এরই একটানে নাগাড়ে উঠে যাওয়া যাবে ছাদে।

পাওয়া যাবে কাকলিকে। সিক্তকে যে উপেক্ষা করতে পারে সেই শুষ্কাকে। আর, তখন, তারপর ধরা পড়ে গেলে সুকান্তকে আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। কাকলির ডাক পড়বে। আর, কৈফিয়ৎ দিতে, বানিয়ে বলতে, বাঁচিয়ে বলতে, মেয়েদের জুড়ি নেই।

সিঁড়ির দিকে এক পা এগুল সুকান্ত। বুকের মধ্য থেকে কে খুট করে উঠল। আবার থামল, আবার তাকাল চারপাশ। মহাশূন্যতার ইতিহাস ছাড়া দেয়ালে আর কিছুই লেখা দেখল না।

আচ্ছা, কী করা উচিত, যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে কী করা উচিত ? পিছু হটে সদর পর্যন্ত ফিরে গিয়ে চাকরের শরণাপন্ন হবে, আর চাকর যদি ততক্ষণে পানের দোকানে বা তাসের আড্ডায় সরে গিয়ে থাকে, তা হলে খোলা দরজায় কড়া নাড়বে? কড়া কি খোলা দরজায় নাড়বার জন্যে? খোলা দরজা মানেই তো চলে এস, তোমাকে মোকাবিলা করবার জন্যে ভিতরে লোক আছে। ঠাকুর-ঠাকুর বলে ডাকবে? সেটা সম্ভ্রান্ত শোনাবে? নয়কি বন্ধ কাঠের জানলার গায়ে আঙুলের গিঁট দিয়ে শালীন শব্দ করবে? নিজের সরু সরু আঙুলগুলির জন্যে মায়া হল সুকান্তর। কাকলির হাতের আঙুল না জানি কি রকম দেখতে ? মোটাসোটা বেঁটে-বেঁটে ভোঁতা-ভোঁতা? নাকি ছুঁচলো ধারালো খরশান ?

শুধু উঁকি মারলেই চলে না, ঝুঁকি নিতে হয়। দু' ধাপ সিঁড়ি উঠে পড়ল সুকান্ত। কিন্তু সত্যি যা সে করছে, করতে চাচ্ছে বা করে ফেলেছে তা আইনের চোখে রীতিমত অপরাধ। বিনানুমতিতে ঢুকে পড়েছে এবং ঢোকার উদ্দেশ্য, সে নিজে যাই ভান বা ভাব করুক, খুব স্বচ্ছ নয়। সুতরাং—আবার থামল সুকান্ত, আঙুল না ভেবে লাঙুল ভাবুক। আঙুল না দেখে লাঙুল দেখিয়ে পালিয়ে যাক। ছোট একটা ছেলে মেয়েও বাড়িতে নেই? কাকলি কি একশ্চন্দ্র? হয়তো আছে ভাই-বোন, কিন্তু এ সময় ভাই গিয়েছে হয়তো খেলতে আর বোন পাড়া বেড়াতে। আর ওরা থাকলেই বা এগোত কী? হয়তো গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠত, ও দিদি, নিচে তোমাকে কে ডাকছে দেখবে এসো। একতারার জিনিস মাটি হত ঢাকে-ঢোলে। আর, ভাই-বোন কেন, দিদিও তো এ সময়টায় একটু নিচে থাকতে পারতেন। তিনি একদম নিচে নামেন না এমন তো নয়। এবং কখনো-কখনো, এমন হওয়াও আশ্চর্য নয় যে যখন তিনি নেমেছেন তখন তিনি একলা আর নিচেটা এমনি হা-হা করা সাদা শূন্যের দেশ।

নিচে, দোরগোড়ায় বা প্রথম উঁকিতেই, দেখা হলে লাভ হত কী! কী ধরনের আলাপ হত ?

কাকলি বলত, এই দিকে এসেছিলেন বুঝি ?

ও, হ্যাঁ, এই পাড়ায় আমার মাসিমার বাড়ি।

কদ্দূরে বলুন তো?

ঐ যে ওখানে—হাত দিয়ে দিশেহারা একটা প্রাচ্য নাচের ভঙ্গি করে দিত।

মাঝে-মাঝে আসতে হয় বুঝি এদিকে।

ক্বচিৎ-কদাচিৎ।

তারপরে আরো হয়তো একটু বলত কাকলি। বলত, সেদিন কী বৃষ্টি।

হ্যাঁ, বেড়াল-কুকুর। মানে ক্যাটস অ্যান্ড ডগসের বাংলা করলাম।

আর আপনি কেমন নামলেন রিকশা থেকে। নামবার কী দরকার ছিল!

রিকশাওলা আর যেতে চাইল না। আমতা-আমতা করে বলত সুকান্ত।

আর এক পা এগিয়েই তো বাস-স্টপ। অদ্দুর পর্যন্ত নিয়ে গেলেই পারত। অত ভেজবার পর যত শিগগির সম্ভব বাড়ি চলে যাওয়া উচিত। নামবার বা থামবার কোনো মানে হয় না।

না, কিছু না। ঢোক গিলত সুকান্ত। কিন্তু আপনি দেখলেন কোত্থেকে?

আমি যে ছিলাম ওখানে।

সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন বুঝি ?

না।

তবে?

ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, বৃষ্টি এসে পড়তেই আশ্রয়ের জন্যে ঢুকে পড়লাম। আমি ভিজিনি, আমার

দাঁড়াবার মানে হয়। আর আপনি ডোবা জাহাজের থেকে জ্যান্ত তোলা খালাসি—আপনার ওখানে দাঁড়াবার, দেরি করবার মানে হয় না—

আমার বন্ধু অনিমেষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কিনা—

তাই। তবু—

আচ্ছা। আসি।

নমস্কার।

তার চেয়ে এ অনেক অনেক অনেকানেক ভালো যে কাকলি নিচে নেই, ছাদে আছে। 'তারপরে'র দেশে আছে। সিঁড়ি না ভাঙলে ছাদ কই। যা হয় তাই হবে, পিছু হটব না। একটা কিছু বাধা না থাকলে চলায় সুখ কী! পাশ করতে চাই অথচ পড়ার পাশ কাটিয়ে যাব, এ হতে পারে না। বাধা আছে বলেই তো মজা। সরকার চালাব অথচ বিরুদ্ধবাদী রাখব না, জল কাত বললে সবাই একবাক্যে ঘাড় কাত করবে, এ একটা চালানোই নয়। ব্যাট করব অথচ ফাস্ট বল দেখলে উইকেট ছেড়ে আম্পায়ারের পিছনে গিয়ে লুকোব এ ছেলেমানষি বললেও বেশি বলা হয়, এ শিশুয়ালি।

একটার পর একটা করে সুকান্ত সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। চাকরের যা বর্ণনা তাতে কোথাও ঠেকবার কথা নয়, একেবারে সোজা বন্দরে গিয়ে পৌঁছুনো। আর যদি পৌঁছবার আগেই নৌকোর তলা ফুটো হয়ে যায় তো যাবে। ভরাডুবি করে দিয়ে এসেছি বলা যাবে সেন্টুকে। হাতের দান আর ফেরৎ হয় না।

দোতলা পেরিয়ে ছাদের সিঁড়ি ধরেছে, পিছন থেকে কে বলে উঠল : 'এ কে!'

এ একটা ধূসর বিস্ময়ের সুর মাত্র, স্বগতোক্তি, তাই সুকান্ত গায়ে মাখল না। উপেক্ষা করেই উঠে চলল।

এবার যে স্বরটা নির্গত হল সেটা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, পরুষপ্রখর।

'কে?'

সিঁড়ির উপরেই থামল সুকান্ত।

'কে যাচ্ছে উপরে?'

একটা ঘুড়ি কাটা পড়ে উড়ে এসেছে ছাদে, এ যদি বলতে পারত সুকান্ত, এ বলবার যদি তার বয়স থাকত। কাটা ঘুড়ি কোথায় না নিয়ে যেতে পারে, গোঠে-মাঠে-ময়দানে বনে-জলে-জঙ্গলে, বিদেশে-বিভুঁয়ে, ছাদ তো সামান্য। আর কাটা ঘুড়ি মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখলে মনে-মনে হাত তুলবে না এমন মানুষও আছে নাকি পৃথিবীতে। তাই বলবে নাকি কাটা ঘুড়ি? রঙিন ঘুড়ি?

'এ কি, কে তুমি? কোথায় যাচ্ছ?' হুমকে উঠল পরুষস্বর।

ফিরল সুকান্ত। নেমে এসে দেখল স্থূলাঙ্গ প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক দোতলার বারান্দায় আধা-ইজিচেয়ারে আধশোয়াভাবে হেলে আছেন আর তাঁর পাশে মেঝের উপর বসে তাঁর দুই পায়ের পাতায় তেল মাখিয়ে দিচ্ছেন এক ভদ্রমহিলা।

এগিয়ে এল সুকান্ত। নিচু হয়ে একটা প্রণাম ঠুকে দিলেই চুকে যায়, থমকে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোকের পা দুখানি অস্বাভাবিক ফুলো, তাতে আবার এখন তেল মাখানো। প্রণাম করতে প্রাণে রস পেল না। দু' হাতে শুকনো নমস্কার সেরে বললে, 'আমি সুকান্ত বসু—'

'আমি বনবিহারী মিত্র—শুধু এটুকু বললেই পরিচয় হল?' গর্জন ছাড়লেন ভদ্রলোক।

'আস্তে-আস্তে বলছি।' ঢোঁক গিলল সুকান্ত : 'আমার বাবার নাম—'

'তোমার বংশ পরিচয়ে আমার কৌতূহল নেই। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে তুমি কী সুবাদে এ বাড়িতে ঢুকেছ? কী চাই তোমার?'

যন্ত্রণা বাড়িয়ে লাভ নেই, সুকান্ত বললে, 'কাকলিকে চাই।'

'কে কাকলি?' পায়ে নিশ্চয়ই ব্যাধি ও ব্যথা, একটানে ঝটকা মেরে দাঁড়াতে পারেন না ভদ্রলোক, তবু উত্তেজনায় নড়ে-চড়ে উঠলেন।

সুকান্তর মুখ শুকিয়ে গেল। বললে, 'কাকলি এ বাড়ি থাকে না?'

'থাকে কি না থাকে তাতে তোমার কী?'

'তা হলে থাকে।' অস্ফুটস্বরে বললে সুকান্ত।

'হ্যাঁ, থাকে। সে আমার মেয়ে। কিন্তু তোমার তাকে কী প্রয়োজন?' ভদ্রলোক বললেন আবার রোখা গলায়।

এখানে আবার আরেকটা সম্ভাবনা ছিল। নত হয়ে সুকান্ত তাকাল আবার ভদ্রলোকের পায়ের দিকে। ভরসা পেল না। কে জানে পায়ে হাত ঠেকলেই হয়তো তারস্বরে চিৎকার করে উঠবেন। চাকর যে বলেছে বাবুর অসুখ তার মানে এই পায়ের অসুখ।

ঘাড়টা আস্তে-আস্তে একটু চুলকে নম্রস্বরে সুকান্ত বললে, 'তার সঙ্গে আমি পড়ি।'

'পড়ো তো এখানে কী, বাড়িতে কী। সটান উঠে যাচ্ছ সিঁড়ি দিয়ে তার মানেটা কী।' বনবিহারী আবার হুমকালেন।

'দরজাটা খোলা পেলাম—'

'দরজা খোলা পেলেই উঠে আসতে হয়? নিচে থেকে খবর দিলে না কেন?'

'লোকজন কাউকে দেখলাম না—একটা কলিং বেল নেই।'

'কলিং বেল! তোমার জন্যে কলিং বেল ফিট করতে হবে।' বনবিহারী আবার তড়পালেন : 'কেউ নেই তো নিচে ওয়েট করো।'

'সে এক ক্যাসাবিয়ানকা পেরেছিল।' সুকান্ত তাকাল আরেকবার চারপাশ। বললে, 'ভাবলাম নিচে নেই হয়তো উপরে পাব।'

'তা আমাদের লক্ষ্য না করেই তো উঠে যাচ্ছ ছাদে। ছাদে কী! আজকাল পড়াশোনা ছাদে হচ্ছে নাকি?'

'ঘরে-ছাদে কোথাও হচ্ছে না। তবে ঘরের মধ্যে তো গুমোট, ছাদে ঘুরলে মাথাটা ঠাণ্ডা থাকে, রিক্যাপিচুলেশানটা ভালো হয়।'

'কী ভালো হয়?' বনবিহারী ছুঁড়লেন আরেক মেঘধ্বনি।

কথাটা পুনর্বার আওড়াতে সাহস পেল না সুকান্ত।

'গোবর্ধন! গোবর্ধন!' ডাকাত-পড়া আওয়াজ তুললেন বনবিহারী।

সুকান্ত বুঝল চাকরকে ডাকছেন।

'দাঁড়াও, আমি ডাকছি।' এতক্ষণে মুখ খুললেন ভদ্রমহিলা। মালিশ ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।

তবুও আশ্বাস নেই বনবিহারীর। এবার অন্য ডাক ডাকলেন। 'বিজন, বিজন! বিজন বাড়ি নেই?'

সুকান্ত বুঝল এবার ছেলেকে ডাকছেন।

একটা ফাটাফাটি না হয়ে আর যায় না। হাত দিয়ে নিজের মাথাটা একবার অনুভব করল সুকান্ত। যদি খাড়া পায়ে দাঁড়াতে পারতেন তা হলে বনবিহারী নিজেই প্রমাণ করে দিতেন যে তিনি বনেই ভ্রাম্যমাণ।

কোলাহলটা এমন আর মৃদু কোথায়। যার লক্ষ্য, নিচের লোককে সন্ত্রস্ত করা, বাড়ির আনাচে-কানাচে তোলপাড় জাগানো, বিজনকে পর্যন্ত সজনে নিয়ে আসা, তা এক নিভৃতচারিণী ছাদবিহারিণীর কানে ঢুকছে না!

তাকেও আর রাখা হল না শান্তিতে। ভদ্রমহিলা উপরের দিকের সিঁড়ির ক' ধাপ উঠে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকতে লাগলেন : 'কাকলি! কাকলি!'

এবার উনি এসে কী সুর ধরেন দেয়ালগুলিই বলতে পারে।

একদৃষ্টে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল সুকান্ত।

আহা, এ কি কলিং বেল টিপে কার্ড পাঠিয়ে দেখা করতে এলে দেখা যেত। নাকি দিনক্ষণ ঠিক করে এসে ড্রয়িং রুমের পারিপাট্যে চিত্রার্পিত করে।

দ্রুত পায়ে ধুপধুপ করে নেমে আসতে লাগল কাকলি।

সন্ধ্যার গা ধোয়া হয় নি তারই আগেকার শৈথিল্য শাড়িতে-শরীরে গুচ্ছীকৃত হয়ে আছে। চুল খোলা, খালি পা। পরনের আটপৌরে শাড়িখানি আধময়লা। এবং সব চেয়ে আশ্চর্য, এই একটু নিজের

সঙ্গে নিজের নিঃসঙ্গ হয়েও অন্তরঙ্গ মুহূর্তে, হাত দুখানি খালি।

'কে এই লোক তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—' ভদ্রমহিলা বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলেন।

'ও, আপনি এসেছেন! আমি ভাবলাম শুনতে পেলেন না বুঝি ডাক!' কাকলি ঝলমলিয়ে উঠল। বনবিহারীর শিলীভূত দুই চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমাদের সঙ্গে পড়ে বাবা, খুব ভালো ছেলে, ফার্স্ট ক্লাস পাবে নির্ঘাত। এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ছাদ থেকে দেখতে পেলাম।'

'দেখতে পেলে!'

'হ্যাঁ বাবা, ঝুঁকে দাঁড়ালে দেখা যায়। দেখতে পেয়ে ডাকলাম হাতছানি দিয়ে। মনে হল দেখলেন না বুঝি, বুঝলেন না বুঝি।'

'হাতছানি দিয়ে ডাকার মানে?' বনবিহারীর চোখের পাতা যেন কাঁপছে না এখনো।

'হঠাৎ দেখা কিনা। তা ছাড়া অত দূর থেকে চেঁচিয়ে কি ডাকা যায় নাম ধরে?'

'তাই ইশারায় ডাকলে।'

'বাবা, কতদিন ছোট-ছোট ক্লাসগুলি অ্যাটেণ্ড করি নি, তাই ভয় ছিল কত না জানি পিছিয়ে আছি। তাই ওঁকে ডেকে একটু দেখে-শুনে ঝালাই করে নেওয়া—'

তারপর ভদ্রমহিলার কাছে এগুল কাকলি। ছেলেমানষি আবদেরে সুর বের করে বললে, 'জানো, মা, উনি এখনো নাকি কদমফুল দেখেন নি। বাঙালী ছেলের কী দুর্দশা। লেখাপড়ায় ওস্তাদ অথচ নিজের দেশের ফুল ফল চেনে না। আসুন, দেখবেন আসুন', এবার লক্ষ্য করল সুকান্তকে : 'কেমন ঝেঁপে ফুল হয়েছে ছাদের উপর।'

উঠে দাঁড়াবার ভাঙা-ভাঙা চেষ্টা করছেন দেখে কাকলি এল বাবাকে তুলতে। সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে বনবিহারী স্ত্রীর দিকে হাত বাড়ালেন। স্ত্রীর হাত ধরে উঠলেন, লাঠি নিয়ে ভর দিয়ে দিয়ে এগুতে চাইলেন ঘরের দিকে। পিছন ফিরে লক্ষ্য করলেন সুকান্তকে। বললেন, 'যাও, দাঁড়িয়ে আছ কেন? ছাদে গিয়ে কদমফুল দেখে এসো।'

সাত

সত্যিই দেখে নি বুঝি কদম ফুল। কিন্তু ও ফুল কি মর্তের তরুতে ফোটে? নাকি এ ফুলেরই আরেক নাম পারিজাত?

কি জানি কি।

এর পর ছাদে না ওঠার কোনো মানে হয় না। আর কাকলিকেও আসতে হয় পিছে পিছে। ছন্দ মিলিয়ে।

'আপনার এভাবে আসাটা মোটেই ঠিক হয় নি।' চোখে-মুখে বিরাগ-বিরক্তির ভাব আনল কাকলি।

'ঠিক হয় নি।' গলার স্বরকে অনুতাপের প্রায় কাছাকাছি নিয়ে এল সুকান্ত। কিন্তু পরমুহূর্তেই উজ্জ্বল হয়ে বললে, 'কিন্তু কী সুন্দর তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিলে বলো তো! সিচুয়েশনটা সেভ করে দিলে। তুমি ক্রিকেট বোঝ?'

'ঝিঁঝিপোকা বুঝি।'

'না, না, ঝিল্লি নয়, ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি নয়। এ হচ্ছে এক খণ্ড লগুড় দিয়ে এক অখণ্ড গোলককে তাড়না করা।' আনন্দে টইটুম্বুর সুকান্ত : 'ক্রিকেট বুঝলে বলতাম এক ইনিংসে হেরে যেতে যেতে ড্র করে ফেললে।'

'না, ড্র নয়, কে জানে হেরেই গেলাম বুঝি পুরোপুরি।' গাম্ভীর্যে আরো স্পষ্ট হল কাকলি : 'আপনাকে বাঁচালাম হয়তো, কিন্তু নিজে মরলাম।'

'অসম্ভব। আমাকে যদি তুমি বাঁচালে, তোমাকেও আমি বাঁচাব।'

'আপনার ক্ষমতা কী!'

'ক্ষমতা?' একটা বুঝি ধাক্কা খেল সুকান্ত। বললে, 'মাটির কী ক্ষমতা তা মাটি কী জানে! ম্লান মৌন মাটি। একটা বীজ এসে পড়লে তবে বোঝে।'

তবু স্পন্দিত হয় না কাকলি। বললে, 'যাই বলুন, এভাবে আসাটা আপনার মোটেই উচিত হয় নি।'

'এভাবে না এলে তোমার এভাবে থাকাটা দেখতাম কী করে?' দু' চোখে নির্মল স্নেহ নিয়ে তাকাল সুকান্ত।

যথার্থ শাসনে না থাকলেও বসন বেশ বিস্তৃত হয়েই আছে। তবু কাঁধ ও কক্ষের দিকে হাত গেল একটু অধ্যক্ষতা করতে। খোলা চুলও নিমেষে পিণ্ডীকৃত হয়ে উঠল। লঘুতাকে যেন লেশমাত্রও প্রশ্রয় দেবে না কাকলি। বললে, 'সদরে যখন চাকর ছিল তখন আপনার উচিত ছিল ওকে দিয়ে খবর পাঠানো।'

'চাকর মানে গোবর্ধনের কথা বলছ?' প্রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুকান্ত।

'হ্যাঁ—'

এরকম কাঠখোট্টা হলে আর 'তুমি' বলে কোন নৈকট্যে? তাই সুকান্তও দূরস্থ হল। বললে, 'গো শব্দের অর্থ জানেন?'

'না।'

'অনেক অর্থ আছে শুনেছি। এক অর্থ নাকি ইন্দ্রিয়। আর ইন্দ্রিয় মানেই যন্ত্রণা। তাই গোবর্ধনকে দিয়ে খবর পাঠানো মানেই যন্ত্রণাবৃদ্ধি। কি বলতে কী বোঝে, কাকে ডাকতে গিয়ে কাকে নিয়ে আসে বা আদৌ আসে কিনা তার ঠিক কি।' কাকলির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একটি কোমল রেখা ফুটল না কোথাও, না ঠোঁটে না চিবুকে না বা চোখের কোলে। হতাশের শেষ নিশ্বাস ফেলল সুকান্ত : 'তাই গিরি নিজে ধারণ না করে লঙ্ঘন করেই উঠে এলাম।'

শুধু গম্ভীর নয়, এবার যেন কঠিন হল কাকলি। বললে, 'আপনি জানেন না, আমার বাবা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে রিটায়ার করেছেন। সারা জীবন ডিসিপ্লিন মেনে এসেছেন—'

'তা উনি যদি রিটায়ার করে থাকেন তবে ডিসিপ্লিনও রিটায়ার করেছে।'

'না।' শুধু কঠিন নয়, এবার যেন উদ্ধত হল কাকলি। বললে, 'দিনে দিনে আমরা যতই কেননা বদলাই, যতই কেননা চালাক হই, এমন কতকগুলি জিনিস আছে যার মূল্যের কোনো বদল হয় না। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, যাকে বলে গিয়ে, ভদ্রতা, শালীনতা, ডিসেন্সি—' সরে দু-পা দূরে গেল কাকলি।

'তা হলে আর কথা কি।' দরজার দিকে এগিয়ে গেল সুকান্ত। 'এক দেশের বুলি অন্য দেশের গালি। একজনের ভালোবাসা অন্যজনের অভদ্রতা। যে যেমন বোঝে। আচ্ছা, আসি, নমস্কার।' দু হাত যুক্ত করল সুকান্ত।

'বলি নমস্কার করতে তো খুব শিখেছ,' কাকলি হঠাৎ কাছে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল। গলার স্বর অস্পষ্ট করে বললে, 'বাবাকে প্রণাম করেছিলে?'

'কী করে করি? দু পায়ে তেল মাখানো।'

মুচকে এবার একটু হাসল কাকলি। বললে, 'সারা জীবন লোকে এই পায়ে তেল দিয়েছে, তুমিও না হয় দিতে দু' ফোঁটা। দুটো ঠোক্করে দু' ফোঁটা প্রণাম।'

মুখ শোকার্ত করল সুকান্ত। বললে, 'ভুল হয়ে গিয়েছে। আর গোড়ায় ভুল হলে আগাগোড়া ভুল। তোমার বাবাকে প্রণাম করা হল না বলে তোমার মাও বাদ পড়লেন।'

'দাঁড়াও, মা ডাকছেন নিচে। শুনে আসি। যেও না কিন্তু।' কাকলি ছুট দিল সিঁড়ির দিকে। আর নামতে যেতেই চুলের পিণ্ডটা ভেঙে গিয়ে নেমে পড়ল বৃষ্টির মত।

ছাদে এতক্ষণ থাকবার কী হয়েছে! গায়ত্রী প্রায় মুখঝামটা দিয়ে উঠল। এক ডাকের মামলা, কদম ফুল দেখিয়ে দিলেই তো চলে যায়। না হয় গোটা কতক ছিঁড়ে নিক হাত বাড়িয়ে। অতক্ষণ লাগে কিসে? না হয় পাঠিয়ে দিই গোবর্ধনকে।

'আমি ভাবছিলাম চা করে দিতে ডাকলে বুঝি—'

আবার যাচ্ছিস? আর এ কী তোর ছিরিছাঁদ? বেশভূষা? বিকেলের গা ধুস নি, চুল বাঁধিস নি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোস নি। দু হাতের বালা খুলে ফেলেছিস? গলারটা আছে, না, গলাও খালি? আহা, কী অপরূপ মূর্তিই ধরেছেন শ্রীমতী! যা, বৈকালিক প্রসাধন সাঙ্গ কর, ভদ্র সাজ, ভব্যতায় শালীনতায় ফিরে আয়—

'ততক্ষণ?' কাকলি ছাদের দিকে চোখ তুলল।

'ততক্ষণ ও একা-একা হাওয়া খাক, নয়তো কেটে পড়ুক।'

'তার চেয়ে সরাসরি ওকে চলে যেতে বলি। সেইটেই ভালো।'

'তার আগে শাড়িটা পালটে নে।' গায়ত্রী আবার বাধা দিল : 'ভদ্র হ।'

'একবার ধরা পড়ে যাবার পর পালটাবার মানে হয় না। কেন, এ বেশবাস মন্দ কি! সরল সাদাসিধে থাকা কি দোষের? বাড়িতে মেয়েরা কি সর্বক্ষণ পেখম চড়িয়ে থাকে?'

'তাই বলে তোর মত হাতছানি দিয়ে অকালের কালো মেঘ কেউ ডেকে আনে না।' গায়ত্রী চোখের কটাক্ষকে কালো করল।

'বেশ তো, কালো মেঘ তাড়িয়ে দিতে কতক্ষণ!' কাকলি উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। মুখে ধ্বনি তুলল : 'দেখছেন, শুনুন আপনি এখন—'

পিছন থেকে গায়ত্রী বলে উঠল, 'এ আবার কোনদিশি ভদ্রতা?'

মা-ও বুঝি উঠছেন পিছু পিছু। পা না উঠলেও কান উঠছে নিশ্চয়ই। তাই ছাদে দরজাব কাছে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য স্থির রেখে অসমাপ্ত কথাটা শেষ করতে চাইল কাকলি। কিন্তু কই, সুকান্ত কোথায়?

'এ কী, কোথায় গেলেন?'

এপাশ ওপাশ কাকলি তাকাল ব্যাকুল হয়ে। ছাদ এমন কিছু ঘোড়দৌড়ের মাঠ নয় যে নজরে আসবে না। কিন্তু সত্যি, গেল কোথায়? গাছটা যেখানে ডালে-ফুলে উচ্ছ্বসিত হয়ে রেলিঙ ছাপিয়ে ঝুঁকে পড়েছে সেদিকটাতেও নয়। এ কি আশ্চর্য, হাওয়া হয়ে গেল নাকি? নাকি লাফিয়ে পড়ল ছাদ থেকে?

কাকলি গাছটার কাছে এসে দাঁড়াল। রেলিঙে ভর রেখে ঝুঁকল নিচে।

নাকি গাছ বেয়ে নেমে গেল রাস্তায়?

তাকাল ফুলগুলির দিকে। যেন ওরা জানে। ওরাই বলতে পারবে। যেন ওদেরই একটি হয়ে রয়েছে লুকিয়ে। রয়েছে ঘুমিয়ে। সুগন্ধি হয়ে।

কী অদ্ভুত ছেলেমানুষ! জলের ট্যাঙ্কটার পিছনে লুকিয়েছিল গুড়ি মেরে। ঝকঝকে দাঁতে এক ঝাঁক পাতিহাঁস উড়িয়ে বেরিয়ে এলেন কালো মেঘ।

'কী সাংঘাতিক ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন!' ফ্যাকাশে মুখের সব জায়গায় এখনো নিশ্চিন্ত রক্ত আসে নি, কাকলি বললে ধূসর স্বরে, 'বুক এখনো কাঁপছে নিদারুণ।'

'বিশ্বাস করি না।' বললে সুকান্ত।

'কী বিশ্বাস করেন না?'

'আপনার বুক যে কাঁপছে।'

'মুখে বলছি—'

'বুকের কথা কি মুখের কথায় শ্রবণীয়? পরীক্ষা চাই।'

'পরীক্ষা! আপনি কি ডাক্তার! সঙ্গে আপনার স্টেথিসকোপ আছে?' তুমি চালাক হতে পারো, আমি হতে পারি না—এমনি দুরন্ত জিজ্ঞাসার চোখে তাকাল কাকলি।

'কিন্তু আমার পরীক্ষা আরো নিকট, আরো নিবিষ্ট।' হাসল সুকান্ত : 'আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি তোমারি গান—'

'আপনার ছাদ থেকে পথে যাওয়াই উচিত ছিল।'

'সেটা তো মাটিতে, রাস্তায় পড়া হবে। যদি পড়ব তো এভারেস্ট থেকে পড়ব। আর পড়ব এই ছাদের উপর।'

'কেন, এই ছাদের উপর কেন?' যেন এতে বিশেষ আপত্তি বর্তমান, এমনি ভাব করল কাকলি।

'ছাদের উপর মানে তোমার কোলের কাছাকাছি।' দিব্যি বলল, বলতে পারল সুকান্ত : 'যেখানে এভার-রেস্ট। চিরন্তন বিশ্রাম।'

আশিরপদনখ গম্ভীর হয়ে গেল কাকলি। ফিল্মের রিল ঘুরিয়ে যাচ্ছে এমনি দ্রুত শেষ করবার উদ্যোগে বললে, 'যার জন্যে এসেছিলেন ছাদে, এই দেখুন সেই কদম গাছ। দেখুন কী গাঢ় পাতা আর কী নীটোল ফুল, সাদায়-সোনায় গায়ে হলুদ!'

এক ফুঁয়ে সব যেন উড়িয়ে দেবার মত। সুকান্ত বললে, 'মানুষ পেলে গাছ কে দেখে!'

'মানুষ পেলে!'

'হ্যাঁ, তা ছাড়া ঐ গাছ, কদম গাছ তো অশ্লীল।'

'অশ্লীল?' যেন বসে পড়ল কাকলি।

'হ্যাঁ। আমাদের মধ্যে যারা দেবদেবী মানে না নিরাকার মানে তারা কদম গাছকে অশ্লীল বলে। এই কদম গাছের উপরে-নিচে আমাদের কৃষ্ণ অনেক দুষ্কাণ্ড করেছেন, তারই জন্যে।'

'উপরে-নিচে?'

'নিচে থেকে বাঁশি বাজিয়ে ঘরের বউকে বার করে এনেছেন। আর', চোখে মুখে হাসির কুঙ্কুম ছড়াল সুকান্ত : 'আর, উপরের কথা শুনতে চেয়ো না। এবার কুল-চোর নয়, দুকূলচোর। স্নানার্থিনীদের শাড়ি চুরি করে নিয়ে দিব্যি বসেছেন মগডালে। জলাঙ্গিনীদের কী দুর্দশা। দুর্দশা দেখেও দয়া নেই গুণমণির।'

'জানো', গলার স্বর আর্দ্র করল কাকলি : 'মা তোমাকে কালো মেঘ বলেছেন।'

'সে আমার গায়ের রঙ দেখে। আমি স্বভাবে কৃষ্ণ বলে নয়। তা ছাড়া আমার নাম তো শ্রীকান্ত নয়, আমার নাম সুকান্ত।'

'কিন্তু কালো মেঘ দেখে শ্রীমতীর কী আকূতি!' সুকান্তর চোখের মধ্যে তাকাল কাকলি।

'কলির শ্রীমতীর তো কালো মেঘকে তাড়াতে পারলেই শান্তি। বলে, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ুন। চম্পট দিন।'

'কিন্তু আমি কি শ্রীমতী?'

'তুমি এই কলকাতার সন্ধে। দেখ দেখি তাকিয়ে। এখনো জ্বলে নি আলো, গায়ে হাতে পরে নি একটিও গয়নার ছিটে। শুধু আভরণহীনতার আভা। রংটি মাজা-মাজা, মৃদু-মৃদু মিষ্টি। আর খুব-ভাঙা চুল, আস্তে-আস্তে পড়ছে ছড়িয়ে-গড়িয়ে। আর চোখভরা বৃষ্টির মমতা। তুমি আরেকরকম শ্রীমতী।'

'সন্ধে হয়েছে। এবার তবে বাড়ি যাও।' যেন সত্যিসত্যিই বললে কাকলি।

'যেতে ইচ্ছে করছে না।' শিশুর মত মুখ করল সুকান্ত। মুখ করল বটে কিন্তু নির্ভুল ফিরে চলল দরজার দিকে। দুর্দান্তের মত পা ফেলে।

'ও কি, এখুনি চলে যাচ্ছেন কি!' প্রায় আর্ত হাঁক দিল কাকলি : 'একটা অন্তত ফুল নিয়ে যান। যার জন্যে এত কষ্ট করে আসা।'

ফিরল সুকান্ত। কাছে এল।

কাছে আসতেই কাকলি বললে, 'ফুল একটু দেখবে না? ধরবে না?'

নিষ্ঠুর নির্লিপ্তের মত সুকান্ত গাছেরই একটা ফুল ধরল মুঠোতে। বললে, 'জানো, কদম খুব খাঁটি ফুল।'

'খাঁটি?' বিশেষণ শুনে আশ্চর্য হল কাকলি।

'হ্যাঁ, একনিষ্ঠ। প্রথম থেকে, উদগম থেকেই গোল হয়ে দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত গোলাই থাকে। আকার বা অবয়ব কিছুই বদলায় না একটুকু। আদিম থেকে অন্তিম এক অবস্থিতি। জীবনে প্রথম ভালোবাসার মত।'

গোবর্ধন দু' কাঁধে দুই বেতের চেয়ার নিয়ে এসে উপস্থিত হল।

'এ কি, চেয়ার কেন? চেয়ার দিয়ে কী হবে?' কাকলি হকচকিয়ে উঠল।

'বাবু পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, আপনারা পড়বেন বসে। ঘুরে ঘুরে পড়তে নাকি অসুবিধে হচ্ছে। তারপরে, যাচ্ছি, আবার একটা টেবিল নিয়ে আসতে হবে।'

'টেবিল? কিন্তু এখানে আলো কই?'

'তা জানি না।' চলে গেল গোবর্ধন।

'তার মানে দু চেয়ারে হয় নি এবার অন্ধকারে টেবিল ছুঁড়ে মারা হবে। এবার পালাই।' পিছন ফিরেও তাকাল না, নেমে চলল সুকান্ত।

'সে কি, একটা ফুল নিয়ে যান।' ডেকে উঠল কাকলি।

একটা ফুল হাতে করে নিয়ে না গেলে এখানে আসার সাধুতাটা সাব্যস্ত হয় কি করে?

কিন্তু দাঁড়াল না সুকান্ত।

দোতলায় নেমেই টেবিল কাঁধে গোবর্ধনের সামনে পড়ল। কি মাথায় এল, বলে বসল, 'বাবু কোথায়?'

ঘর দেখিয়ে দিল গোবর্ধন।

প্রণাম করবে কি, দু' পা পুরু কম্বলে ঢেকে শুয়ে আছেন বনবিহারী।

'আমি এবার যাই।' বিনয়নম্র হয়ে বললে সুকান্ত।

'ও তুমি? তুমি এখনো আছ? কি, এখন যাবে? বেশ, যাও। এরপর আবার যখন আসবে, যদি আস, বাইরে থেকে প্রথমে জানান দেবে—বুঝলে?'

'কেন, এখন তো জানাশোনা হয়ে গেল।' সুকান্ত মাথা চুলকোল : 'এখন তো সটান চলে আসতে পারব।'

'সটান? অত টানে দরকার নেই। শোনো।' বনবিহারী থামালেন সুকান্তকে : 'তোমার বাবা কি করেন?'

'বাবা উকিল।'

'যে বাড়িতে থাকো সেটা নিজেদের বাড়ি?'

'না। ভাড়াটে বাড়ি।'

'কে কে, কতজন থাকে সে বাড়িতে?'

'রাবণের গুষ্টি। আমরা একান্নবর্তী কিনা—এক-এক গুলি দো-দো চিড়িয়া—' ঘর থেকে বেরিয়ে আবার নিচের সিঁড়ি ধরল সুকান্ত। আর বনবিহারী পায়ের কম্বলে মাথা ঢাকলেন।

সিঁড়ির মুখেই কাকলি। তার হাতে একটা কদমের ডাল। তাতে তিনটি ফুল। কী ভেবে একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে ডালটাকে দু-ফুল করলে। কোনো কথা বলল না। ডালটি দিয়ে দিল সুকান্তর হাতে।

নিচের তলায় নেমেছে, গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা। তার এক হাতে চায়ের কাপ আরেক হাতে খাবারের প্লেট।

'এ কি, চা করেছিলাম যে—'

'আরেকদিন এসে খাব।' দ্রুত বেরিয়ে গেল সুকান্ত।

বাড়িতে এসেই ডাক দিল সেন্টুকে। দ্যাখ তোর জন্যে কী এনেছি।

'কী এনেছ কাকা?' পড়ি-মরি করে ছুটল সেন্টু।

'দেখবি আয়। রাধাকৃষ্ণ এনেছি।'

'খুব ভালো, খুব ভালো।' ফুলের বৃন্ত ধরে সেন্টুর খুশি আর ধরে না।

'ভীষণ ভালো।' বললে সুকান্ত, 'বাসেও ভালো রসেও ভালো। রাতেও ভালো দিনেও ভালো। সুখেও ভালো স্মৃতিতেও ভালো। এমন ভালো আর হয় না।'

ক'দিন পরে এ বাড়িতে একটা হট্টগোল উঠল।

ওরে সুকু, শিগগির আয়, তোর কাছে কে এসেছে। চারদিক থেকে সমস্বর কোলাহল উঠল।

এসেছে তো এসেছে, তায় এত ভূমিকম্প কিসের? এসেছে তো রাস্তায় দাঁড়াক, অপেক্ষা করুক। আমি এখন দাড়ি কামাচ্ছি।

বন্দনা চোখ মুখ স্বর ঝাপসা করে বললে, 'এ তোমার সুবল সখাদের কেউ নয়। এ মেয়ে। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। ফুটানিকা ডিব্বা।'

আট

'না না, এ বাড়িতে নয়। এ বাড়িতে লাগবে না।' মুখিয়ে উঠল মৃণালিনী। 'অন্য বাড়ি দেখুন।'

মন-মেজাজ ভালো ছিল না মৃণালিনীর। আফিস থেকে ফিরে এসে খাবে বলে প্রশান্তর জন্যে এক বাটি মাছ মিটসেফের এক কোণে রেখেছিল লুকিয়ে, তাই বিজয়া খুঁজে পেতে বার করে খাইয়ে দিয়েছে হেমেনকে। এ নিয়ে খানিক আগে হয়ে গেছে খণ্ডপ্রলয়। স্বামীকে বেশি করে খাওয়াতে হয় আলাদা হয়ে গেলেই তো চলে। কে ধরে রাখছে! এ বেশি করে খাওয়ানো নয় এ ন্যায্য ভাবে, ন্যায্য ভাগে খাওয়ানো। আফিস-আদালত যানেওয়ালা তিনজন—ভাসুর-ঠাকুর, ভাসুরপো আর উনি। তিনজনের থালার পাশে-পাশে মাছের বাটি রেখে খুব তো চলে গেলেন উপরে, কিন্তু কী কারুকার্যটা করে গেলেন, ভাবলেন কেউ বুঝি দেখতে পেল না। একজন তো আছেন চোখ মেলে, তিনিই দেখিয়ে দিলেন। দেখলাম, নিজের স্বামী-পুত্রের বাটিতে দুখানা করে আর দেওরের বেলায় একখানা। মনে হল এ ত্রুটি নয়, এ ক্ষুদ্রতা, এ অন্যায়, একে উচিত নয় সহ্য করা। কিন্তু আছে কি কোনো প্রতিকার? চারদিকে একটু সতর্ক হয়ে তাকাতেই মিলে গেল প্রত্যুত্তর। মিটসেফের ভিতরে, প্রায়. নিগূঢ়ে, লুকোনো একটা বাটি, আর, তার ঢাকা খুলতেই, সন্দেহ কি, ঝোলে-ভাসা দু' টুকরো চাকা-চাকা মাছ। কী কর্তব্য স্থির করতে একচুলও সরতে-নড়তে হল না, পলকের মধ্যে বাটি দুটো বদলাবদলি করে ফেললাম।

'আমি ভাগ করে দিয়েছি, আমার উপরে আবার কথা কী।' লকলক করে উঠল মৃণালিনী : 'আমি বড় নই? আমার মান রাখবে না তুমি?'

'বড় শুধু মানে নয়, বড় প্রাণে।' পালটা জবাব দিল বিজয়া। 'আর, প্রাণ ঠিক বড় না হোক, অন্তত প্রমাণসাইজ হলেই হাতের মাপ ঠিক থাকে।'

'প্রশান্ত রুগ্ন, ওকে, একটু বেশি খেতে দিলে তোমার হিংসে হয় কেন?'

'একলা ঘরে-বাইরে যত খুশি খাক না প্রশান্ত, কে দেখতে যাচ্ছে, কে বলতে যাচ্ছে? কিন্তু একসঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে বসিয়ে ছোটকে বেশি ও বড়কে কম দেওয়ার স্বেচ্ছাচারকে শোধন করার নাম হিংসে নয়, গণতন্ত্র।'

'টাকার গরমে খুব যে বড়-বড় কথা বলতে শিখেছ।'

'বড়র কথা যখন তুলছেন তখন প্রশান্তর চেয়ে তার কাকা বড় ছিল। কিন্তু এখানে বড়-ছোটর কথা নয়, সমানত্বের কথা। আর, আপনার কথামত, বড় হলেই যদি তার বেশি প্রাপ্য, তবে, সেদিক থেকে দেখলেও —'

'বেশি খেতে হলে বেশি দিতে হয়।' দু' হাত মুখের কাছে তুলে কাকে বেশি বলা হয় গহ্বর রচনা করে দেখাল মৃণালিনী।

'এখানে আহরণ তো ঠিকই ছিল, বিতরণেই গোলমাল। মন্ত্রিত্বটা এবার বউয়ের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজে দাঁড়ান না সরে।'

'কোন দুঃখে? তার চেয়ে তোমরা এ বাড়ি ছেড়ে দূর হয়ে যাও।'

'কার বাড়ি কে ছাড়ে!' ধিক্কারের মত হেসে উঠল বিজয়া।

'কার বাড়ি মানে? এ বাড়ির ভাড়া কার নামে চলেছে? ট্যাক্সো দেয় কে? কার নামে লাইসেন্স?' যত কিছু শুনেছে বুঝেছে, একধার থেকে বলে যাচ্ছে মৃণালিনী।

'ঐ সুখেই থাকুন।' বিজয়া তেজী ভঙ্গি করে দাঁড়াল সোজা হয়ে; বাড়িওলার সঙ্গে উনি দেখা করে এসেছেন। গোটা বাড়ি উনি কিনে নেবেন একলা, তখন কে কাকে তাড়ায় দেখা যাবে।

'দেখা যাবে।' থপথপ করতে করতে দোতলায় উঠে গেল মৃণালিনী।

উপরে ধোপা এসেছে, এক তাল ময়লা কাপড়ের মধ্যে বসে খাতায় হিসাব লিখছে বন্দনা। হিসাব লিখছে মানে যোগে বিয়োগে হিমসিম খাচ্ছে। ধোপার মোট গণতির সঙ্গে কিছুতেই ঘটাতে পারছে না অঙ্কের সমানত্ব। মাছ কমায় তো ঝোল বাড়ে, ঝোল কমায় তো মাছ লুকোয়। মাছে-ঝোলে-কাঁটায় ঘ্যাঁট পাকিয়ে যায়।

'তুমি কী করো? তুমি গিয়ে একটু দেখতে পারো না?' মৃণালিনী এবার বন্দনাকে নিয়ে পড়ল।

'বাঃ, কখন থেকে তো আমি রামধরমকে নিয়ে আছি।' ভীরু চোখে তাকাল বন্দনা।

এবার রামধরমের উপর উদ্যত হল মৃণালিনী : 'তোমাকে কতদিন বলেছি না এই আফিসটাইম ঘেঁষে এসো না, বিকেলের দিকে এসো। বাবুরা সবাই আফিস-কাচারি বেরুবার সময় একগাদা ময়লা কাপড় দেখে গেল তো? কি জানি কি আছে আজ অদৃষ্টে। গোড়াতেই যা নমুনা—'

'কী হয়েছে?' মায়ের মুখের উপর প্রশ্ন করাও উচিত নয় অথচ না করাটাও কেমন, বলেই ফেলল বন্দনা।

মৃণালিনী কাঁদ-কাঁদ মুখ করে বললে, 'প্রশান্তর মাছ খেয়ে নিয়ে গেছে।

প্রশান্তর হাত না পা কাটা পড়েছে দুর্ঘটনায়, ট্রামের চাকা না বাসের চাকা খেয়ে নিয়ে গেছে এমনি যেন শুনল বন্দনা। 'কোথায়?' ফ্যাকাশে মুখে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

'মিটসেফে। বিকেলের জন্যে যে মাছ তুলে রেখেছিলাম ঢাকা দিয়ে তার আদ্যোপান্ত কিছুই রাখে নি।'

ধাতস্থ হল বন্দনা। আঙুলের মধ্যে ঝরনা কলমটা স্থির হয়ে গিয়েছিল, প্রাণ পেয়ে নড়ে উঠল। বললে, 'কে খেয়ে গিয়েছে? বেড়াল?'

'বেড়ালের বড়দিদি। বিজয়া।'

'কাকিমা খেয়েছেন?' হাসতে গিয়ে আঁতকে উঠল বন্দনা।

'ও একই কথা। সোয়ামীকে খাইয়েছে। আর সকলের দুখানা করে, ওর সোয়ামীর একখানা। এ সইল না ঠাকরুনের। মিটসেফ থেকে চুরি করে এনে সোয়ামীর পাতে ঢেলে দিল।'

'সে কি কথা?' আফিস যাবার আগে খুব লাইট, হালকা খাবেন এই তো কাকার হুকুম। এক হাতা ভাত, এক চিলতে মাছ —'

'আর, এক চামচ দই। তোমাকে আর সর্দারি করতে হবে না, বউমা।' কান ঠিক খাড়া রেখেছিল, নিচে থেকে বিজয়া ঝংকার দিয়ে উঠল : 'কবে আবার ঐ ফরমান জারি করল তোমার কাছে? কই আমি তো শুনি নি। ভাবখানা দেখাচ্ছ যেন ঐ নির্দেশের জন্যেই ঐ সরু ব্যবস্থা। তাই যদি হবে তবে দু' টুকরো মাছের ভরপুর ঝোলের বাটিটা উনি 'না' করলেন না কেন? চকচকে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কেন খেলেন চেটেপুটে? সর্দার! হালকা খাওয়াবার আর তুমি জায়গা পেলে না?'

কী বলতে যাচ্ছিল বন্দনা, চোখে-মুখে নীরব তর্জন করে দমন করল মৃণালিনী। তারা দু'জন, শাশুড়ি-বউ, এক পক্ষে, ইঙ্গিতটা তাই বিশদ করল। বললে, 'কিছু বলতে যেও না। ওরা এই বাড়ি কিনছে, কিনেই উচ্ছেদের নোটিশ দেবে আমাদের।'

'খ্যাঁদা নাকে অনেকেরই নথ পরতে সাধ যায়।' মুখ টিপে হাসল বন্দনা। 'তা স্যাকরার বাড়ি থেকে নথ আগে আসুক গড়িয়ে। যতদিন না আসে ততদিন নাক উঁচু করতে না চাওয়াই ভালো।'

'হ্যাঁ, ততদিন মানতে হবেই আমার কর্তাত্তি। শোনো, আমি আবার বাজার থেকে মাছ আনাচ্ছি।' ঘরে গিয়ে আলমারি খুলে টাকা বের করল মৃণালিনী : 'তুমি গিয়ে রেঁধে ফেলো নতুন করে। রেঁধে মিটসেফে রেখে তালা দিয়ে বন্ধ করে এসো ভালো করে। হ্যাঁ, রুপোর মল আগে গড়িয়ে আসুক তারপর যেন গোদা পায়ের লাথি তোলে।'

বারান্দার একধারে ছোট আয়নাটাকে অনেক কায়দা কসরৎ করে দাঁড় করিয়ে দাড়ি কামাচ্ছে

সুকান্ত, বুকের ভিতরটা এবার ছ্যাঁৎ করে উঠল। এবার না তাকে স্মরণ হয়! বাজারে যাবার লোকের দরকার, এবার না ঝোপ বুঝে কোপ পড়ে। মাছ খাবে অন্যে আর কাঁটা বিঁধবে তার নিজের গলায়। নতুন করে গালে সাবান ঘষতে লাগল সুকান্ত। ভাবখানা এমনি যেন কারুকার্যের এই মোটে আরম্ভ।

মৃণালিনী নিচেই নেমে গেল চাকরের খোঁজে। নিচে আবার না আরেক প্রস্থ শুরু হয়! এক দেশের বুলি তো অন্য দেশের গালি। মায়ের কাছে কাকিমা চোর, কাকিমার কাছে মা জোচ্চোর। যেমন হিটলারের কাছে চার্চিল, চার্চিলের কাছে হিটলার। অথচ কী সামান্য নিয়ে কলহ, কী অসামান্য ক্ষুদ্রতা! এ মিটবে কবে, মিটবে কিসে?'

ঘন করে ফের বুরুশ করতে লাগল সুকান্ত, কিন্তু, এ কী, নিচে আবার এ কিসের গোলমাল?

হরিপদর খোঁজে মৃণালিনী সদরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, ব্যাগ কাঁধে অচেনা মহিলা সামনে পড়তেই ঝাঁজিয়ে উঠল : 'না, না, এ বাড়িতে নয়। এ বাড়িতে লাগবে না। অন্য বাড়ি দেখুন।'

'আমাকে বলছেন?' সদরের মুখে, রাস্তার উপরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাকলি।

'তা ছাড়া আবার কাকে! আপনি কী এনেছেন, কিসের স্যাম্পল?'

'স্যাম্পল?'

'হ্যাঁ, চা, না সাবান, না গুঁড়ো দুধ? যাই আনুন, কিছু লাগবে না আমাদের।' মৃণালিনী চাকরের জন্যে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

'না, চা হলে আমার লাগবে।' নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল বিজয়া : 'এজমালি চায়ে ভীষণ ঝামেলা, তাই আমার আলাদা স্টোভ জ্বলে। আলাদা টি-সেট। আসুন। আপনি কোন কোম্পানির এজেন্ট? দার্জিলিং না আসাম না মধ্যপ্রদেশ?'

হাসতে-হাসতে প্যাসেজটাতে উঠে এল কাকলি। বললে, 'না, আমি এজেন্ট নই, আমি প্রিন্সিপ্যাল।'

'প্রিন্সিপ্যাল?' হাঁ হয়ে গেল মৃণালিনী।

'কোন কলেজের?' সবিস্ময় চোখে জিজ্ঞেস করল বিজয়া। সসম্ভ্রমে বললে, 'আসুন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ঘরে আসুন। ফ্যান আছে ঘরে।'

বাইরেই দ্বিধা করতে লাগল কাকলি। বললে, 'প্রিন্সিপ্যাল মানে বলতে চাচ্ছি, আমি নিজেই নিজের কর্তা, কারু আমি প্রতিনিধি নই। গোমস্তা বা আমমোক্তার নই। তা ছাড়া অধ্যক্ষ হব কোত্থেকে? আমি এখনো ছাত্রী।'

'এত বড় মেয়ে এখনো ছাত্রী?' মৃণালিনী আবার প্রায় হাই তুলল : 'ঠিকমত প্রমোশন পাও না বুঝি?'

'প্রায় তাই। এবার শেষ প্রমোশনের চেষ্টা।' কাকলি বাড়ির মধ্যে তাকাল।

'শেষ মানে?' বিজয়া বেশি ওয়াকিবহাল, তাই গম্ভীর আন্দাজ করল : 'বি-এ দেবে বুঝি?'

'এম-এ দেব।'

'এম-এ!' বিজয়ার কটাক্ষ মৃণালিনীর উপর। বললে, 'এইটুকু ছোট এক চিলতে মেয়ে, এম-এ দেবে! বলো কি!'

মৃণালিনীও গম্ভীর হতে জানে। বললে, 'কেন, আমার সুকু—সুকান্ত—সেও তো এবার এম-এ দেবে।'

'ও! আপনিই তা হলে সুকান্তবাবুর মা?' অক্লেশে মৃণালিনীকে প্রণাম করল কাকলি। বিজয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি?'

'যাই হই, ওঁকে যখন করেছ আমাকেও করতে পারো।' বিজয়া চিড়বিড় করে উঠল।

বিজয়াকেও প্রণাম করতে দেরি হল না। সহাস্য নম্রমুখে বললে, 'আমি আর সুকান্তবাবু একসঙ্গে পড়ি, একই বিষয়। পরীক্ষাসমুদ্রে আমরা একই জাহাজের সোয়ারি, যদিও উনি ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে আর আমি খোলা ডেকে। উনি বাড়ি আছেন?' তাকাল মৃণালিনীর দিকে।

'কী জানি আছে কিনা। সারাক্ষণই তো আড্ডা দিয়ে বেড়ায়।' মৃণালিনী পাশ কাটাতে চাইল : 'পড়ার নামে ঠনঠন। কখন বেরিয়ে গেছে টো-টো কোম্পানি হয়ে কিছু ঠিক আছে?'

'আপনি জানেন?' কাকলি তাকাল বিজয়ার দিকে।
'অনেকক্ষণ তো শুনি নি সাড়াশব্দ। বোধ হয় নেই।' মৃণালিনীর সঙ্গে চোখোচোখি হল বিজয়ার।
'দেখুন না একটু। ওঁকে আমার দরকার।' যেন পুলিস হয়ে গ্রেপ্তার করতে এসেছে এমন শোনাল কাকলিকে।
'কেন, দরকার কেন?'
'আমার প্রোফেসর, মানে যিনি আমাকে বাড়িতে পড়ান, তিনি জানতে পেরেছেন কটা প্রশ্ন যা ঠিক আসবে পরীক্ষায়, নির্ঘাত আসবে।' ঢোঁক না গিলে দিব্যি বানাতে পারছে কাকলি : 'যতই কম পড়ুন সুকান্তবাবু ঠিক পাবেন ফার্স্ট ক্লাস, আর যদি এ প্রশ্নগুলিও তাঁকে পৌঁছে দিতে পারি তবে আর দেখতে হবে না, একেবারে সকলের মাথার উপরে। চুড়োর উপরে ময়ূরপাখা হয়ে বসবেন। তাই ওঁর জন্যেই ওঁকে দরকার, আমার জন্যে নয়।' বলতে বলতে নিজেই দু' পা এগিয়ে গেল অভ্যন্তরে।
'সুকু, সুকু!' স্বর যতদূর কর্কশ করা যায় ডাক ছাড়ল মৃণালিনী : 'দ্যাখ এসে কে এক মেয়ে তোকে ডাকছে, কে এক ছাত্রী—'
খালি পা, পরনে লুঙ্গি, গায়ে হাত-কাটা গেঞ্জি, এক গালে সাবান, আরেক গাল কামানো, পড়িমরি ছুটে এল সুকান্ত। দেখল কাকলি দাঁড়িয়ে। অভ্যাসের দেশে আশ্চর্যের মত। যে মাধুরীর শেষ নেই, ইয়ত্তা নেই, যে মাধুরী আস্বাদ করে জীবনে কেউ বললে না আমার আশা মিটেছে, সে নিত্য-অফুরন্ত নিত্য-অপূর্বের মত। পাষাণস্তূপের তলে অজানা নির্ঝরিণী।
'এ কী, আপনি?' ন যযৌ ন তস্থৌর মত করে উঠল সুকান্ত।
যেন সুকান্তকে এখন দু' চোখ ভরে দেখবার মত নয় এমনি উদাসীন চোখে ব্যাগ ঘাঁটতে লাগল কাকলি। বললে, 'দাঁড়ান, যার জন্যে আসা, আপনাকে ক'টা 'সিওর' কোশ্চেন দিই। আপনাকে কিন্তু কপি করে নিতে হবে।'
'আপনি একটু বসুন কাকিমার ঘরে। ঐ ঘরেই শুধু ফ্যান আছে এ বাড়িতে।' দিশেহারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল সুকান্ত : 'আমি একটু আসছি মানুষ হয়ে।'
'এখন বুঝি বনমানুষ আছেন!' স্বচ্ছ স্রোতে সারল্যের ধ্বনি তুলল কাকলি : 'আর কাগজ-কলম নিয়ে আসবেন।'
'না, আমার ঘরে অত লেখালেখির জায়গা নেই।' বিজয়া কাঠ-কাঠ গলায় বললে, 'তোমার নিজের ঘরেই নিয়ে যাও। সেখানেই ভালো জমবে।'
'তাই চলুন।' যেন বাঁচিয়ে দিয়েছে এমনি কৃতজ্ঞ চোখে বিজয়ার দিকে তাকাল কাকলি। তারপরে নির্ভয়ে, যেন কতদিনের আনাগোনা, ভিতরে ঢুকে পড়ল। উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। যেন সুকান্ত তাকে টেনে আনছে না। কাকলিই তাকে ঠেলে তুলছে।
দুই জায়ে আর ঝগড়া নেই, তৃতীয় একটি মেয়ের বিষয়ে আলোচনার খাতিরে একত্র হয়েছে।
'কে এই মেয়ে?' বিজয়া কোনো হদিস দিতে পারে কিনা এমনি অসহায় চোখে তার দিকে তাকাল মৃণালিনী।
'আর কে! সুকান্তর বন্ধু। নইলে, কী সাহস দেখলেন, সটান ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে?' মৃণালিনীর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল বিজয়া।
'বন্ধু মানে?' হতাশপাংশু মুখ করল মৃণালিনী।
ঐ যে নাকে দড়ি বিঁধিয়ে টানে। মানে যে বেন্ধে আর বান্ধে তাকেই বন্ধু বলে। কিন্তু যাই বলি মেয়েটা কিন্তু দেখতে মন্দ নয়।'
'আর বেশ বড়লোক তাই না? বাপ না জানি কী করে!' মৃণালিনী বিজয়ার কাছে আবার আশ্রয় খুঁজল।
'হাতে ঘড়িচুড়িব্যাগ জামায় ফাউন্টেন পেনের ক্লিপ এই সরঞ্জাম থেকে আর কী বোঝা যাবে?'
'কিন্তু হাতে চুড়ি একগাছা দুগাছা নয়, চারগাছা করে। তা বুঝি দেখিস নি?' আরো সন্নিহিত হল মৃণালিনী।

'আরো কত দেখব কে জানে।'

এক রাজ্যের নোংরার মধ্য দিয়ে নিয়ে আসছে কাকলিকে। নিচে এঁটো বাসনের পাহাড় পড়ে আছে, উপরে ময়লা কাপড়ের কুড়। সমস্ত শরীরে ছি ছি ছি করে উঠল সুকান্ত। আর তার নিজের এই রাজসজ্জা।

'আপনাকে একটা জঞ্জালের জঙ্গলে নিয়ে এলাম।' উঠতে-উঠতে সুকান্ত বললে।

'আহাহা, এতে কুণ্ঠিত হবার কী! এ সব আবর্জনাই তো সংসারের শোভা।' এক কথায় জল করে দিল কাকলি।

'আর এই আমার বউদি। গোময়ে কমলমণি।' বন্দনাকে লক্ষ্য করল সুকান্ত।

প্রস্তুত হতে দিল না, ঝুপ করে বন্দনাকে প্রণাম করল কাকলি।

'আর এ কাকলি।' কী বিশেষণ দেবে একসঙ্গে এতগুলি সিঁড়ি ভাঙবার পর সুকান্তর মাথায় এল না।

একসঙ্গে ঘরে ঢুকল দু'জনে আর বন্দনা নিচে শামিল হবার জন্যে ছুট দিল। সম্মিলিত আলোচনার বৈঠকে তারও কোন না বক্তব্য পেশ করা যাবে।

'তুমি কী জাদুকরী!' বিগাঢ় চোখে তাকাল সুকান্ত।

'তার চেয়েও বেশি।' হাসতে লাগল কাকলি : 'সাবানের এজেন্ট। ওঁরা তাই আমাকে ভেবেছেন নিচে।'

'সাবানের এজেন্ট ? ঠিকই ভেবেছেন তবে।'

'ঠিকই ভেবেছেন?'

'হ্যাঁ, কে জানে এ সংসারে অনেক ময়লা সাফ হবার জন্যে তোমার সাবানের অপেক্ষা করে আছে। আগে থেকে খবর দিয়ে আস নি কেন?'

'তুমি খবর দিয়ে গিয়েছিলে? আমাকে একেবারে ধরে ফেলে দিলে স্বপ্নের মধ্যে।' চোখের মধ্যে কৌতুকের কুহক নিয়ে তাকাল কাকলি।

'আমি তার চেয়েও স্বল্প।' ব্র্যাকেটে হাত বাড়াল সুকান্ত : 'দাঁড়াও, জামাটা গায়ে দিই।'

'কেন, মানুষ হতে চাও? বেশ তো দেবতা হয়ে আছ। তাই আরেকটু থাকো না দেবতা হয়ে।'

ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠল সুকান্ত। আশেপাশে দ্রুত তাকিয়ে বললে, 'দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।'

পাশের ঘর থেকে দু' হাতে করে কী একটা মস্ত পুতুলের মতন কাকে নিয়ে এল সুকান্ত। বললে, 'এই আমার সেন্টু। আর সেন্টু', পুতুলটার দিকে তাকাল : 'এই কে জানিস?'

কোল থেকে ঘাই দিতে-দিতে নেমে পড়ল সেন্টু। বললে, 'কে?'

'সেই তোকে বলেছিলাম না এমন এক লোক আছে যে আসে অথচ দেখা দেয় না সে।'

'তুমি সেই?' নিচু একটা তক্তপোশের উপর বসেছে কাকলি তার কোলের মধ্যে ঢুকে পড়ল সেন্টু।

'হ্যাঁ, সেই।' দু হাতে তার চুলের মধ্যে আনন্দে হাত ঢুকিয়ে দিল কাকলি।

'না রে, সে নয়। আরেকজন।' ব্র্যাকেট থেকে জামাটা তুলে নিয়ে গায়ে দিল সুকান্ত। বললে প্রায় বিষণ্ণ সুরে, 'যে দেখা দেয় অথচ আসে না সে।'

নয়

পড়তে পড়তে কাকলি তাকাল জানলা দিয়ে। আবার মেঘ! সকালবেলায়ই মেঘ কেন? সেদিন তো বিকেলবেলা করেছিল।

বিকেলবেলা বৃষ্টি হলে সকালবেলা হতে পারবে না? রাত্রে ভালবাসা এসেছিল বলে কি আসবে না ভোর হলেও?

আসুক বৃষ্টি। নামবার আগেই ঠিক বেরিয়ে পড়বে কাকলি। ভিজবে। কৃপণ আত্মরক্ষার জন্যে ছুটোছুটি করবে না। মন ভাসিয়ে দিয়ে শুধু মাথা বাঁচাতে চাইবে না। বৃষ্টি না হলে যেমন যা করত বৃষ্টি হলেও তেমনি তাই করে যাবে। শান্ত পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে, ভিজতে-ভিজতে, বাস নেবে। ভিজতে-ভিজতে, শান্ত পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে পৌঁছুবে তার গন্তব্যে। সর্বাঙ্গীণ শীতলতা হয়ে দাঁড়াবে সামনে।

তারপর?

জানি না। মনে-মনেই একটু হাসল বুঝি কাকলি।

না, জানি। সোনা-ঢালা রোদ উঠবে। গায়ে-গায়েই শুকিয়ে নেব শাড়ি জামা। ভদ্র হতে সুস্থ হতে তপ্ত হতে পালাব না বাড়ি, নিভৃতির বদ্ধ গুহায়। থাকব আকাশের নিচে। উন্মুক্তির দরবারে। যে আকাশ ভিজিয়েছে সে আকাশই শুকিয়ে দেবে।

যে প্রেম ঘরছাড়া করেছে সে প্রেমই মিলিয়ে দেবে ঘর।

সেদিন সুকান্ত কি রকম ভিজেছিল! ছি ছি, এমন অবস্থায় কেউ আসে? সিনেমার টিকিট কাটা থাকলেও কেউ আসে না। বাতিল করে দেয়।

কিন্তু, যাই বলো, সুকান্ত এসেছিল সত্যের টিকিট কেটেছিল বলে। কথা যখন দিয়েছে, রেখেছে কথা। বৃষ্টি-আগুন, বজ্র-বন্যা, কিছুই গ্রাহ্য করে নি। আগাপাশতলা জলের মধ্যে সত্যের মত অপূর্বের মত এসে দাঁড়িয়েছে।

সত্যি, কী অদ্ভুত সুন্দর দেখতে হয়েছিল সুকান্তকে। মাথার চুলের কতকগুলি ভিজে রেখায় নেমে এসেছে কপালে, কপাল ছাপিয়ে চোখের উপর, ঠোঁটের কিনারে জল, দুই চোখের পালকে, চিবুক বেয়ে কানের লতি বেয়ে ঝরছিল ফোঁটা-ফোঁটা। জামা আর পরনের ধুতি জায়গায়-জায়গায় লেপটে আছে গায়ের সঙ্গে—কী অম্লান সুন্দর দেখাচ্ছিল সুকান্তকে, কী দুর্ধর্ষ স্বাভাবিক! কাকলি যে কাছে যায় নি, দূরে ভিড়ের আড়ালে লুকিয়েছিল, সে শুধু ভয়ে। ভয়ও একটা সুখ! কিন্তু যাই বলো, অমন একটা জলজ্যান্ত সমস্যার সামনে কী মীমাংসা নিয়ে দাঁড়াতে পারত সে! কী সান্ত্বনা ছিল তার সঙ্গে, কী তাপভাগু! কিন্তু এ কথা ভোলা যায় কি করে, তার জন্যেই তো ভেজা। সারারাত কী কষ্টের মধ্য দিয়েই কেটেছে কাকলির। তারপর, কে জানে, ঠাণ্ডায় যদি অসুখ করে! কাকলি জানতেও পারবে না। যদি বাড়াবাড়ি হয়! কে বলে দেবে তার ঠিকানা। কে বা মনে করে রাখবে সে বিদঘুটে প্লট নাম্বার! কে বা লিখবে। আর লিখবেই বা কেন?

টুক করে কাছে এসে দেখা দিলে কী এমন অশুদ্ধ হত! বরং দেখা না দেওয়ার দরুন সুকান্ত কী ভাবল তাকে? মিথ্যেবাদী ভাবল, নয়তো ভাবল, অসহায়, নিরুপায়, পরাধীন অপোগণ্ড। নাবালক ভাবল। ছি ছি, কী স্বার্থপর কাকলি! নিজে কেমন অপলক চোখে দেখে নিল অপরূপকে, অথচ সুকান্তকে জানতেই দিল না জলের মরুভূমির মধ্যে কোথাও রয়েছে একটি ফসলের খেত, তার সন্ধানের অদূরেই সোনার স্বীকৃতি। কেমন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল গোবেচারার মত। মা-হারা শিশুর মত। অন্তত দেখা দিয়ে ওর মুখে আনতে পারত তো একটু তৃপ্তির রং। আর কিছু না হোক, তাকে দিতে পারত তো একটু কথার উত্তাপ, একটু বা চোখের দৃষ্টির সেঁক। তাই নিয়ে রাজা হয়ে ফিরে যেতে পারত বাড়িতে। অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে এত ভিজল অথচ মনই ভেজাতে পারল না একটুকু। ও চলে গেলে পর, বৃষ্টি থামবার পর, বাড়ি ফিরতে কাকলি কম কাঙালিনী সাজে নি। কাউকে বঞ্চিত করলে নিজের জন্যেও বুঝি কিছু সঞ্চিত থাকে না।

সাধে কি আর হাতছানি দিয়ে ডাকার কথা বলেছিল সেদিন বানিয়ে? সুকান্তর কাছে সে ঋণী হয়ে আছে না? শঠের ঋণ শাঠ্য দিয়েই শোধ করা উচিত কিনা জানি না কিন্তু হঠকারীর ঋণ তো হঠ দিয়েই শোধ করতে হয়। আর, কেমন অসম্ভব সুন্দরভাবে সে এল। সেই বৃষ্টিতে আসার চেয়েও সুন্দর। কাউকে জানতে দিল না। বুঝতে দিল না। প্রস্তুত হতে দিল না, যেমন ঘুমের মধ্যে মৃত্যু আসে, তেমনি সহজের মত অবধারিতের মত এল। কোনো বিধি কোনো নিষেধ মানল না, খাটলও না বুঝি। সবাইকে চটিয়েও কেমন পটিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। বাবা ভঙ্গ দিয়ে শুলেন গিয়ে ঘরে। মা প্লেট সাজালেন

খাবারের। জলখাবার দেবার পর কোথাও তর্জন-তিরস্কার হল না। *না খেয়ে গেলেও পরিবেশটি মিঠে* হয়েই রইল। শুধু ছাদে নয়, ঘরে, সিঁড়িতে-বারান্দায়, কদম ফুল রেখে গেছে তার নিশ্বাসের জাদু।

কাকলিও প্রতিশোধ নিতে জানে। কেমন অসাবধানের মধ্যে ধরে ফেলেছি বলো। অফিসটাইমে কর্তাব্যক্তিদের বেরিয়ে যাবার পর, এলোমেলো সংসারের মাঝখানে কেমন চলে এসেছি ফেরিওয়ালা সেজে। বাবুরা বেরিয়ে গেলেই তো ফেরিওয়ালা আসে। কিন্তু আমার আসা মেয়েদের কাছে নয়, আরেকজনের কাছে। আর এ ফেরি বেচবার নয়, অমনি দিয়ে দেবার।

এখন তোয়ালে দিয়ে মুখের সাবান মুছলেই বা কি, গেঞ্জির উপরে পাঞ্জাবি চড়ালেই বা কি, আমি দেখে নিয়েছি। কী দেখে নিয়েছ? আমার অপরিচ্ছন্নতা? আমার দারিদ্র্য? মোটেই তা নয়। দেখে নিয়েছি তুমি ছোট একটি শিশুর মতই সরল হয়েও দুরন্ত, চঞ্চল হয়েও অসহায়। নইলে এখন তোমার মা,-মৃণালিনী উপরে উঠছেন, হয়তো বা তোমাকে মোকাবিলা করতে, তাই দেখে কেমন ভয় পেয়ে গেলে। কি আশ্চর্য, মাকে অমন ভয়?

টেবিলের সামনে তাড়াতাড়ি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে খাতা মেলে ধরে কলম উদ্যত করল সুকান্ত। চেঁচিয়ে বললে, 'বলুন প্রশ্নগুলো'। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে যোগ করল : 'যা হয় কিছু বানিয়ে-টানিয়ে বলো। একটা পড়াশোনার অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করো। খবরদার, হাসি-হাসি মুখ নয়, সিরিয়স মুখ করো। মাস্টারি মুখ। পশ্চাৎ যা হবে তারই প্রাক্‌ছায়া আনো।'

'তা হলে হাসি-হাসিই রাখতে হয়।' হাসল কাকলি।

মৃণালিনী দরজার কাছে এসে থামল, ভিতরে ঢুকল না। সুকান্তকে গম্ভীর মুখে ডেকে নিল বাইরে।

কী না জানি আদেশ হয় মা'র। হয়তো সঙ্গচ্যুত করবার উদ্দেশ্যে বাজারে পাঠিয়ে বসবে। শুধু স্বর্গ থেকে বিদায় নয়, নরকে বদলি। যা, ঠোঙায় করে সিঙাড়া সন্দেশ নিয়ে আয়।

বাইরে, বারান্দায়, বেশ খানিক দূরেই মৃণালিনী টেনে নিলেন সুকান্তকে। গলা খাটো করে বললেন, 'ও কার মেয়ে?'

'কার মেয়ে মানে? ভদ্রলোকের মেয়ে।' সুকান্ত অবাক হয়ে রইল।

'না, না, সে কথা নয়। বলছি ওর বাবা কী করে? কোনো বড় চাকরি? বড় ব্যবসা?' গলা খুব খাদে রাখতে পারল না মৃণালিনী।

'ওর বাবা কী করে তা দিয়ে কী হবে?' সুকান্ত বিরক্তির ধার ঘেঁষে দাঁড়াল : 'ও আমার সঙ্গে পড়ে, এক ক্লাসে, এক সঙ্গে পরীক্ষা দেব এ বছর, এই ওর যথেষ্ট পরিচয়। ওর বাবাতে কী দরকার?'

'আহাহা সেই কথা নয়।' চোখে মুখে অস্থৈর্যের ভাব আঁকল মৃণালিনী : 'আমাদের মধ্যে একটা কথা উঠেছে, প্রায় বাজি ধরাব মত। আমি আর বউমা একদিকে আর বিজয়া, তোর কাকিমা আরেক দিকে। আমরা বলছি ওর বাবা নিশ্চয়ই কেউ হোমড়াচোমড়া হবেন আর বিজয়া বলছে, হেঁজিপেঁজি আজেবাজের বেশি হবে না। তুই জানিস?'

'জানি বৈকি।'

'কী? উকিল, কেরানি, মাস্টার?'

'না, না, চুনোপুঁটিদের কেউ নয়, বাঘসিংহ। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট।'

উজ্জ্বল চোখ উৎফুল্ল করে নিচে নামতে গেল মৃণালিনী। সিঁড়িতে বন্দনার সঙ্গে দেখা। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে জজটাই তার পছন্দ হল। যার প্রতাপে তার স্বামী পর্যন্ত তটস্থ সে-ই নিশ্চয় মহা-মহিম। বন্দনাকে বললে, 'বলো গে বিজয়াকে, জজসাহেবের মেয়ে।'

আর সেইটেই বাড়িয়ে বন্দনা বললে, 'শুনেছেন কাকিমা, যে-সে নয়, হাইকোর্টের জজের মেয়ে।'

শুয়ে শুয়ে হাই তুলছিল বিজয়া। বললে, 'হ্যাঁ, এমনি হাই-তোলা কোর্টের জজ। আর বিদ্যে ফলিও না বউমা। সত্যিকার হলে বাড়ির গাড়ি করে আসত, পায়ে হেঁটে আসত না।'

'কেন, গাড়ি তো ওদের আছে।' এমনি ভাবে বললেই কথাটা জমে তাই বললে বন্দনা।

'হ্যাঁ, জানি, আছে, কারখানায় আছে। যখনই জিজ্ঞেস করবে গাড়ি কোথায়, শুনবে কারখানায়।' খাটে ম্যাগাজিন হাতে উঠে বসল বিজয়া : 'গাড়ি না হয় হল, কিন্তু শাড়ি কোথায়? শাড়ি বুঝি শালকরের দোকানে।'

'কেন, যেটা পরেএসেছে সেটা শাড়ি নয়?'

'ওটা কাপড় নিশ্চয়ই, আর যখন চওড়া পাড় আছে রয়ে-সয়ে বলা যায় শাড়ি। কিন্তু আটপৌরেরও একটা সীমা আছে।'

'ভুলে যাচ্ছেন কেন, ও ছাত্রী।'

'ছাত্রীদের চিনতে আর বাকি নেই। চিকনচাকন দিতে পারলে কেউ ছাড়ে না। তুমি যা বললে, ওই যজন-যাজনের মেয়ে হলে দেখতে কেমন জলে ঢেউ দিত। বললাম নেহাতই গরিব-গুরবো, অল্পপুঁজি—

প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের পরেও এই কথা। অসহ্য লাগল বন্দনার অকারণে পরনিন্দা, পিতৃনিন্দা, ঝাঁজিয়ে উঠল মুখের উপর : 'যত পুঁজি আপনার। যত বিদ্যেবুদ্ধি সমস্ত আপনার একার পেটে।'

এখন আবার এই বউটার সঙ্গে ঝগড়া করো। বিজয়া বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। ম্যাগাজিন হাতে আবার হেলান দিল বালিশে।

এদিকে একটা হাতপাখা কুড়িয়ে নিয়ে মৃণালিনী সুকান্তর ঘরে ঢুকল।

সুকান্ত কাকলিকে লক্ষ্য করে বললে, 'হ্যাঁ, বলুন, তারপর—'

'তুই কী!' সুকান্তর উদ্দেশে শাসনের ভঙ্গি করল মৃণালিনী : 'তুই ওকে ন্যাড়া তক্তপোশে বসিয়ে নিজে চেয়ার নিয়েছিস!'

'উপায় কী! আমি যে লিখছি টেবিলে। উনি তো লিখছেন না, লেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, তারপর বলুন, কোশ্চেন নাম্বার ফোর—'

'এ ঘরটায় ফ্যান নেই।' কাকলিকে মৃণালিনী মৃদু-মৃদু হাওয়া করতে লাগল।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল কাকলি। 'কী সর্বনাশ!' হাত থেকে প্রায় জোর করে কেড়ে নিল পাখা। উলটে মৃণালিনীকেই হাওয়া করতে লাগল।

মৃণালিনী সরল ঘরের বাইরে। বললে, 'কী দেব তোমাকে? সরবৎ না চা?'

'যা আপনার খুশি।'

'বাতাস দিয়ে মাকে তাড়ালে।' বললে সুকান্ত, 'এবার তবে একটু আমাকে দাও। পরিশ্রম তো আর কম হচ্ছে না।'

'বয়ে গেছে। এই সুযোগে আগাম সেবা পাবার চালাকি, তা বুঝি আমি বুঝি না?' কাকলির চোখের সাদায় কালো তারা দুটি টলটল করে উঠল। 'বরং তুমি যদি দাও—'

'দেব?' উঠি-উঠি করল সুকান্ত।

'আমি তাড়ালাম মাকে, তুমি তাড়াও আমাকে।'

'রক্ষে করো। দরকার নেই পাখা। অন্ধ-বন্ধ হয়ে থাকাই ভালো।' হাসল সুকান্ত : 'কিন্তু দেখলে তো আমার মা কত মিষ্টি। চা চাইলে চা, সরবৎ চাইলে সরবৎ।'

'সব মা-ই মিষ্টি। তুমি আমার মা'র হাত থেকে নিলে না কেন খাবারের প্লেট?'

'মুলতুবি রেখে এলাম। আর, জানো তো, ময়রার মিষ্টি নয়, আমি গাছের ফল চাই। টাটকা ফল। আর সে ফল ধৈর্যের ফল।'

'তার মানে,' চোখের উপর চোখ রাখল কাকলি, 'বলতে চাও সবুরেই মেওয়া ফলে।'

চলে যাবার সময় আবার এক চালাকি করল কাকলি। বললে, 'বড় রাস্তার শর্টকাটটা বলে দিন। আসবার সময় কত যে ঘুরেছি এদিক-ওদিক তার ঠিক নেই।'

শর্টকাট বন্দনাও বলে দিতে পারে কিন্তু যদি কেউ জেগেও চোখ বুজে থাকে, সরলকে জটিল করে দেখে তা হলে কার কী সাধ্য!

মৃণালিনী বললে সুকান্তকে, 'তুই যা না, একটুখানি দে না এগিয়ে।'

বাইরে রোদের দিকে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'এই রোদে বেরুলে ঠিক মাথা ধরে যাবে।' তারপর কাকলির দিকে তাকিয়ে বললে, 'যদি আসতে পারেন যেতেও পারবেন। বরং আসার চেয়ে যাওয়াটাই সোজা। চলে যান নাক ধরে—'

'তুই কী!' মৃণালিনী গঞ্জনা দিল : 'তোর জন্যে দরকারি প্রশ্ন নিয়ে এল বাড়ি বয়ে আর তোর এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই। দু পা এগিয়ে দিতে পারিস না?'

'মাথা ধরে যে।'

'বেশ, আমি ছাতা দিচ্ছি।' বন্দনাও কাকলির দিকে।

'থাক, এক ধরা ছিল মাথা, আরেক ধরা হবে ছাতা।' মুখভরা অনিচ্ছা নিয়ে কাকলির দিকে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'বলিহারি আপনাদের। তালুক-মুলুক চুঁড়তে পারেন একা-একা, বাড়ির রাস্তায় গাইড চাই। ঐ যে বলেছে সারা ঘর লেপে এসে দুয়ারে আছাড়—আপনাদেরও তাই হয়েছে। চলুন—'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে কয়েক পা এগুতেই কাকলি বললে, 'উঃ, তুমি কী মিথ্যে কথাই যে বলতে পারো। মুখে এতটুকু বাধে না।'

'আর তুমি? চালুনির কাছে ধুচুনি।'

'দু'জনেই সমান।' হেসে ফেলল কাকলি।

'কার নিন্দা করো তুমি, এ আমার এ তোমার পাপ।'

'খুব পাপ হচ্ছে, তাই না?' চোখ মুখ আর্ত করল কাকলি।

'মোটেও না। এ ব্যাপারে মিথ্যে দোষের নয়।'

'কোন ব্যাপারে।'

'প্রণয় ব্যাপারে।'

'কে বলেছে?'

'শাস্ত্র।'

'না, না, সে কথা নয়। কে বলেছে তোমাকে যে এ ব্যাপারটা প্রণয়?'

'না, না, কেউ বলে নি। তবে তো নিঃসংশয় মিথ্যে। বিনিশ্চিত পাপ। নির্ঘাত নরকবাস।' চোখ মুখ কালো করল সুকান্ত।

'দু'জনে একসঙ্গে তো?' হেসে ফেলল কাকলি।

কতক্ষণ চলবার পর সুকান্ত বললে, 'সাত পা'র বেশি হাঁটলাম একসঙ্গে। সাত পা একসঙ্গে হাঁটলে কী হয়?'

'কিছুই হয় না। বড় জোর একটা স্ট্রেট লাইন হয়।'

'শাস্ত্রে যে বলে—'

'আবার শাস্ত্র!' শাস্ত্রীয় কিছু হতে হলে একটা মণ্ডলের চারপাশে ঘোরা চাই।'

আবার হাসি।

জানলা দিয়ে আবার তাকাতেই কাকলি দেখল মেঘ নেই। রোদে পথঘাট দোকান-বেসাত ট্রাম-বাস লোকজন সব ঝলমল করে উঠেছে।

তোড়জোড় করে বেরুচ্ছে, বেলা প্রায় দশ, বিনতা এসে হাজির। বিনতা কাকলির এক কলেজের হলেও দু' বছরের অগ্রণী, বি-টি পাশ করে চেতলায় কোন মেয়ে-স্কুলে মাস্টারি করছে। বয়সে কিছু বড় হলেও হৃদ্যতায় সমান-সমান। সমস্ত নির্জন-গোপনের অংশীদার।

'এ কি, বেরুচ্ছিস? কোথায়?' বিনতা প্রশ্ন করল ব্যস্ত হয়ে।

'ছাত্রীবন্ধুর বাড়ি।' মুখ টিপে হাসল কাকলি। বললে, 'সকালের দিকে হলে ছাত্রীবন্ধু, দুপুরের দিকে হলে লাইব্রেরি, সন্ধের দিকে হলে প্রোফেসর। তার মানে, বুঝতেই পাচ্ছিস—'

'কী বুঝতে পারব?' হাঁ হয়ে রইল বিনতা।

'তার মানেই মিট করতে যাচ্ছি।'

'কার সঙ্গে মকদ্দমা?'

সশব্দে হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'এ বাংলা মিট নয়, ঝগড়ার নিষ্পত্তি নয়, এ ইংরিজি মিট, এর মানে নিভৃত-সাক্ষাৎ—'

'কার সঙ্গে?'

'এ জেনে তোর লাভ নেই।'

'ভেট কোথায় হবে? কোন কুঞ্জে?'

'এও অবান্তর।'

'তোদের পরীক্ষা কবে শুনি?'

'এক মাসও আর নেই।'

বক্তৃতা জুড়ল বিনতা। পরীক্ষাকে এত কাছে রেখে সময় নিয়ে হেলাফেলা করার কোনো মানে হয় না। আগে পরীক্ষা পরে প্রেম। আগে কেরিয়র পরে আর সব। প্রেম একটা যায় আরেকটা আসে কিন্তু কেরিয়র একবার নষ্ট হয়ে গেলে আর তার সংশোধন চলে না। মনোবিলাসের জন্যে ফাঁকা মেঘ না কুড়িয়ে দৃঢ় ভূমির উপর মজবুত বাড়ি তৈরির জন্যে শক্ত ইট কাঠ লোহা লক্কড়ের দরকার।

'সব সত্যি কথা।' বললে কাকলি, 'কিন্তু তোর তো এখনো জোটে নি, তুই কী বুঝবি বল।'

'জোটে নি তো জোটে নি!' রাগ করে উঠল বিনতা : 'জোটাবার জন্যে আমি ফোটানো ফুল হয়ে মৌমাছি ডেকে ডেকে ঘুরে বেড়াই না। জীবনে প্রেমই সর্বস্ব নয়। তার চেয়েও বড় জিনিস আছে। তা হচ্ছে কর্তব্য, তা হচ্ছে সংগ্রাম—'

'হবে হয়তো। কে জানে প্রেমই আবার মহত্তম কর্তব্য কিনা, সংগ্রাম কিনা। তবু প্রার্থনা করি,' বিনতার দিকে করুণ চোখে তাকাল কাকলি : 'জীবনের সে আশ্চর্য অনুগ্রহ তোর হাতে একবার অন্তত আসুক। সে প্রসাদের স্বাদ পেয়ে তারপর তুই কথা বলিস।'

কে জানে কী করে আসে। বিনতার একটা শখ হচ্ছে গণ্যমান্যদের সঙ্গে, বিশেষত সংস্কারমুক্ত কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের সঙ্গে চিঠি লিখে-লিখে আলাপ করা, এবং দৈবী কৃপা যদি ঘটে কারু সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া, শেষ পর্যন্ত বা সর্বাধিক হওয়া।

তরুণতম ভাবের তীব্রতম কবি, বর্তমানে, 'অনিরুদ্ধ'। চিঠি লিখে দিনক্ষণ ঠিক করে তার বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিল বিনতা। দেখল বাইরের ঘরে একটি সুদর্শন যুবক ইজিচেয়ারে শুয়ে কি একটা বই পড়ছে।

'আপনি কি অনিরুদ্ধ?' রক্তের মধ্যে আনন্দের রুনুঝুনু তুলে জিজ্ঞেস করল বিনতা।

সাতাশ-আটাশ বছরের যুবকটি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'বসুন। বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।' যুবক চলে গেল ভিতরে।

বিনতা প্রায় ধুলোর উপর বসে পড়ল।

'যেমন ধর রসবোধ। সাহিত্যে-শিল্পে রসবোধ। সে কি সকলেরই আসে? কিন্তু কেন যে কার আসে কেউ বলতে পারে না।' বলতে লাগল কাকলি। 'কিন্তু যার আছে ঐ রসবোধ সে কি জীবনকে বেশি করে উপভোগ করে না? তেমনি যার জীবনে এসেছে সেই দুর্গমের ডাক—সেই অজ্ঞেয়ের স্পর্শ—তুইই বল সে কি জীবনকে একটু বেশি করে পায় না? আর বাঁচতে এসে কার না বেশির প্রতি লালসা?'

বনবিহারীর ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল কাকলি।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'একটি ছাত্রীর বাড়িতে বাবা।'

'তোর দাদার খোঁজ পেলি?'

'পেয়েছি। মা তোমাকে বলে নি?'

'কই, না তো। কোথায় দেবনাথ?'

'শ্রীরামপুর স্টেশনে ধরা পড়েছে। ডবলিউ-টি, উইদাউট টিকেটে ট্র্যাভেল করছিল। ধরা পড়তে ফাইন হয়েছে বিচারে। জরিমানা দিতে পারে নি। জামিন দাঁড়াবারও লোক পায় নি কোথাও। তাই সাত দিনের জেল। নরুকাকাকে মা পাঠিয়েছেন শ্রীরামপুর।'

উত্তেজনায় উঠে বসেছিলেন বনবিহারী, আবার শুয়ে পড়লেন।

কাকলির সঙ্গে-সঙ্গে বিনতাও বাইরে এল।

'তুই তো অন্য দিকে।' রুক্ষ মুখে বলল বিনতা।

'হ্যাঁ,' স্মিতস্নিগ্ধ মুখে বলল কাকলি, 'প্রেমের দিকে। আর তুই কর্তব্যের দিকে, বিধেয়ের দিকে। যার যেমন বুঝ। যার যেমন মতি। আর যদি ডাক্তারি কথায় বলিস, যার যাতে এলার্জি।'

দশ

কী সেই দুর্জ্ঞেয় গহন শক্তি যে এমনি করে রোদে-বৃষ্টিতে ঘরের বার করে আনে। অসাধ্যকে সাধ্য করার মন্ত্র শেখায়। আশ্চর্যের চোখে অসম্ভবকে দেখতে বলে। অণু থেকে অণিষ্ঠ গুরু থেকে গরিষ্ঠ সে-শক্তির নাম কী! কোনখানে তার বাসা? কী চায় সে আমাদের কাছে?

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তর ফটকের সামনে দেখা হল দু' জনের।

কাকলিই পরে এল।

'ভাবলাম এলেই না বুঝি।' এক পা এগিয়ে এল সুকান্ত।

'ওরকম সকলকেই ভাবতে হয়।' কাকলি হাসল : 'আমিও ভাবছিলাম গিয়ে হয়তো দেখতে পাব না। তবু ছেলে দাঁড়িয়ে থাকলে বড় জোর বোকা-বোকা দেখায়, কিন্তু মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে—ও, হোপলেস—চলো কোথাও একটু বসি।'

'এখানে নয়।' চলতে চলতে সুকান্ত বললে।

'এলাম এখানে অথচ এখানে নয় কেন?' দুই কালো চোখে এক ঝলক আনন্দের রোদ নিয়ে তাকাল কাকলি : 'চারদিক বেশ ফাঁকা—'

'কিন্তু খুব সেকেলে-সেকেলে ঠেকছে না?'

'সেকেলে?'

'লোকে বলতেই বলে লেক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইডেন গার্ডেন। কোনো একটা নতুন জায়গা ভাবা যাক। তা ছাড়া এখানটা কেমন একটা বাড়ি-বাড়ি গম্বুজ-গম্বুজ ভাব—চারদিকে আবার দেয়ালের বন্ধন—'

'ওর চেয়ে ভালো জায়গা কোথায়?' অসহায় চোখে অনুদ্দেশে তাকাল কাকলি।

'আছে ভালো জায়গা। তুমি দেখতে পাচ্ছ না।'

'কোথায়?'

'বাইরের ঐ মাঠ। গড়ের মাঠ। ঐ অঢেল মুক্তি। বৃষ্টির পরে কী ঘনসবুজ ঘাস হয়েছে দেখেছ!'

'মাঠে গিয়ে বসব।' হাঁ হয়ে রইল কাকলি।

'প্রায় পথে বসার মত মুখ করছ দেখছি। কিন্তু কী সুন্দর মাঠ বলো তো। জগতে আর কোথাও আছে বলে শুনি নি। এত বড় মাঠ, কিন্তু আশ্চর্য, কারু মাথায় আসে না।'

'রাত্রে মাঝে মাঝে পুলিসের মাথায় আসে বলে শুনি।' কটাক্ষ হাসল কাকলি।

'কিন্তু আমরা তো অন্ধকারে আসি নি, দিনে এসেছি, রোদ্দুরে এসেছি। পালিয়ে-এড়িয়ে নয়, সকলের চোখের উপর দিয়ে। জানিয়ে-শুনিয়ে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।'

কথাটা তিরস্কারের মত শোনাল না, মমতার মত শোনাল।

'তা একটু যে না হয়েছে তা বলি কি করে? কিন্তু,' মমতার চোখে সুকান্তও তাকাতে জানে : 'তোমার মাথাও খুব সুস্থ নেই।'

গম্ভীর হল কাকলি। বললে, 'কিন্তু সব কিছুরই মাত্রা আছে।'

'আনন্দের মাত্রা নেই, ভালোবাসার মাত্রা নেই। চলো রেসকোর্সটার পাশে চলো, নয় তো চলো ওদিকে, গাছের নিচে কেমন আঁচল-ছড়ানো ছায়া, দু' জনে বসি গিয়ে সেখানে—'

'এখন ভরা অফিসটাইম। রাজ্যের গাড়ি যাচ্ছে রেড রোড দিয়ে। তারা সব দেখুক।'

'দেখুক। শিখুক।'

'শিখুক ?' চমকে উঠল কাকলি : 'কী শিখবে?'

'কেমন করে দেখাতে হয়। সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য তো দেখাবার জন্যে। সূর্য থেকে ঘাস সকলেরই সেই এক চেষ্টা, এক পাগলামো। তেমনি কোথাও যদি ঠিক-ঠিক ভালোবাসা জন্মায়, তা হলে তাকে রাখতে হবে লুকিয়ে? পারা যাবে রাখতে ? কাপড় দিয়ে ঢাকা যাবে আগুন? ঢাকা যাবে যৌবন? জগজ্জনে দেখুক না একটা ছবি। শুনুক না একটা গান।'

'পুলিসে খবর না দিক', হাসল কাকলি : 'খবরের কাগজের আফিসে খবর দেবে। চলে আসবে স্টাফ রিপোর্টার।'

'আসুক। এসে দেশের দুরবস্থাটা দেখে যাক স্বচক্ষে।'

'দুরবস্থা?'

'হ্যাঁ, দেখে যাক, বাঙালি পরিবারের ঘরে ছাত্রছাত্রীদের কী নিদারুণ স্থানাভাব। পড়বার জন্যে সূচ্যগ্র জায়গা পাচ্ছে না, পাচ্ছে না তিলার্ধ নিরিবিলি। তারই মধ্যে যারা অধ্যবসায়ী, শ্রমনিষ্ঠ, তারা কেমন দুপুরবেলায় গড়ের মাঠে চলে এসেছে, গাছের ছায়ার নিরিবিলিতে বসে পড়ছে একমনে—'

'তবু যদি সঙ্গে একখানা বই থাকত !'

'সে কি ?' চলতে চলতে দাঁড়াল সুকান্ত : 'সঙ্গে যে একটা ঝোলা এনেছ তার মধ্যে একখানাও বই নেই?'

'আমার কী আছে না আছে তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। বলি, তোমার তো কিচ্ছু নেই। তুমি তো রিক্ত।'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো বটে। আমি রিক্ত।' স্বর দৃঢ় করল সুকান্ত : 'রিক্ততাই আমার শক্তি।'

'কিন্তু আমার যদি থাকে তা হলে তোমারও আছে।' স্বর গাঢ় করল কাকলি। পরে লঘু হবার চেষ্টায় বললে, 'কেন, এক বই পড়ে না দুই জনে? এক বই লেখে না? এক নৌকোয় একজন হাল ধরলে আরেকজন টানে না দাঁড় ?'

'তবে চলো, হাঁটি। বসে দরকার নেই। হাঁটতে হাঁটতে গল্প করি।'

দু' জনে হাঁটতে লাগল।

'তোমার ঝোলাটা আমাকে দেবে নাকি ?' হাত বাড়াল সুকান্ত।

'এত সামান্য ভার নিয়ে তুমি কী করবে? তোমার শক্তি আরো গুরুতরের জন্যে প্রস্তুত।' চোখের উপর চোখ রাখল কাকলি।

'হ্যাঁ, প্রস্তুত।'

গল্পই করছে দু' জনে। আজেবাজে কথার ভুরভুরি তুলছে। কিন্তু দু' জনেই কান পেতে আছে গল্প কখন সংবাদ হয়ে ওঠে, কল্পনা কখন ইতিহাসের মাটি ধরে।

খনির সোনা কখন যায় বাজার দরে যাচাই হতে।

কত কথা বলার পর, কোন কথার পিঠে, কত পথ হেঁটে এসে, কোন ভঙ্গিতে শ্রান্ত প্রাণকে বিশ্রাম দিতে বলা হবে সে কথা, আদিম আহুতির কথা। কে পাড়বে, কাকলি না সুকান্ত ! কী ভাবে পাড়বে! কী রকম প্রথম লাগবে না জানি শুনলে!

আমার কী স্পর্ধা, আমি কী করে বলি, কথার ধার দিয়েও কেউ ঘেঁষছে না। তবু এক সময় তো কথাটা উঠবেই, ফসল পাকলে ফসল তোলবার কথা, সেই আশায় বসে আছে দু' জনে। কে না জানি আগে বলে! আর না জানি, কখন!

সজ্ঞানে কে না জানি আগে ছোঁয়। আমার কী দরকার, কী না জানি ভেবে বসবে, নিজের চৌকাঠের বাইরে একটি আঙুলও বাড়ায় না কেউ। যার যেই কোট তাতে নিটুট হয়ে বসে থাকে। তবু সজাগ রেখেছে চোখ, কখন না জানি সাদা কাগজে স্বাক্ষর পড়ে, কে না প্রথম উসখুস করে দাগ দিতে।

চোখ আর কানের পাহারায় সাহারা জাগিয়ে রেখে কথা বলে চলেছে দু' জন।

আর হাঁটছে।

হাঁটতে হাঁটতে অন্তহীন পথ যেন চলে যেতে পারে অতন্দ্র। রোদে এতটুকু কষ্ট নেই, চলায় নেই ক্লান্তি। চেতনার কোন গভীরতম ধামে এসে উপস্থিত হবে প্রতি পদে তার প্রত্যাশা। যেন কাছেই আছে কোনো মৌনী সমুদ্র, প্রতি নিশ্বাসে শুনছে তার নৈঃশব্দ।

'এই বোধ হয় ঠিক জায়গায় এলাম এতক্ষণে।' উৎসাহী স্বরে বললে সুকান্ত।

'ও মা, এ তো জু। চিড়িয়াখানা।' কাকলিও কম চঞ্চল হল না। বললে, 'দাঁড়াও, কিছু কলা আর বাদাম কিনি।'

'বাদাম আবার কার জন্যে?'

'হরিণের জন্যে। কী সুন্দর ছলছল বড় বড় চোখ হরিণের।'

কেনাকাটা করে এগিয়ে এসে জানোয়ারের এলাকার দিকে যাচ্ছিল কাকলি, সুকান্ত বাধা দিল। বললে, 'ওদিকে গিয়ে আর কী লাভ? এসো ঐ জলের ধারে ছায়াতে বসি।'

'বাঃ, এগুলো কী হবে?' হাতের ঠোঙার দিকে লক্ষ্য করল কাকলি।

'যা খিদে পেয়েছে, এগুলো আমরা নিজেরাই সদ্ব্যবহার করতে পারব।'

'আমরা?'

'হ্যাঁ, বাদামটা না হয় তুমিই খেয়ো, আর কলা—বুঝতেই পারছ—ও আমার প্রাপ্য।' অসংকোচ সারল্যে হাসল সুকান্ত।

দু'জনে বসল ঘাসের উপর।

বাদাম ছাড়িয়ে খেতে খেতে কাকলি বললে, 'ওদের খাদ্য খাচ্ছি দেখে লোকেরা না আমাদের ভুল করে।'

'লোকেরা ভুল করবে না। যে রকম ব্যগ্রব্যস্ত হয়ে দেখছে আমাদের, ঠিক ঠিক মৃগমর্কটই ভাবছে। আমার ভয় হচ্ছে জু'র কর্তাব্যক্তিদের—'

'কেন, ভয় কেন? পাছে জঙ্গুলে মনে করে খাঁচায় পুরে ফেলে।'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু এমন আসান কি হবে যে দু'জনকে এক খাঁচায় পুরবে?'

'ওরা না পুরুক কিন্তু সংসার তো পুরতে পারে।' বলেই চমকে উঠল কাকলি। এ কি, অগোচরে কাকলিই প্রথম কথা পাড়ল নাকি? নিত্যতরুণায়মান তৃষ্ণার ইঙ্গিত সেই আনল প্রথম?

যাক, বেঁচেছে, কথাটা ঘুরিয়ে নিল সুকান্ত। মুখ গম্ভীর করে বললে, 'আমি খুব খেলো হয়ে যাচ্ছি তাই তোমার মনে হচ্ছে না? খুব হালকা, লঘু—যাকে বলে অর্বাচীন।'

জলে ছায়া দেখতে দেখতে কাকলি বললে, 'তাই তো ভালো। গভীর কথা গম্ভীর করে বলতে গেলে মানে পায় না। হালকা হাসির পাখায় উড়িয়ে দিলে ঠিক প্রজাপতির মত হৃদয়ের উপরে এসে বসে।'

'কিছুতেই শালীন হতে পারি না।' মুখভাব কাতর করল সুকান্ত।

'শাল গায়ে না দিলে শালীন হওয়া যায় না।' কাকলি হেসে উঠল।

'খালি গায়ে থাকি—দেখেছ তো—তাই খেলো চলি খেলো বলি—'

'তাই ভালো, খোলাখুলিই ভালো। কপাট না রাখাই অকপট হওয়া।'

'তার মানে বলতে চাও অকপাটই অকপট।'

কী সুন্দর কথা বলতে, কী সুন্দর কথা না বলতে! কথা বানাতে, কথা ভুলে যেতে। রোদ দেখতে, জল দেখতে, জলের ছায়া দেখতে। উপস্থিতি দিয়ে অস্তিত্বকে মুছে ফেলতে। সময়ের কারবারে দেউলে হয়ে যেতে। নানা জাতের পাখির কলরব শুনতে। গাছের উপর থেকে একটা উল্লুক যে উকু-উকু করছে—তাও কত আনন্দের!

জীবনে কেন এত উচ্চারিত আনন্দ, কেন এত অব্যক্ত আরাম!'

কে একজন এদিকে আসছে। সঙ্গে ক'টি ছেলে-মেয়ে।

'আরে, দীপঙ্কর যে। কতদিন তোমাকে খুঁজছি। কোথায় আছ আজকাল? এরা কারা?' উঠে দাঁড়াল সুকান্ত।

'মেস ছেড়ে দিয়েছি। বাসা নিয়েছি আলাদা। বাসা মানে একতলার একটা এঁদো ছোট কুঠুরি। পাকিস্তান থেকে নিয়ে এসেছি মা-ভাই-বোনদের। আমার চাকরি হয়েছে জানো বোধ হয়।'

'জানি। বরেনদের ওখানে তো?'

'হ্যাঁ, তোমার সেই স্কুলের পুরোনো বন্ধু, স্থায়ী বন্ধু বরেন। কিন্তু ভাই চাকরিটা অস্থায়ী, টেম্পরারি।' শীর্ণ মুখে হতাশার রেখা ফোটাল দীপঙ্কর।

'সমস্ত কিছুই অস্থায়ী।' এই প্রসঙ্গে উচিত ছিল না, তবু কাকলির দিকে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'এই জীবনটাই স্বল্প মেয়াদের ইজারা। ইজারা শেষ কি বিনা নুটিসে উৎখাত।'

'অত সহজ নয়।' হাসল বটে দীপঙ্কর কিন্তু চোয়ালের হাড় দুটো যেন কঠিন দেখাল।

'আমি বলব বরেনকে।'

'বোলো।' নরম হল চোয়ালের হাড়।

'তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। ইনি শ্রীমতী কাকলি, আর ইনি আমার বন্ধু দীপঙ্কর। দীপঙ্কর মানেই ইস্পাতের ফলা। যে ইস্পাত শুধু অস্ত্র নয়, যন্ত্রও। তলোয়ার যেমন লাঙলও তেমনি।'

'ঠিক বলেছ। শুধু জঞ্জালই কাটি না, ফসলও ফলাই।' হাসল দীপঙ্কর।

'ইস্পাত ইচ্ছে হলে কঠিন, ইচ্ছে হলে নরম। এই দেখ-না, সকলকে নিয়ে থাকবে বলে বাসা করেছে। ছোট ভাইবোনদের নিয়ে এসেছে চিড়িয়াখানায়।'

যাই বলো, পাকতেড়ে লোকটাকে পছন্দ হচ্ছে না কাকলির।

ঠিকানা দিল দীপঙ্কর। দু'জনকে বললে একদিন বেড়াতে যেতে। স্বচক্ষে দেখে আসতে মানুষ কীভাবে থাকে, কীভাবে রাস্তাকে বাড়ির শামিল করে নেয়, নিতে হয়, কীভাবে বাড়ির লোক রাস্তার লোক হয়ে যায়।

'যাব একদিন।' চলে যাচ্ছে দীপঙ্কর, হেঁকে বললে সুকান্ত।

'এবার তবে আমরাও উঠি।' কাকলি উদ্যোগ করতে চাইল : 'এ কি, তুমি আবার বসছ যে।'

'বসছি মানে? শুয়ে না পড়ি?'

'কেন, কী হল?'

'ভীষণ মাথা ধরেছে।'

'মাথা ধরেছে তো তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো। বাইরে নিশ্চয়ই ট্যাক্সি পাব।'

তবু চঞ্চল হয় না সুকান্ত। বললে, 'সাবিত্রীর সঙ্গে বনে কাঠ কাটতে এসে সত্যবানের এমনি মাথা ধরেছিল—'

'এমনি?'

'মাথা ধরতেই সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সত্যবান।'

'পড়ুক। কিন্তু এটা বন নয়, আর আমরা কেউ এখানে কাঠ কাটতেও আসি নি।'

'কিন্তু যাই বলো,' গাসের উপর গা এলিয়ে দেবার ভঙ্গি করল সুকান্ত, 'সাবিত্রী খুব ভালো মেয়ে। অন্তত খুব ভালো উকিল।'

'জানো পাশ করে আমি 'ল' পড়ব, উকিল হব।' মুখে-চোখে দীপ্ত হয়ে উঠল কাকলি : 'কী সুন্দর দেখতে হয় মেয়ে-উকিলদের! মাথায় খোঁপা, কালো শাড়ির উপরে কালো গাউন, গলায় সাদা ব্যাণ্ড ঝোলানো। যেন কৃষ্ণকলঙ্ক সায়রে শ্রীরাধিকা। মাথায় খোঁপা, মুখে চোপা—সে এক দেবতাদের দেখবার মত। দেখো আমি ঠিক উকিল হব।'

'কিন্তু সাবিত্রীর মত হতে পারবে না। সওয়াল জবাবে কেমন ঘায়েল করল যমকে। মরা স্বামীকে ফিরিয়ে আনল।'

'ফিরিয়ে আনল সে সাবিত্রীর ওকালতির জোরে নয়, যম নিতান্ত ভালোমানুষ ছিল বলে।'

'তার মানে?'

'তার মানে তাই। একটার পর একটা বর দিয়ে যাচ্ছে যম। সাহস পেয়ে সাবিত্রী বললে, আমার এক শো পুত্র হোক। যম বললে, তথাস্তু।'

'তথাস্তু। তাতে কী?'

'তখন সাবিত্রী প্যাঁচ কষতে গেল। বললে, আমার স্বামী ছাড়া আমার শতপুত্রতা বর সিদ্ধ হয় কি করে? সুতরাং আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন। যম হাবাগোবার মত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বললে, তথাস্তু।'

'এ ছাড়া আর কী বলতে পারত যম?' অজ্ঞানের মত মুখ করে তাকাল সুকান্ত।

'যম যদি টেকনিক্যাল হত, বলতে পারত, তুমি শত পুত্র চেয়েছ নাও শতপুত্র। তাতেই পর্যাপ্ততৃপ্ত হও। ঐ বরের সিদ্ধির জন্যে সত্যবানকে না হলেও চলবে।'

'যমটা বোকা।'

'অন্তত উকিল হিসেবে আনাড়ি।' খিলখিল করে হাসল কাকলি। বললে, 'সুতরাং যমকে ভয় নেই। আমি কি যমেরে ডরাই, যে বলেছে সে ঠিকই বলেছে।'

বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি নিল দু'জনে।

মাঝামাঝি একটা মোড়ে এসে দু'জনে ছাড়াছাড়ি হবে।

তার আগেই প্রায় হয়ে উঠেছিল। পাশ থেকে একটা ছুটন্ত জিপ হুমড়ি খেয়ে প্রায় পড়ছিল ট্যাক্সির উপর। ভাঙা সেকেন্ডের ডগায় ব্রেকটা সজোরে কষতেই বেঁচে গেল ট্যাক্সি।

নিজের সিটের সীমার মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে সুকান্ত বললে, 'কী কেলেঙ্কারিটাই হত বলো তো অ্যাকসিডেন্ট হলে।'

অনুরূপ সম্রতায় কাকলিকেও প্রত্যাবৃত্ত হতে হল। বললে, 'অ্যাকসিডেন্টের চেয়েও কেলেঙ্কারি।'

'এবার ঠিক আসত স্টাফ রিপোর্টার। খবরের কাগজে ঠিক দু'জনের ছবি বেরুত।' সুকান্ত তাকাল কাকলির দিকে : 'আর আমাদের জন্যে তো যম নয়, যমদূত আসত, তখন তোমার শত তর্কেও কিছু হত না।'

'দু'জনে একসঙ্গে সাবাড় হয়ে গেলে কে মিছিমিছি তর্ক তুলত।' এততেও কাকলি হাসছে : 'জখম হয়ে নিস্পন্দ পড়ে থাকলেই বিপদ। তখন ননদিনি বলো নগরে ডুবেছে রাই-রাজনন্দিনী—' মাথার চুলটা ঠিক করল কাকলি।

তারপর, পরীক্ষা হয়ে যাবার পর, দু'জনে সন্ধ্যার শোতে এল এক সিনেমা ঘরের দরজায়। একটা বাজে ঘর, একটা পচা ছবি।

'এ তোমার মামুলি হয়ে যাচ্ছে না?' আপত্তিভরা চোখে তাকাল কাকলি।

'বোধ হয় নয়। একটু আশ্চর্যের আলো জ্বলবে হয়তো কোথাও।'

উপরে, ব্যালকনির দুটো টিকিট নিয়েছে। শেষ লাইনে কোণের দুটো চেয়ার।

উপরে আর জনমনিষ্যি নেই। ঢালা শূন্যতায় অঢেল অন্ধকার।

'এ কি, আর একটাও লোক নেই?' কাকলি কলধ্বনিত হয়ে উঠল।

'যারা পাশে দেখে তারাও আজ পাশ কাটিয়েছে। হাউসের ঐ টর্চওলা লোকটা যদি বিরক্ত না করে, শান্তিতেই দেখতে পাব ছবি।'

'অন্ধকার দেখ।'

'অন্ধকার?'

'হ্যাঁ, আশ্চর্যের আলো।'

শানানো ক্ষুরের ধারের উপরে বসে আছে পাশাপাশি। যে নড়বে সেই কাটা পড়বে।

কে আগে নড়ে।

কে প্রথম হয়!

এগারো

'আমাদের যারা দেখছে তারা আমাদের কী ভাবছে বলো তো।' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'এসকেপিস্ট ভাবছে।' বললে সুকান্ত।

ফল বেরিয়ে গেছে পরীক্ষার। এখন তাই আরো ফলের দিকে, স্কুলের দিকে যাত্রা।

'না, আমি এসকেপিস্ট নই। যুদ্ধ থেকে আমি পালাব না।' ছুরিবেঁধা মাংসের টুকরোটা মুখে তুলল সুকান্ত। বললে, 'নিধিরামও যুদ্ধ-পলাতক ছিল না।'

'কে নিধিরাম?' প্লেটের আলুটাকে বিদ্ধ করবার চেষ্টা করছিল কাকলি, তার আগে চোখই সে আলু করে তুলল।

'সে কি, নিধিরামকে চেনো না?'

'তোমার সব বন্ধুকেই কি আমি চিনি?'

'আহা, শুধু আমার বন্ধু হতে যাবে কেন? সকলের বন্ধু। জগজ্জনের বন্ধু।'

'সে আবার কে?' আলুটা মুখে পুরল কাকলি।

'আমাদের সেই নিধিরাম সর্দার। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার। অথচ ইয়া গালপাট্টা ইয়া শুঁড়তোলা নাগরা ইয়া কোমরবন্ধ।' ছুরিতে কাঁটায় টুং-টং শব্দ তুলল সুকান্ত : 'সাজসজ্জার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু বিসমিল্লায় গলদ। ঢাল-তলোয়ারই নেই।'

'তুমি কি নিধিরাম?'

'তা ছাড়া আর কী!'

'তুমি কি নিরস্ত্র?' নিরন্ন? প্রতিশ্রুতিশূন্য?' কোল থেকে ন্যাপকিন তুলে ঠোঁটের প্রান্ত দুটো মুছল কাকলি।

'কিন্তু বর্তমানটা তো দেখবে। রূঢ় বাস্তব বর্তমান।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বর্তমানই দেখছি।'

'দেখছ?' কাকলির চোখের মধ্যে চোখ ফেলতে চাইল সুকান্ত।

দু' চোখের পাতা সবলে বন্ধ করে কাকলি বললে, 'আদ্যোপান্ত দেখছি।'

'অতক্ষণ চোখ বুজে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।' হেসে ফেলল সুকান্ত : 'বর্তমান দেখতে গিয়ে কিঞ্চিৎ ভবিষ্যৎও না দেখে ফেলো সেই সঙ্গে।'

'ভবিষ্যৎ থাক ভবিষ্যতের জায়গায়।' চোখ খুলল কাকলি : 'আমার এই বর্তমানই সুন্দর।'

'সুন্দর? আমার চাকরি নেই—এখনো হয় নি, আর ঐ আমাদের বাসা। তুমি সুন্দর বলো?'

'বলি।' চিবোতে চিবোতে থামল কাকলি। রসাল মুখে বললে, 'যেখানে তুমি সেখানেই আমার সুন্দর।'

'এটা কোনো কাজের কথাই নয়।' গম্ভীর হল সুকান্ত : 'মনে রেখো কাব্যের কথা ছেড়ে আমরা এখন কাজের কথায় নেমেছি।'

'তার মানেই হৃদয় থেকে উদরে নেমেছি।' নিটোল হাঁ করে দিব্যি এক গ্রাস মুখে তুলল কাকলি : 'নামলামই বা। দিব্যি পেট ভরবে। হিসেবে ভুল হবে না।'

'হবে না?' কাকলি কি দয়া করে বলছে এমনি করুণ জিজ্ঞাসায় তাকাল সুকান্ত।

'না। যা হোক তোমার কিছু একটা আয় আছে, আয়ের পথ আছে—এম-এ হবার পর তোমার টিউশানির বাজার তেজী হবে নির্ঘাত—'

'তুমি কী বলছ? এ একটা আয়?'

'চরিত্র যাই হোক চেহারাটা আয়ের মতই। আর কে না জানে, তিল কুড়িয়েই তাল, হাঁটি-হাঁটি করেই হাওয়াগাড়ি—'

'হাওয়াগাড়ির মধ্যে নয়, হাওয়াগাড়ির তলায়।' হাসল সুকান্ত।

'আজ্ঞে নয়, অত পঙ্গুতা দেখিয়ো না।' সস্নেহ শাসনের চোখে তাকাল কাকলি : 'তা ছাড়া তুমি

একটা রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়ে যাচ্ছ। দু'জনের পক্ষে বেশ একটা মোটা টাকা দিয়ে দিতে পারবে সংসারে।'

'দু'জনের পক্ষে।' কথাটা মৃদুগম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করল সুকান্ত। একটু বুঝি বা চিন্তাকুল শোনাল।

'যখন বর্তমান নিয়ে কথা বলছ, আপাতত তো দু'জনই।' হাড়টা শেষ পর্যন্ত ছুরির অধীন থাকবে, না, হাতে করে ধরতে হবে, কাকলি বললে চোখ নামিয়ে।

'কত টাকাই বা স্কলারশিপ। সবটা দিয়ে দিলেও মোটা টাকা হয় না। তবে যখন দু'জন, দু'জনের ব্যাপার, তখন তুমিও যদি হাত লাগাও—'

'তার মানে?' হাড়টা হাতে করেই তুলল কাকলি : 'আমাকেও চাকরি করতে বলছ?'

'মন্দ কি।'

'ওসব হবে না।' চুলভরা সুন্দর মাথাটা মৃদু মৃদু নাড়তে লাগল কাকলি : 'ওসব মনের কোণেও স্থান দিও না। বিয়ের পর চাকরি করতে পারব না বলে রাখছি। এক জীবন জ্বলেছি পড়া আর পরীক্ষা নিয়ে, আরেক জীবন জ্বলতে পারব না চাকরি নিয়ে। জানো পেট পুরে খেতে পারি নি এ পর্যন্ত। এই স্কুলের বাস, ঐ কলেজের ঘণ্টা, এই ক্লাসের রুটিন, ঐ পরীক্ষার নুটিস—দিন-রাত চড়কে চড়িয়ে রেখেছে। বিয়ের পর আবার আফিস নিয়ে, ট্রামে-বাসে ওঠা-নামা নিয়ে, পাগল হতে রাজি নই। বিয়ে মানেই বিশ্রাম। বিয়ের পরে স্রেফ বিশ্রাম করব।'

'বিশ্রাম করবে?'

'জানো, বাড়ির সমস্ত রান্না শেষ হয়ে যাবার পর কোনোদিন খাই নি। এবার খাব।' হাসতে লাগল কাকলি : 'চচ্চড়ির ডাঁটা খাব চিবিয়ে চিবিয়ে। মাছ-পাতুরির ল্যাজা খাব চুষে চুষে। কত চাটনি আচার, কত কুলচুর আমচুর। পান খাব গাল পুরে। তারপর গা ঢেলে ঘুমুব দুপুরবেলা। উঃ, কতদিন ঘুমুই নি নিশ্চিন্ত হয়ে। আর খারাপ হবার ভয় নেই, এর-ওর-তার এন্তার উপন্যাস পড়ব। বিকেলবেলা আলতাউলি আসবে,—শোনো, আর নাপতেনি বলা চলবে না—ঝামা দিয়ে পা ঘষে মোটা করে আলতা পরিয়ে দেবে। সিনেমায় যাব।'

'জীবন সার্থক করবে।' গদগদ হবার ভাব করল সুকান্ত।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, করব। নইলে শুধু শুধু এত পরিশ্রম কেন?'

'পরিশ্রম?'

'প্রেম প্রচণ্ড এক পরিশ্রম ছাড়া আর কি।' ইতিমধ্যে বয় চা দিয়ে গিয়েছে, নিজের কাপে চামচ নাড়তে লাগল কাকলি : 'মজুরি ছিল বলেই মেহনত, তেমনি বিয়ে ছিল বলেই প্রেম। বিয়েই হচ্ছে প্রেমের রোজগার। বিয়ে হবে না অথচ প্রেম করো, এ যেন ঘোড়া নেই তবু চাবুক হাঁকড়াও। ওসব ফাঁকা আওয়াজে আমি নেই মশাই। আমার কাছে সাফ কথা, ফেলো কড়ি মাখো তেল। বিয়ে করতে রাজি আছ তো এসো প্রেম করতে। নচেৎ দূর হও, অর্থাৎ দূরে থাকো।'

কী সুন্দর কথা বলছে কাকলি, যেন একটা ফোয়ারা খুলে গিয়েছে, সানন্দ চোখে তাই দেখছে সুকান্ত। দেখতে দেখতে বললে, 'তুমিই ঠিক বুঝেছ।'

'আর এও বুঝেছি যিনি প্রেম করছেন অর্থাৎ যিনি স্বামী হবেন তাঁরই পুরোপুরি দায়িত্ব স্ত্রীকে ভাত-কাপড় দেবার, ঘরবাড়ি দেবার। স্ত্রীর দায়িত্ব নেই যে, স্বামীকে খাওয়াবে, পরাবে, বসবাসের সুবিধে করে দেবে। ঘুরে ঘুরে দেখে এসো দেশবিদেশ। সর্বত্র এক বিধি এক ব্যবস্থা। স্বামীর ঘাড়েই স্ত্রীর পড়া। সুতরাং আমার মুখের দিকে দীন নয়নে তাকিয়ো না। তোমাকেই একা-একা সমস্ত বহন করতে হবে, পালন করতে হবে—পালিয়ে যাবার, এসকেপিস্ট হবার আর উপায় নেই।'

'কিন্তু বাড়িতে যে ঘরে তুমি থাকবে, তা তুমি দেখেছ?' ভয়ে ভয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল সুকান্ত।

'আমি থাকব মানে? আমরা দু'জনে থাকব।' কাকলি প্রায় বিজয়িনীর ভঙ্গি করল।

'ঐ হল। দু'জনের ঘর। দেখেছ?'

'দেখেছি বৈকি। ঘরটা ছোট। দু ভায়ের পক্ষে না হলেও স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে ছোট। তা ছাড়া সুবীরকে

সরতে হবে। যেতে হবে আর কোথাও, তোমার মায়ের ঘরে, নচেৎ ঢাকা বারান্দায়। উপায় নেই। কিন্তু,' কাকলি পেয়ালার উপর ঠোঁট নামাল : 'এবার এতদিনে, তোমার কাকা-কাকিমা সরবেন না?'

'সরা তো উচিত।'

'সরলে ঐ ঘরটা আমরা নিয়ে নেব। স-আসবাব আমাদের কুলিয়ে যাবে।'

'কিন্তু যদি না সরেন?'

'সরাবার চেষ্টা করতে হবে প্রাণপণ।'

'তবু যদি না পারি?'

'থাকবে। থেকে যাবে। আমাদের এই ব্যবস্থাটাই বা ক'দিনের জন্যে! যতদিন তোমার না একটা চাকরি হয়। একটা আস্ত-সুস্থ চাকরি পাওয়া মানেই বড় একটা অধিকারের মালিক হওয়া। তখন ইচ্ছে হলে বেশি দামের টিকিট কেটে সংসারের প্রথম লাইনের উঁচু আসনে বোসো গ্যাঁট হয়ে, নয়তো একান্ত বিতাড়িত হলে কেটে পড়ো, তাঁবু ফেলো অন্যত্র।'

'সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ একটি শাঁসালো মজবুত চাকরি দরকার।' নিশ্বাস ফেলল সুকান্ত।

'সেটা কে না বুঝছে? কিন্তু অন্তর্বর্তী সময়টাতে কী হবে সেইটেই প্রশ্ন।'

বিল এনেছে বয়। দু-জনে একসঙ্গে হাত রাখল—সুকান্ত তার মনিব্যাগে, কাকলি তার বটুয়ায়।

শাসনরুষ্ট চোখে তাকাল সুকান্ত।

'ও, হ্যাঁ, তুমিই তো দেবে। তোমারই তো একার দায়িত্ব।' হাত সংবৃত করল কাকলি। দু'জনে বেরিয়ে এল রেস্টুর্যান্ট থেকে। হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। খানিকক্ষণ কথা কইল না কেউ। আবছায়ায় চুপচাপ হাঁটতেই শান্তি মনে হল।

'চলো জলের ধারে গিয়ে একটু বসি।' বললে সুকান্ত। 'মনে যখন কোনো আলোড়ন আসে তখন জল দেখতে খুব ভালো লাগে।'

'সম্প্রতি যে আলোড়ন এসেছে এতে জল-মাটি আলো-আঁধার লোকজন ইট-পাথর ট্রাম-বাস ট্যাক্সি-রিকশা সমস্ত ভালো লাগছে। যেন রহস্যের দেশে অপূর্বের পোশাক পরে দাঁড়িয়েছে সকলে। স্বয়ং নিধিরামকেও মনে হচ্ছে হৃদিরাম।' হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'রাত বেশি হয় নি তো? চলো তবে। আরেকটু বসি।'

'কথাটা শেষ করি।'

অনেক খুঁজে পেতে জলের কাছাকাছি ঘাসের উপর বসল দূরে-দূরে। যেন সহসা সন্দেহের না ছায়া পড়ে। কিন্তু দূরে বসলেও মনে হয় কত কাছে, কাছে বসলেও মনে হয় কত দূর। এ যেন বিরহের পর মিলন বা মিলনের পর বিরহ নয়, এ যেন মিলন-বিরহ একত্র গাঁথা।

কারু মুখে কোনো কথা নেই।

কৌতূহলে কত সজাগ ছিল কাকলি, সে দেখবে কুঁড়ি কি করে ফুল হয়ে ফোটে। কুণ্ঠার কপাট খুলে কি করে প্রথমে কথা আসে। কি করে ইচ্ছা তার আঙুল বাড়ায়। মাঝখানে কাকলি ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল টের পেল না। সহসা চোখ চেয়ে দেখল এক বাগান গোলাপ, এক গাছ পাখি, এক হৃদয় জলতরঙ্গের শব্দ। আর বাসনা রক্তের ছোঁয়া পেয়ে সোনার রঙ-ধরা।

আর সুকান্তকে কে বিশ্বভূবনের আনন্দের খনির মালিক করে দিয়েছিল এক মুহূর্ত। বলেছিল, যত পারো, যত ধরে, যত ভরে, তুলে নাও দু হাতে। সুকান্তও যত পেরেছে উন্মাদের মত তুলে নিয়েছে বুকে করে। সেই একস্তূপ সুখকেই এখন সে বসিয়েছে ঐ ঘাসের উপর, তার চোখের সামনে, তার আকাঙ্ক্ষার এলাকায়।

'তোমার কথা তো বললে, কিন্তু আমারও একটা বিকল্প প্রস্তাব ছিল।' নতুন করে কথা পাড়ে সুকান্ত।

'তোমার আবার কোন বিষয়ে প্রস্তাব?' লঘু করতে চাইল কাকলি।

'ঐ একই বিষয়ে। অন্তর্বর্তী সময়টা কীভাবে যাবে সেই সম্পর্কে।'

'তোমার প্রস্তাব তো জানা।'

'জানা?'

'হ্যাঁ, মান্ধাতার আমলের সেই মামুলি প্রস্তাব। ধৈর্যের প্রস্তাব। এ কে না জানে?' এলানো ভঙ্গি ঋজু করল কাকলি : 'তার মানে যতদিন তোমার সুস্থ-সমর্থ চাকরি না জোটে ততদিন আমি বাপের বাড়িতে ভাত মারি আর তা-না-না-না করে দিন কাটাই। তুমি চাকরির জন্যে ঘোরো আর আমি ঘুরি তুমি চাকরি পেলে কিনা সেই সংবাদের জন্যে। দিনের পর দিন দিনমণি অস্ত যাক।'

'মন্দ কি।'

'তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বের কাছে খেলো করে দিতে চাও?'

'বাঃ, খেলো করে দিতে চাইব কেন?'

'তা ছাড়া আর কি। জগৎ সমক্ষে তুমি এই প্রমাণ করতে চাও যে আমি একটি বাঙালি মেয়ে যতই কেননা ভালোবাসি আমার পুরুষকে, যেহেতু সেই পুরুষ রোজগারে কমজোর, যেহেতু তার জোটে নি এখনো হৃষ্টপুষ্ট চাকরি, খোলামেলা বাড়িঘর, আমি তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত নই। যেন আমার সম্মতির শর্তই এই যে, তুমি আমাকে আরাম দেবে, প্রাচুর্য দেবে, বিলাসের জীবন দেবে। আর যতদিন তা না দেবে ততদিন আমি গালে হাত দিয়ে বসে থাকব। আমার সাধের যৌবন ভেসে যাবে। শোনো, আমি অত সস্তায় বিকিয়ে যেতে আসি নি।'

'কিন্তু পুরুষের চালচুলোটা দেখবে তো।' হাসল সুকান্ত : 'পুরুষ যখন তখন, মিহি নয়, পুরু করেই দেখতে হবে। যে পুরু নয় সে এখনো পুরুষ নয়।'

'থাক। দেখেছি। কিন্তু ধরো, বসে আছি, এক বছর গেল দু' বছর গেল, তোমার তেমন চাকরি কিছু জুটল না, পারলে না পুরু হতে, তখন কী হবে? মিহি হতে হতে মিইয়ে যাব আমি, মিলিয়ে যাব আমি? আমাকে তুমি ছেড়ে দেবে? চলে যেতে বলবে?' যেন কথায় একটু কান্নার ছোঁয়াচ লাগল কাকলির।

'অত সোজা নয়। শোনো, সরে এসো।' চোখের ইশারা করল সুকান্ত।

'কেন, এখান থেকেই বেশ শুনতে পাচ্ছি।'

সুকান্তই এগিয়ে গিয়ে বসল। বলল, 'আমার প্রস্তাবটা, তুমি যেমন বলছ, অতটা সেকেলে নয়?'

'কিছু নতুনত্ব আছে?'

'নিশ্চয়ই। নইলে অসংলগ্ন তুমি গালে হাত দিয়ে বাপের বাড়ি বসে থাকবে আর আমি পথে-পথে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াব—ব্যাপারটা মোটেই সুখেরও হবে না, গৌরবেরও হবে না। তা ছাড়া গালে হাত আর ক'দিন থাকবে? গালের হাত শেষে কপালে এসে উঠবে। আমাকে ফ্যা-ফ্যা করতে দেখে শতমুখে ছ্যা-ছ্যা করতে থাকবে। আর, ফিকির বুঝে সটকান দেবে খিড়কি দিয়ে।'

'আমি?' নিজের বুকের উপর হাত রাখল কাকলি।

'ভয় শুধু আমার দিক থেকে নয়, দু দিক থেকেই। ভয় ভয়—সময় ফেলে রাখাই ভয়। সময় বয়ে যেতে দেব না। দু দিক থেকেই তার পথ আটকাব।'

'তার মানে?'

'এক্ষুনি-এক্ষুনি বিয়ে করব।'

'মানে, এই মুহূর্তে? অন দিস্ স্পট ? কাকলির উল্লাসের মধ্যে আতঙ্ক এসে মিশল।

'মানে যৎপরোনাস্তি শিগগির। তোড়জোড়ে অন্তত মাসখানেক তো লাগবেই।' আশ্বস্ত করল সুকান্ত। বললে, 'বিয়ে করব কিন্তু ইনটেরিম পিরিয়ডটা, মানে, অন্তর্বর্তী সময়টা—আমার চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত—আমরা আলাদা-আলাদা থাকব। তুমি তোমার বাপের বাড়িতে আমি আমার মায়ের হাঁড়িতে।'

'আলাদা-আলাদা?' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল কাকলি : 'বিয়ে হবে অথচ একত্র হব না? মানুষে বলবে কী!'

'মানুষে জানতেই পারবে না।'

'জানতেই পারবে না?' সে কী কথা!'

'বিয়েটা গোপনে হবে। রেজেস্ট্রি করে হবে।'

'গোপনের কী দরকার!' গম্ভীর হল কাকলি : 'তাতে কী সুবিধে?'

'সুবিধে অনেক। তোমার-আমার বাড়ি দুই-ই সন্দেহের বাইরে বসে ঘুমুবে, আমরা যে যার মনে থাকতে পারব, চলতে পারব এদিক-ওদিক। আমি কাজের চেষ্টায়, তুমি না হয় আরো পড়ার চেষ্টায়। দু' জনের ঘন-ঘন দেখা হবারও কোনো দরকার পড়বে না। তেমন কোনো অসুবিধের জায়গায় যদি দেখা হয় এমন ভাব করলে চলবে যেন আমাদের মুখ চেনা। নির্ঝঞ্ঝাটে দিন যাবে। পাকা দলিল হয়ে থাকবে, কারু ফরকে বা ফসকে যাবার পথ থাকবে না। আর এ দলিল শুধু বিয়ের দলিল নয়, আমার গৌরবের দলিল—আমাকে অকৃতী জেনেও তুমি আমাকে দিয়েছ বরমাল্য। জগৎ সমক্ষে সেই বাঙালি মেয়েটিকে আমি খেলো হতে দিই নি, তার হাত থেকে নিয়েছি রাজটীকা। তারপর যখন চাকরি পাব, আসবে সে প্রার্থিত মুহূর্ত, ছদ্মবেশ খুলে ফেলব, সগর্বে নিয়ে যাব তোমাকে, স্থানে-মানে দেব অনেক স্বাচ্ছন্দ্য। কোথাও কোনো হৈ-চৈ হবে না, সব সুন্দরে শেষ হবে।'

করুণ করে তাকাল কাকলি। বললে, 'তোমার কষ্ট হবে না ছেড়ে থাকতে?'

এক মুহূর্ত হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে রইল সুকান্ত। পরে বললে, 'কিন্তু এখুনি যদি তুমি আমাদের বাড়িতে চলে আসো এই আয়হীন স্থানহীন সংকীর্ণতার মধ্যে, সে কষ্ট আরো কঠিন হবে।'

'হোক। তবু বিয়ের পর, স্বামী বর্তমানে থাকতে পারব না বিধবার মত।' সশব্দে হেসে উঠল কাকলি : 'কী অপরূপ ব্যবস্থা, সর্বাঙ্গে দগ্ধ হয়ে বসে থাকো সমুদ্রের পারে কিন্তু খবরদার, স্নান করে স্নিগ্ধ হতে পারবে না। এতে আমি রাজি নই। আর এ সমুদ্র আমার অস্তিত্বের সমুদ্র, অমৃতের সমুদ্র। আর স্নানে শুধু স্নিগ্ধ হওয়া নয়, শুদ্ধ হওয়া, স্নানান্তে জীবনের নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করা—'

দু'জনে উঠে পড়ল।

'চলো, একটা ট্যাক্সি পাই কিনা দেখি।' সুকান্ত বললে।

'তুমি রেজেস্ট্রি করার কথা ভাবছিলে কেন? আমরা কি আলাদা জাত, আলাদা দেশ, আলাদা ধর্ম?'

'না, না, তার জন্যে নয়। যেখানে কোনো বাধা নেই তেমনি সাধারণ বিয়েও রেজেস্ট্রি করে করা যায়। রেজেস্ট্রি করায় হাঙ্গামা কম। খরচ কম। নেমন্তন্নপত্রও ছাপতে হয় না। তারপর যদি একটু গোপন করে রাখতে হয় রেজেস্ট্রিই প্রশস্ত।'

'না, অন্যায় তো কিছু হচ্ছে না, কোনো অর্থেই নয়।' চলতে-চলতে বললে কাকলি, 'তবে কেন গোপন করতে যাব? তারপর সাজব-গুজব না, লোকজন আসবে না, আলো জ্বলবে না, সানাই বাজবে না, আসর-বাসর বসবে না—সে আবার একটা বিয়ে কী! বাপ জানে না মা জানে না, হোগলা বনে বিয়ে—তাতে আমি রাজি নই।'

'বাবা-মাকে বলবে?'

'নিশ্চয় বলব। বাজনা যখন বাজিয়েছি, তখন মিউজিক ফেস করব।'

অন্ধকারেও কী সুন্দর দেখাচ্ছে কাকলির মুখ। সুকান্ত বললে, 'যদি অনুমতি না পাও!'

যেন হোঁচট খেল কাকলি। বললে, 'তখন দেখা যাবে। কিন্তু তুমি? তুমি যদি না পাও।'

'আমার ভয় কি! আমি তো এসকেপিস্ট নই।' মুঠো করে কাকলির ডান মণিবন্ধটা ধরল সুকান্ত : 'আমি রণমুখো সেপাই।'

ট্যাক্সি ডাকতে হল না। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল অপেক্ষায়। উঠল দু'জনে।

কাকলি বললে, 'হ্যাঁ, লড়ব, দাঁড়াব, তৈরি করব। আমি তোমার চিত্রাঙ্গদা।'

বারো

'তোমার জন্যে একটা ফ্ল্যাট দেখে এলাম, কাকিমা।' যতদূর সম্ভব চোখে ও গলায় ফুটন্ত উৎসাহ নিয়ে বললে সুকান্ত।

যেমন পড়ছে, বিজয়া তেমনি পড়তে লাগল ম্যাগাজিন।

'বেশ বড়-বড় দু'খানা ঘর, সামনে বারান্দা—'

গ্রাহ্যও করছে না। চোখ ডুবিয়ে পড়ছে তন্ময় হয়ে। কী একটা উৎকট উৎকণ্ঠার মুহূর্তে এসেছে না জানি।

'দক্ষিণ খোলা—' টেবিলের ওপর এটা-ওটা নাড়তে লাগল সুকান্ত : 'নিতে হলে এখুনি গিয়ে ধরতে হয়।'

এত তাড়া কিসের, এখুনিই ঘর ছাড়ব কেন, সরাসরি এমন সুখের প্রশ্নটা করবে এ অবশ্যি সুকান্ত আশা করে নি। কিন্তু ফ্ল্যাটটা কোথায়, কোন পাড়ায়, একতলা না দোতলা, তা ছাড়া শেলের মধ্যে শক্তিশেল, প্রশ্নের মধ্যে মূল প্রশ্ন, ফ্ল্যাটটার ভাড়া কত, তা অন্তত তো জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই বিজয়ার। চোখ দুটো এতদূর খুলেছে যে মুখ খুলতে পারছে না।

অথচ কথা বলাতে না পারলে অলি-গলি করে সে-কথায় আসে কী করে। আর বাড়ির কথা বলতে-বলতেই তো বিয়ের কথা বলা সহজ।

'বড় রাস্তার উপরেই ফ্ল্যাটটা—হ্যাঁ, দোতলায়, আর ভাড়া—'তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সুকান্ত।

পত্রিকার থেকে চোখ না তুলেই বিজয়া বললে, 'আমরা আর ফ্ল্যাট ভাড়া নেব না ঠিক করেছি।'

'নেবে না?' চক্ষে অন্ধকার দেখল সুকান্ত।

'না।'

'কিন্তু সব দিক দিয়ে সুবিধে ছিল।' প্রায় যেন মিনতির সুর বেরুল সুকান্তর : 'ভাড়াও বেশ সস্তা বলতে হবে।'

'হোক গে।' মুখ তুলল বিজয়া, চোখ ফেরাল। গম্ভীরস্বরে বললে, 'ভাড়া-টাড়া আর নেব না, গোটা বাড়ি কিনব।'

'বাড়ি কিনবে?' খুব ভালো, খুব ভালো।' লাফিয়ে উঠল সুকান্ত : 'আমি আজই দালাল ধরি। ক হাজারের মধ্যে? কম পক্ষে ক'খানা ঘর চাই? উপরে-নিচে ছ'খানা তো বটেই, দুটো অন্তত বাথরুম। আর সামনে একটু জমি, একটু ফুলটুল লতাপাতা—কী বলো?'

'তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।' বিজয়া পত্রিকার পৃষ্ঠা ওলটাল : 'দালাল অলরেডি লাগানো হয়েছে।'

'হয়েছে? তবে এত দেরি করছে কেন? একটা ডিল হতে সাত দিন, বড় জোর দু' সপ্তাহ—'

'পছন্দসই বাড়ি চাই তো—'

'তা তো এক শো বার। কিন্তু যাই বলো, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকব।' সাঁতরে যেন প্রায় পার ধরল সুকান্ত : 'বাড়ির বড় দুই ছেলে—দাদা থাকবে মা'র কাছে, আমি তোমার কাছে। আমি ছাড়া, আমরা ছাড়া, কে দেখবে তোমাকে? অত বড় ফাঁকা বাড়িতে দুপুর-সন্ধে একা তোমার কাটবে কী করে?'

একটা সন্দেহের দৃষ্টিও ফেলল না বিজয়া। তোলা বিছানায় হেলান দিয়ে খাটের উপর আধশোয়া ভঙ্গিটা মেরামত করে খাড়া করে তুলল। বললে, 'আমার বাড়িতে কোনো আত্মীয়স্বজনের স্থান হবে না।'

'হবে না?' সুকান্তর বুকে যেন কে ছুরি বসাল, অন্তিম নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললে, 'যদি বাড়তি ঘর থাকে —'

'তা হলেও না।' রস করে গল্পটা পড়া যাচ্ছে না, মেজাজ তাই সমে নেই বিজয়ার। বললে, 'তাই দালালকে বলে দিয়েছি ছিমছাম বাড়ি না পেলে সোজাসুজি জমি দেখতে।'

'জমি!' সে না জানি আরো কত দূরের পাল্লা। চারদিক ধু-ধু দেখল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, কেনা বাড়িতে বাড়তি ক'টা ঘর কোন না থাকবে! আর বাড়তি ঘর দেখলেই কাঁথাকম্বল নিয়ে ঢুকে পড়বে আত্মীয়ের দল। আর, দেখছি তো, একবার ঢুকলে কারু বেরুবার নাম নেই। আজকাল লাঠিই ভাঙে, ধনঞ্জয় নড়ে না। তাই ভাবছি,' পাশ ফিরল বিজয়া — 'গোড়াতেই পথ বন্ধ করে দেব।'

'কী করে?' যদি এখনো মরীচিকা দেখা যায় সুকান্ত প্রার্থনার চোখে তাকাল মরুভূমির দিকে।

'জমি যাই পাই, বাড়িটা ছোট করে তুলব। ঠিক দু'জনের আন্দাজ। কোথাও এক ফালি ফালতু রাখব না। যাতে এক বেলার জন্যেও অতিথি না মাথা পাততে পারে!'

কী বিপদের মধ্যেই ফেলল কাকলি! বিয়ে করে ফেলেছি, ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে, এ বলা কত সোজা। এই দেখ আমার বউ, কাকলিকে সঙ্গে নিয়ে সটান বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়াও কিছু দুরূহ ছিল না। কিন্তু, ওগো, আমি বিয়ে করব, আমার বিয়ের জোগাড় করে দাও, নাপিত-পুরুত ডাকো, গ্যাস-ব্যাণ্ড বায়না করো, আমাকে কনের বাড়িতে নিয়ে চলো মিছিল করে, কই আমার টোপর কই, এ'একটা আস্ত-সুস্থ পুরুষ হয়ে কেউ বলতে পারে? ভূ-ভারতে বলেছে কেউ কোনোদিন? রব তুলেছে?'

কী জেদী মেয়ে! যত জেদ তত যদি থাকত যুক্তি।

কাকলি বলে, তার দিকে যুক্তি আছে বলেই তো তার জেদ। কেন, কিছু অপরাধ করছি যে লুকিয়ে-চুরিয়ে করব? গোপন রাখব? গায়ে চোর-চোর গন্ধ মেখে বেড়াব? সমুদ্রের পারে বসে ঘটি করে জল তুলে মাথায় ঢালব? সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে ভিজিয়ে স্নান করতে পারব না?

কিন্তু কত নিশ্চিন্ত হওয়া যেত যদি সুকান্তর পরামর্শটা শোনা হত। রেজেস্ট্রি করে বিয়েটা হয়ে থাকত, শুধু বর্তমান থাকা-খাওয়ার অসুবিধের জন্যে ফুলশয্যাটি থাকত কিছুকাল পিছিয়ে। এ একটা এমন অসাধ্য কী! কত অদর্শনই লোকে সহ্য করে, এ তো শুধু একটু অস্পর্শন। আগুন পোয়াতে বসে আগুনে হাত না দেওয়া। আর ক'টা দিনেরই বা এ কৃচ্ছ্র। দেখতে-দেখতে শীত যেতে-না যেতেই, একটা চাকরি জোটাতে পারবে না? পারবে না ঘরে-দোরে প্রশস্ত হতে ?

যদি না পারো? যদি চাকরি জুটলেও বলো, এটা অভাব ঠেঙাবার পক্ষে যথেষ্ট মজবুত নয়? অর্থাৎ যদি ঝোপ বুঝলেও কোপ না মারো? পাশ কাটাও? প্রতীক্ষার দিন খালি লম্বা করো? আমি শুকিয়ে মরব? এ কাকলির কথা। যাতে কেউই পালাতে না পারি তারই জন্যে যখন বাঁধা পড়ছি, তখন যাতে বাঁধা না পড়তে পারি তার জন্যে পালিয়ে বেড়ানো কেন?

'আর শোনো, অনেস্ট সাধু হওয়া ভালো। চোখ মুখ গম্ভীর করল কাকলি।

'সাধুরা কি বিয়ে করে?'

'সাধুরাই তো বিয়ে করে। এবং সেটা প্রকাশ করে। বলতে চাচ্ছি সত্যের আশ্রয়ে থাকাই শান্তি। বিয়ে যখন করছি পুরোপুরিই করছি। না, ওসব ভাবিনী ভাবের দেহী হতে পারব না। সিনান করব অথচ কেশ ভিজবে না, নীড় ছোঁব না, এ অসম্ভব।'

'তার মানে ঔষধার্থে সুরাপানের মধ্যে তুমি নেই।'

হেসে উঠল দু'জনে।

কিন্তু যাই বলো, ছলনাটুকু থাকলে মন্দ হত না। যাই বলো, মন্দের একটু গন্ধ না থাকলে কোনো ভালোই বুঝি আলো দেয় না।

হয়তো কোনো মেলায় বা সভায়, ভিড়ে-ভাড়ে কোথাও তাদের দেখা হয়েছে। পরস্পর এমন মুখ করে থাকবে যে চক্ষের ঘুণাক্ষরেও কেউ কাউকে চেনে না। দেখতে কুমারী শুনতে মাধুরী, কত যুবক, গাঢ় ও প্রৌঢ়, সপ্রতিভ হয়ে ঘুরবে আশেপাশে, ঝিলিক দেবে। আর প্রতিধ্বনিতে কত রকম ঢেউ তুলবে কাকলি। কোথাও মৃদু কোথাও প্রগল্‌ভ। কোথাও বা কঠিন কোথাও বা ধূর্ত। কোথাও কুন্দলতা কোথাও বা লজ্জাবতী। কিন্তু এক কলার ক্ষুদ্র একটি অংশই শুধু নিচ্ছ কুড়িয়ে, আর আমি যে দূরে, আমি যে ঘুমিয়ে, আমারই সে ষোলকলা, আমারই সে পূর্ণিমার পরমা প্রতিমা। কী গৌরব সে ভাবনায়! কী অপূর্ব সে স্বাদগন্ধ। অন্যের হতে-হতে-না-হয়ে সে আমার। আকাশে অনেক কিছুই ওঠে-ফোটে, কিন্তু

আকাশ জানে সে শুধু সূর্যের। কারা সব তপস্যা ভাঙাবার উদ্দেশ্যে ঘুরঘুর করছে, ঐ ক্ষামমধ্যা অপর্ণার আমি সেই মহাদেব।

দিব্যি ল' পড়ত কাকলি, অন্তত দু-তিন বছরের গড়িমসি, আর মক্কেল-মক্কেল চেহারায় সুকান্ত ঘুরতে পারত আশেপাশে।

হঠাৎ সমস্ত ভিড়ের থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে একটু নিরালায়, রাস্তায় বা দোকানে, তার বুকের খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়াত কাকলি, দ্রুত তপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করত, 'কেমন আছ?'

সুকান্ত বলত, 'ভালো। তুমি?'

হেসে উত্তর দিত কাকলি, 'তোমার মত।' তারপর দ্রুত পায়ে চলে যেত আঁচল উড়িয়ে।

এমন আশ্চর্য সম্ভাষণ কেউ আর কোথাও শুনেছে? যারা সমস্ত বাক্য ও ব্যবহারের আবরণ নিমেষে দূর করে দিতে পারে তাদের এ কী করুণ কার্পণ্য। যার উপর যে কোনো মুহূর্তে খাসদখল জারি করতে পারে তাকে অবলীলায় চলে যেতে দিচ্ছে সুকান্ত, পিছন থেকে একবার ডাকছে না পর্যন্ত। ও খানিক-দূরে গিয়ে আবার পিছন ফিরে তাকায় কিনা তা দেখতেও একবিন্দু প্রতীক্ষা করছে না।

সেবার কী হল জানো না বুঝি ? স্বপ্ন দেখছে সুকান্ত। সেবার একটা টুরিস্ট পার্টির সঙ্গে জুটে গিয়েছিল তারা। মুখ্যত ছাত্রছাত্রীর দল, বয়স্কেরাও কেউ আছেন অবধায়কের পর্যায়ে। ট্রেনের কামরা থেকে শুরু করে আস্তানায় খাওয়া শোওয়ার জায়গা পর্যন্ত আলাদা। প্রবীরেরা এক দিকে, প্রমীলারা আরেক দিকে। শুধু বেড়াতে বেরুবার সময়, মাঠে পড়লেই, একাকার হতে পারত, দাগ-দড়ির বা দলাদলির বালাই থাকত না। তেমনি একবার মাঠে পড়ে সুকান্ত আর কাকলি হঠাৎ মাঠছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ছোট একটা পাহাড়ের টিলার আড়ালে বসেছিল ঘন হয়ে। কী ললাটের গ্রন্থি, ওষ্ঠাধরে একটু অসাবধান হতে চেয়েছিল। চরচক্ষু পাহাড়কেও ভেদ করে। পাখার বাতাস খেতে-খেতে আগুন লেগে গেল ক্যাম্পে, অবধায়কদের কানে উঠল। কী প্রতিকার এবং কিসে, কানের সঙ্গে-সঙ্গে ভাবতে বসল মাথারা।

শান্তভাবে বাক্স থেকে দলিল বের করল সুকান্ত। ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেট। কাকলি বনে-ওড়া পক্ষীর কাকলি নয়, পাঁজর-ভাঙা বক্ষের কাকলি।

চারদিকে হাসাহাসি পড়ে গেল।

সেবার যা ঘটেছিল, তা আরো মারাত্মক। রাত্রে গঙ্গায় জাহাজ দেখতে গিয়েছিল দু'জনে। জাহাজ দেখে ফিরে স্ট্যাণ্ডে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল। জল আর জাহাজ দেখলে, দেখে আবার স্থলে ফিরে এলে কার মন না উচাটন হয়! কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সার্জেন্ট এসে ধরবে এ কে পেরেছিল কল্পনা করতে ? কোনো কথাই শুনলে না, একেবারে থানায় এনে উপস্থিত করলে। তখন, পকেটেই ছিল, ঘরের প্রত্যক্ষ আলোতে দলিলটা বার করে দিল সুকান্ত।

দেখে পুলিস বোকা বনে গেল।

একটা বাকতাল্লা মারছে এই এতক্ষণ ভেবেছিল পুলিস কিন্তু কুণ্ডলকবচ সঙ্গেই বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এ স্বপ্নের অতীত।

তখন ক্ষমা চাইতে পথ পায় না কর্তারা। নিজেদের গাড়িতে যার-যার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে সসম্মানে।

এসব স্বপ্ন একটুও দেখতে দিল না কাকলি। একেবারে গোড়াতেই সিঁদুরে-গয়নায় ন্যাতাজোবড়া হয়ে এসে দাঁড়াল। কুমারী-কুমারী থাকল না, থাকতে পেল না, একেবারে প্রথম থেকেই সধবা। অহল্যা মাটিতে দিল না একটু হাওয়া খেতে। মাথায় কোটেশন-চিহ্ন ও পায়ে ফুটনোট দেওয়া থাকলে কি পড়ে সুখ হয়? সিঁদুর আর আলতাতে কি আবিল হবে না সেই শুভ্রতা? যে নিদাগ অবাধ মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম সে কি আর থাকবে? লালে-নীলে সর্বাঙ্গে আণ্ডারলাইনড্ হলে সে কি অপাঠ্য হয়ে উঠবে না? সুকান্তকে কি কেউ কৌমারহর বলবে? না। বলবে, বিবাহিত ভদ্রলোক।

'ওসব বাহ্য। অন্য কথা বলো।' চপল চোখে হাসতে গিয়ে কাকলি নিষ্পলকে চেয়ে থাকে।

দুই চোখে শ্যামলসুন্দর স্নেহ, প্রশ্নহীন প্রার্থনা।

আমি কি শুধু নৈবেদ্যের থালা? এক স্তূপ বসনভূষণ? শুধু অন্নজলের পাত্র?

না, তুমি এক আনন্দের চিঠি। কোন এক অচেনা পোস্টাপিস থেকে তোমাকে কে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার ঠিকানা লিখে। নির্জনে বসে সেই চিঠিটি পড়ব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। সেই যে তোমার প্রথম চিঠি পেয়েছিলাম, খুলেছিলাম, পড়েছিলাম—তেমনি।

না, না, দাগে কি মানে কমে?

তবে এবার বউদিকে ধরতে হয়। সাধুদের পরিত্রাণের জন্যে যেমন অবতার তেমনি দেওরদের পরিত্রাণের জন্যে বউদি।

ছন্নছাড়ার মত চেহারা করে উপরে উঠছে বন্দনা, সুকান্ত বললে, 'তোমার এত কষ্ট আর দেখতে পারি না।'

এত কষ্টেও হাসল বন্দনা। বললে, 'দেখতে তো পাচ্ছ না কিন্তু ব্যবস্থাটা কী করছ শুনতে পাই?'

'ভাবছি তোমাকে একটি সঙ্গিনী জুটিয়ে দি।'

প্রস্তাবটা একবাক্যে ভূপাতিত করলে বন্দনা। বললে, 'রক্ষে করো। একা জ্বলছি জ্বলছি, আরেকজনকে জ্বলতে দিতে পারব না।'

ব্যস, হয়ে গেল।

কাটা সুতো ধরবার জন্যে হাত বাড়াল সুকান্ত। বললে, 'কিন্তু জ্বালার প্রতিকারটা তো ভাববে।'

'জ্বালার প্রতিকার ঠাকুরানী নয়, ঠাকুর, একটি বামুন ঠাকুর। যে বাঁচাবে দু বেলার এই আগুনের, উনুনের তাপ থেকে।'

'বাঃ, ঠাকুর আমি আগামী মাস থেকেই রেখে দিচ্ছি।' কথায় অন্য মানে পুরল সুকান্ত : 'কিন্তু মানুষের অন্য তাপও তো ছিল, যাকে বলে, সন্তাপ—'

'ছিল বৈকি। তার জন্যে ঘরে ফ্যান দাও, কিনতে না পারো ভাড়া করো।'

'বাঃ, ফ্যানও দেব বৈকি। আজ-কালই যাচ্ছি আমি দোকানে, খোঁজ নিচ্ছি।' কানের কাছটা চুলকোবার উদ্যোগ করল সুকান্ত : 'কিন্তু তাই বলে তোমার সঙ্গিনীর কথাটা—'

'রাখো।' ধমক দিয়ে উঠল বন্দনা : 'যে কুঁজো সে যেন কাত হয়েই শোয়। চিৎ হয়ে শোবার সাধ না করে। ঘর নেই বারান্দা নেই চাকরি নেই বাকরি নেই, তার আবার সঙ্গিনী। গিন্নি ধরে এনে তাকে আর সঙ বানিয়ো না।' হাতের কাছে মুখ ঘোরাল বন্দনা : 'সঙ্গিনী না সঙ-গিন্নি!'

দু হাত যুক্ত করল সুকান্ত। বললে, 'তোমাকে বন্দনা করি বউদি, ক্ষেমা দাও। ও নাম আর উত্থাপন করব না।'

কী অনর্থক ঝামেলার মধ্যেই না ফেলেছে কাকলি। যদি সঙ্গিনী হতে না চেয়ে শুধু রঙ্গিণী হয়ে থাকত বড় জোর দুই বসন্ত, তা হলে বউদির এই ঝংকারটা শুনতে হত না। মেয়েরা সকলেই এত কম বোঝে।

ওভাবে হলে চলবে না। পাত্রকে স্পষ্ট করতে হবে।

সেন্টুর শরণ নিল সুকান্ত।

'সেন্টু, একটা কাজ করবি?'

কাঠের টুকরো দিয়ে বাড়ি বানাচ্ছিল সেন্টু, গম্ভীর মুখে বললে, 'কাজ-টাজ আমি করতে পারি না।'

শোনো কথা! নক্ষত্র বিরূপ হলে সেন্টুও বিরুদ্ধে যায়!

'শোন, কাজ করতে হবে না তোকে। শুধু একটা কথা বলবি।'

'আমার সময় কই?' তৎপর হয়ে ছবির সঙ্গে কাঠের টুকরো মেলাতে লাগল সেন্টু।

'শোন, তোকে সেই একটা পিস্তল দিয়েছিলাম না—'

কাঠের টুকরোগুলো সেন্টুর হাত থেকে খসে পড়ল অনায়াসে। বললে, 'জানো, আমার আর ক্যাপ নেই।'

'আর পিস্তল নয়। পিস্তল পুরোনো হয়ে গেছে। তোকে এবার একটা মেশিনগান কিনে দেব।'

'দেবে?' উঠে এল সেন্টু। ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ের উপর। চোখ বড় করে বললে, 'সেটা কী জিনিস কাকা?'

'বন্দুকের ঘোড়া টিপবি আর ঘটাঘট ঘটাঘট গুলির আওয়াজ হতে থাকবে। আর সঙ্গে সঙ্গে গুলির ঘরে-ঘরে জ্বলবে আগুনের চোখ—'

'কবে দেবে বলো?' সুকান্তর বুকের মধ্যে মুখ রাখল সেন্টু।

'তার আগে একটা কথা শুনবি বল?'

'শুনব।' ভারিক্কি চালে মাথা নাড়ল সেন্টু : 'কিন্তু কী কাজ বলছিলে না?'

'হ্যাঁ, কাজ, ঠিক বলেছিস। ভারি লক্ষ্মী ছেলে তুই—'

'কি, পিঠ চুলকে দেব? দাঁড়াব পায়ের উপর?'

'না, ওসব নয়। কথা আর কাজ এক সঙ্গে।' চোখের উপর চোখ রেখে গলা নামাল সুকান্ত, 'তোর ঠাকমার গলা জড়িয়ে ধরবি আর কানে কানে বলবি, জানো, সেই যে একটা মেয়ে এসেছিল আমাদের বাড়ি, যাকে সবাই সাবানের ফিরিউলি ভেবেছিল, তার সঙ্গে কাকার বিয়ে হচ্ছে। কী, পারবি বলতে?'

'বিয়ে হলে অনেক জিনিস পাওয়া যায়, তাই না কাকা? তবে আমার বিয়ে কবে হবে?' কান্নার সুর বের করল সেন্টু।

'আগে আমারটা হোক। তারপর তোর।' দু হাতের মধ্যে সেন্টুর দু গাল চেপে ধরল সুকান্ত · 'বল তো কী বলবি ঠাকমাকে।'

আবৃত্তি করিয়ে করিয়ে দোরস্ত করে দিল।

মৃণালিনীর অত সোহাগ করবার সময় নেই। কোল থেকে জোর করে নামিয়ে দিল সেন্টুকে। সেন্টুর হাতে আজ মেশিনগান, সহজে সে নিরস্ত হবার পাত্র নয়। তড়বড় তড়বড় করে ছোটাল সে গুলির ঝড়। হ্যাঁ, সাবানের ফিরিউলি, তার সঙ্গে কাকার বিয়ে হচ্ছে। হ্যাঁ, হচ্ছে, বিয়ে হচ্ছে। কাকার সঙ্গে সাবানের ফিরিউলির।

মৃণালিনী ধমক দিয়ে উঠল।

ধমকে কি মেশিনগান থামে?

'আমি কী জানি। কাকাই তো বললে বলতে।' ভারিক্কি চাল ঝাড়ল সেন্টু : 'আর কাকার পরেই আমার বিয়ে। আমার বউ সাবান নয়, ঘটাঘট মেশিনগান। দেখো সব ঘরে কেমন আগুনের চোখ জ্বলে, আগুনের জিভ নড়ে—'

'দেখ তো বউমা, খোকন কী সব বলছে—'

'বারে, আমি বলব কেন, কাকা বলছে।'

সুতোর পর সুতোর জট খুলে রহস্য-উদ্ভেদ করল বন্দনা। সঙ্গিনী মানে যে এই সঙিন অবস্থা তা কে বুঝেছে।

'সেই যে কাকলি বলে একটি মেয়ে এসেছিল, হাইকোর্ট না ছাইকোর্টের জজের মেয়ে, সে ঠাকুরপোর সঙ্গে বিয়ে বসতে চাচ্ছে। ঠাকুরপোও নিমরাজি। জাত-গোত্রের বাধা নেই। এখন আমাদের মত হলেই নৌকোতে বাদাম দেয়।'

চোখেমুখে ঝলমল করে উঠল মৃণালিনী। বললে, 'বেশ হয়। দেখতে-শুনতে বেশ মেয়ে। তারপরে এম-এ পাশ। চারটিখানি কথা নয়। যেখানে মেয়েরা একখানা খবরের কাগজ উলটে দেখে না, সেখানে এত রাজ্যের পড়া—'

এ কটাক্ষ বন্দনাকে। কিন্তু কাকলির কৃতিত্বকে কে অস্বীকার করবে? বন্দনা তাই চুপ করে রইল।

'তারপরে কত বড় বাপ। কত দেওয়া-থোওয়া করবে না জানি।' মৃণালিনী স্বপ্নের রামধনু দেখল।

মানেটা সেন্টু বুঝতে পেরেছে আন্দাজে। বললে, 'হ্যাঁ, বিয়ে করলেই অনেক পাওয়া যায় জিনিস। আমার জন্মদিন হয়ে গিয়েছে, এখন আছে শুধু বিয়ের দিন। কাকা বলেছে তার আর বেশি দেরি নেই। কাকারটা চুকে গেলেই আমারটা।'

বৈঠকখানার নিরিবিলিতে ভূপেনবাবুর কাছে কথাটা ভাঙল মৃণালিনী।

লেখার থেকে চোখ তোলবারও প্রয়োজন মনে করল না ভূপেন। বললে, 'বাবুর বেটা গাড়োয়ান, ও বিয়ে করবে কী!'

'কিন্তু সম্বন্ধটা তো ভালো।'

'এই সম্বন্ধ ভালো করতে গিয়েই ঘোরাঘুরিতে ফার্স্ট ক্লাসটা পেল না।'

'তিন নম্বরের জন্য মিস করেছে।'

'যারা পায় না দু-এক নম্বরের জন্যেই মিস করে।'

'কিন্তু রিসার্চ স্কলারশিপ তো পেয়েছে।'

'চাল নেই তার ভাতে ভাত। সামান্য দু শো টাকা আয়। তাও কত দিন?'

'কেন ও কি অক্ষম?' ঝামটা দিল মৃণালিনী : 'ও কি পাকাপোক্ত একটা চাকরি জোগাড় করতে পারবে না?'

'সেইটি বন্দোবস্ত করে সম্বন্ধের দিকে গেলেই তো বুদ্ধিমানের কাজ হত।'

'আজকালকার ছেলে অঘোরে-বিঘোরে কত কী কাণ্ড করে বসছে। বেজাত-বেহাত ধরে এনে ঘরে পুরছে। সেইদিক থেকে সুকু কত ভালো, কত সৎ। অসামাজিক কিছু করে নি, চায় নি করতে। ধর্ম-কর্ম বজায় রাখতে চেয়েছে। আর কত বড় বাপের মেয়ে। তুমি আর বুদ্ধির বড়াই করতে এসো না। তুমি হলে কেমন বউ আনতে, কেমন বউ এনেছ—' ভিতরের দিকে জ্বলন্ত চাউনি ছুঁড়তেই তক্ষুনি সংহরণ করলে মৃণালিনী। বললে, 'এ সম্বন্ধ খুব ভালো। এ সম্বন্ধই হবে।'

'বেশ তো, হবে।' এতক্ষণে চোখ তুলল ভূপেন : 'কিন্তু সম্বন্ধের প্রস্তাবটা আগে আসুক। মেয়েপক্ষ থেকে প্রস্তাবটা আগে আসবে তো। সামাজিক ব্যাপার, প্রথামত মেয়ের বাপ তো একটা চিঠি লিখবে অন্তত—'

'তা তো লিখবেই।'

'নয়তো বাড়িতে এসে মৌখিক বলবে। একটা সরকারি প্রস্তাব তো চাই।'

'তা চাই বৈকি।'

এ আবার আরেক ঝামেলা। আরেক কণ্টক।

এ লগ্নে বিয়ে বুঝি আর হল না। ক্ষণ গেলে ক্ষণ আসে, কিন্তু লগ্ন গেলে আর ফেরে কই।

তেরো

ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে এতক্ষণ ক্যারম খেলছিল কাকলি, এখন খেলা ফেলে রেখে, আবার এসে শুয়েছে তার খাটে। একটা উপন্যাস পড়ছিল, ভাবল সেটা আবার ধরবে কিনা। আলস্যে হাত বাড়াল সেদিকে। তক্ষুনি আবার হাতটা গুটিয়ে নিল। বইটার শেষ কী হবে তা যেন এখুনি, মাঝপথেই বোঝা যাচ্ছে। যদি শেষই বোঝা যায় তা হলে আর পথ চলে, জীবনের পৃষ্ঠা উলটিয়ে, সুখ কই?

মরবে তো একদিন। তা কে না জানে। কাল সূর্য উঠবে হয়তো, তারই মত অবধারিত। কিন্তু সে তো একটা অবস্থার শেষ, অস্তিত্বের শেষ কই? আধার ভেঙে গেল বলে কি আধেয়ও উড়ে গেল? প্রিয় চলে গেলে কি প্রেমও চলে যায়? অন্ধ হলে কি আর থাকেই না দৃষ্টিশক্তি?

দেহে, দিনে-রাত্রে প্রতি মুহূর্তে আমরা মরছি। সামর্থ্য ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কই, আকাঙ্ক্ষা তো ক্ষয় হচ্ছে না। ভাসতে-ভাসতে চরে এসে উঠছি, কিন্তু পার পাচ্ছি কই? মনে হচ্ছে মৃত্যুর পরেও আছে আরো পরিচ্ছেদ। আরো কামনা করবার সহর্ষ যন্ত্রণা। কিন্তু আরো যে আছে তার প্রমাণ কী! কাল সূর্য যে উঠবে তারই বা প্রমাণ কী। আর, সুকান্ত যে সুন্দর, বরণীয়, তাই বা আমি প্রমাণ করি কী দিয়ে?

মৃত্যুই যদি শেষ হয়, বেশ, হোক। কিন্তু কিসে মরব, কবে মরব, কোথায় মরব, স্থলে না জলে, স্ববাসে কি প্রবাসে, এ জানতে দিচ্ছে না। জানতে দিচ্ছে না বলেই জাগিয়ে রাখছে, বাঁচিয়ে রাখছে। শুধু ঋণ করে ঘি খাবার কথা বলেই সরে পড়তে চাইছে না। চার্বাক এখন একবার এলে পারে। মনে-মনে

হাসল কাকলি। মহাজনী আইন হয়ে যাবার পর এখন আর ঋণ কই? আর কায়ক্লেশে ঋণ যদি বা মেলে ঘি কই বাজারে? ঘৃতই তো মৃত। সে ঘি খেয়ে যাবজ্জীবন সুখে থাকা সুদূরের কথা। শুধু খাওয়া, খেতে পাওয়াই কি সমস্ত ? জীবনে নেই কি সে এক শাণিত আস্পৃহা যা কোনোদিন বারিত হয় না, বাহ্যত হয় না? সব খেয়ে-পেয়েও যে সমানে পায় নি বলে মাথা কোটে?

ধরবার নয়, তবু ধরবার জন্যে হাত বাড়ানো। বাঁধবার নয়, তবু বাঁধবার জন্যে বাজার থেকে দড়ি কেনা। জানবার নয়, তবু নিরালায় নগ্ন হৃদয়ের উপরে কান পাতা।

তাই বা মন্দ কী! মরণের ঘাটের দিকে যেতে-যেতে জীবনের গাছতলায় বসে এই একটু চড়ুইভাতি করে নেওয়া।

ভালোবাসা এলেই বুঝি মরণকে মনে পড়ে। ভালোবাসাই বুঝি সেই এক সুখ, একান্ত সুখ, যার পরে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুর অর্থই থাকতে নেই। সেই এক ডাক যা বুঝি মৃত্যুর মতই অন্ধকার।

'কি রে, শুয়ে আছিস কেন?' গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল।

'এমনি।'

'শরীর খারাপ?' সন্দিগ্ধ পায়ে গায়ত্রী কাছে এগুল।

'না।' বাহু দিয়েচোখ ঢাকল কাকলি।

'দেখ তো কী হল মেয়ের।' নিজের মনে বলছে না কাউকে সম্ভাষণ করছে দেখবার জন্যে কাকলি চোখ খুলল না। দিবারাত্র শুনছে, এখনো না হয় আরো কিছু বার হবে কানের পোকা। 'সব তাতেই অরুচি, সব তাতেই অনিচ্ছা। এম-এ টা খারাপ হয়েছে বলে এত কী মন খারাপ করা! ফেল তো আর করিস নি।'

'এম-এ এম-এ। থার্ড ক্লাস না কোন ক্লাস কে জানতে আসছে! এত যে সব ডক্টর-ফক্টর দেখি তাদের কে কোত্থেকে কীভাবে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কিনে-কেটে এনেছে কে খোঁজ নেয়! আর যারা গালভরা উপাধি ঝাড়ে? কাব্য বিনোদ না ভক্তিবিনোদ! কে জিজ্ঞেস করে, কে মশাই আপনাকে বিনোদ করল? কিংবা কাকে আপনি বিনোদ করলেন?'

নরনাথ—নরুকাকা এসেছে। বুঝতে পারল কাকলি। তার শোকটা যে কত ভয়াবহ তা বোঝাবার জন্যে আঁচলটা মুখের উপরে টেনে নিল। এ কালো মুখ কি কাউকে দেখানো চলে?

'বেশ তো, আরেক গ্রুপ নিয়ে পরীক্ষা দে।' গায়ত্রী বাগ-রাগ ভাব করে বললে, 'নইলে বি-টি তে গিয়ে ঢোক। 'ল' পড়বি বলে এত তড়পেছিলি তাতে গিয়ে ভর্তি হ।'

'না, না, ওসব ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই।' নরনাথও এগিয়ে এল খাটের দিকে : 'দেখছ না, ওর ভঙ্গিটা দেখছ না, ও এখন আরাম চায়। আলস্য চায়।'

'ও ওরকম মেয়ে নয়।'

'সব মেয়েই ওরকম।' পকেট হাটকে কি একটা বের করে সহসা গায়ত্রীর কাছে গিয়ে নরনাথ বললে, 'এই দেখ কী এনেছি। বলো কেমন দেখতে?'

সানন্দ কৌতূহলে চোখ বড় করল গায়ত্রী : 'কে এ?'

'আমাদের কোম্পানিতে নতুন জয়েন করেছে। স্টার্টিংয়েই পাঁচ শো টাকা। তারপর কোম্পানি থেকেই পাঠাবে 'ফরেনে'। বিয়ে করে একেবারে বউ নিয়ে যেতে পারবে।' ফোটোটা চশমার কাছে বাগিয়ে ধরল নরনাথ : 'কেমন স্মার্ট দেখেছ?'

কাকলি কি নড়ে-চড়ে উঠল? পাশ-ফেরানো মুখটা সোজা করল? মুখের আঁচল কি এল শিথিল হয়ে?

'স্মার্ট তো বটেই।' দূর থেকেই আরেকবার চোখ বুলোল গায়ত্রী : 'স্মার্ট না হলে সাহেব কোম্পানিতে নেবে কেন? বয়েসও তো বেশি নয়।'

'না, না, সাতাশ-আটাশ। সুন্দর মানাবে। খাসা। আইডিয়াল।' প্রায় স্বর্গে গলা তুলল নরনাথ।

'পাশ-টাশ কদ্দুর?' মায়ের প্রাণ তো, জিজ্ঞেস না করে পারল না গায়ত্রী।

'জাতে-গোত্রে যুগ্যি, নিটোল-নিটুট চাকরি, অল্প-বয়স, সুস্থ, সুদর্শন—আবার বাড়তি পালকে দরকার কী!' উড়িয়ে দিতে চাইল নরনাথ।

'তবু মেয়ে তো আমার এম-এ।'

'এম-এ দিয়ে তো ধুয়ে খাবে। ঐ কে এম-এ পাস, জহরলালকে বলেছিল দোকানদার পান্নালালের বড় ভাই, ভাবে-কে বলেছিল বাঙলা ভাবার প্রেজেন্ট টেন্‌স, আর হর্মোনকে বলেছিল—কী যেন বলেছিল রে?' কাকলিকে লক্ষ্য করল নরনাথ।

এ অবস্থায়, মেয়ের সামনে গুরুজনদের মধ্যে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধের কথা উঠলে, মেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়, হ্যাংলার মত বসে থাকে না। আর যদি কিছু শোনবার লালসাও হয়, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে উল বুনতে-বুনতে আড়ি পাতে। কিন্তু নরুকাকা কী অদ্ভুত ভালো, প্রায় ঈশ্বরপ্রেরিত। কেমন সুন্দর বিয়ের কথা নিয়ে এসেছে। বাড়িতে একটা বিয়ের কথা উঠুক এই এতদিন চাইছিল কাকলি। তারই জন্যে ভাবে-অভাবে আবহাওয়া তৈরি করে চলেছিল। এরা সব ভাবছিল শূন্যতার কথা। পূর্ণতার খবর নিয়ে এই প্রথম এল নরুকাকা। প্রসঙ্গটা উঠলেই তো তবে আসঙ্গের কথাটা বলা যায়।

খুশিতে ঝলমল করতে-করতে উঠে বসল কাকলি। বললে, 'হর্মোনকে বলেছিল হার্মোনিয়ামের আবিষ্কর্তা।'

'দেখলে তো বউদি, কেমন বেজে উঠল হার্মোনিয়ম। সবগুলো দাঁত দেখা গেল, তাই না?' কাকলির দিকে তাকাল নরনাথ : 'একসঙ্গে সবগুলো রিড!'

অগত্যা গম্ভীর হল কাকলি। উপায় নেই, বইটা তুলে নিতে হল। অপেক্ষা করে রইল।

'জানি বাজবেই, উঠবেই বেজে। যখন যেমন গান—'

'কিন্তু কতদূর পাস-টাশ করেছে বললে না তো—' গায়ত্রী বাকিটুকুর জন্যে উসখুস করতে লাগল।

'ক পাস নয়, ধ—পাস।' কাকলি টিপ্পনী না কেটে পারল না।

হাসল নরনাথ। গায়ত্রীকে বললে, 'তোমার শিক্ষার খবরে দরকার কী। তুমি মা, তুমি শুধু বিত্ত দেখবে। ছেলের মাইনে ভালো, উন্নতি যতদূর চোখ যায়। আফিসের গাড়ি পাবে, আর যা আফিসের তাই গৃহের, গৃহ মানেই গৃহিণীর, মানে স্ত্রীর,—আর স্ত্রীর হলেই শাশুড়ির। বাড়ি আছে দর্জিপাড়ায়, আর যা চাকরি বাগিয়েছে, বুঝতেই পারছ, মুরুব্বির জোর কত। আজকাল যার মুরুব্বি তারই মোরব্বা।'

'তবু শিক্ষা-দীক্ষার কথাটা জানতে হয়।' গায়ত্রী বললে, 'আর তা জানবার মাপকাঠিই হচ্ছে কী পাস, ক'টা—'

বইয়ে মুখ ঢাকল কাকলি। শুধু দুরন্ত দুটি চোখ বাইরে রেখে বললে, 'শুধু এপাশ ওপাশই করেছে বোধ হয়—'

'তুই মেয়ে, তোর ও খোঁজে কী দরকার? তুই শুধু রূপ দেখবি।' পকেট থেকে ফোটোটা ফের বার করল নরনাথ : 'দেখবি? দ্যাখ না। দেখতে কী দোষ!'

কাকলি মুখ ফিরিয়ে নিল। বললে, 'বিদ্যা ছাড়া বুঝি রূপ হয়? আর যে পুরুষ বিয়ের অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে নিজের ফোটো এনক্লোজ করে দেয় সে যে কতখানি শিক্ষিত তা আর বলতে হবে না।'

'মোটেই তা নয়। আবেদনটা আমাদের, আর আমরা এনক্লোজ না করে ডিসক্লোজ করব, তাই উনি দেখতে আসবেন স্বচক্ষে। কে উনি আসছেন তারই পূর্বাভাসের জন্যে এই ছবিটা তার অ্যালবাম থেকে তুলে এনেছি। দিতে কী চায়! অনেক পিড়াপিড়ি ধস্তাধস্তির পর দিল। সিনিয়র অফিসার, আমাকে কি আর চটাতে পারে! বললাম, কে তুমি যাচ্ছ তাদের একটা আইডিয়া তো দিতে হয়। অন্তত, অন দি ফেস অফ ইট, তুমি যে প্রত্যাখ্যেয় নও, বরং তুমি যে নির্বাচনের, নিমন্ত্রণের, এ সম্বন্ধে তো তাদের নিঃসংশয় হওয়া চাই। ফাইন্যালের আগে একটা হিট হতে দোষ কী। ঘটনা তার ছায়া ফেলে শোনো নি? এও ঘটনার আগে একটু ছায়া দেখানো। কই, দাদা কই, কেমন আছেন?' অন্য ঘরের দিকে পা বাড়াল নরনাথ।

মহাভারতের এখনো অনেক পর্বই বাকি, গায়ত্রী পিছু নিল। কাকলি আবার শুল। উপরের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

কতক্ষণ পরে ব্যস্ত পায়ে ছুটে এল গায়ত্রী। ঘনিষ্ঠ ষড়যন্ত্রীর সুরে বললে, 'শুনেছিস, শুধু মুরুব্বির জোরেই চাকরি পায় নি, ছেলের গুণ আছে।'

মায়ের ভর-ভর মুখের দিকে তাকাল কাকলি, কোনো কথা বলল না।

'ছেলে এম-কম, তার উপর আবার 'ল' পাশ। শুধু নুনেই কি হয়, স্বাদের জন্যে মিষ্টিও লাগে।' ডগমগ হয়ে বলল গায়ত্রী, 'ছেলের নিজের মিষ্টি আর মুরুব্বিদের তদবিরের নুন। চৌকস ছেলে। এখন আমাদের অদৃষ্ট। তা ছেলের চোখে নরুঠাকুরপো মধুর ছিটে দিয়ে দিয়েছে—তবু একবার দেখুক, দেখে যাক—'

'আমাকে দেখবে?' আঁতকে উঠল কাকলি।

'আহা, এ কি সেই সরাসরি দেখা, না চুল খুলে পিঠ দেখিয়ে দাঁড়ানো? সে একটা ডিসেন্ট কিছু হবেই। ঠাকুরপো যখন আছে তখন আর ভাবতে হবে না। কিন্তু কী আশ্চর্য,' গায়ত্রী আবার ছুটল ব্যস্ত পায়ে : 'ছেলের নামটাই তো জানা হয় নি। যখন সব ভালো, নামটাই বা না কোন ভালো হবে। আর নামে কী আসে যায়—'

'লেখক তো নয়, যে নাম চলল না বলে বইও চলল না—'

'আর আজকাল তো আফিসে-বাজারে উপাধি ধরে ডাকার রেওয়াজ—চক্রবর্তী না দাশগুপ্ত—' চলে গেল গায়ত্রী।

কতক্ষণ পরে বেরিয়ে এল নরনাথ। পিছনে বনবিহারী। ঘর থেকে বাইরে, সিঁড়ির মুখে বারান্দার কাছে সবাইকে দেখতে পাচ্ছে কাকলি। কী আশ্চর্য, লাঠি ছাড়াই বাবা হাঁটতে পাচ্ছেন। তাঁর পায়ের ব্যথাটা হঠাৎ কম বলে মনে করছেন। যেন কী একটা কাঁটা ফুটে ছিল, খসে গিয়েছে। মুখে আর সেই ভার-ভার অবসাদের ভাব নেই। আর মা তো মুহূর্তে বয়স অনেক কমিয়ে ফেলেছেন। হালকা হয়ে গিয়েছেন।

বাঁ হাতের তালুর উপরে ডান হাতের কিল মেরে নরনাথ বললে, 'এ সম্বন্ধ হবেই। আমি জানি আমার কথা ও ফেলতে পারবে না।'

মেয়ের জন্যে অগাধ মমতা, তাই বুঝি নৈরাশ্যকেও হিসেবের মধ্যে রাখছেন বনবিহারী। বললেন, 'এখন পছন্দ হলে হয়!'

'পছন্দ হবে না কী!' নরনাথ চশমার কাঁচ মুছতে লাগল : 'এমন মেয়ে ক'টা পাবে কলকাতায়? যদি ঝাপসা কিছু দেখে, তা মেয়ের দোষ নয়, ওর চোখের দোষ। তাই ঠিক পাওয়ারের চশমা পরিয়ে নিয়ে আসব।'

'কিন্তু মেয়ে আমার গৃহস্থ টাইপ—' বনবিহারী আবার মমতা ঝরালেন।

'আর উনিই বা কোন গৃহহীন। যেমন সাজাবে তেমনি সাজবে। বউ সাজালে বউ, বিবি সাজালে বিবি। মেয়েদের কি, ছন্দ ধরে থাকলেই পছন্দ। হয় শ্বেতপাথরের গ্লাস নয়তো ডিকেন্টার। যা বলো। চীনেমাটির প্লেট নয় কলাপাতা—'

'আমার ভয় হচ্ছে, বেশি কিছু দাবি-দাওয়া না করে বসে।' গায়ত্রী মুখ শুকনো করল।

'দাবি-দাওয়া না হাতি। দিলে দেবে, না দিলে না দেবে—যা তোমাদের সাধ।'

'না, না, দেব।' বললেন বনবিহারী, 'কাকলির জন্যে আলাদা টাকা রেখেছি।'

'তবে সেই কথাই রইল।' নরনাথ গায়ত্রীকে মনে করিয়ে দিল —'আগামী শনিবার দুপুর দুটোয় এসে আমি তোমাকে আর কাকলিকে নিয়ে যাব। ইন্দিরাও যাবে।'

'ও পক্ষে?'

'ছেলে, তার দিদি আর ভগ্নীপতি। মা তো নেইই বলেছি—'

'ছোট বোনটোন?'

'যদ্দুর জানি, তাও নেই।'

আরো হালকা হল গায়ত্রী। শাশুড়ি থাকবে না, অঙ্গনে নেমেই ষোলো আনা কর্ত্রী হতে পারবে, আর ননদ-ফনদের বিয়ের জন্যে টাকা জমাতে হবে না মাস-মাস, কত বড় উপশম সংসারে। চোখে ইঙ্গিত পুরে গায়ত্রী তাকাল নরনাথের দিকে। ববলে, 'কাকলিকে ভালো করে বলে যাও।'

বনবিহারী টলতে-টলতে আরো কয়েক পা এগিয়ে এলেন। বললেন, 'ফাংশনটা কী?'

'দেখি কী দাঁড়ায়! হয় কোনো হোটেলে চা, নয় গঙ্গার পারে কোথাও পিকনিক। ডিটেলস পরে জানাব। হ্যাঁ, কী জানি কথাটা? খবরের কাগজে বিশেষণ হিসেবে খুব চলে। হ্যাঁ, মনোজ্ঞ—ব্যাপারটা যতদূর মনোজ্ঞ করা যায়—'

ভয়ানক কথা, হাসলেন বনবিহারী। 'আজ মঙ্গলবার—' গুনলেন হয়তো শনিবারের দেরি কত।

নামবার আগে নরনাথ ঢুকল কাকলির ঘরে। নিমন্ত্রণের বিষয়টা বিশদ করতে চাইল।

হার্মোনিয়ামের সমস্তগুলি রিড খুলে বেজে উঠল কাকলি : 'কিন্তু চা যেন হাই-টি হয় নরুকাকা। বেশ হেভি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হবে—'

এবার কাকলি নীরবে হাসল। প্রায় আধ্যাত্মিক হাসি। এ হাসিই বলে, প্রভু, এদের তুমি ক্ষমা কর। এরা জানে না এরা কী করছে।

গায়ত্রী নরনাথকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। বনবিহারী অসাহায্যে হেঁটে-হেঁটে চলে গেলেন নিজের ঘরে।

গায়ত্রী এল কাকলির কাছে। কতদিন তার স্বাস্থ্য-লাবণ্যের সরজমিন তদন্ত করেনি ভেবে অনুতাপ হল। মাথাভরা কত সুন্দর চুল ছিল, অযত্নে-আলস্যে উঠে যেতে বসেছে। চুলগুলি দু হাতে তুলে নিয়ে আদরে তেল মাখিয়ে দিতে লাগল গায়ত্রী।

কাকলি ডাকল : 'মা।'

কি রকম অদ্ভুত লাগল গায়ত্রীর। কী কথা আছে সরলভাবে সরাসরি বলেই ফেল না। সম্বোধন করবার কী দরকার। বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

ডেকেছিস তো কথা বলছিস না কেন?

'মা!'

'কী?'

গায়ত্রী পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখ দেখা যাচ্ছে না এই যা শান্তি। বললে কাকলি, 'নরুকাকাকে বলে দাও শনিবারের ফাংশন বন্ধ করে দিক।'

'কেন?' গায়ত্রীর দু-হাতে কাকলির চুল অচল হয়ে রইল।

'ওখানে হবে না।'

'কী হবে না?'

'ঢাক-ঢাক-গুড়-গুড়ে লাভ নেই, স্পষ্ট কণ্ঠেই বললে কাকলি, 'বিয়ে।'

গায়ত্রী ভাবল, প্রত্যেক চাকরির উমেদারই যেমন সন্দেহ করে, তার বৈগুণ্য বেশি, সম্ভাবনা কম, তেমনি একটা অলস সন্দেহই কাকলিকে আচ্ছন্ন করে বসেছে। প্রত্যেক পরীক্ষার আগে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর যেমন হয়।

'তা না হোক। তার জন্যে দেখাতে বা দেখে আসতে দোষ কী! না হয় তা ঠাকুরপো বুঝবে। আমাদের মাথা ঘামাবার কী দরকার!'

'কথাটার মানে তা নয়।'

'তা নয় মানে?'

'তা নয় মানে,' একটুও ঢোক গিলল না কাকলি, 'আমার বিয়ে অন্যত্র ঠিক হয়ে আছে।'

গায়ত্রীর হাত থেকে চুলের গোছা আলগোছে খসে পড়ল। বিবর্ণ স্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল : 'কী হয়ে আছে?'

'ঠিক হয়ে আছে। মানে স্থির হয়ে আছে।'

'এখনো হয় নি তো'? সমস্ত শরীর যেন কাঁপছে গায়ত্রীর।

'না, হয় নি।'

'তবে জেনে রাখো, আর হবে না।' চুলের গোছা আবার তুলে নিল গায়ত্রী।

সুকান্ত যা বলেছিল তাই করলেই ভালো হত। এত কথা কইতে-সইতে হত না। সোজাসুজি বলে দিলেই হত, হয়ে গিয়েছে, চুকে-বুকে গিয়েছে—এই দেখ সরকারি দলিল। সিলমোহর মারা। এ আর নাকচ হবার নয়। আমি নাবালক নই, আইনের কোনো বাধা-নিষেধের মধ্যে আমরা পড়ি না। এখন পারো তো ভোজ ডাকো।

'কেন হবে না?' কাকলি ঘাড় ফেরাল মা'র দিকে।

'না, হবে না।' গায়ত্রী চুল ধরে টান মারল সজোরে : 'আমরা যাকে মনোনীত করব তাকেই তোমার নিতে হবে।'

'তবে এতদিন কর নি কেন? দাও নি কেন গছিয়ে? সাবালক করে, সাবালকের স্বাধীনতা দিয়ে এখন কেন আর তর্জনগর্জন করবে?'

'এক শো বার করব।' চুলের উপর আবার হামলা চালাল গায়ত্রী : 'কিন্তু জিজ্ঞেস করি কাকে তোর নির্বাচন?'

'তোমরা তাকে চেনো।'

বুকের ভিতর যেন তীর ছুঁড়ে মারল গায়ত্রীর। 'সেই জুতোকান্ত ভেড়াকান্ত ছেলেটা?'

'না।'

'সুকান্ত না?'

'হ্যাঁ, সুকান্ত।'

'ঐ ওয়ার্থলেস অপদার্থ অকর্মণ্য ছেলেটা? ফাজিল ফক্কড় বাউন্ডুলে লোফার—' বিশেষণ খুঁজে পাচ্ছে না গায়ত্রী।

'মৃগাঙ্কশেখর শিবকেও সকলে ঐ কথা বলত। সুকান্ত একটা সুস্থ-সবল চাকরি পেয়ে গেলেই এসব বিশেষণ বিপরীত মূর্তি ধরবে।'

'এখনো পায়নি তো।' দাঁতে দাঁত লাগল গায়ত্রীর : 'শুনেছিলাম কী জেল্লাদার ছেলে—ব্রিলিয়্যান্ট—কই, ফার্স্ট ক্লাস তো জুটল না—'

'না জুটুক। সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়েছে। পরে ডক্টরেট পাবে। পরে নির্ঘাত প্রোফেসরি। এমন কী অসার জিজ্ঞেস করি!'

'কিন্তু যে পাত্র নরু-ঠাকুরপো এনেছে —'

'সে ফুটো পাত্র, মা।' চুলের উপর অত্যাচার অসহ্য হবে জেনেও কিছুতেই না বলে পারল না কাকলি।

'চুপ কর। কিসে আর কিসে, তামায় আর সিসে। চাঁদের কাছে জোনাকি!' চুল ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ল গায়ত্রী। শাসনের সুরে বললে, 'তোকে বলে রাখছি, সুকান্ত-ফুকান্ত কিছুতেই চলবে না, না, চলবে না,—চলবে না—'

'তুমি যে প্রায় রাস্তার আওয়াজ তুললে।' কাকলি বললে পিছন থেকে, একটু বা রূঢ়স্বরে : 'আমারও একটা উলটো আওয়াজ ছিল। অমার দাবি মানতে হবে। দুটো আসলে একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। যা চলবে না তাই হবে, যা হবে তাই চলবে না—' কাকলিও উঠে পড়ল।

ভেবেছিল মা বুঝি সটান বাবার কাছে গিয়ে পড়বেন; না, অন্য দিকে গেলেন। বোধ হয় এখনো নিচ্ছেন না মোটা করে। কিংবা কে জানে, হয়তো শনিবারের অপেক্ষা করছেন।

শনিবারের সকালে বেরুচ্ছে, নিচে, পথ আটকাল গায়ত্রী।

'সাত সকালে চলেছিস কোথায়?'

'নরুকাকার বাড়ি।' কাকলি এক পা দাঁড়াল।

'সেখানে কী?'

'নরুকাকাকে বলতে আজকের দুপুরের ফাংশনটা যেন বাতিল করে দেয়।' বলতেই-বলতেই বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

'কাকলি!' রাস্তায় আর্তনাদ ছুঁড়ে মারল গায়ত্রী, একটা কণিকাও কাকলিকে স্পর্শ করল না।

তখন গায়ত্রী দ্রুত পায়ে চলে এল বনবিহারীর কাছে। বললে ইতিবৃত্ত। নদীতে বান ছিল, এবার তুফান উঠল।

চুপি চুপি পায়ে পরদা সরিয়ে নরনাথের ঘরে এসে ঢুকল কাকলি। বাবার মামাতো ভাই এই নরুকাকা। সাহেবি ফার্মের বড়বাবু। সবচেয়ে বড় পরিচয়, মেজাজ সাহেবি নয়, ছোট-বড় সকলের সঙ্গে মেশেন সমান হয়ে, সকলের ভালো দেখেন, ভালো করে বেড়ান।

'কি রে, ফাংশনের গন্ধে একেবারে ভোরে উঠেছিস, ভোরে ছুটেছিস?' আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল নরনাথ : 'দাঁড়া, সকলকে, তোর কাকিমাকে ডাকি—'

'কাউকে ডাকতে হবে না।' স্বর স্তিমিত করল কাকলি : 'তোমার সঙ্গে গোপনে জরুরি কথা আছে আমার।'

'কি রে, কী কথা?' নরনাথও স্বর নিয়ে এল ধূসরে : 'বোস। এই কাছের চেয়ারটায় বোস।'

'আজকের দুপুরের ফাংশনটা বন্ধ করে দিতে হবে।'

'কেন বল তো? শরীর খারাপ? নয় তো অন্য কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট?'

'না, ওসব কিছু না।'

'তবে?'

'ওখানে আমার বিয়ে হবে না।' চোখ নামাল কাকলি।

'তবে কোথায় হবে?'

'আমার জায়গা ঠিক করা আছে।'

'ঠিক করা আছে! ভালোবাসার জায়গা?'

'হ্যাঁ—' দুরু-দুরু ভয়ে মৃদু-মৃদু তাকাল কাকলি।

'তবে আর কথা কী! ভালোবাসার কাছে কিসের ফাংশন কিসের স্যাংশন! কিসের কভেনেন্টেড অফিসর! চুক্তি নেই যুক্তি নেই, হিসেবের অঙ্ক কষা নেই। এ তো খুব ভালো কথা রে, সুখের কথা। ক'জনের ভাগ্যে জোটে এই আশীর্বাদ! ফাংশন বন্ধ হয়ে যাবে বৈকি, এক ফুঁয়ে বাতিল হয়ে যাবে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নরনাথ : 'সকলকে ডাকি। সুখের সংবাদটা চাউর করে দি—'

'না, না, এখন নয়।' ভিতরের দরজা বন্ধ করল কাকলি : 'আগে বিয়েটা ঘটিয়ে দাও, তারপর—'

কাকলি বাড়ি ফিরল প্রায় দুপুরের গা ঘেঁষে। সে বাড়ি এসেছে শুনতে পেয়েই বনবিহারী তুমুল হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। ডাকো তাকে।

নীরবে কাকলি বনবিহারীর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

'তুই কোন ছোঁড়াটাকে বিয়ে করতে চাস?'

কাকলি চুপ করে রইল।

'সেই যে ইডিয়টটা কদম ফুল দেখে নি, তাকে?'

কাকলি কথা কইল না।

'কদম ফুল মানে কে ড্যাম ফুল—সেই নিনকোমপুপটাকে?'

কাকলি চলে গেল আস্তে আস্তে।

চোদ্দো

এতক্ষণ গর্জন গেছে, এখন বর্ষণ শুরু হল। রাগের পরে দুঃখের সুর ধরলেন বনবিহারী।

'ভেবেছিলাম তোমাকে দিয়ে আমার মুখ উজ্জ্বল হবে—'

কাছেই একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে কাকলি। ভাগ্যিস চেয়ারে হাতল ছিল তাই তার উপরে রাখতে পেরেছে কনুই, আর সেই সূত্রে করতলে রাখতে পেরেছে চিবুক। সমস্ত ভঙ্গিতে আনতে পেরেছে বাধ্যতা ও নম্রতার লাবণ্য।

'বড় ছেলে দেবনাথ, তোমার দাদা, অমানুষ হয়ে গেল।' কতকটা বা আত্মগত হলেন বনবিহারী : 'ছেলেবেলায় কী যে এক অসুখ করল, ব্রেন নষ্ট হয়ে গেল। কিছুতেই কিছু করতে পারলাম না। সামান্য ম্যাট্রিকটাই পারলাম না পাস করাতে। মাস্টারে-ডাক্তারে কম ঢাললাম না, সব ভস্মে ঘি হল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু থামলেন বনবিহারী। যেমনি বসে ছিল তেমনি বিরলে-বিরসে বসে রইল কাকলি।

'বোকা হয়েছিস তো বোকা হয়ে থাক। মাথাখারাপ তো থাক ঘরের কোণে বন্দী হয়ে। কিন্তু তুই বদ হতে যাস কোন সুবাদে? আবার হতাশার সুর ধরলেন বনবিহারী : 'মিশল গিয়ে কিনা গুণ্ডার দলে। কত কিছু ধরবে-করবে বলে কত-কত টাকা নিয়েছে আগে-আগে—পরে আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে আমার নাম করে নিয়েছে ধার, আমার দুর্নাম করে ভিক্ষে—শেষে, শেষকালে শুরু করল বাক্স ভাঙতে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হল, দেবনাথ যদিও আমার ছেলে, ওকে যেন কেউ ধার না দেয়, ভিক্ষে না দেয়, এমন-কি বাড়িতে ঢুকতে না দেয়—' আবার থামলেন, সশব্দে নিশ্বাস ফেললেন বনবিহারী। বললেন, 'যখন বিজ্ঞাপনটা দেখলাম কাগজে, মনে হল কালো কালির কাগজে ঐ বিজ্ঞাপনটাই শুধু লাল কালিতে ছাপা হয়েছে। লজ্জার লাল কালি।'

'দাদার সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থাটাই ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে।' মুখ তুলল কাকলি।

'আগাগোড়াই ভুল। শুধু দেবনাথের সম্পর্কে নয়, তোমার সম্পর্কেও।'

'দাদার কথা উঠেছে, দাদার কথাই হোক। কী হয়েছে ওর বেলায়?' বনবিহারীর মুখের দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকাল কাকলি : 'তুমি বারে-বারে তাকে সদর দরজা দিয়ে বার করে দিয়েছ আর মা তাকে বারে-বারে খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকিয়েছে। তুমি ওকে জেলে পাঠাতে চেয়েছ আর মা ওর হয়ে দিয়ে দিয়েছে জরিমানা।'

'তেমনিধারা তোমাকে যখন এ বাড়ির বার করে দেব তখন', চোখ বুজলেন বনবিহারী : 'কে জানে, তোমার মা-ই হয়তো আবার তোমাকে টেনে নেবেন কোলের মধ্যে।'

'কক্ষনো না।' পাশের বারান্দায় কাকে চিঠি লিখছিল গায়ত্রী, চোখ আর হাত কাগজে কিন্তু মন আর কান ঘরের মধ্যে, সহসা ঝংকার করে উঠল : 'কক্ষনো না যদি সুকান্তকে ও বিয়ে করে। তখন একবার যে ও যাবে চিরদিনের মত যাবে।'

কথাটা গায়ে মাখল না কাকলি। আগের খেই ধরে বললে, 'দাদার সম্পর্কে আমাদের কোনো সুস্থ চিন্তা ছিল না। একটা সৎ সস্নেহ পরিবেশে ওকে কিছু একটা আমরা গড়ে তোলবার সুযোগ দিই নি। কেবল এক দিকে তাড়ন আর পীড়ন, আরেক দিকে প্রশ্রয় আর ক্ষমা। অমানুষের অ-টা আর ঘোচাতে পারল না। আমরাই দিলাম না ঘোচাতে।'

'তাই তো তোমার উপরে নির্ভর। দেবনাথের পরেই তুমি, তুমিই বাড়ির দ্বিতীয়। তোমাকে তাই উচ্চ শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি বড় হবে, সংসারকে শ্রীমন্ত করবে। ফেরাবে দেবনাথকে। তোমার ছোট ভাইবোনগুলির কাছে আদর্শস্থানীয় হয়ে থাকবে। আমি জাঁক করে বেড়াব। ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকব না। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তাকাব চারদিকে।'

কষ্টে হাসল কাকলি। চোখ নামিয়ে বললে, 'আমি মেয়ে। আমার কী সাধ্য!'

'তোমার সাধ্য নয়? মেয়ে—মেয়েরা আজকাল কী না করছে! সমুদ্র পেরোচ্ছে, পাহাড় ডিঙোচ্ছে, মরুভূমি পার হয়ে যাচ্ছে পায়ে হেঁটে—' বনবিহারী পিঠ খাড়া করলেন।

'সবাই-কি সব কিছু করতে পারে? হতে পারে? সকলে কি হতে পারে ঝাঁসির রানী? মীরাবাঈ?'

'তোমার জীবনে কোনো উচ্চাশা ছিল না?'

'উচ্চাশা!' কষ্টে আবার হাসল কাকলি : 'তোমাদেরই বা কী ছিল আমাকে দিয়ে! মধ্যবিত্ত ঘরের সামান্য এম-এ পাস মেয়ে—কী তার ক্ষমতা! বড় জোর একটা টিচারি নয়তো মুরুব্বির জোর থাকলে কোনো আফিসে ক্লার্ক, বা শুদ্ধ করে বলতে গেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট। একটা সাধারণ মেয়ের পক্ষে এর বেশি আর কি। এর বেশি ভাবতে গেলেই উপন্যাস, আকাশকুসুম।' একটু সাহস নেবার জন্যে বাইরের গাছ, আকাশ, বাড়িঘর, লোকজনের দিকে তাকাল কাকলি। বললে, 'তা ছাড়া মেয়েরা রয়েছে পরের ঘরে চলে যাবার জন্যে, তাদের ভায়ের ঘরকে শ্রীমন্ত করবার জন্যে নয়।'

'তাই, সেই পরের ঘরেই তোকে আমি পাঠাতুম নিজের হাতে।' বনবিহারী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন : 'তুই সাধারণ হয়েই থাকতিস। সব দেশ ঘুরে তোর জন্যে আমি অসাধারণ বর নিয়ে আসতুম। রাজরাজেশ্বর বর। সবাই চোখ উঁচু করে তাকাত। আমার ছাদ ভরে প্যান্ডেল উঠত। আলোয় আলোময় হয়ে যেত বাড়িঘর, নবত বসত, থেকে-থেকে সানাই বাজত দিন-রাত। পাড়ার লোকেরা জিজ্ঞেস করত, কী হচ্ছে এ বাড়িতে? রিটায়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এম-এ পাশ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। বর কে? সে কোন এক কৃতকৃত্য—দেখবি চল। চারদিকে পড়ে যাবে ঠেলাঠেলি। দেখতে যেমন সুপুরুষ, তেমনি স্বাস্থ্যে-শীলে বিত্তে-বিদ্যায় অগ্রগণ্য। যেসব আত্মীয় দেবনাথের বেলায় ঘৃণায় নাক কুঁচকে ছিল এবার তারা হিংসেয় নাক ফোলাবে। তুই তোর বাপকে তা উপভোগ করতে দিবি নে? এবারও তারা নাক সরু করে চলে যাবে? ছেলে মানুষ হয়েছে, মেয়েকে সৎপাত্রস্থ করেছি এইটুকু ছাড়া আর অমাদের কী মান আছে? আমার এই মধ্যবিত্ত মানটুকু তুই রাখবি নে? আমার মুখ উজ্জ্বল করবি নে?'

কতক্ষণ কথা কইতে পারল না কাকলি। তার দু চোখ ছলছল করে উঠল। শান্ত সিক্ত স্বরে বললে, 'আমার মুখ উজ্জ্বল হলেই কি তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে না বাবা?' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, বারান্দা এড়িয়ে চলল আরেক দিকে।

'শোন—' হুঙ্কার ছাড়লেন বনবিহারী : 'শুনে যা—'

অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাকলি।

'শোন। তবু যদি তুই ঐ অপদার্থটাকে বিয়ে করিস তবে জানবি আমাদের সঙ্গে তোর আর সম্পর্ক থাকবে না, আর, কোনো দিন পথ ভুলেও আসবি না এ বাড়িতে। কি, মনে থাকবে?'

কাকলিকে দেখা গেল না। শোনা গেল না হাঁ-না কোনো শব্দ।

'ঠাকুরপোকে ডাকো।' ঘরের মধ্যে চলে এল গায়ত্রী।

কলিং বেল আর কোথায়, ইজিচেয়ারের হাতলে হাতের চড় মারলেন বনবিহারী। সংক্ষেপে ব্যেরা বলে আর ডাকতে পারেন না এ যন্ত্রণা চোখে মুখে ফুটে উঠল, সঙ্গে চাকরের নামটা মনে না আনতে পারার যন্ত্রণা। বললেন, 'কি, কী না জানি নাম তোমার চাকরের।'

'ওকে নয়, বিজনকে পাঠাচ্ছি।'

তড়িঘড়ি চলে এল নরনাথ। ব্যাপার কী?

'আমার একতলাটার জন্যে ভাড়াটে দেখ।' মুখের উপর প্রায় ছুঁড়ে মারলেন বনবিহারী।

'সে কি?' নরনাথ থমকে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, একতলাটা ভাড়া দেব। আরো একজন সরেছে। এত জায়গা দিয়ে আমাদের কী হবে? উপরে যা আছে তাতেই কুলিয়ে যাব আমরা।'

'নিচেটা ভাড়া দেবেন বলে তো এ বাড়ি তৈরি হয় নি—' কী-একটা হেঁয়ালির মধ্যে পড়ল নরনাথ, এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

'তখন হয় নি, এখন হবে। একজন কনট্র্যাকটার ডাকো। তার আগেই ভাড়াটে দরকার। ভাড়াটে এসে গেলেই এ বাড়িতে হ্যাঙ্গাম-হুজ্জুত হতে পারবে না। তারা নির্ঘাত ঠেকাবে। বলবে, নতুন ঢুকেছি, ছাড়তে পারব না ঘর।'

'কী ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।' নরনাথ মুখ-চোখ হতাশ করল : 'কে সরল? কেনই বা হ্যাঙ্গাম-হুজ্জুতের ভয়?'

'কাকলির কথা শুনেছ?'

'শুনেছি। বিয়ে করতে চায়। সে তো খুব ভালো কথা।' সুস্থ হয়ে এতক্ষণে বসল নরনাথ।

'ভালো কথা! কাকে চায় তা শুনেছ?'

'শুনেছি।'

'ও কি একটা পাত্র?'

হাসল নরনাথ। বললে, 'এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত ইররেলেভেন্ট, অবান্তর। হয়তো বা আমাদের একতিয়ার, জুরিসডিকশানই নেই।'

'নেই? না, আছে।' ইজিচেয়ারের হাতলটা মুঠি করে ধরলেন বনবিহারী : 'গায়ের জোরের কাছে আবার আইন কী! তুমি যে করে পারো এ বিয়ে ঠেকাও। কিছুতেই হতে দিও না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল নরনাথ। পরে বললে, 'কেন, হতে দেব না কেন? হতে দিলে দোষ কী। কোথায় বাধছে? কোথাও না। না ধর্মে, না সমাজে, না কোনো আচারে-বিচারে।'

'সেন্টিমেন্টে।' মুঠো করা ডান হাতটা কাঁপতে লাগল বনবিহারীর।

'আইনের কাছে সেন্টিমেন্টের দাম কী!' পায়ের উপর পা তুলে ভঙ্গিটা শিথিল করল নরনাথ : 'আপনি মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, সাবালক হবার সুযোগ দিয়েছেন, আর আইন তাকে তার গণ্ডির মধ্যে যাকে খুশি বিয়ে করার অধিকার দিয়েছে। যা বেআইনী নয় তাকে আপনি বাধা দেবেন কী করে? আর বাধা দেওয়ার মধ্যে নীতিই বা কোথায়? ওরা ইচ্ছে করলে আইনমত রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করে এসে বলতে পারত, অনুপায়, এক নিশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ করে এসেছি, তখন কী করতে পারতেন? আর এখনও যত বাধাই দিই ওদের রেজেস্ট্রি আটকাতে পারি এমন আমাদের কেস নেই। সুতরাং যার বোঝা সে বুঝবে। যার নির্বাচন সে জানবে কেমন মন্ত্রী এনে বসিয়েছে গদিতে। আমাদের কথা এখানে বিকোবে না। পাঁঠার কথায় ঝোল রান্না হয় না কোনো দিন।'

'কিন্তু পাত্র—লোকে যখন জিজ্ঞেস করবে, পাত্র কে, বলতে পারবে, একটা কে ড্যাম ফুল, সমবয়সী এক কলেজের ছাত্র, বেকার—ছি, ছি, ছি!'

'বাঃ, পাত্র এমন খাস্ত কী! নিদেন একটা লেকচারার তো হবেই—'

'তা হওয়ার পর করলেই হত। এত হন্তদন্ত হবার কী হয়েছিল?'

এখানে নরনাথের একটা ব্রেন-ওয়েভ—মস্তিষ্ক-তরঙ্গ—এল। সব সংক্ষেপ করে দেওয়া দরকার। অনিবার্য করে দেওয়া দরকার। এত কলহ-কোলাহলের দরকার কী! বিয়েই তো করতে চাইছে—আর কিছু তো নয়। সবচেয়ে যা সভ্য, সবচেয়ে যা শাস্ত্রীয়। আর বিয়েই তো সব রাখে, সব ঢাকে, সব সংশোধন করে, তবে আর কী ভাবনা।

'হ্যাঁ, এই তাড়াতাড়িটাই জানি কি রকম!' গাল চুলকোল নরনাথ : 'মনে হচ্ছে কোথায় ডিফিকালটি আছে—'

'ডিফিকালটি আছে!' ইঙ্গিতটা যেন অনায়াসেই বুঝতে পারলেন বনবিহারী। খাড়া পিঠ এলিয়ে দিলেন ইজিচেয়ারে। সাদা শূন্য দৃষ্টি মেলে বললেন, 'তাই!'

'হ্যাঁ, আর গত্যন্তর নেই।' তোলা পা মেঝের উপর নামিয়ে আনল নরনাথ : 'তা, পাঁঠা যখন রান্নাই হচ্ছে তখন তাকে ঘাড়ের দিকেই কাটুক বা লেজের দিকেই কাটুক কিছু এসে যায় না।' কোঁচায় ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল নরনাথ : 'এখন শুভস্য—'

'শুভস্য?'

'যদি বলতে চান, অশুভ, তবে অশুভস্য।' নরনাথ হাসল : 'কিন্তু শ্রীঘ্রত্ব সর্বাবস্থায়। তাই অশুভস্য শীঘ্রং।'

'তুমি যা করে পারো, নমো-নমো করে উদ্ধার করে দাও।' এক পাশে দেয়ালের দিকে ঘাড় কাত করলেন বনবিহারী : 'বিয়ে যদি হয়, আর এখন না হয়ে উপায় কি, তোমার ওখানেই বন্দোবস্ত করো। টিমটিম করে, নেহাত যেটুকু না হলে নয়, ততটুকুতে দায় সারো। যা লাগে আমি দিয়ে দেব।'

'তার জন্যে ভাববেন না। কিন্তু আপনার প্রথম মেয়ে, আপনার প্রথম কাজ—আপনার নিজের বাড়িতে হলেই তো ভালো ছিল। লোকে ভিতরের কথা আর কী জানবে, তারা দেখবে আপনাকে—'

'না, আমার বাড়িতে নয়, আমার সামনেতে নয়। আমার সামনেতে হলে আমার প্রেসার বাড়বে, আমি টলে পড়ে যাব মাটিতে। তা ছাড়া আমার বাড়িতে ভাড়াটে বসবে, ছাদ এজমালি হবে, তারা বরদাস্ত করবে না এসব হট্টগোল। না, আমিও করব না।' নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টায় থরথর করতে লাগলেন বনবিহারী : 'এ বিয়ে, এমন বিয়ে আমি মানি না। কাকলিকে বলে দিয়েছি এ বাড়িতে তার স্থান নেই। তুমিও আরেকবার তাকে মনে করিয়ে দিও।' উঠে দাঁড়াবার চেষ্টায় ভেঙে পড়ে চেয়ারে ছড়িয়ে পড়লেন বনবিহারী।

'বউদিকে ডেকে দিচ্ছি, আপনি বসুন।' দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল নরনাথ, আর কাকলির ছোট বোন পত্রালির কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে ওদিককার ছোট ঘরে ধরলে কাকলিকে।

'এ কি, বেরুচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল নরনাথ।

'হ্যাঁ, এই একটু—' ম্লান রেখায় হাসল কাকলি।

'বুঝেছি—' জ্ঞানীর মত দুই চোখে জ্যোতি আনল নরনাথ। বললে, 'এদিকে অনেকটা বাগিয়েছি।'

'সত্যি?' এ যেন প্রায় আশাতীতকে শুনছে কাকলি।

'হ্যাঁ, বিয়েটা আমার বাড়িতেই হবে আর কিছু খরচও উনি দেবেন।'

'তা হলে আলো জ্বলবে, সানাই বাজবে?' ফ্রক পরা ছোট্ট খুকির মত ঝলমল করে উঠল কাকলি : 'সেজেগুজে আসবে সব লোকজন?'

'দেখি কতদূর কী করতে পারি।' যেন অনেক দূরই করতে পারে এমনি ভাব করল নরনাথ।

'এখন তোমাকে আরেক কাজ করতে হয়।' কাকলি দরজার কাছে এগিয়ে আসতে-আসতে বললে, 'ও পক্ষে গিয়ে যথাবিধি কথাটা পাড়তে হয়। মানে কথাটা ক্লোজ করতে হয়।'

'হ্যাঁ, আজকালের মধ্যেই যাচ্ছি।' নরনাথ তার ভুরুতে কুঞ্চনের খেলা খেলল। বললে, 'আর, সব সংক্ষেপ করে দিয়ে আসছি। এমন এক প্যাঁচ কষব যে বাছাধনরা ট্যাফো করতে পারবেন না, সুড়সুড় করে বিয়ের আসরে এসে হাজির হবেন।

কিছুই বুঝল না কাকলি, তবু সরল প্রাণে হাসল। বাধা-বিপদ সব বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। পথঘাট সুগম, এই যেন তার শীতের দিনে আরামের রোদ।

গায়ত্রী এসে দাঁড়াল বনবিহারীর কাছে। স্নানের তোড়জোড় করতে হয় এখন।

বনবিহারী বললেন, 'নরু কাকলি সম্বন্ধে কী একটা ইঙ্গিত করে গেল—'

সর্বশরীরে শিউরে উঠল গায়ত্রী : 'কী ইঙ্গিত?'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করলেন বনবিহারী।

'ছি ছি ছি', শতকণ্ঠে না-না-না করে উঠল গায়ত্রী : 'ও কী কথা! আমি মা, আমার লক্ষ্য নেই?'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।' বনবিহারী আশ্বস্ত হলেন : 'কাকলি কি এত বোকা এত হালকা এত লক্ষ্মীছাড়া হতে পারে? তবে নরু ওরকম করে বললে কেন?'

'ও বললেই তো হবে না।' বিরক্ত-আরক্ত মুখ গায়ত্রীর : 'যে বেশি কথা বলে সে অমনি বানিয়ে-বাড়িয়েই বলে। ও ভেবেছে অমনি করে বললেই হয়তো তোমাকে সহজেই রাজি করাতে পারবে। কিন্তু ও জানে না আমি আছি।'

'তুমি আছ।' মাথার চুলে গায়ত্রীর তৈলাক্ত হাতটা নড়াচড়া করছিল, সেটা সবল স্নেহে আঁকড়ে ধরলেন বনবিহারী। চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কার দলে?'

'তোমার।' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চুলে আবার বিলি কাটতে লাগল গায়ত্রী। বললে, 'কাকলি ভেবেছে ওর জেদই জয়ী হবে। কিন্তু ও জানে না ওর ঐ জেদ উত্তরাধিকারসূত্রে আমার কাছ থেকেই পাওয়া।'

বনবিহারী বললেন, 'কিন্তু তুমি বলতে পারো ও ঐ দুস্থ ছন্নছাড়া ছেলেটাকে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করার জন্যে খেপেছে কেন?'

'স্পর্ধা। স্রেফ অহংকার। ও বলতে চায় প্রেমের মূল্য সম্পদে নয়, কৃতিত্বে নয়, প্রেমের মূল্য প্রেমে।

আর যে দুঃস্থ তাকে যদি ভালোবাসাই যায়, তবে তার সঙ্গে ঘর করতে দুঃখ নেই। যদি অবস্থা সচ্ছল হওয়া পযন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তবে সেটা সচ্ছলতাকেই ভালোবাসা হল, ব্যক্তিটাকে নয়।'

'চাইল্ডিস!'

'ও বলে, যদি ধরো, অপেক্ষা করা সত্ত্বেও লোকটার অবস্থা ফিরল না, তা হলে কি আমি ফিরে যাব, আমার ভালোবাসাও ফিরে যাবে? গরিব কত কিছু থেকেই তো বঞ্চিত, শেষ পর্যন্ত ভালোবাসা থেকেও বঞ্চিত হবে? গরিব বলে অকৃতী বলে কেউ তার সঙ্গে ঘর করবে না?'

দুঃস্থ অপরিচিতের জন্যে তার এত দয়া, দুঃস্থ বাপের প্রতি তার দয়া হবে না? মেয়ের জন্যে মন আবার হঠাৎ নরম হয়ে গেল বনবিহারীর। তিনি গলা ছেড়ে ডাকতে-লাগলেন কাকলিকে।

পত্রালি এসে বললে, 'দিদি বাড়ি নেই।'

'বেরিয়ে গেছে?' স্ত্রীর দিকে নালিশের চোখে তাকালেন বনবিহারী : 'যখন তখন বেরিয়ে গেলেই হল? এটা বেরুবার সময়? কাউকে বলে যাবে না?'

'তুমিই তো বলেছ এ বাড়িতে তার স্থান হবে না।' বললে গায়ত্রী।

'সে তো ঐখানে বিয়ে হলে। তা বিয়ে তো এখনো হয় নি। যখন সত্যি কোনো ডিফিকালটি নেই, বাধ্যবাধকতা নেই, তখন বিয়ে তো শেষ পর্যন্ত না-ও হতে পারে।' পত্রালির উপর মুখিয়ে উঠলেন বনবিহারী : 'কোথায় গেছে এ অসময়?'

'তা আমি কী জানি।' পালিয়ে গেল পত্রালি।

গেছে আর কোথায়। গেছে মার্কেটে, গোল চত্বরে।

একটা ওজন নেবার যন্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে সুকান্ত। হাসতে-হাসতে পাশ থেকে কাকলি এসে হাজির। বললে, 'হঠাৎ ওজন নেবার দরকার হল কেন?'

'দেখি বাড়ল কিনা।'

'বাড়বে? তুমি তাই আশা করো?' কাকলি অবাক হয়ে বললে।

'ফাঁসিকাঠে লটকাবার আগে কারু কারু নাকি বেড়েছিল শুনেছি।' ফোকরে আনি দিল সুকান্ত।

'ফাঁসিকাঠ!' চোখ কপালস্থ করল কাকলি।

'তা ছাড়া আবার কি। বিয়ে করে সংসারে ঢোকা মানেই ফাঁসিকাঠে লটকানো।' কার্ডটা কুড়িয়ে নিয়ে চোখ বুলোল সুকান্ত। বললে, 'হ্যাঁ, যা বলেছি, ঠিক বেড়েছে। বাড়তেই হবে। এবার তুমি ওঠো।'

কুণ্ঠিত হয়ে সরে গেল কাকলি। বললে, 'আমার দরকার নেই।'

'দরকার আবার কার আছে।' নেমে এল সুকান্ত।

'সেই একবার একপক্ষের দরকার হয়েছিল।' হাসিমুখে বলতে লাগল কাকলি, 'সেই এই বিয়ের ব্যাপারেই। মেয়ে দেখতে রোগা, বলছিল বরপক্ষ। রোগা বলছেন কেন, বলুন কৃশ, এ সাফাই কন্যাপক্ষের। বেশ, ওজন করাবেন চলুন। চলুন, ঠিক স্ট্যান্ডার্ড ওয়েটের মেয়ে আমাদের। মেয়েকে নিয়ে আসা হল মার্কেটে, এইখানে। ব্লাউজের মধ্যে গুচ্ছের ঢিল নিয়ে মেয়ে দাঁড়াল ওজন নিতে। একেবারে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েট, কাঁটায়-কাঁটায়।'

'পুরনো গল্প। কিন্তু তোমার ভয় কী! তোমাকে ঢিল নিতেও হবে না ঢিল দিতেও হবে না। যেমনটি আছ তেমনি—'

'তোমার ওজনেই আমার ওজন। তোমার ঐ কার্ডে আমাদের দু'জনের ওজনই একত্র যোগ করে লেখা হয়েছে।' কাকলি চলতে শুরু করল : 'এসব কথা থাক। কাজের কথা—'

'হ্যাঁ, কাজের কথা। তারই জন্যে তো ডেকেছি তোমাকে। কই, তোমাদের বাড়ি থেকে সরকারি প্রস্তাব এল কই?' সুকান্তও পা মেলাল।

'নরুকাকা আজকালের মধ্যেই যাবেন।'

'নরুকাকা?'

'হ্যাঁ, বাবা খড়্গহস্তের চেয়েও বেশি, পিস্তলহস্ত। নরুকাকার বাড়িতেই হবে।'

'কী হবে?'

'আহা, যেন বলতে পারি না! বিয়ে হবে।'

'শুধু ঐটুকু?'

'না। মুখচন্দ্রিকা। মালাবদল। সম্প্রদান। মন্ত্র। যজ্ঞ। সপ্তপদী। অগ্নিসাক্ষী—শিলাসাক্ষী। শঙ্খধ্বনি, হুলুরব। আমি কি সব জানি? হেসে ফেলল কাকলি।

'জানো না? আমি সব জানি।'

'কী জানো?'

'তুমি ভয়ানক সেকেলে। আর তারই জন্যে যত গোলমাল।'

'শোনো, সবচেয়ে গোলমালের যে ভয় করছি তা হচ্ছে প্রস্তাবের পর তোমাদের বাড়ি কোনো দাবি করে না বসে।'

'তা করতেই তো পারে।' সুকান্ত বললে নিশ্চিন্ত সুরে, 'নগদ টাকা না হোক, ফার্নিচার, বাসনকোসন, রেডিও, সেলায়ের কল, সাইকেল—'

'থামো।'

'অন্তত সোনার বোতাম না হোক, একটা ঘড়ি আর ফাউন্টেন পেন তো দেবে আমাকে।'

'কাঁচকলা দেবে।'

'কিন্তু মা'র নমস্কারী শাড়ি খান তিরিশ—এ ঠেকানো অসম্ভব।' মুখ গম্ভীর করল সুকান্ত।

'এ তুমি, মা'র ছেলে, তুমিই ম্যানেজ কোরো।'

'দেখি কদ্দুর কী পারি। তুমি তোমার নরুকাকাকে শুধু নেমন্তন্নপত্রটা ছাপতে বোলো। তারপর একটা শুধু শামিয়ানা খাটানো আর একটু রোশনাই। কি গো, সানাই একটু বাজবে, করতব করবে?'

'করবে। কিন্তু তার আগে তোমার কেরামতিটাও দেখিও। তোমাদের দিকের সব শান্ত স্তব্ধ সংযত রাখার কেরামতি।' করুণ চোখে তাকাল কাকলি।

কিন্তু আসল কেরামতি নরনাথের। মূলকথা বলার পর যখন অবান্তর কথা প্রায় ওঠে-ওঠে, তখন নরনাথ ভূপেনবাবুর কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'এ বিয়ে না হতে দিয়ে আর উপায় নেই।'

ভূপেন হাঁ হয়ে রইল।

'হ্যাঁ, ডিফিকালটি হয়েছে। এখন দেয়ার ইজ নো গেটিং এওয়ে। একটা কুমারী মেয়ের মান। আর আপনার ছেলে,' নরনাথ সাহস করে চাইল সুকান্তের দিকে : 'পার্ফেক্ট জেন্টলম্যান—খাঁটি ভদ্রছেলে। হি হ্যাজ অউনড ইট আপ।'

কেউ একটা শব্দ করতে পারল না। হাসবে না কাঁদবে বুঝতে না পেরে সুকান্ত মাথা হেঁট করে চলে গেল ঘর থেকে।

তবেই বুঝতে পারছেন, যেমন তেমন করে নমো নমো করে এ বিয়ে এক্ষুনি সেরে ফেলা দরকার।' উঠে দাঁড়াল নরনাথ : 'এ বিয়েতে দাবি-দাওয়াই কি, লোক-লৌকিকতাই বা কি।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, কোনো রকমে মান রাখা, প্রাণ রাখা।' যথারীতি আবার লেখালেখির মধ্যে ডুবে গেল ভূপেন : 'তাড়াতাড়ি দিন ঠিক করে শুভকাজটা সম্পন্ন করান।'

'আমরা আছি।' হেমেন বললে।

এবার নরনাথকে গায়ত্রী ডেকে পাঠাল।

তুমি আমার মেয়ের নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটাচ্ছ কেন? কোথায় রাগবে, কেঁদে ফেলল গায়ত্রী।

দু' হাত জোড় করে নমস্কার করল নরনাথ। বললে, 'এ কলঙ্ক নয় বউদি, এ কৌশল। এ কৌশলের উদ্দেশ্য বিয়েটাকে অনিবার্য করা, নির্বিঘ্ন করা, নিরুপদ্রব করা। এ কৌশলে কাকলির লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। যে কৌশলে ঈপ্সিত ধন পাওয়া যায় তাকে কি কলঙ্ক বলে? তাকে অলংকার বলে।'

পনেরো

'কাগজ-কলম নিয়ে এসো।' বনবিহারী গম্ভীর গলায় হুকুম করলেন কাকলিকে।

কাকলি থমকে গেল। কিছু লিখে দিতে হবে নিশ্চয়ই। কী না জানি লিখে দিতে হবে। কোনো দাসখত ? ইস্তফানামা ? কোনো সম্মতিপত্র ?

কী না জানি কী। ভয়ে বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেল কাকলির।

যদি লিখে দিতে হয় এ-বাড়ির সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল, লিখে দেবে স্বচ্ছন্দে। মনে মনে হাসল কাকলি। যা স্বয়ংসিদ্ধ তাকে শুধু কলমের আঁচড়ে নাকচ করা যায় ? কলমের কালিতে কালো করা যায় গায়ের রক্ত, বংশের রক্ত ?

যাই না, কাগজ-কলম নিয়ে বসি না গিয়ে। দেখি না কী লেখান। তেমন কিছু হয়, লিখব না। সব ছুঁড়ে ফেলে সোজা ছুট দেব। ঘোড়াকে জলের কাছে নিয়ে যেতে পারো, কিন্তু তাকে জল খাওয়াতে পারো না।

কলমে কালি ভরে নিল। একটা একসারসাইজ খাতার পেটের কাগজটা ছিঁড়ে নিল একটানে। ধীর পায়ে কাছে এসে বসল মেঝের উপর।

ঝিমুচ্ছেন বনবিহারী। তাঁর দিকে চেয়ে কাকলির মন মায়ায় ভরে গেল। ভালো ঘুমুতে পাচ্ছেন না, মুখের রুচি চলে গিয়ে হজমে গোলমাল শুরু হয়েছে. গায়ে হাত দিলেই বোধ হয় জ্বর-জ্বর বলে মনে হবে। যেন শেষ ট্রেন মিস করে শূন্য প্ল্যাটফর্মে একা এক যাত্রী নৈরাশ্যকে শিয়র করে শুয়ে আছে ক্লান্তির ধূলিতে।

রিটায়ার করে, ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে, আর কোথাও ঢুকতে পেলেন না। কত লোক গাছের শাখা থেকে নেমে গেলেও কেমন ঝুরি ধরে এখনো ঝুলছে—বাবা সামান্য একটা এক্সটেনশানও পেলেন না। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এই বাড়িখানা শুধু তুলেছেন, কিন্তু তাঁর স্বপ্নের বাড়ি এর চেয়েও বড় ছিল। দাদার তো ঐ অবস্থা, আর আমি তো পথে ভেসেছি। ছোট ভাইবোনগুলি কত দিনে কী হবে, কেমন চেহারা নেবে, কে জানে। না, বাবা যা বলেন, তাই করব। যা চান, তাই লিখে দেব স্বচ্ছন্দে। যদি তাঁর একটু শান্তি হয়।

'কিছু লিখতে হবে?' উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল কাকলি।

'হ্যাঁ। এনেছ কাগজ-কলম?' বনবিহারী ইজিচেয়ারে নড়ে-চড়ে উঠলেন : 'হ্যাঁ, লেখো।' ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে লাগলেন জামার পকেট : 'এই যে, পেয়েছি।' একটা কাগজের টুকরো বের করে তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণ চোখে : 'হ্যাঁ এই—এই নম্বরগুলো—'

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল কাকলি।

'কই, লিখছ না যে?' ধমক দিয়ে উঠলেন বনবিহারী : 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একের পর এক দশটা নম্বর, দশ নম্বরের দশখানা। তারিখ আলাদা। আফিসও বোধ হয় সমান নয়। কী, লিখছ? হাত গুটিয়ে বসে আছ কী করতে ?'

'বিষয়টা কী, তা তো বলবে।' কাকলি তাকাল করুণ চোখে।

'লেখো, আই ডু হিয়ারবাই ডিক্লেয়ার—'

এটুকুন লিখতে আপত্তি কি, কাকলি লিখল। কিন্তু সত্যি সত্যি ঘোষণাটা কী তা ঠিক-ঠিক না জানা পর্যন্ত আর কলম চালানো অনুচিত। অসম্ভব।

'কী লিখলি?' আবার দাবড়ি মারলেন বনবিহারী।

'লিখেছি। কিন্তু লেখবার আগে ব্যাপারটা মোটামুটি আমাকে একটু বুঝতে দেবে না?' দু' চোখে বিষণ্ণ কুণ্ঠা নিয়ে তাকাল কাকলি।

'এর আর বোঝাবুঝি কী!' বনবিহারী উঠি-উঠি করেও শুয়েই থাকলেন চেয়ারে : 'তোমার জন্যে, তোমার বিয়ের বাবদ, দশ হাজার টাকার সেভিংস সার্টিফিকেট কিনেছিলাম। সেই টাকাটা তুমি আবার

আমাকে লিখে দেবে। বলবে, ঐ ঐ নম্বর সার্টিফিকেটে তোমার কোনো অধিকার নেই; যেহেতু ওগুলো আমার টাকায় কেনা হয়েছিল, সেহেতু ওগুলো আমার।'

'এই কথা? তা আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি।' কাকলি লেখার উপরে উপুড় হয়ে পড়ল। বললে, 'বলো, কি রকম হবে বয়ানটা—'

বনবিহারীর মুখে কথা নেই। নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছেন নাকি?

সোজা হয়ে উঠে বসল কাকলি। বললে, 'শুধু একটা ডিক্লেরেশান করলেই হবে, না, একটা ক্লিয়ার এসাইনমেন্ট দরকার? ঠিক কী ফর্মটা হওয়া উচিত, আমি বলি কি, নরুকাকাকে পাঠিয়ে জেনে নেওয়া ভালো।'

বনবিহারী তবু নিঃশব্দ।

'লেখালেখিতেই বা কাজ কি।' কাকলি মুক্তকণ্ঠে বললে, 'সোজাসুজি সার্টিফিকেটগুলো ক্যাশ করে টাকাটা তোমার অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দিলেই তো চুকে যায়—'

'ক্যাশ করব মানে?' চমকে উঠলেন বনবিহারী : 'কে ক্যাশ করবে? ক্যাশ করবে তো তুমি—তোমার নামে যখন সার্টিফিকেট। তার মানে সার্টিফিকেটগুলো ভাঙিয়ে টাকাটা দিব্যি হাতিয়ে তুমি ভেগে পড়ো, চম্পট দাও, তাই না?'

কাকলির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধরিত্রী ছি-ছি করে উঠল।

'চলবে না ওসব মতলব।' বনবিহারী বসলেন খাড়া হয়ে : 'যা বলছি তাই লেখো। আইনের চোখে কী দাঁড়ায় না দাঁড়ায় তার জন্যে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি শুধু আমাকে একটা স্বত্বের দলিল লিখে দাও—একটা মুক্তিপত্র। লিখে দাও, ঐ টাকা তুমি ছোঁবে না, ঐ টাকায় তোমার স্বত্ব নেই, দাবি নেই এক তন্তু।'

যা বললেন, মনের বিস্তীর্ণ আনন্দে তাই লিখে দিল কাকলি।

নরনাথ এলে বললে, 'যাই বলুন, এ আপনার একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে।'

'বাড়াবাড়ি?' চেয়ারের হাতল চেপে ধরলেন বনবিহারী : 'কোন আইনে? খুব তো তুমি আইন দেখাও, এবার বলো কোন অ্যাক্ট, কোন সেকশান, কোন প্রোভাইসো?'

শীর্ণ রেখায় হাসল নরনাথ। বললে, 'যা একবার দিয়েছেন, তা আবার ফেরত নেবেন কেন?'

'এবার আইন ছেড়ে যে ধর্মকথা ধরলে। দিয়েছি মানে?' বনবিহারী ভঙ্গি আরো উদ্ধত করলেন : 'সার্টিফিকেটগুলো সমস্ত আমার কাস্টডিতে। এ দান হল? এ শুধু একটা বেনামী কাণ্ড। এর বেশি নয় কিছুতেই। আইনমত টাকা যখন আমার, তখন আমার খুশিমত ব্যয় করবার অধিকারও আমার।'

'কিন্তু এত কী অপরাধ কাকলির?'

'অপরাধ নয়? এক শো বার অপরাধ। ও ডিসিপ্লিন ভেঙেছে।'

'সব জিনিসেরই সীমা আছে। তেমনি, যাকে ডিসিপ্লিন বলছেন, হয়তো তারও।'

'না, নেই।' হুঙ্কার ছাড়লেন বনবিহারী : 'আমার দেওয়া টাকা শেষ পর্যন্ত ঐ লোফারটার হাতে গিয়ে পড়বে, তা দিয়ে ওর সংসারের সুসার হবে—এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।'

'তবেই দেখুন কেমন ভালো বর বেছেছে কাকলি।' শব্দ করে হেসে উঠল নরনাথ : 'কেমন আপনার দশ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিল অনায়াসে।'

'আমার কি টাকা খরচ করতে অসাধ, নরনাথ?' বনবিহারী চেয়ারে ভেঙে পড়লেন। বললেন, 'আমার কত দিনের স্বপ্ন, একটি অখণ্ড মুক্তোর মালার মত করে মাকে সাজাই। কিন্তু,' দুহাতে চোখ ঢাকলেন বনবিহারী : 'কিন্তু সে মালা আজ কার গলায় গিয়ে উঠছে?'

'তুমি কী ছেলেমানুষ, মালা নিয়ে এসেছ কেন? আধ-আধ সোহাগের ভঙ্গিতে বললে কাকলি।

'তোমার এই ছেলেমানুষ ভাবটি দেখব বলে।' বললে সুকান্ত।

'কী হবে আমার মুক্তোর মালায়, আমার ফুলের মালাই ভালো।'

'তোমার মুখে এই নতুন কথাটি শুনব বলে।'

সন্ধের দিকে ভিক্টোরিয়া স্কোয়ারে দেখা হয়েছে দু'জনের। এদিকটায় তত ভিড় নেই। উঁকিঝুঁকি নেই। শান্তিতে একটা কোণ পেয়েছে নিরিবিলি।

'জানো আমরা এখনো জানি না আমাদের মধ্যে কত রহস্য, কত চন্দ্র-সূর্য, কত ওঠা আর অস্ত যাওয়া।' বলতে লাগল সুকান্ত, 'কত ভাব রস দীপ্তি কান্তি, কত অন্ধকার। কিছুই জানি না। জানতেও পারি না যদি প্রেম না জাগে। একমাত্র প্রেমই নানা কোণে আলো ফেলে আমাদের মধ্যে নতুনকে দেখতে চায়। বিচিত্রকে দেখতে চায়। আশা করে আমরাও চিরন্তন নতুন থাকি। তাই তো প্রবৃত্তি পুরানী হলেও বাসনার কারুকলার আর শেষ নেই। যদি আর নতুনকে খুঁজে না পায়, তা হলেই প্রেম বিষণ্ণ। তাই, দেখছ না,' ফুলের মালাটা সুকান্ত নিজেই কাকলির খোঁপায় পরিয়ে দিল : 'ফুলের মালায় তোমাকে একটু নতুন করলাম। দেখলাম নতুন করে। দেখি।' কাকলির চিবুক ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল সুকান্ত।

'আর তোমাকে নতুন দেখলাম কথার মালায়।' টলটলে চোখে বললে কাকলি।

'এবার বিষয়জ্বালায় আসি।' হাসল সুকান্ত : 'তোমার নরুকাকা দিনক্ষণ ঠিক করেছেন?'

'সব ঠিক। এমনকি নিমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত ছাপা হয়ে গেছে। আর জানো, নিমন্ত্রণপত্র বাবার নামে।'

'আয়োজন সব সংক্ষেপ তো?'

'অতিশয়। বাবার সেন্টিমেন্টের মান রাখছেন নরুকাকা। যে ক'টি নিকটতম আত্মীয়-বন্ধুদের না বললে নয়, শুধু তাদেরকেই চিঠি দিচ্ছেন। বলছেন, বাবার প্রেসার ভীষণ বেড়ে গিয়েছে, হৈ-চৈ, গোলমাল সইতে পারবেন না বলেই কাণ্ডটা ও-বাড়িতে না হয়ে এ-বাড়িতে হচ্ছে—'

'আসল কথা কারুরই বুঝতে আর বাকি থাকবে না।'

'বুঝুকগে।'

'তারপর বিয়েটাকে অনিবার্য করবার জন্যে মানে অনিবার্যরূপে নগ্ন-নিঃস্ব করবার জন্যে নরুকাকা যা একখানা গুল ছেড়েছেন তা এখন ইতি-গজ বা ইতি-গাঁজা বলে চালালেও লোকে চাচ্ছে না নিতে। কেমন কুটিল-কুটিল চোখে দেখছে আমাকে।

'তোমাকে দেখছে?' খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি . 'তোমাকে দেখে কী হবে?'

এই হাসিটি নতুন। কটাক্ষটি নতুন। মধুরের এই টানটি আর কোনো দিন দেখে নি চিবুকে।

'তোমাকে এখন পাচ্ছে কোথায়? যখন পাবে—'

'মুক্ত দেখবে।' আঁচলে একটা ঘূর্ণি দিল কাকলি। বললে, 'এদিকে কী হয়েছে জানো? একটা মুক্তিপত্র লিখে দিয়ে এসেছি।'

'সে আবার কী!'

ব্যাপারটা বিশদ করল কাকলি।

খুব একটা গৌরবের কাজ করেছে সুকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে তা মনে হল না। বরং প্রায় বেদনার সুর বার করল সুকান্ত, বললে, 'ইশ! তুমি কী বোকা!'

'বোকা!' ঘাড় ফেরাল কাকলি।

'তা ছাড়া আবার কী! নইলে অতগুলো টাকা কেউ ছেড়ে দেয় এক কথায়?'

'বাঃ, ঐ টাকা কি আমার?'

'তোমার নয় তো কার! যখন তোমার নামে সার্টিফিকেটগুলো কেনা হয়েছে, তুমি অ্যাডাল্ট হয়েছ, টাকা তোমার ছাড়া আর কারু নয়। তুমিই তার একমাত্র মালিক—যাকে বলে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান। এখন যদি তুমি তা সাধ করে বিলিয়ে দাও, নেপোকে দাও দই মারতে, তা হলে আর কী করা যাবে।'

কি রকম বিশ্রী লাগছে কাকলির। কিন্তু প্রসঙ্গের সঙ্গে চলতে গিয়ে তাকেও এখন একটু গম্ভীর না হলেই নয়। মুখও মেঘলা হয়ে এল সহজেই। বললে, 'কিন্তু আসল জিনিসে চোখ ঠারলে তো চলবে না। যে যাই বলুক, আসলে টাকাটা তো বাবার—তিনি যদি—'

'না, নয়, আর নয়, কখনোই নয়।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সুকান্ত : 'তাঁর হাত থেকে দান পড়ে গিয়েছে। ছিলা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে তীর। দি ট্র্যানজ্যাকশান হ্যাজ বিন ক্লোজড, কনক্লুডেড। আর চারা নেই, ফিরে যাওয়া নেই, আউট হবার পর আর ব্যাট করা নেই। কিন্তু তুমি যদি আবার ডেকে আনো, মাঠ সাজাও, হাতে ব্যাট তুলে দাও, লোফা লোফা বল দাও দুদ্দাড় পেটাতে—ছি-ছি-ছি—'

হাসির কথার মত করে বলছে বটে, কিন্তু মোটেই হাসির কথা নয়। কাজে কাজেই কাকলির স্বরেও নম্রতার রেখা ফুটল না। বললে, 'কিন্তু করতাম কী শুনি? বাবা যদি সার্টিফিকেটগুলো হাতছাড়া না করতেন, যদি বন্ধ করে রেখে দিতেন তাঁর কাছে! কী করতে পারতাম!'

'কী করতে পারতাম মানে? মামলা করতাম।'

কি রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে সুকান্তকে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল কাকলি। কিন্তু কথাটা আগে শেষ করা দরকার।

'মামলা! আমি বাবার বিরুদ্ধে মামলা করব?'

'কেন করবে না? এখানে মামলা বাবার বিরুদ্ধে নয়, অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে, যে পরের সম্পত্তি জোর করে ভোগ করতে চাইছে, বলতে পারো, পরস্বাপহারীর বিরুদ্ধে। এরই জন্যে তো আদালত। বঞ্চিতকে তার ন্যায্য, তার প্রাপ্য উপশম দেবার জন্যে। নইলে, বলো তো, দশ হাজার টাকা কি কম! টু স্টার্ট উইথ, আমাদের জীবনে কত বড় একটা সুযোগ!'

'আমাদের জীবন মানে?'

কি রকম লাগল সুকান্তর কানে। বললে, 'কেন, মানেটা কঠিন কি! আমাদের জীবনে মানে আমাদের সংযুক্ত ভবিষ্যৎ জীবনে—'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমাদের মানে কী?' কি রকম কঠিন শোনাল কাকলিকে।

'আমাদের মানে আমার আর তোমার।' সুকান্ত মিনমিনে গলায় বললে।

'শুধু আমার বলো, তোমার নয়। টাকাটা বাবা আমাকে দিয়েছেন, আমাদের দু'জনকে নয়।' পাথুরে গলা বের করল কাকলি : 'সুতরাং টাকাটা যখন আমার একলার, যখন ওটার উপর আমার একার কর্তৃত্ব, তখন আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দিয়ে দিয়েছি আমার বাবাকে।' এবার গ্রীবায় যে রেখা ফুটল, তা প্রায় কর্কশের কাছাকাছি।

'তা বেশ করেছ।' নিমেষে লঘু হয়ে গেল সুকান্ত, একটু বা ঘন হয়ে বসতে চাইল বেঞ্চিতে। বললে, 'কিন্তু তুমি-আমি কি আলাদা? যদি পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য হতে পারে, সতীর অর্থে কেন পতির অর্থ হবে না? আর শাস্ত্রে তো বলেইছে, স্ত্রীভাগ্যে ধন—'

'আর স্বামীভাগ্যে?' অলসে-বিলাসে তাকাল কাকলি।

'ইতি-গজঃ।' হেসে উঠল সুকান্ত।

'গজ না হাতি!'

'গজ আর হাতি একই কথা।'

'হোকগে। আমার কথা শোনো। স্বামীভাগ্যে এই ফুলের মালা।' ঘাড় নিচু করে খোঁপার উপরে মালাটা ছুঁল কাকলি। ছুঁতে দিল সুকান্তকে। বললে, 'এই মালার দাম দশ হাজার টাকারও বেশি। যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, তা নিয়ে আমি কী করব?'

পরস্পর বাঁচিয়ে দিয়েছে পরস্পরকে। একটা ঝড়ের মুখে পড়েছিল এসে নৌকো, হালী আর দাঁড়ী দুয়ে মিলেই সামলেছে। নিয়ে এসেছে শান্ত জলে, নিরাপদের ঘাটে। তারা কৃতজ্ঞ তাই পরস্পর। দু'জনের চোখে সেই তৃপ্তি, সেই প্রার্থনা।

'তোমার সাধের সানাই বাজবে তো সেদিন?'

'নিশ্চয়ই। নরুকাকা বলেছে জোগাড় করবে।' মুচকে হাসল কাকলি : 'কানাই ছাড়া গান নেই, তেমনি সানাই ছাড়া বিয়ে নেই।'

'সানাইটা যেন কেমন!' বললে সুকান্ত, 'আনন্দের সুর, কিন্তু কেমন কান্না-কান্না কথা।'

'তাই তো অত সুন্দর। প্রেমের মধ্যে যদি ভয় না থাকে, যদি সুখের মধ্যে না থাকে একটু সন্দেহ, জীবনের মধ্যে না থাকে সংগ্রামের অবকাশ, তা হলে স্বাদে কম পড়ে। কি বলো, পড়ে না?'

'পড়ে হয়তো।' পাশ কাটাল সুকান্ত। বললে, 'তোমার বন্ধুদের কাকে বলবে?'

'বিনতাকে তো বলবই।' আপনমনে হাসল কাকলি : 'জানো, একেক সময় সুখটাকে নেহাত গ্রাম্য বলে মনে হয়। ঐ যে গাঁ থেকে শহর দেখতে আসে রঙবেরঙের জামা-কাপড় পরে, তেমনি। দেখতে আসা মানে কতকটা বা দেখাতে আসা। যদি ফলাও করে দেখানো না যায়, কেউ ঈর্ষান্বিত হচ্ছে এই আরামটা যদি না থাকে, তবে, এমন পোড়াকপাল, সুখেরও সুখ হয় না। তাই সকলের আগে বিনতাকে মনে পড়ছে।'

'কিন্তু এমন লোকও হয়তো আছে যে সুখকে অনুকম্পা করে। মনে-মনে বলে, আহা, কী মোহেই আছে এরা, এক শ্বাসের তাসের প্রাসাদে। গোকুলে যে কে বাড়ছে, তার খেয়াল নেই।'

'তুমি বলবে কাকে?'

'দীপঙ্করকে তো নিশ্চয়ই—'

'এখুনি তবে বেরুতে হয় বলতে। আর ক'টা দিন!' লজ্জার ডৌলে লাস্যের তুলি বুলোল কাকলি।

'না, চলো আজই বেরুই। ধরি গিয়ে দীপঙ্করকে। ও তো তোমারও চেনা।'

দু' জনে উঠে পড়ল। চলল উত্তরে।

'হাঁটবে?' জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'উপায় কি। রাস্তার নাম যদিও উড, কিন্তু অরণ্যের নামগন্ধও নেই।'

'উড মানে এখানে কাষ্ঠ। যানবাহনের লতাপাতা পাবে না কোথাও। শুধু একটানা পায়ে হাঁটার কাঠ।'

'ঐ একটা কাষ্ঠ যাচ্ছে ঠুনঠুনিয়ে। ডাকি রিকশাটাকে।' হাত তুলল সুকান্ত।

'না, না, রিকশা নয়।'

'কেন, মানুষে মানুষ টানে?' সুকান্তের গলায় অজানতেই বুঝি একটু ঝাঁজ এসে গেল : 'মানুষটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করো না। এই মুহূর্তে ও সোয়ারি চায়, না, খালি হাতে চলে যেতে চায় ঘণ্টা বাজিয়ে? আরো জিজ্ঞেস করো, যদি ওর বরাদ্দ ভাড়ার পর ওকে কিছু বকশিশ দিই, ওর কেমন লাগে?'

'মোটেও ওর জন্যে নয়।' শাসন-ভরা চোখে তাকাল কাকলি : 'আমাদের নিজেদের সোয়াস্তির জন্যে।'

'ও! ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের তো এখন অসিধারাব্রত।'

'হ্যাঁ, আমরা এখন অশেষের দেশের দিকে চলেছি। ধৈর্য তো আমাদেরই মানায়।'

'মন্দ বলো নি, অশেষের দেশ।'

'হ্যাঁ, মন্দের শেষ আছে, ভালোর শেষ নেই।' চলতে চলতে বললে কাকলি, 'দুঃখের শেষ আছে, আনন্দের শেষ নেই। ঘৃণা দ্বেষ কলহ-বিরোধের শেষ আছে, ভালোবাসার শেষ নেই।'

মনের অঙ্গনে গভীরের ছায়া পড়ল। অনেকটা পথ কাটল চুপচাপ।

'আর কতদূর হাঁটাবে? এ যে প্রায় পার্ক স্ট্রিট।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুকান্ত : 'যন্ত্রের শেষ আছে, যন্ত্রণার শেষ নেই।'

ট্রামে-বাসেই আসতে পারল দীপঙ্করের আস্তানায়।

কিন্তু এ যে একটা অকৃত্রিম বস্তি। খোলার চালে একসার ঘিঞ্জি জাঁতিকল। ছত্রিশ জাতের সদাব্রত। ধোপা আছে, ভুজাওয়ালা আছে, ঝি আছে, শিশি-বোতলওয়ালাও আছে। ওদিকে বুঝি এক হিন্দুস্থানি গয়লানির এলাকা। চালের উপরে ফুটবলের ব্লাডার আর সাইকেলের টিউব দেখে সহজেই বোঝা যায়, মদ চোলাইয়ের কারবার চলেছে ওখানে। গরুর গোয়ালও কি ওরই মধ্যে নাকি? না। গরুর বসবাস রাজপথে। সে কি? পুলিসে দেখে না? দেখে বৈকি। দেখে, শোঁকে, শোনে। মাতালদের সে কী হল্লা।

কখনো বা কী মারামারি! পুলিস এসে রাস্তায় লাঠি ঠোকে। কি হে? তোমরাও সুখে থাকো, আমরাও সুখে থাকি। তোমরাও যদি সিক্ত হয়েছ, আমাদেরও আর্দ্র করো। রুধিরাক্ত হয়েছ তো তৈলাক্ত করো। আর গয়লানির সঙ্গে তো পরিপাটি ব্যবস্থা। ভাটিও জ্বলবে, গরুও হাঁটবে।

সেই অকৃত্রিম বস্তির রাস্তাঘেঁষা খোপের মধ্যে দীপঙ্কর চাক বেঁধেছে। তার মা বাবা দিদি আর কতগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে। ভিড়ের চাপে ঘর ছেড়ে বাইরে উপচে এসেছে দীপঙ্কর, তার খাটিয়া ফুটপাতে।

'দীপঙ্কর আছে?' বাইরে থেকে হাঁক দিল সুকান্ত।

'না, এখনো ফেরে নি।' বাইরে বেরিয়ে এলেন দুর্গাবালা, দীপঙ্করের মা। 'ফিরতে দেরি হয়। আপনি কে? কী বলব ও ফিরে এলে?' লক্ষ্য করলেন সুকান্তকে।

'আমি ওর বন্ধু। বলবেন, সুকান্ত এসেছিল।'

'আহাহা, বন্ধু। এ নিষ্ঠুর শহরে এমন কথা আর কে বলে? বলে, বন্ধু। বোসো বাবা, বোসো।' ভিতর থেকে একটা ময়লা সুজনি নিয়ে এসে খাটিয়ার উপর পাতল দুর্গাবালা। তারপর নজরে আনল কাকলিকে : 'আর তুমি?'

দুর্গাবালা ভাবছিল, সুকান্তেরই কেউ হবে হয়তো। আর সুকান্তেরও সেই আশা, তার মধ্য দিয়েই কাকলি পরিচিত হবে।

'আমরা দু'জনেই ওর বন্ধু।' বললে কাকলি।

'বোসো মা, বোসো। এই রাস্তাই আমাদের উঠোন, আমাদের বারবাড়ি। কোনোরকমে কষ্টেসৃষ্টে বোসো দুটিতে পাশাপাশি। বন্ধুর প্রাণে আবার কষ্ট কী! আহাহা, আমি দেখি, আমি শুনি, আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হোক।'

'না, আজ আর বসব না। আরেকদিন আসব।' সুকান্ত বললে।

চলে যাচ্ছিল, দু-তিনটে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল কাকলিকে : 'তুমিই সেদিন গিয়েছিলে চিড়িয়াখানায়। চীনেবাদাম খাচ্ছিলে। তাই না?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। তোমরাও গিয়েছিলে। কিন্তু ও— ঐ ছেলেটি কে?' ঘরের মধ্যে চোখ পাঠাল কাকলি : 'ও যায় নি?'

'না, ও কি করে যাবে?' ছোটদের মধ্যে থেকে কে একজন বললে, 'ওর একটা পা নেই। জ্বরে খসে গিয়েছে। যে পা-টা আছে, সেটাও নন্নড়ে।'

'আর ও কে?' আরো ভিতরে কৌতূহলকে সজাগ করল কাকলি।

'ও বিষ্টুরই ঠিক আগে। বিষ্টু নয়, আভা এগারো।' এবার দুর্গাবালাই এগুলেন।

'কী করছে?'

'রাঁধছে। ফেন গালছে।'

বিষ্টু জ্বলজ্বলে চোখে মুখভরা হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে, যেন কিছুই তার হয় নি, আর ফেন গেলে আভা যখন উঠে দাঁড়াল, গায়ের উপর ছেঁড়া আঁচলটি মেলা, মনে হল একেও খোঁড়া করবার জন্যে আরেক দুর্মর জ্বর আসন্ন। আর, তখন যেন তারও কিছুই হবে না।

গলির থেকে বাইরে আসতে আসতে কাকলি বললে, 'এরা কি করে বাঁচবে? কি করে দাঁড়াবে?'

'তোমার এ জিজ্ঞাসা মহাশূন্যের শোকে মহাশূন্যের বিলাপ।' সুকান্তর কথাটা প্রায় হাসির মত শোনাল : 'ফাঁকা কথা আর কতদূর হতে পারে?'

'যা বলেছ।' কাকলিও হাসল স্বচ্ছন্দে : 'সত্যি, কোথায় নিয়ে এসেছিলে তুমি? বাবাঃ, বুকে হাঁপ ধরে। তুমি দিব্যি বললে কিনা আরেকদিন আসবে।'

'পাগল! আর কে এমুখো হয়? দীপঙ্করকে আমি তার আফিসে গিয়ে ধরব।'

ষোলো

দীপঙ্করকে আফিসে গিয়েই ধরল সুকান্ত।

'কাল তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম।' সুকান্ত বললে, 'বাবাঃ, কোথায় এসে বাসা নিয়েছ।'

মুখের দিকে তাকাল দীপঙ্কর। না, ঘৃণা নয়, অনুকম্পা নয়. প্রচ্ছন্নে আছে বা একটু বন্ধুতার সুর। বললে, 'রেলস্টেশন দেখেছ? টিনের কৌটো আর কাঁচের শিশি দিয়ে এলাকা ভাগ করে শুয়েছে। কখনো কখনো আবার এই শিশি-কৌটোকেই অস্ত্র করে রাজ্যে-রাজ্যে বেঁধেছে যুদ্ধ। তার চেয়ে ভালো আছি।'

'না, না, মোটেই ভালো নয়।' সুকান্ত প্রতিবাদ করল। বললে, 'যখন সবাইকে আনলেই দেশ থেকে—'

'না এনে উপায় ছিল না। প্রতিটি মুহূর্তই তখন বাঘের চোখ। দেখেছ তো বোনটাকে?'

'তবু এর চেয়ে একটা ভালো আস্তানা জোগাড় করা যেত।' বলতে আর কী, বললে সুকান্ত।

'চট করে হাতের কাছে আর পেলাম কই? জানো এরই জন্যে সেলামি দিতে হয়েছে গয়লানিকে।'

'অসম্ভব। না, না, তুমি একটা ভদ্র বাসা দেখ। এখানে বাঘের চোখ না থাকলেও হায়নার চোখ আছে।'

'দেখছি তো, দেয় কে।' হাসল দীপঙ্কর : 'মাইনেটা যদি বেশি হত!'

'কত মাইনে?'

'শ দেড়েক।'

চারদিকে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'আফিসটা তো ছোট। আমি ভেবেছিলাম—'

দোতলায় একটা হল মতন ঘর কাঠের পার্টিশন দিয়ে তিন টুকরো করা। আর ও-পাশে একটা ফালতু। চার কামরার আফিসে কী বা জেল্লাজমক হবে। কী বা দেবে থোবে অন্যকে। লোকজনও তো বিশেষ দেখছি না। সুকান্তের মুখে হতাশার ছাড়া পড়ল।

'আফিসের আয়তন দিয়ে ব্যবসার আয়তন বোঝা যাবে না। মারোয়াড়ির গদি এর চেয়েও ছোট হয়।' দীপঙ্কর সুর বদলাল : 'অবশ্যি আমাকে যা দিচ্ছে তা একনজরে খুব খারাপ বলা যায় না। আজকালকার বাজারে সাধারণ বি-এ পাশের দাম কী! আমার চলে না বলেই মাইনে বাড়াতে হবে এটা যুক্তি নয়, কিন্তু চুক্তির বাইরে যদি আমার কাজ বাড়াও সেই সঙ্গে চুক্তির বাইরে মাইনেও বাড়াবে না এটা অযুক্তি।'

'কেন, বেড়েছে নাকি কাজ?'

'প্রথমে যখন ঢুকি তখন কথা ছিল খাতা লেখার, এটা-ওটা স্টেটমেন্ট তৈরি করার কাজ। দু-চারটে চিঠি লিখতে দাও তাও না হয় করলাম। এখন বলছে গোডাউন ইনস্পেকশনে যাও। আর সেসব গুদোম কোথায়। পৃথিবী ছাড়িয়ে। পাতিপুকুর, ঠাকুরপুকুর, ঢাকুরে। আগে আগে সন্ধে ঘেঁষেই বাসায় ফিরতাম, এখন কত রাত যে হয়ে যায় ফিরতে!'

'আলাদা ইনস্পেক্টর নেই?'

'বরেনই আগে ঘোরাঘুরি করত। গাড়ি আছে, গায়ে-পায়ে লাগত না। এখন প্রায়ই তাকে টুরে যেতে হয় বাইরে, পার্টির সঙ্গে মোকাবিলা করতে। তাই আমার উপর ভার পড়ে। বলে, একজন হোলটাইম সুপারভাইজার রাখবে। কী দরকার! আমার মাইনেটা ভদ্র ও সুস্থ করে দিক, আমিই খেটে দিচ্ছি একস্ট্রা। শুধু একটা গালভরা নাম দিয়ে কী হবে। তা ছাড়া, সেই বাড়তি খাটনিটা তো খাটছিই—'

'এদের কিসের এত ব্যবসা?' সুকান্ত তাকাল জিজ্ঞাসু চোখে।

'ওরে বাবা, বিরাট ইমপোর্টের কারবার।' দীপঙ্কর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : 'বিদেশ থেকে নামারকম র-মেটিরিয়েলস নিয়ে এসে বিক্রি করে এখানকার ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল ফার্মের কাছে। দিশি ফার্মের প্রোডাকশান বন্ধ যদি ওসব মেটিরিয়েলস না পায়। আর বিদেশেই জন্মায় ওসব উপাদান। আর এরা, এ কোম্পানি, ঐ বিদেশী কোম্পানিদের সোল এজেন্ট। সুতরাং, বুঝতে পারছ, ঢালাও ব্যবসা। এই তো কত্তা সেদিন ঘুরে এল টোকিও থেকে। শিগগির আবার যাবে নাকি হংকং—'

'কে কত্তা? বরেনের বাবা?'

'হ্যাঁ, ঐ তো রয়েছে ঐ ঘরে।' ফালতু ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল দীপঙ্কর, আর, সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেরও অজানতে কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে এল। তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্বর সরল করে নিয়ে বললে, 'বেশ আছে আনন্দে। এই মালয়, ঐ কানাডা। হাওয়ায় পাখা মেলে দিলেই হল। নিচে রূপোর চাকা আর উপরে স্বপ্নের পাখা।'

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সুকান্ত, 'বরেন আছে?'

'আছে। ঐ ঘরে।' প্রান্তের সুইং-ডোরটা ইঙ্গিত করল দীপঙ্কর : 'যাবে? দেখা করবে ওর সঙ্গে?' শুধু মামুলি জিজ্ঞাসা নয়, যেন বা আশায় ভরা উৎসাহের স্পর্শ।

'মন্দ কি। যাই না। কিন্তু, কী আশ্চর্য', পকেটে হাত ঢোকাল সুকান্ত, 'আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয় নি এতক্ষণ। আমার বিয়ে। সেই যে মেয়েটিকে দেখেছিলে জু-তে, তার সঙ্গে। কী সব বাজে কথায় কাজের কথাটাই চাপা পড়ে গিয়েছিল।' একটা চিঠি বার করে বাড়িয়ে ধরল দীপঙ্করের দিকে। বললে, 'যেও কিন্তু। দেখে রাখো তারিখ। আর শোনো, দু' দিনই খাওয়া চাই—'

কাষ্ঠহাসি হাসল দীপঙ্কর। চিঠিটা প্রায় অজ্ঞানেই রেখে দিল পকেটে, তাকিয়েও দেখল না। বললে, 'বরেনকেও বলো না।' এগুচ্ছিল সুকান্ত, জামা ধরে টানল পিছন থেকে : 'আর সেই সঙ্গে আমার কথাটা কিন্তু মনে রেখো।'

'তোমার আবার কোন কথা!'

'বাঃ, এতক্ষণ বলছিলাম কী তোমাকে!' পীড়িত মুখ করল দীপঙ্কর : 'বিয়ে তো লোকে আকছার করছে, তাই বলে দরকারি কথা কে ভুলে থাকে?'

'মানে, তুমি বলছ, তোমার ঐ গোডাউন ইনস্পেক্ট করার কথা?' সুকান্ত মাথা চুলকোল : 'গোডাউনগুলো কার?'

'ব্যাঙ্কের। কিন্তু প্রশ্নটা তা নয়।'

'ব্যাঙ্কের গোডাউন? কেন, এদের নিজেদের নেই?'

'কী দরকার করে? করলেই তো ঝামেলা, খরচান্ত। এ দিব্যি ব্যাঙ্কের গুদোমে এসে জমছে, সময় মত খালাস করে নিচ্ছে পার্টি। তারপর সরকার একজন আছে, ঘুরে-ঘুরে লেন-দেন দেখছে, মালের হিসেব রাখছে, কিন্তু বাড়তি এক পয়সা তার আসান নেই—'

'ও! তুমি তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেবার কথা বলতে বলছ? তাই না?'

এবার আর কাষ্ঠ নয়, পুষ্পহাসি হাসল দীপঙ্কর। বললে, 'বুঝেছ এতক্ষণে?'

'বাঃ, এ তো তুমি নিজেও বলতে পারো।'

'আমি বললে হবে না।' মুখ নিচু করল দীপঙ্কর।

'আমি বললে হবে?'

'হবে। তুমি ওর বন্ধু। তোমার কথা ও পারবে না ঠেলতে।'

'বাঃ, ওর বন্ধু তো তুমিও। আমি তো জানি সেই সুবাদেই তোমার চাকরি হয়েছে এখানে।'

'কার সঙ্গে কার তুলনা!' ম্লান একটু হাসল দীপঙ্কর। বললে, 'আমি ওর মুখ-চেনা, আর তুমি ওর হৃদয়-চেনা। স্কুল পর্যন্ত এক সঙ্গে ছিলাম তিনজন। পাশ করে তুমি ওকে টেনে নিয়ে গেলে স্কটিশে, আমি হলাম বঙ্গবাসী। সেই থেকে তোমার সঙ্গে না হলেও ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আর, বলো, ওর ঘনিষ্ঠই বা আমি ছিলাম কবে! স্কুলে কোনো দিন বসিও নি পাশাপাশি।

'স্কটিশেই বা ক'দিন ছিল আমার সঙ্গে!'

'নাই বা থাকল। তুমি এগিয়ে গেলে আর ও দু-দু'বার আই-এতে ফেল করে কেটে পড়ল। কেটে পড়ল তো নয়, ফেটে পড়ল। নিজে ব্যবসাতে নামল, বাপের কিছু হচ্ছিল না এদিক-সেদিক, তাকেও নামাল। দেখতে-দেখতে দশদিক পয়মন্ত করে তুলল। ছোকরা বয়সের মাথায় রক্ত এসে উঠলেও মনে মনে এখনো কিছু সবুজ আছে। অন্তত কারু কারু কাছে আছে। আর তাদের মধ্যে তুমি যে একজন তাতে সন্দেহ কি। তোমাদের কত একদিন ভালোবাসা ছিল!'

'ছিল!' সুকান্ত হাসল।

'যতই এখন উপেক্ষার ধুলো পড়ুক, ধৈর্য ধরে কিছুটা বালি খুঁড়লেই পাওয়া যাবে ভালোবাসার জল।' দীপঙ্কর বললে, 'আমরা যখন ফার্স্ট ক্লাসে উঠে ওকে ধরি, ও তার আগে দু-দু'বার এলাউড হয় নি টেস্টে। মনে আছে, তুমিই ওকে নিজের কাছে বসিয়ে পড়িয়ে-পড়িয়ে তরিয়ে দিলে। আর মনে নেই সেই খেলার মাঠের কথা?'

'সে আবার কবে?' অবাক হবার ভাব করল সুকান্ত।

'সেই খেলার মধ্যে কালবোশেখীর প্রচণ্ড ঝড় উঠল, দশদিক আঁধার করে নামল অঘোর বর্ষণ, আমরা যে যার দিকে ছুটলাম আশ্রয়ের খোঁজে। কেউ লক্ষ্যও করি নি কখন একটা গাছের ভাঙা ডাল এসে বরেনের উপর পড়েছিল। তুমি কাছে ছিলে, তুমি দেখলে। দেখলে, বরেন মাটিতে মুখ থুবড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। সাহায্যের জন্যে কত নাম ধরে ডাকলে আমাদের, ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবের মধ্যে কে তা শোনে। শুনলেও কে তার জবাব দেয়! তখন তুমি কী করলে? তুমিও ছুটলে।'

'বলো কি, আমিও ছুটলাম!'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি ছুটলে নিজেকে বাঁচাতে নয়, বন্ধুকে বাঁচাতে। ঝড়জলের মধ্যেই লোকজন নিয়ে এলে, গাড়ি নিয়ে এলে, খবর পাঠালে বাড়িতে। ধরাধরি করে ওকে তুলে নিয়ে এলে, এক ডাক্তারখানায়। বাঁচিয়ে দিলে ওকে, ভালো করে তুললে। কি, মনে নেই?'

'আমার মনে থাকায় লাভ কী! বরেনের মনে আছে কিনা সেইটেই জিজ্ঞাস্য।'

'নিশ্চয়ই আছে। সে কথা কি কেউ ভুলতে পারে? ঝড়জল মাথায় করে অন্ধকার মাঠ দিয়ে তোমার সেদিনের ছোটাটা জ্বলন্ত রেখায় এখনো আঁকা আছে চোখের সামনে।'

'কিন্তু কে জানে সেদিনের সেই অন্ধকার আর কারু মনে হয়তো অন্ধকারই হয়ে আছে।' বললে সুকান্ত, 'জলের ঝাপটায় একটি রেখাও হয়েতো আর জেগে নেই।'

'আছে, আছে।' জোর দিল দীপঙ্কর : 'একটা পশুরও স্মরণশক্তি থাকে। আর এ তো বন্ধু—এক স্কুলের ছাত্র।'

'এক সার্কাসের জানোয়ার।' হাসল সুকান্ত।

'তাই তুমি বললেই হবে। তুমি যদি বলো আমার হয়ে—'

'বলব, নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু আমি ভাবছি, বাড়তি কাজের জন্যে বাড়তি মাইনের দাবি এ তো বিধিমত তোমারই করা চলে। এ তো ন্যাচারেল জাস্টিসের কথা। তা ছাড়া, তুমি স্কুল-ফ্রেণ্ড, পুরোনো পরিচিত, তোমার কথামত অন্তত মুখ-চেনা তো নিশ্চয়ই—'

'মুখ-চেনা!' অধররেখাটা বঙ্কিম করল দীপঙ্কর : 'ভাবে ভঙ্গিতে সেই পুরোনো দিনের গন্ধ এতটুকুও ভেসে আসে না কোনো দিন। আমি তো ওর এমপ্লয়ী, ওর চাকুরে। আগের সুরে আমাকে আর ভুলেও তুমি বলে না—আপনি বলে।'

'বাঃ, তাই তো বলবে। তাই তো আজকালকার কোড অফ কনডাক্ট, ব্যবহারনীতি। নিম্নপদস্থকেও আপনি বলতে হবে। বাস-ট্রাম কণ্ডাক্টর তো দূরের কথা, আফিসের চাপরাশি, পোস্টম্যান, এমন-কি হোটেল-রেস্তরাঁর বয়কেও তুমি বলা চলবে না। চাকরদের জন্যে যে বিল আসছে তাতেও একটা ক্লজ থাকবে, তাদের আপনি বলা চাই। রেল-স্টিমারের কুলিদেরও সেই আওয়াজ।' সুকান্ত প্রায় বক্তৃতা দিয়ে উঠল।

'তুলুক আওয়াজ, আপত্তি নেই। কিন্তু কাজকর্মের বাইরে, আফিসের বাইরে, একেবারে আলাদা পরিবেশে যখন দেখা হয়, তখনো সেই 'আপনি'। কিছুতেই পুরোনো চোখে চায় না চিনতে। প্রভুত্বের চোয়ারটা সব সময়েই পিছনে লাগিয়ে চলেছে।'

'আর যেই তোমার সামনে বসছে গ্যাঁট হয়ে, তুমিও বাধ্য ছেলের মত দাঁড়াচ্ছ হেঁট হয়ে।' সুকান্ত ঝাঁজ আনল গলায়।

'উপায় কী তা ছাড়া। প্রভুর কাছে ভৃত্য সব সময়েই ভৃত্য। নিত্যভৃত্য।'

'তবে দেখা করে কাজ নেই।' সুকান্ত পিছু হটল : 'হয়তো আমাকেও চিনবে না, আপনি করে বলবে।'

'না, না, তুমি তো ওর এমপ্লয়ী নও—'

'রক্ষে করো।'

'তোমাকে তাই ঠিক চিনবে। কথা কইবে আগের সুরে।'

'তা হলে যেতে বলছ? যাব?'

'অন্তত আমার জন্যে যাও। আমার বিশ্বাস তুমি বললেই আমার সুরাহা হবে। তুমি বললেই জাস্টিসটা স্পষ্ট হবে ওর কাছে। নইলে, মানুষের জাস্টিস আর কী! যার যেখানে স্বার্থ তার সেখানে জাস্টিস! সেই জজই খুব জাস্ট যে আমার মামলাতে ডিক্রি দেয়। আমি ডিসমিস খেলেও বিচারকে বিশুদ্ধ বলব, প্রশংসা করব জজকে, এ কথা শাস্ত্রে পুরাণে ইতিহাসে কোথাও লেখা নেই।' কষ্টে হাসল দীপঙ্কর : 'সব জানি। কিন্তু আমার অবস্থাটা তো স্বচক্ষে দেখে এসেছ। কিংবা দেখনি হয়তো পুরোপুরি। আমার বাবাকে দেখ নি।'

'তোমার বাবা!'

'হ্যাঁ, লোকে কাঁদে ভাতের জন্যে, ছাদের জন্যে, আর আমার বাবার কান্না আফিঙের জন্যে। আমি এক দিকে কমাই উনি আরেক দিকে বাড়ান। কিছুতেই পাল্লা দিয়ে উঠতে পারি না তাঁর সঙ্গে।'

'কী কমাও-বাড়াও?' সুকান্ত কৌতূহলী হল।

'আমি ভার কমাই, উনি ধার বাড়ান। আর ধার অত বেশি হলে তাতে সব কিছুই কাটা পড়ে। পেটের ভাত পরনের কাপড় স্কুলের বই তো বটেই, ঝি-চাকর, মাস্টার-ডাক্তার, এমনকি মান-সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা-ভক্তি—সমস্ত।' বারান্দা দিয়ে সুকান্তকে এক পা এগিয়ে দিল দীপঙ্কর। গলা নামিয়ে বললে, 'বলের আগে কৌশল ভালো। যদি ধরাধরি করেই হয় তবে আর লড়ালড়ির দরকার কি। মীমাংসা একান্ত না হলেই তবে বংশ সিংকে ডাকা যাবে।' একটু থামল দীপঙ্কর : 'তবে তুমি যখন আছ তখন বংশীতেই কাজ হবে হয়তো।'

'ঢুকব যে কার্ড লাগবে না তো?' পারে এসেও সুকান্তর দ্বিধা নাকি?

'তোমার আবার কার্ড!'

সুইং-ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল সুকান্ত।

ব্র্যাকেটে কোট ঝুলছে হ্যাঙ্গারে, শার্টে-টাইয়ে-ট্রাউজার্সে দক্ষতাযোগ্যতার প্রতিচ্ছবি, বরেন বসে আছে নিখুঁত মনোযোগে। বিরক্ত-সন্দিগ্ধ চোখে আগন্তুকের দিকে তাকাল সূচ্যগ্র স্তব্ধতায়। ক্ষণপরেই উঠল উত্তাল হয়ে : 'আরে, সুকু, সুকু যে। কী মনে করে? আয় আয়, বোস।' ভঙ্গির সমস্ত তীক্ষ্ণতা মুহূর্তে ভোঁতা করে দিল। শৈথিল্যে ডুবে গিয়ে বললে, 'কতদিন পরে দেখা বল তো।'

নিশ্চিন্ত হয়ে বসল সুকান্ত। মুখময় মিষ্টি হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন আছিস?'

'তুই কেমন আছিস? চেহারাটা তো বেশ ব্রাইট দেখাচ্ছে।'

'তোর চেয়েও?'

'আমার সব পোশাক। মলাট।'

'ললাট বল।' সস্নেহে তাকাল সুকান্ত।

'ললাট মানে কপাল, তাই না?' যন্ত্রচালিতের মত কপালে একবার হাত বুলোল বরেন। বললে, 'কিছু নেই, খা-খা করছে। বিদ্যার জাহাজ তোরা, এক কথায় তোরাই তো বিদ্যাপতি। আমরা তো কুলিমজুর। নে, সিগারেট খা।' সুকান্তকে একটা দিয়ে নিজে ধরাল আরেকটা : 'তারপর কী করছিস? এম-এ হয়ে গিয়েছে? বাঃ, কোথাও ঠেকলি না একটুও। তারপর? এখন?'

'রিসার্চ করছি।'

সুকান্তর দিকে করুণার চোখে তাকাল বরেন। বললে, 'তোর ছাত্রত্ব আর ঘুচল না।'

'কিন্তু পাত্রত্ব ঘুচছে।'

'তার মানে?' টেবিলের উপর দু' কনুই রেখে ভঙ্গিটা ধারালো করল বরেন।

'তার মানে আর পাত্র থাকছি না। ফুটোপাত্তর হয়ে যাচ্ছি। বুঝলি না?'

'না।' বোকা-বোকা মুখ করল বরেন।

'তার মানে বিয়ে করছি। এ জীবনে আর বিয়ের পাত্র বলে চিহ্নিত হব না তারই দুঃখে হাহাকার করছি।' চোখে মুখে আনন্দ নিয়ে জ্বলে উঠল সুকান্ত।

বরেন গলা ছেড়ে হেসে উঠল হো হো করে। বললে, 'তাই। তাই তোর চেহারাটা এত চেকনাই মারছে।'

'সত্যি?'

'কিন্তু এখুনি? এরই মধ্যে বিয়ে?' অনুকম্পার সুর আনল বরেন : 'শেষ পরীক্ষা হয়ে গেল, সম্বন্ধ করে বাবা-মা পাত্রী বেছে দিলেন আর অমনি রাজি হয়ে গেলি? এই উঠতি বয়সেই ক্লান্তি এসে গেল? এখন রাত কত?'

'রাত জন্মায় নি এখনো।

'বাব-মা ডাল-ভাত মেখে গরস পাকিয়ে দিলেন আর তাই নির্বিবাদে গালে পুরলি? বিয়েটা একটা হাতের মোয়া? ক্রিকেটের ডলি ক্যাচ? কি রে, মুখ টিপে হাসছিস কী!' শাসনবিলাসী বিজ্ঞের মত মুখ করলে বরেন : 'একটু দুর্গমের পথে যাবি না? একটু কঠিন করে জটিল করে নিবি না? হাত বাড়িয়েই যে ফল পাড়া যায় তার চেয়ে গাছে চড়ে তার মগডাল থেকে ছিনিয়ে আনা ফল কি বেশি মিষ্টি নয়? কঠিন না হলে কি দামি হয়? জটিল না হলে কি আনন্দ আছে? রোমাঞ্চ আছে? তার মানে? মাথা নাড়ছিস কেন? খুব দাঁও মেরেছিস বুঝি?'

'একটা কলাই যথেষ্ট, এখানে একেবারে আটটা। অষ্টরম্ভা।'

'তবে আকর্ষণটা কিসে?' চোখ দুটো একটু সরু করতে চাইল বরেন : 'মানে, জিনিস খুব ভালো?'

শব্দ করে হেসে উঠল সুকান্ত। বললে, 'তা এখুনি কী করে বলি! ফিনিশ না হলে কি জিনিস বোঝা যায়?'

'তা হলে রহস্যটা কোথায়?'

'তুই এত বুঝিস আর এটুকু বুঝলি না? ভালোবাসার নাম শুনেছিস?'

'স্কার্লেট ফিভারের নাম শুনেছি।'

'ঐ, হ্যাঁ, ঐ লাল জ্বর। যাকে বলে, রুধিরে যন্ত্রণা। সেই ভালোবাসা হয়েছে।'

'ভালোবাসা হয়েছে!' ঠাট্টা করে উঠল বরেন : 'তুই একটা মেয়েকে ভালোবাসিস এ সহজেই আন্দাজ করতে পারি। এককালে যাকে দেখতিস তাকেই ভালোবাসতিস—সে কথা নয়। কিন্তু তোকে কোনো মেয়ে গায়ে পড়ে ভালোবাসবে এ অবিশ্বাস্য। বলি, কে, মেয়েটা কে?'

'আমার সঙ্গে পড়ত। আমার সঙ্গেই পাশ করেছে এম-এ।'

'বলিস কি! একটা এম-এ পাশ মেয়ে তোর প্রেমে পড়েছে!'

'সেইটেই তো আশ্চর্যের দেশে মহাশ্চর্য। তুই তো আমাদের সব জানিস—কত ত্রুটি কত দৈন্য নিয়ে বড় হয়েছি। চাল নেই, চুলো নেই, কিস্তু নেই, বেসাত নেই—অধম-অধনদের একজন, তবু দ্যাখ কী অদ্ভুত, তাকেই কিনা একজন ভালোবাসে, আর শুধু ঠুনকো এক রাত্রির জন্যে নয়, জীবনভোর দিন-রাত্রির জন্যে তাকে পেতে চায়! পৃথিবীর ধুলোতে আশ্চর্যের ঋতু এখনো শেষ হয় নি। সূর্য উঠুক আর অস্ত যাক, আশ্চর্যের উদয়াস্ত নেই।'

বরেনের মনে হল আবার সে হারল, মার খেল সুকান্তের কাছে। চেয়ারের আলস্যে ঢলে পড়ল।

পাড়ায় তাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই যেদিন সুকান্তরা ভাড়াটে আসে সেদিন স্পষ্ট মনে আছে বরেনের। দূর মফস্বল থেকে এসেছে, বাঙাল-বাঙাল দেখতে, মোটেই তার উপর সদয় ছিল না বরেন। আর কী স্পর্ধা, তাদের স্কুলে এসে ভর্তি হল, শুধু স্কুলে নয়, ঠিক তার ক্লাসে, তারই সেকশনে, আর বলিহারি, উকিল-বাপের ছোট-হয়ে-আসা আলপাকাব কোট গায়ে দিয়ে বসল তার পাশটিতে। প্রথম-প্রথম মনে হত বরেনের, যেন কে-এক অস্পৃশ্য ঢুকে সমস্ত মন্দিরকে অশুচি করে দিচ্ছে। কথা কইতেও চাইত না, নাক সিঁটকে থাকত। কিন্তু একটা লোক যদি সর্বক্ষণ কারণে-অকারণে স্তবস্তুতি করে, উপকার করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে তবে তার প্রতি ক্রমে-ক্রমে নরম না হয়ে উপায় কি। ও কেন উড়ে এসে মোড়ালি করবে, শুধু লেখায়-পড়ায় নয়, এমন-কি খেলার মাঠে, বাঙাল হয়েও

কেন চিরকালের কাঙাল হয়ে থাকবে না, বরং আশেপাশে সবাইকে কাঙাল করে রাখবে, এ বরেনের অসহ্য ছিল। তবে যে লোক নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে অন্ধকার ঝড়ের থেকে অজ্ঞানকে বাঁচায়, নিজের শত-শত অসুবিধে ঘটিয়েও পড়িয়ে পাস করায়, তার প্রতি সুপ্রসন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুখে যাই বলুক, সর্বক্ষেত্রেই সুকান্তের হার হোক, তার গ্রাম্য উদ্ধত স্পর্ধা লুণ্ঠিত হোক ধুলোতে, এ বরেনের প্রচ্ছন্ন অভিলাষ। তাই বিদ্যায় না পারলেও যখন তাকে ব্যবসায় মারল, বরেনের গর্বের অবধি ছিল না। সাধ্য নেই টাকায় সুকান্ত তার নাগাল পায়। ঝকঝকে ক'টা ডিগ্রি পেতে পারে, কিছুটা হয়তো নাম, কিন্তু টাকার কাছে ওসব সোনার কাছে রাংতা। টাকা দিয়েই নাম-কাম রাম-শ্যাম কিনতে পারে সমস্ত। এমনকি, যদি সুকান্ত হাত পাতে, কিছু তাকে দিয়েই দিতে পারে অকাতরে।

খুব স্বস্তিতে ছিল বরেন, গৌরবের স্তম্ভিতে। কিন্তু এ আজ সে কী শুনল? একটি মেয়ে ভালোবেসেছে সুকান্তকে, তাকে তার হৃদয় দিয়েছে। আর এ মেয়ে স্রোতের শ্যাওলা নয়, স্থির জলের পদ্ম। শুধু রূপসী নয়, বিদুষী। আর, একটা হৃদয় পাওয়া মানে একটা সাম্রাজ্যের চেয়েও বেশি পাওয়া। তার চেয়ে ঢের ঢের বড় ধনী আজ সুকান্ত।

কতদিন ধরে একটা ভালোবাসার জন্যে বসে আছে বরেন। টাকার শব্দ দিয়ে তার নূপুরের ধ্বনি তৈরি হয় না। বসে আছি তো থাকব, আরো থাকব। কিন্তু এরই মধ্যে এক ফাঁকে সুকান্ত জয় করে নেবে অভাবনীয়কে—এ ধারণার অতীত।

'তোকে একটু দেখি ভালো করে।' বরেন তেরছা করে নিল চোয়ারটাকে। 'যে দৈব তোকে কৃপা করল দেখি সেই দৈবকে।'

'যুগলে দেখিস। তা হলেই ঠিক দেখা হবে, করুণাটা সমান-সমান না বেশি-কম।' উঠে পড়ল সুকান্ত। বললে, 'তোকে চিঠি দিচ্ছি। যাস কিন্তু। দু' জায়গায়ই যাস দু' দিন।'

'বাঃ, যাব না? নিশ্চয়ই যাব।' বরেনও উঠে পড়ল : 'তোর সেই শাশ্বতের প্রার্থনাকে দেখে আসব।'

'তোর বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন করলাম না বলে যেন কিছু মনে করিস নে।'

'ছি ছি, তোর সঙ্গে কি আমার সেই সম্পর্ক?' আবার একটা সিগারেট ধরাল বরেন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সুকান্ত।

ওত পেতে ছিল, দীপঙ্কর তাকে ঠিক ধরেছে। বললে, 'বরেন কী বললে আমার কথা?'

'বললে, হ্যাঁ, দেবে, দেবে তোমাকে একটা অ্যালাউয়েন্স—'

'দেবে?' সিঁড়ির মুখে দীপঙ্কর আটকাল সুকান্তকে : 'বলো তো কী আরাম! তুমি তদবির করলে বলেই তো এটুকু হল। বরেন যখন একবার কথা দিয়েছে তখন আর তার খেলাপ হবে না। তারপর তুমি আছ।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে গেল সুকান্ত।

আর, এদিকে কাকলি এসেছে বিনতাদের হোস্টেলে।

কতগুলি মেয়ে একটা চুটকি সিনেমা-কাগজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আহরণ করে নিচ্ছে। কে কোন ব্লেড দিয়ে দাড়ি কামায়, টেলিফোনের রিসিভর তুলে ধরে কোন কানে আগে পাতে, কেউ কাত হয়ে শুতে ভালোবাসে, রাত্রে কেউ ঘুমের মধ্যে হাঁটে কিনা এবং হাঁটতে হাঁটতে গেট পেরিয়ে চলে আসে কিনা রাস্তায়—

'এই, কাকলিদি!' ইউনিভার্সিটিতে যারা চিনত, ফিফ্‌থ ইয়ারের মেয়েরা, সমীহ করতে চাইল।

কিন্তু অন্যান্যদের সেই মেজাজ নয়। তাদের বয়ে গেছে যাকে চেনে না তাকে মান দিতে।

'খোল না বইটা। দ্যাখ না পরেরটা কী মজার প্রশ্ন! এঁরা কোত্থেকে সাবান-তোয়ালে কেনেন এবং সাবান-তোয়ালে কোন কোম্পানির?'

'বিনতা আছে?'

'তার ওপাশে ঘর। আছে কিনা দেখুন।'

দেখল, আছে। তার হাতে চিঠি দিল কাকলি। বললে, 'বিশেষ কাউকে বলছি না। তুই কিন্তু যাস। কেউ একদম না থাকলে ভালো লাগবে না।'

'যাব।' তৃষিত চোখে কাকলিকে সর্বাঙ্গে লেহন করল বিনতা। বললে, 'কিন্তু এক কথা। বিয়ের পরেই শিগগির তুই আমার কাছে একদিন আসবি।'

'বাঃ, তাতে কি, আসব।'

'আর আমাকে সব বলবি—কী হল-টল।'

খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'সে কি বলা যায়, না বোঝানো যায়? তুই ঘি দিয়ে ভাত খেয়ে এলে বলতে পারবি এ কেমন ঘি?'

সতেরো

ভূপেনবাবু স্তব্ধ হয়ে গেল, বাড়তে দিল না প্রেসার। যা অখণ্ডনীয়, তার সঙ্গে লড়তে যাওয়া বৃথা। কালস্রোতের সামনে সামান্য খড়কুটো হয়ে লাভ নেই। দূরে থাকা, সরে থাকাই সুন্দর।

কিন্তু মৃণালিনী হৈ-চৈ করে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। অথচ কার উপরে যে রাগবে পাচ্ছে না প্রতিপক্ষ, প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ। শুধু ধোঁয়াচ্ছে আর থেকে থেকে দমকা রাগে ফেটে ফেটে পড়ছে।

'এ কি রকম হল! এ কেমন বউ এল সুকান্তর!'

ঘরে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল প্রশান্ত, কথার সুরটা ভালো লাগল না। মা'র কাছে সুকান্ত যেন কী, ওড়া-ঘোড়া-চড়া রাজপুত্র, আর তার বউ ডানাকাটা পরী না হলে সমস্ত রূপকথার রাজ্যটাই যেন ভিত্তিহীন। মা'র ছেলে সুকান্ত, যখন-তখন অঘটন কিছু ঘটবে, সাপের মাথার মানিক আসবে হাতের মুঠোয়। তুলনায় সুকান্তের চেয়ে প্রশান্তকে মা কম মনোযোগ দিয়েছে, এই অভিমান থেকে মুক্ত ছিল না প্রশান্ত। সকলের দিনই একবার অন্তত ফিরে আসে। তেমনি বুঝি এসেছে আজ পাঁজির পৃষ্ঠায়। মা বুঝুন, শুধু বয়সেই নয়, আরো অন্যান্য ব্যাপারেও সুকান্তের চেয়ে প্রশান্ত বড় ছিল। বিদ্যায় না হোক, বুদ্ধিতে। অন্তত চরিত্রে তো বটেই।

অঘটন না ঘটুক, অ-রটন তো রটেছে।

চোয়ালের নিচে মোটা-করা গলার ভাঁজে জোরে ব্লেড ঘষতে ঘষতে প্রশান্ত বললে, 'এখনো তো কই আসে নি। আগে মাঠে নামুক, তারপরেই তো আসল খেলা শুরু হবে।'

দিন শুধু প্রশান্তের নয়, বন্দনারও ফিরে এসেছে। সে ঠোঁট উলটিয়ে বললে, 'বাঃ, এম-এ পাস!'

'প্রেমে পাস।'

'শুধু পাস নয়, ডবল প্রমোশন।' স্বামীর দিকে চেয়ে কুটিল হাসি হেসে বন্দনা চাপা গলায় বললে।

কম খোঁটা সইতে হয় নি বন্দনাকে। লেখাপড়ায় সেই মামুলি ম্যাট্রিক পর্যন্ত, রূপেও তেমন কিছু আহা-মরি নয়। বাইরে যে সবাইকে একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে সন্তোষ পাবে, তার উপায় নেই মৃণালিনীর। বাইরের জন্যে যাই হোক, ঘরের জন্যেই বা কী আনল? নগদ দু হাজার টাকা, তাতে তো বিয়ের খরচাই কুলোল না। উলটে ধার। আর ফার্নিচারের কী রোগা-ভোগা চেহারা! লরি থেকে নামাতে গিয়ে খাটের ছতরি ভেঙে গেল, আর আলনাটা আগে থেকেই দ হয়ে রয়েছে। বাঁচবার মধ্যে বেঁচেছে ড্রেসিং-টেবলটা, আর তাতে যা একখানা আয়না ফিট করা, তাকালেই মনে হবে যেন মুখচ্ছায়া নয়, চিরন্তন একটি পক্ষীকে দেখছি, যে পক্ষী লক্ষ্মীর বাহন। আর কানে এক তিল, গলায় এক সুতো, হাতে এক চিলতে, আর আঙুলে এক ফোঁটা যা দিয়ে সব দিয়েছে সাজিয়ে, তাকে গয়না বলে না, বলে গয়নার উপহাস। ক্ষুদ্র মনের দন্তবিকাশও বলা যায়।

দেখ, তোমার মা এত খোঁটা দেন, এক সময় কিন্তু পালটা জবাব দিয়ে ফেলব। বন্দনা আগে একবার বলেছিল প্রশান্তকে।

কী জবাব দেবে? সরল কৌতূহলে তাকিয়েছিল প্রশান্ত।

বলব, কী আপনার আই-এ পাশ ছেলে—

বি-এ ফেলটা বলবে না বুঝি?

যদি অনুমতি করো তো তাই বলব। কী আপনার বি-এ ফেল ছেলে, মার্চেন্ট আফিসের লো-গ্রেড ক্লার্ক, তার জন্যে আর যাই জুটুক, অর্ধেক রাজত্বওলা রাজকন্যা জোটে না। যেমন হাঁড়ি, তেমনি তো সরা বসবে মুখ মিলিয়ে।

আমার উপর দিয়ে বলবে তো? তা তুমি যত খুশি বলো। যত খুশি ঢালো। শুধু মা-বাবার উপর সরাসরি কটাক্ষ কোরো না।

না, না, তা করব কেন?

শুধু আমার উপর দিয়েই যখন বলবে, প্রশান্ত তাকিয়েছিল সস্নেহে, তখন তোমাকে আরো একটা জিনিস শিখিয়ে দি। শুধু বি-এ ফেল আর কম মাইনে বলেই ক্ষান্ত হবে না, বলবে, আপনার ছেলের তো অসুখ, পেটে ঘা, পুতুপুতু করে থাকে, তার আবার দর কী বাজারে! তা ছাড়া বিয়ের আগে থেকেই অসুখ, এ কথা বলেছিলেন আমাদের? তা হলে কে গলা বাড়াত! বিয়েই হত না। যেখানে বিয়েই নেই, সেখানে আবার লেনদেন। ঘোড়াই নেই, তার আবার চাবুকের ধুম।

কি রকম মায়াভরা চোখে তাকিয়েছিল বন্দনা। পালটা জবাব আর দেয় নি শাশুড়িকে। কোনো দিনই দেয় নি। মুখ বুজে সহ্য করে এসেছে। প্রতিশোধের দিন প্রতীক্ষা করেছে একমনে।

আর মৃণালিনী প্রতীক্ষা করেছে প্রশান্তের বিয়ের ক্ষতিটা পুষিয়ে নেবে সুকান্তকে দিয়ে। শুধু পাত্রীতে নয়, জিনিসপত্রে। কিন্তু এ কী প্রহসন!

ঘরের মধ্যে ছেলে-বউয়ের কথা, ঝাপসায় হলেও, শুনতে পেয়েছে মৃণালিনী। বারান্দায় এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে-করতে এগিয়ে এল দরজার দিকে। বললে, 'যাই হোক, বিয়েই তো হচ্ছে, সামাজিক বিয়ে। বাপ একেবারেই দেবে না, থোবে না, এমন কী কথা! শত হলেও তো মেয়ে।'

'মেয়েকে তো বাপ তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে।' আয়নায় চোখ রেখেই বললে প্রশান্ত।

'তাই তো কাকার বাড়িতে আয়োজন।' দিন পড়েছে বন্দনার, অনায়াসে সে-ও টিপ্পনী ঝাড়ল।

'যত সব বাজে কথা।' মৃণালিনী ঝাঁজিয়ে উঠল : 'বাপের বাড়িতে জায়গা কম, তাই কাকার বাড়িতে হচ্ছে। মানুষ তো বিয়ের ব্যাপারে স্কুল বাড়িও ভাড়া নেয়। তাই বলে সেটা কি মেয়েকে তাড়িয়ে দেওয়া হল? না কি তাই বলে মেয়েকে সালংকারা করে দান করে না বাপ-মা?'

জিভের ঠেলায় নিচের ঠোঁটের নিচে টিপলি পাকিয়ে তাতে সযত্নে ব্লেড ঘষতে লাগল প্রশান্ত। বললে, 'তা উনি তো সালংকারা হয়েই আসছেন।'

'মিথ্যে কথা।' ইঙ্গিতটা কোথায় মুহূর্তে বুঝে নিয়ে জ্বলে উঠল মৃণালিনী। বললে, 'যাতে কিছু দিতে-থুতে না হয়, তারই জন্যে বাপ-খুড়োর এই কারসাজি। এখন শুনতে পাচ্ছি, উচ্চ আদালতের জজ নয়, নিচু আদালতের। মফস্বলি হাকিম, ধড়িবাজ, সংক্ষেপে কাজ বাগাবার মতলব। নৈবিদ্যি না দিয়েই পুজো হাসিল।'

'জজ নয় মা, ম্যাজিস্টর।'

'বটে? তা হলে তো শুধু-ঘুঘু নয়, রাম-ঘুঘু। নইলে আমি মা, আমি জানি না সুকুকে?'

এবার গরম লাগল বন্দনার গায়ে। ফোস্কার মত ফুলে উঠে বললে, 'বেশ তো ঠাকুরপো গিয়ে তার ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা দাবি করুক না, আর শাসিয়ে আসুক, যদি তা না দেয়, এ বিয়ে ভেঙে দেবে।'

'ভেঙে দেবে!' এবার নাকের নিচে কসরৎ দেখাচ্ছে প্রশান্ত: 'তা হলে কোমরে দড়ি পড়বে। বিয়ে করলে নাকে দড়ি হত, না করলে কোমরে দড়ি।'

'এমনিতে বিয়ে না করলে পুলিস জোর করে বিয়ে দেওয়াতে পারে?' স্বামীর থেকে এসব ব্যাপারে আইন কানুন জানা না-জানি তার কত দরকার, এমনি একখানা ছাত্রী-ছাত্রী মুখ করলে বন্দনা।

'পুলিসে কী না পারে!' গালে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে প্রশান্ত দেখতে লাগল কাঁটা-খোঁচা কোথাও আছে কিনা লুকিয়ে। বললে, 'বিয়ে হোক বা না হোক, খোরপোষের দায় থেকে আর রেহাই নেই।'

বন্দনা খুশি-খুশি চোখে তাকাল স্বামীর দিকে। বললে, 'ডবল খোরপোষ!'

'আহা কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে যাচ্ছে।' মৃণালিনী ধমক দিয়ে উঠল। বললে, 'মুখ ফুটে দাবি-দাওয়া নাই বা করল, তাই বলে নিজের থেকে বাপ মেয়েকে কিছু দেয় না? দেবে না?'

'অমন মেয়েকে কোনো বাপেরই দিতে ইচ্ছে করে না।' বন্দনা সংসারের হালে এতদিনে পানি পেয়েছে।

'অমন মেয়েকে মানে?' ক্রুদ্ধ না শুনিয়ে আর্ত শোনাল মৃণালিনী।

'আর বর্ণনা করে বলতে হবে না। দু' দিন পরেই দেখতে পাব সকলে। বৃক্ষের কথা ফলই কইবে ভালো।'

এমন সময়ে বিজয়া এসে সেখানে দাঁড়াল। বললে, 'ওরা কিছু দিক বা না দিক, আমাদের ছেলের বিয়ে, আমারাই সব দেব বর-কনেকে। ওদের তোয়াক্কা করব না। ওরা না করুক, আমরা উৎসব করব।'

মুহূর্তে কী হল কে বলবে মৃণালিনী ঘি-পড়া আগুনের মত দাউ-দাউ করে উঠল। বললে, 'অমন ঘর জুড়ে থাকলে উৎসব হবে কি করে? উৎসব! বউ নিয়ে এসে সুকু ঐ কোণের ছোট্ট ঘরটাতে থাকবে আর উনি নিচের বড় ঘরটাতে বহাল তবিয়তে আমিরি করবেন, এই বুঝি উৎসবের চেহারা?'

'কী কথা বললাম আর তার কী উত্তর হল!' বিজয়া মূঢ়ের মত তাকাল বন্দনার দিকে। সংসার রণাঙ্গনে কে যে কখন কার পক্ষ নেয় বলা কঠিন। কিন্তু বিজয়া স্পষ্ট অনুভব করল, বন্দনা আজ তার দলে। তার বহুদিনের ক্ষতের স্তব্ধতা থেকে সরে গিয়েছে ব্যাণ্ডেজ।

'এই উত্তর হবে না তো হবে কী।' চড়া সুর নরম করল না মৃণালিনী : 'তোমাদের ক্ষমতা আছে, তোমরা কেন আলাদা বাড়ি দেখে উঠে যাবে না? কেন এখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকবে? তোমাদের ছেলেপুলে নেই, ঝাড়া হাত-পা, তোমাদের কেন কৃপণ-স্বভাব? এদিকে আমার ছেলেপিলেব ঘর, ক্রমশই বাড়বে, বড় হবে—নাতি-নাতনি—'

খুঁকখুঁক করে হেসে উঠল বন্দনা।

কান যখন পক্ষে, তখন মাথাও পক্ষে। তাই বলে উঠল প্রশান্ত, 'কেন, যে ঘর পাচ্ছে তা জেলখানার আন্দাজে মন্দ কি। তা ছাড়া কাকিমা যখন বলছে আরো এমিনিটিস, আরাম-উপশম জোগাড় করে দেবে। সবচেয়ে বড় কথা, পাচ্ছে এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ—'

'সেটা আবার কী?' উথলে উঠল বন্দনা।

'আজকাল জেলে চোরেদের খুব আদর। তাদের জন্যে বিড়ি, বড়-তামাক, দাড়ি কামানো, চুলছাঁট, খেলাধুলো, জলসা, চোরেদের মনোমত প্রোগ্রাম, মনোমত সব অ্যাক্টর-অ্যাকট্রেস। সে-এক আনন্দের লহরী। সবক্ষণ তাদের বলা হচ্ছে, ভাই সব, আবার ফিরে এসো জেলে। এমন সোহাগ আর পাবে না। যার আবার গুড কন্ডাক্ট, তাকে দেওয়া হচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে এক্সক্লুসিভ ইনটারভিউ।' স্ত্রীর দিকে তাকাল প্রশান্ত : 'তার মানে একা ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখাশোনা। ধারে-কাছে কোনো ওয়াচার থাকবে না, একেবারে নিজের বাড়ির মত ব্যবস্থা।'

'স্ত্রী যে, সব সময়ে শনাক্ত করবে কে?' দিন পড়েছে বন্দনার, হেসে নিল মুখ টিপে।

'আহা-হা, স্ত্রীলোক হলেই হল। স্ত্রীও তো স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছু নয়।' ক্ষৌরান্তিক পরিষ্করণটা রোজ প্রশান্ত নিজেই করে, আজ ব্লেড-ব্রাশ-বাটি সব বন্দনার দিকে চোখের ইশারায় ঠেলে দিল আর বন্দনাও প্রসন্নদৃষ্টির ইঙ্গিতে সায় দিল সেই সব ধুয়ে-মুছে তুলে রাখবে।

বিজয়া মৃণালিনীকে লক্ষ্য করে বললে, 'আপনার কি তবে তাই ইচ্ছে যে, সুকুর বিয়ে হবার আগেই আমরা চলে যাই?'

'বিয়ে না ইয়ে!' মৃণালিনীও পরাভূতের চেহারা করল : 'এ শুধু একটা বউ নিয়ে আসা। সঙ্গে না এক টুকরো আসবাব, না এক টুকরো গয়না। নগদ টাকা তো দিনের বেলার স্বপ্ন। সুবীরের কতদিনের সাধ, ছোড়দার বিয়েতে রেডিও পাবে. বাড়া ভাতে ছাই পড়ল সকলের। এ অবস্থায় যদি একখানা ঘর পাওয়া যেত, ফাঁকা ঘর, তা হলেও কিছুটা আসান হত। ভরাডুবিতে অন্তত মুঠো লাভ হত।'

এই ফ্রন্টে মৃণালিনী-বন্দনা একদিকে। আর যেদিকে কান, সেদিকেই আপাতত মাথা।

সত্যি কাকা-কাকিমা যেন কী! মোটা মাইনে পায় কাকা, কাকিমাও বাপের বাড়ি থেকে এনেছে ব্যাঙ্ক বোঝাই করে, অথচ কী কঞ্জুসের মত থাকে দেখ না। বিবরের মধ্যে দুটো ইঁদুরের মত খুঁটে-খুঁটে জীবনধারণ করে। আর, কত রাজ্যের জিনিস একটা ঘরের মধ্যে এনে ঢুকিয়েছে। নিজেদের দম বন্ধ হয়ে যায় না? আমার তো মনে হয়, ঘরটাই বুঝি মারা গেল। আচ্ছা, তোদের ভাবনাটা কী, টাকা জমাচ্ছিস কার জন্যে? পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই তো পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। তার চেয়ে নিজেরা খেয়ে যা না, খাইয়ে যা না। উড়িয়ে-পুড়িয়ে যা না। একটু ভালো ভাবে থাকতে ইচ্ছে করে না, একটু মেলে-ঢেলে, ছড়িয়ে-গড়িয়ে? ঢাউস একটা বাড়ি না করিস, ছিমছাম একটা ফ্ল্যাট নে না। এজমালি সংসারে নিত্যি বাথরুম নিয়ে ঠেলাঠেলি ভালো লাগে? খবরের কাগজ নিয়ে কাড়াকাড়ি? ভিজে কাপড় শুকোবার জন্যে রেলিঙ নিয়ে ভাগাভাগি? আর গল্পের বই আর ম্যাগাজিন—যা কিনা কাকিমার খাদ্য—তা জায়গারটা কোনোদিন পাওয়া গিয়েছে জায়গায়? আর জনে-জনে জিজ্ঞেস করো, সবাই ঘুরে-ঘুরে বলবে একবাক্যে, আমি কী জানি? ভালো লাগে এসব লোয়াজিমা? কত জন্মের তপস্যায় ঠিক সময়ে একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় রাস্তায়। ইচ্ছে করে না একটা গাড়ি কিনতে, অ্যাশট্রে-ওয়ালা গাড়ি? আর সিগারেট খেয়ে তার ছাই জানলা দিয়ে বাইরে না ফেলে ভিতের ট্রেতে ফেলতে? টাকা কি অব্যয়, না শুধু বিস্ময়ের চিহ্ন! টাকা হচ্ছে শুধু ক্রিয়া অসমাপিকা। এবং বলতে লজ্জা কি, আত্মনেপদী। নইলে শুধু কোনো রকমে থাকা, যেমন-তেমন করে থাকা, মাথা গুঁজে থাকা, টাকাতে লোকের কলঙ্ক। ইচ্ছে করে না গ্যাসের রান্না খেতে? খাবার টেবিলে ফর্সা চাদরের উপর প্লেট রাখতে? সোফায় বসে কার্পেটে জুতো ঘষতে? রেডিওতে খেলা শুনতে? রেফ্রিজেরেটারে আইসক্রিম বানাতে? কলিং বেলে আগন্তুক পেতে? ডিভানে শুয়ে নিওন লাইটে বই পড়তে? কি রকম যেন কাকা-কাকিমারা! এত ঠেকেও শেখে না। ছি-ছি, দিব্যি মানিয়ে-বাঁচিয়ে থাকে। টাকা যার আছে, তার কিসের অত কিন্তু-কিন্তু?

এবার যদি যায়!

ঝটপট ঝটপট করতে করতে বিজয়া নিচে তার ঘরে নেমে এল। হেমেনকে বললে, 'দিদি বলেছে সুকুর বিয়ের আগেই ঘর ছেড়ে চলে যেতে।'

দরজার বাইরে ডেকরেটারের সঙ্গে কথা বলছিল হেমেন। বিজয়ার কথা কানে নিল না। বললে, 'হ্যাঁ, একটা মাইক দেবেন। যে যাই বলুক, মাইক না থাকলে গমগম করে না, উৎসব-উৎসব লাগে না। আর, বলছেন, ফুটপাথ ঘেরবার জন্যে থানায় লিখতে হবে। তা লিখে দিচ্ছি। বিয়ের রাত্রে বেকার যুবক রাজা আর ঘুঁটে-গোবরের ফুটপাথ রাজোদ্যান।'

ডেকরেটারকে বিদায় দিয়ে ঘরের মধ্যে পুরো স্ফুটিত হতেই বিজয়া আবার তেরিয়া হয়ে উঠল · 'অপমানের একটা সীমা আছে। দু' দিন বাদে ছেলের বিয়ে, বলছে কিনা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যা, তোর ঘরে থাকবে ছেলে-বউ। আর কিছু না পাই ঘর পেয়ে বুক ভরবে—'

'মাথা খারাপ হলে ওরকম অনেক কথাই বলে থাকে অনেকে। গায়ে মাখতে হয় না। এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিতে হয়।' চেয়ারে বসে মউজ করে এক টিপ নস্যি নিল হেমেন : 'অপমান ভাবলে যন্ত্রণা, পাগলামি ভাবলেই মহাশান্তি।'

'তোমার তত্ত্বকথা শুনতে চাই না।' মুখচোখ আগুন হয়ে আছে বিজয়ার। বললে, 'আজকেই যে করে পারো একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করো। যত ভাড়া চায়, যত সেলামি। নয়তো সেই যে কে মেমসাহেব পেয়িং গেস্ট রাখে সেখানে গিয়ে উঠব। যাও, খোঁজ করো। নিদেন একটা হোটেলে ঘর নাও। দিশি-বিদেশী যেখানে হোক, যত টাকা লাগুক—'

'দাঁড়াও, হালুইকরের ফর্দটা দেখি।' কী একটা কাগজের টুকরো গভীর মনোযোগে দেখতে লাগল হেমেন। বললে, 'আমি এখন সরি কি করে? আমার হাতে এখন কত বড় কাজ!'

'কাজ—তোমার কাজ?' মুখ ভেংচে উঠল বিজয়া : 'তোমাকে সকলে কত পোঁছে!'

'পুঁছুক না পুঁছুক, কাজটা তো নির্বাহ করতে হবে। দাদার কাছে গেলুম, দাদা বললেন, তিনি কিছু জানেন না, যে এ কাজ করেছে সে এর ব্যবস্থা করুক।'

'ঠিকই তো বলেছেন।' খাটের উপরে গ্যাঁট হয়ে বসল বিজয়া।

'মোটেই ঠিক বলেন নি। ওটা ক্ষোভের কথা, অভিমানের কথা। নইলে সুকু ছেলেমানুষ, ও এর কী ব্যবস্থা করবে?'

'তাই তোমাকে মাতব্বরি করতে হবে! গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল! এতে তোমার কী?'

'আমার কী মানে? দাদার মান, পরিবারের প্রতিষ্ঠা—এ আমি দেখব না? আমি থাকতে সব হেঁটমুখ হয়ে দাঁড়াবে? বাড়ির ছেলের বিয়ে হবে, বউ আসবে ঘরে, আর সমস্ত বাড়ি শোকের চেহারা করে থাকবে?'

'তাই তো উচিত। কী কীর্তি করেছেন ছেলে তা তো আর জানো না।'

'রাখো।' ধমকে উঠল হেমেন। 'বিয়ের মন্ত্রটা চলতি বাঙলায় না কি মৃত সংস্কৃতে, ক'দিন আগে না পরে, এ নিয়ে বুদ্ধিমানে মাথা ঘামায় না। আমার পাঁঠা আমি যেদিকেই কাটি তাতে লোকের কী বলবার? বই লিখছি আমি, তাতে আমি যদি শেষ পরিচ্ছেদ আগে লিখে প্রথম-দ্বিতীয় পরে লিখি, তা হলে বই কি অশুদ্ধ হবে? বাজারে চলবে না?'

'বাজারেই চলবে।' দাঁতে দাঁত রাখল বুঝি বিজয়া।

'না, সমস্ত ব্যাপারটা স্বাভাবিক করতে হবে, সম্ভ্রান্ত করতে হবে। এমনিতে যেমন জাঁকজমক হওয়া উচিত কোনো অংশে তার ত্রুটি করা চলবে না। ম্যারাপ বাঁধা হবে, আলোয় আলোকময় হয়ে উঠবে বাড়িঘর। তুমি নেমন্তন্নের লিস্টিটা দেখ নি বুঝি।'

'তুমি আজ আফিসে যাবে না?'

'না, ছুটি নিয়েছি ক'দিন। ছুটি না নিয়ে চলবে কি করে? হাত বাড়িয়ে শার্টটা দাও তো, প্রেসে গিয়ে নেমন্তন্নের চিঠিগুলি ডেলিভারি নিতে হবে। তারপর লিস্টি ধরে বেরোতে হবে বিলোতে। দাদা বলেন, যার বিয়ে সে সব ব্যবস্থা করুক। সুকু সেদিনের ছেলে—ও এসব পারবে? কাকে বলতে কাকে বাদ দেবে তার কিছু ঠিক আছে? আমরা যখন মাথার উপর আছি তখন ঝক্কি আমাদের—'

'কত তোমাকে মাথায় করে রেখেছে! এত বড় কাকা, বলে কিনা ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাও বাইরে!'

'কথাটা খুব খারাপ বলেনি।' হাসল হেমেন। বললে, 'আমাদের এ ঘরটা পেলে ওদের বেশ ভালো হত, তাতে আর সন্দেহ কি।'

'তবে চলো না, এখুনি চলো না ঘর ছেড়ে।' খাট থেকে উৎসাহে নেমে পড়ল বিজয়া : 'ফেরবার সময় সব ঠিক করে একেবারে একটা লরি নিয়ে এসো।'

'আস্তে। অত উতলা হোয়ো না। যাব, ক'দিন পরে যাব। গোলমালটা চুকুক, আর একটা বাড়ি-টাড়িও দেখে ফেলি এর মধ্যে। ক'দিন ওদের কষ্ট।' শার্টটা নিজেই টেনে নিয়ে পরল হেমেন : 'সত্যি উপরের ঐ ছোট ঘরটায় বেঞ্চিমাফিক দুটো চিলতে তক্তপোশ সরিয়ে দিলেও বড়সড় একটা খাট পড়ে না। তা কি আর করা, যেমন পড়ে তেমনি মাপেরই অর্ডার দিয়ে দিলাম।'

'আর বিছানা?'

'উপায় কি, ও-বাড়ি থেকে যখন কিছুই দেবে না তখন আমাদেরই দিতে হবে। কিন্তু সত্যি, দোকান থেকে কেনা নতুন ওয়াড়-দেওয়া লেপ বালিশ বিছানা মশারির কী অপূর্ব গন্ধ বলো তো। তার কাছে ফুলের গন্ধ লাগে না।' চৌকাঠের বাইরে গিয়েছিল, আবার ফিরল হেমেন। বললে, 'আচ্ছা, তোমার জন্যে কী আনব বলো? তুমি কী দেবে বউকে?'

'এই কলা দেবে।' এবার একটা ম্যাগাজিন নিয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ল বিজয়া।

'ছি, তুমি কেন নিষ্ঠুর হবে? নতুন বউ—ভাবো তো সে কেমন এক পবিত্র মূর্তি—তাকে তুমি একটু অভ্যর্থনা করবে না? সেই তুমি যে প্রথম এসেছিলে নতুন বউ সেজে, তুমি চাও নি সকলে তোমাকে আদর করুক, কেউ কেউ দিক কিছু সোনাদানা, আর বাকি সব শাড়ি আর শাড়ি, বই আর বই—'

চোখের কোণ থেকে কি রকম করে তাকাল বিজয়া।

'আমি বলি কি, তোমার নামে একটা নেকলেস কিনে আনি। আর সেটা তুমি—আহা, কী জানি নাম, তুমি ওকে পরিয়ে দাও নিজের হাতে।'

'জানি না। তোমার যা খুশি তাই করো।' খাটের উপর পা টান করে দিল বিজয়া।

'তোমার যা খুশি তাই করো।' এ কথা বনবিহারীও বললেন নরনাথকে, যখন নরনাথ বললে, কাকলিকে দু' দিন আগেই আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

কাকলি এসে দাঁড়াল বাপের কাছে। প্রণাম করল।

নরনাথ বললে, 'ওকে আপনি আশীর্বাদ করুন।'

চুপ করে রইলেন বনবিহারী।

'আপনি এমন একটা কাণ্ড করছেন, যে শুনবে সেই টিটকিরি দেবে। কী সাংঘাতিক সেকেলে আপনি! কাকলির অপরাধ সে নিজে পাত্র বেছেছে, সেটা অপরাধই নয়, আর সে পাত্র সম্প্রতি বিত্তহীন, সেটা তার নিজের রুচি, নিজের নির্বাচন।'

'এসব কথা অনেক হয়ে গিয়েছে।' বিরক্তমুখে বনবিহারী বলশ্লেন, 'আমি সেজন্যে চুপ করে থাকি নি। আমি ভাবছিলাম আশীর্বাদ করবার আমার অধিকার আছে কিনা—'

'সে কী কথা? আপনি বাপ—'

'ভাবছিলাম মানুষেরই আছে কিনা। নেই। মানুষ আবার কী আশীর্বাদ করবে! শুধু ভগবান করবেন।'

'বেশ তো তাই বলুন না, তোকে আশীর্বাদ করুন।'

নরনাথের কথায় পুনরুক্তি করলেন বনবিহারী।

ইন্দিরাও এসেছে। নরনাথের সঙ্গে সেও পিড়াপিড়ি করতে লাগল গায়ত্রীকে।

গায়ত্রী বললে, 'মেয়ের বিয়ে মা দেখে না।'

'সম্প্রদান হয়ে যাবার পর দেখে।'

'কোনো সময়েই দেখে না। চোখ বুজে থাকে।' প্রাণপণে চোখ বুজল গায়ত্রী।

কাকলি মাকে প্রণাম করল।

নরনাথ বললে, 'আশীর্বাদ করুন।'

'মুখ ফুটে পারব না বলতে।' চোখ খুলল না গায়ত্রী : 'তবে অন্তর্যামী মনের কথা কিভাবে বুঝে নেবেন তা তিনিই জানেন।'

কাকলিকে নিয়ে সস্ত্রীক চলে যাচ্ছে নরনাথ, বনবিহারী চেঁচিয়ে উঠলেন : 'সম্প্রদান করবে কে?'

'দেবু, দেবনাথ। তাকে অনেক করে পটিয়েছি।'

আঠেরো

বিনতা সাজাচ্ছে কাকলিকে। পুঙ্খপুঙ্খ করে।

'একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?' মৃদুকণ্ঠে আপত্তি করল কাকলি।

'এর আর বেশি নেই।' বললে বিনতা, 'যতই চড়াচ্ছি ততই কম পড়ছে মনে হচ্ছে।'

'বউ-বউ লাগছে তো?' হাসল কাকলি : 'না কি অ্যাকট্রেস-অ্যাকট্রেস?'

'লক্ষ্মী-লক্ষ্মী লাগছে।' কাকলির চিবুকের নিচে হাত রেখে মুখখানি উঁচু করে তুলে ধরল বিনতা।

'সে কি? খুব ন্যাকা-ন্যাকা দেখাচ্ছে বোধ হয়? না, তা হবে না। বেশ একটা তেজী-তেজী কালী-কালী ভাব এনে দে।'

'কালীর ভাব ধরতে কতক্ষণ?' হাসল বিনতা : 'ঠোঁটে রঙ বা রক্ত তো আছেই। গায়ের আভাটি শুদ্ধ করে বলতে গেলে শ্যামাই। এখন উপর-পাটি দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেই একেবারে চণ্ডমুণ্ডবিখণ্ডিনী।'

'নিচের ঠোঁট কেন, জিভ বের করে জিভ কামড়ে ধরব।' সংশোধন করতে চাইল কাকলি।

'না, না, সে একটা ঘোরতর লজ্জার অবস্থা।' দুই চোখে বিদ্যুৎগর্ভ ইঙ্গিত পুরে বিনতা বললে, 'তা হলে সুকান্তকে এসে তোর পায়ের তলায় শুতে হয়। আর, তোর গায়ে এসব সাজসজ্জাও এক তন্ত রাখা চলে না।'

বিনতার হাতে মিষ্টি করে চিমটি কাটল কাকলি। বললে, 'দরকার নেই কালী সেজে। কালীকে যে কি করে আবার ভদ্রকালী বলে বোঝা কঠিন। দরকার নেই, কৃতার্থ-কৃতার্থ মুখ করেই বসে থাকি।'

'আয়নায় দেখবি একবার?' উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠল বিনতা। বললে, 'তুই নিজেও জানতিস না তোর মুখে কত শ্রী ছিল কত আনন্দ —'

'সত্যি?'

'এমনি একটা দিনের ছোঁয়াচ না লাগলে সে প্রচ্ছন্ন বিকশিত হয় না।' ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস চাপা দিল বিনতা। বললে, 'যাই, একটা আয়না নিয়ে আসি।'

'না, না, যেতে হবে না, আয়না এখানেই আছে।' বাধা দিল কাকলি।

'বাঃ, কই, এখানে আয়না কোথায়?'

নিবিষ্ট চোখে বিনতার দিকে তাকাল কাকলি। বললে, 'তোর মুখই আমার আয়না। তোর মুখেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নিজেকে।'

স্থির হল বিনতা। তার মুখে কি তৃপ্তির লাবণ্য আঁকা, প্রাপ্তির সৌভাগ্য? তার মুখ কি বিজয়িনীর? আনন্দিনীর? কাকলি কি তাই দেখল? না কি বুঝে-সুঝেও ইচ্ছে করেই বিদ্রূপ করল তাকে?

বিষাদের মেঘ উড়ে এসে প্রায় ঢেকে দিচ্ছিল বিনতাকে। এমন সময় নিচে রব উঠল, বর এসেছে, বর এসেছে। সাধ্য কি কেউ স্তিমিত থাকে, শিথিল থাকে, উচ্চকিত না হয়! ক্ষিপ্র হাতে একটা শঙ্খ কুড়িয়ে নিয়ে বিনতা ফুঁ দিল।

আওয়াজটা বেরুল না নিটোল হয়ে। কেমন বিকৃত হয়ে গেল। কে একটি আগন্তুক মেয়ে বিনতার হাত থেকে শঙ্খটা কেড়ে নিয়ে তুলল নির্মল ধ্বনি। ফুঁ দিতে-দিতে নিচে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। যেন ধিক্কার দিয়ে গেল বিনতাকে।

খান তিন ট্যাক্সি করে এসেছে বর আর জন দশ বরযাত্রী। নরনাথ যে অনুরোধ করেছিল সংক্ষেপে সারতে, তা, ওরা লোক ভালো, অগ্রাহ্য করে নি। নিজেও অক্ষুণ্ণ রেখেছে বনবিহারীর অভিলাষ। কোনোরকমে দায় সারা।

'হ্যাঁ, ডিস খাইয়ে দেবে।' বলেছিল বনবিহারী : 'যা না বিয়ে তার আবার খাওয়া।'

'তবু বরযাত্রী যারা আসবে তাদের ভরপেট না খেতে দিলে কি রকম দেখায়!' নরনাথ আপত্তি করলে।

'কিছুমাত্র খারাপ দেখায় না।' বনবিহারী বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠলেন : 'তবে তোমার শখ হয় ভাণ্ডারা বসাও। গায়ে পড়ে নিজের উপর ঝক্কি নিয়েছ, নিজেই নেমন্তন্ন করে ডেকে আনছ লোকজন, নিজেই ঠেলাটা সামলাও এবার। নিজের থলের মুখ খুলে দাও। জন পঞ্চাশ লোকের ডিসের খরচ যা পড়তে পারে আমি তাই দেব।'

'কিন্তু', মাথা নিচু করে কানের পিঠটা চুলকোতে চুলকোতে নরনাথ বললে, 'বিয়ের কনের গায়ে দু' একখানা নতুন গয়না না উঠলে কেমন দেখায়! সোনা অল্প হোক, তবু ক'গাছ চুড়ি এক ছড়া হার আর এক জোড়া বালা—আর কানে—'

গর্জে উঠলেন বনবিহারী : 'মাথায় মুকুট দেবে না, পায়ে পঞ্চম? তোমার যা খুশি তাই করো। আমাকে কিছু বলতে এসো না। গয়না-ফয়না হবে না।'

'সে কি? খালি হাতে-গায়ে বিয়ে হবে? কখনো হয়?'

'যেমন খালি হাত ছেলে তেমনি খালি হাত বউ।' চেয়ারের পিঠে ঢলে পড়লেন বনবিহারী : 'তোমার দরদ হয় তুমি কিনে দাও।'

'আমার কথা আমার কাছে থাক। আপনি বলেছিলেন, নমো নমো করে ব্যাপারটা সেরে দিতে, আর সে বাবদ সামান্য যা খরচ লাগে তা দিয়ে দেবেন।'

'নমো নমো করে সারা মানে কি গয়না, না ভোজ, না ছাদজোড়া প্যাণ্ডেল, না আলো-বাজনার ধুমধাড়াক্কা? হুমকে উঠলেন বনবিহারী : 'নমো নমো করে সারা মানে বিয়ে ও সেই সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলি বিধিমত সম্পন্ন করা। কী বলছি আমি? বলেছি যৎসামান্য যা খরচ লাগে তা পিতৃপুরুষদের খাতিরে দিয়ে দেব।'

'তাই তো দেবেন।' দ্বিধাহীন সায় দিল নরনাথ। বললে, 'তবে কী যে কার সামান্য তার কোনো স্থির মাপ নেই।'

'না, না, আছে। আমি সবসুদ্ধ শো দুই টাকা তোমাকে দেব। এর এক আধলাও বেশি নয়। তাই দিয়েই তুমি ম্যানেজ করবে।'

'করব।'

'তবে তুমি যদি এখন বাজি পোড়াও, জলসা বসাও, ম্যাজিক লাগাও, বাইজি নাচাও, সে খরচা তোমার।'

'তা তো বটেই।'

'মোট কথা, দু' শোর চেয়ে বাড়তি যদি খরচ হয় সে দায়িত্ব আমার নয়।'

'বলছি তো, নয়, দায়িত্ব আমার।'

'তবে আর দাঁড়িয়ে আছ কেন? কি, এক্ষুনি—এক্ষুনি টাকা চাই? দাঁড়াও, দিয়ে দিচ্ছি।' হাতের কাছেই টেবিল, টানার থেকে চেক বই বার করলেন বনবিহারী।

'না, টাকার জন্যে তাড়া কিসের?' নরনাথ কণ্ঠস্বর আর্দ্র করল : 'আমি বলছিলাম কি, গায়ে যদি ছিটেফোঁটা গয়না না থাকে তবে কেমন অশুভ-অশুভ দেখায়।'

'অশুভই তো, অশুভই তো দেখাবে। কিন্তু', ধীরে ধীরে আবার পিঠ তুললেন বনবিহারী, বললেন, 'কিন্তু, কেন, ওর আগে যেসব গয়না ছিল তার কী হল? তাইতেই একটু পালিশ দিয়ে দিতে বলো না স্যাকরাকে।'

'ওসব গয়না নেই।'

'নেই? কী হল? গেল কোথায়? ঐ ছোঁড়াটা পাচার করেছে বুঝি?

'না। কাকলি যখন যায় আমাদের বাড়ি, তখন বউদি বললেন, গায়ের গয়নাগুলি খুলে দিয়ে যেতে। এক-এক করে তাই খুলে দিয়ে গেল কাকলি।'

'খুলে দিয়ে গেল? তা ভালোই করল। সোনাদানা থাকা মানেই ছোঁড়াটার পকেট খরচার সুবিধে করে দেওয়া। তুমি বরং কাঁচ বা প্লাস্টিক বা সেলুলয়েডের কিছু কিনে দিও।'

'তা না হয় দিলাম। কিন্তু অন্তত একখানা বেনারসি শাড়ি চাই তো।'

'কী শাড়ি?'

'বেনারসি। যা পরে বিয়ে হবে।'

'রাখো। বেনারসি না হরিদ্বারি! অত ঠাটে কাজ নেই। চলতি যা শাড়ি আছে তাই, কাচাবার সময় না থাকে, ইস্ত্রি করে নিতে বলো।'

'সেই সব সাবেকি আটপৌরে শাড়িই বা কোথায়? একবস্ত্রে তো বেরিয়ে গেল কাকলি।'

'বেশ বলেছ। রাস্তায় বেরুবার সময় কয় বস্ত্র আবার পরে নেয় লোকে?'

'ইন্দিরাকে পাঠিয়েছিলাম ওর পুরোনো কাপড়জামাগুলো নিয়ে যেতে, বউদি দিলেন না কিছুতেই।'

'ঠিকই করলেন। বিয়ের পরে পুরোনো বস্ত্র আবার কে পরে? তারপর আবার জুতো চাই না?'

'চাই-ই তো! স্ট্র্যাপ-আলগা সামান্য স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। জুতোর দাম তো বেশি নয়। কিন্তু শাড়ি—' ঢোক গিললেন নরনাথ : 'তা ছাড়া একটা বাক্সও তো দরকার।'

'বাক্স?'

'ট্রাঙ্ক নয়, সুটকেস। না হলে জিনিসপত্র রাখবে কোথায়?'

'যে বাঁদরটাকে বিয়ে করছে তার মাথায়।' বনবিহারী কলম কুড়িয়ে নিলেন। বললেন, 'দেখ, বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। দু' শো টাকা দেব বলেছি তাই দেব। এরই মধ্যে যা পারো কিনে-কেটে দাও। না

পারো, হবে না, দেবে না। মেয়ের আমার শখ কত! গায়ে গয়না দিয়ে বেনারসি পরে বিয়ে করতে বসবেন।'

লিখে সই করে চেকটা দিয়ে দিলেন নরনাথকে।

কাঁপা-কাঁপা হাত, চোখও ঝাপসা, কোথাও আবার ভুলত্রুটি থাকল কিনা খুঁটিয়ে দেখবার জেন্য চেকটা নরনাথ মেলে ধরল চোখের সামনে।

যা ভেবেছিল, তাই। মারাত্মক ভুল করেছেন বনবিহারী। নামে তারিখে দস্তখতে ভুল নয়, মূলেই ভুল, মানে অঙ্কেই ভুল। দু' শো লিখতে দু হাজার লিখে ফেলেছেন।

এ করেছেন কী, এমনিতর একটা বিস্ময়ের আওয়াজ বার হতে যাচ্ছিল মুখ দিয়ে, নরনাথ তাকাল বনবিহারীর দিকে। দেখল যুক্ত ঠোঁটের উপর বনবিহারী তাঁর ডান হাতের তর্জনীটি রেখেছেন খাড়া করে। কথা বোলো না। চেপে যাও। পাশের ঘর যেন না পায় শুনতে।

'আর', নরনাথের কানে-কানে বলার মত করে বললেন, 'কাকলি যেন বোঝে যা কিছু হচ্ছে সব তোমার খরচে। তোমার বদান্যতায়।'

কিন্তু দু' হাজার টাকায়ই বা কতদূর কী হবে! তিন পদ গয়না আর শাড়ি ইত্যাদিতেই তার নাভিশ্বাস। সানাই এসেছে বটে কিন্তু নবত হয় নি, রোয়াকের এক কোণে বসেছে কোনোমতে। ম্যারাপ উঠেছে বটে কিন্তু দোতলার খোলা ছাদটুকু ঘিরে। আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু তার রঙ-চঙ নেই, জেল্লা-জমক নেই। খেতে দিতে কলপাতা নয়, মাটির থালা। ঝাল-ঝোল নয়, শুকনো। নমো-নমো।

এরই মধ্যে নরনাথের ইচ্ছে ছিল একটু চড়া সুর বাঁধে। না হয় কিছু খরচই হল তার পকেট থেকে। কিন্তু, চিরন্তন কণ্টক, তারও আছে পাশের ঘর। তোমার নিজের মেয়ের বেলায় এমন খরচ-ভাগাভাগির বদান্য লোক যদি না পাও? তখন যদি তোমাকেই সমস্ত টানতে হয়? তা ছাড়া ভাসুরঠাকুরের মান রাখতে এই উৎসব স্তিমিত রাখা দরকার তা তুমি ভোলো কি করে?

ইন্দিরাও কম যায় না।

তাই বলে চোয়রে-টেবিলে কি বাসর হয়? প্রশস্ত একটা শয্যা দরকার। বরাদ্দ বাজেটে না কুলোলেও নরনাথ নিজের পয়সায় কিনে এনেছে বিছানা। বিছানা ছাড়া আবার বিয়ে কি! পেইস্ট ছাড়া টুথব্রাশ কি!

এ নিয়ে কম তড়পায় নি ইন্দিরা : 'কার্পেটের উপর একটা ফর্সা চাদর পেতে দিলেই হত! নয়তো অত দামি শাড়ি কেনবার কী হয়েছিল? গয়নার মধ্যেও তো এদিক-সেদিক করা যেত অনায়াসে। তোমার কী মাথাব্যথা? তুমি কেন জরিমানা দিয়ে মরো?'

নরনাথ বললে, 'কাল সকালে যখন বরের বাড়ির লোক আসবে তার থেকে শয্যাতুলুনি বাবদ মোটা টাকা আদায় করে নিও। বিছানার দাম উশুল হয়ে যাবে।'

'এ তো খোলা শয্যা, এর আবার তুলুনি কী!' ইন্দিরাও দলের বুলি ধরল : 'কেউ আসবেও না, টাকাও দেবে না। সুতরাং এ বিছানাটা থাকবে বাড়িতে, সংসারে, যাবে না ওদের সঙ্গে।'

'ভালোই তো। তুমি তোমার সান্ত্বনা পেলেই হল।'

নরনাথও পাচ্ছে তার সান্ত্বনা। আহা, ওরা মিলুক। ওদের ক'টি দিন-রাত্রি সুখের হোক।

সকলের সঙ্গে বিনতাও দেখতে গেল বর। এমনি ভদ্রলোক শুনলে, অমুকবাবু শুনলে কি যেত? বর শুনলেই সকল নারীর মন কিশোরী হয়ে যায়। তুমি ধাড়ি ধিঙ্গি, বুড়ি, তুমি কেন দেখতে এসেছ, এ কেউই প্রশ্ন করে না, আর সকলেই চোখে বেশ একটু আবেশ নিয়ে দেখে। বিনতাও দেখল।

ফিরে এসে কাকলির পাশ ঘেঁষে বসল বিনতা। বললে, 'কে আরেকজন নতুন লোক দেখলাম।'

'নতুন লোকই তো দেখবি।' সুন্দর করে হাসল কাকলি।

'মনে হচ্ছে সুকান্তই নয়।'

'ওকে তুই কখনো দেখেছিস?'

'বাঃ, দেখেছি বৈকি।'

'কবে দেখলি?'

'ওর পাড়ায় ঘুরে ওর বাড়ির সামনে রাস্তায় ওকে দেখে নিয়েছি একদিন। যাকে তুই ভালোবাসলি, সম্রাট করলি, তাকে একবার দেখব না চর্মচোখে?'

'তবে এখন যাকে দেখলি তাকে সেই সম্রাট-সম্রাট লাগছে না?'

'মোটেও না। সম্রাটের চেয়েও সুপুরুষ লাগছে।'

'চিন্তিত হবার মত মুখ করল কাকলি। বললে 'তবে, কে জানে কে-না-কে এসেছে। বর, না, চোর?'

'যেই আসুক, সুকান্ত নয়। আরেক পুরুষ।'

'তবে ডাকাত? ভয় পাইয়ে দিচ্ছিস যে।'

'সত্যি বলছি। আরেক রকম চেহারা।'

'শুভদৃষ্টির সময় চোখ বড় করে দেখব ভালো করে। যদি সুকান্ত না হয় মালা দেব না। নেমে যাব পিঁড়ি থেকে।'

'শুভদৃষ্টির সময় চোখ বড় করে চেয়ে দেখল কাকলি। বর দাঁড়িয়ে, আর কাকলি পিঁড়িতে বসা, তাকে দু'জন জোয়ান ছেলে—এমন সময় জুটে যায় নওজোয়ান—পিঁড়ি সুদ্ধ ঠেলে তুলেছে বরের মুখোমুখি। বর-কানের মাথার উপর নিভৃতির আচ্ছাদন। বিনতা ঠিকই বলেছে, এ আরেক সুকান্ত। সুকান্তের আরেক উচ্চারণ, আরেক উদ্‌ঘাটন। আরেক উপস্থিতি। সুকান্তের চেয়েও সুন্দরতর সুকান্ত।

রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করলে এ সুকান্তকে সে কোথায় পেত, দেখত কবে? তখন তার পোশাকই বা কি এমনি হত কোনো দিন? তখন নিশ্চয়ই তার পরনে ট্রাউজার্স, গায়ে হাফ-হাতা বুশ-শার্ট, পায়ে কাবলি। সে এক নচ্ছার চেহারা। এখন তার পরনে কোঁচানো লম্বা ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবি, কপালে চন্দনের বিন্দু—আহা, কে না জানি তাকে সাজিয়ে দিয়েছে—দেখাচ্ছে জীবনের সে এক বরদ ও শিবদ মূর্তি, আনন্দের অনন্ত নিলয়! উল্লাস-বিলাসের উদ্বেল সমুদ্র!

মৃদু রেখায় হাসল কাকলি। সেই যে প্রথম প্রশ্ন করেছিল চিঠিতে এ যেন সেই হাসি। তারপর?

সত্যি কি সুন্দর সেজেছে কাকলি, কী সুন্দর বসেছে কোল পেতে! এমন গহন গভীর হাসিটি সে হাসতে পারত এ কে ভেবেছিল? রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করলে কে পেত এই অগাধের স্বাদ, এই প্রশান্তির সুষমা? সমস্ত দিন কাকলি উপোস করে আছে নিশ্চয়। তাই শরীরে এই ক্লান্তির পবিত্রতা। কী সুন্দর লজ্জা ফুটেছে চোখে! কোন রূপসাগরে ডুব দিয়ে এই অরূপরতন সে কুড়িয়ে পেত! একটি কণাও যেখানে হারায় না সেই আনন্দের অব্যয় ধাম হয়ে বসে আছে। এই বসে থাকাটি আর দেখত কে।

তারপর? তারপর কী জানতে চাও?

তারপর রহস্যসিন্ধুপারে বসে উপলখণ্ড কুড়োনো। উপলখণ্ড, পাথরের টুকরো? না, না, মুক্তো কুড়োনো। স্বাতী নক্ষত্রের বারিবিন্দুপাতে যে মুক্তোর জন্ম, সেই মুক্তো। স্নিগ্ধকান্ত অমল মুক্তো!

সত্যি, আজ রাত্রিও ঘন হবে? স্তব্ধ হবে? নিবিড় হবে রুদ্ধশ্বাস নিভৃতি? আর পরমের সীমানায় যে ভাষা শোনা যায় না সেই ভাষাতেই কথা কইবে অন্ধকার?

সম্প্রদান হয়ে গিয়েছে, বিয়ের আসরে দীপঙ্কর এসে উপস্থিত।

'কখন এলে?' জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'এই তো—'

'সোজা এখানে?'

'তা ছাড়া আবার কি!'

'তা হলে তুমি বরপক্ষের নও, তুমি কন্যাপক্ষের।'

কাকলি তাকাল দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর বললে, 'যে পক্ষেরই হই আমরা ইতরজন, আমাদের মিষ্টান্নে সন্তোষ।'

'বরেন এসেছে?'

'কই, দেখি নি তো।'

'এখানে আসবে না। বউভাতে আসবে।' নিজেই জল্পনা করল সুকান্ত।

'তাই সম্ভব। কিন্তু জানো এখনো বাড়তি অ্যালাউয়েন্স কিছু দিল না।' দীপঙ্কর বিষাদের সুর আনল : 'তুমি এত করে বললে তবু কান পাতল না।'

'তবেই তো বুঝছ আমার কত বড় বন্ধু!'

'না, তুমি জানো না, যদি হয়, তোমার কথাতেই হবে। বউভাতে যখন সে আসবে তোমাদের বাড়ি তখন তাকে একবার রিমাইণ্ড করে দিও।'

এসব কথা বলার সময় ও স্থান বেশ বেছে নিয়েছ তোমরা। ...নি তিরস্কার পুরে কাকলি তাকাতেই দীপঙ্কর চুপ করল।

কিন্তু বউভাতের দিন সুকান্তদের বাড়িতেও বরেন অনুপস্থিত।

সুকান্ত জিজ্ঞেস করল দীপঙ্করকে, 'বরেন আছে তো কলকাতায়? না কি বাইরে যাবার কথা আছে?'

'না না, এখানেই আছে, আফিস করেছে। বাইরে যেতে হলে আমাকেই তো সব টিকিট-ফিকিট বন্দোবস্ত করতে হত। যায় নি কোথাও।'

'বাড়ি বয়ে নেমন্তন্ন করি নি বলেই হয়তো আসে নি।'

'তাই হবে।'

'তবেই দেখছ কত বড় বন্ধু। কত বড় মুরুব্বি ধরেছ আমাকে।' কষ্টে হাসল সুকান্ত।

'আমি যা ধরেছি ঠিকই ধরেছি।' দীপঙ্কর বিজ্ঞের মত মুখ করল : নিশ্চয়ই না-আসার গ্রহণযোগ্য কারণ আছে।'

'থাকলে আছে না থাকলে নেই।' সুকান্ত বিরক্ত হয়ে বললে।

'তাই আবার যখন দেখা হবে ওর সঙ্গে, কথা হবে, আমাকে ভুলে যেও না। ভুলো না আমার বস্তির চোহারা!'

বউভাতের তিন দিন পর নিচে, রান্নাঘরে, সকালে, বন্দনার সঙ্গে রান্না করতে গেছে কাকলি, হঠাৎ শুনতে পেল উপরে কে কাকে মারছে।

ভয় পেল কাকলি। জিজ্ঞেস করলে, 'কী হচ্ছে দিদি?'

এক নিশ্বাসে বুঝতে পেরেছে বন্দনা। বললে, 'ঠাকুরপো সুবীরকে মারছে।'

কেন মারছে কাকে জিজ্ঞেস করবে! দুরুদুরু বুকে উন্মনা হয়ে রইল কাকলি। ভাবল নিজেই একবার উপরে যাবে নাকি, সব জেনে-বুঝে দেবে নাকি মিটিয়ে! নতুন বউয়ের পক্ষে সেটা সুষ্ঠু হবে কিনা কে বলবে! এ নিয়ে সংসারে আর কোথাও চাঞ্চল্য নেই। এমন ঘটনা যেন মোটেই আকস্মিক নয়।

নিত্যিকার পড়ার ঘর থেকে বঞ্চিত হয়েছে সুবীর। সুকান্ত বলে দিয়েছে, খবরদার, তোর বইখাতার জঞ্জাল নিয়ে আর ঢুকতে পাবি না এ ঘরে। ঢুকবি তো ঠ্যাং ভেঙে দেব।

সেই আদেশ পালন করে নি সুবীর। সুকান্তের চেয়ারটেবিলে বসে বইখাতার ভূপ নিয়ে দিব্যি পড়তে শুরু করে দিয়েছে।

'এখানে এসেছিস যে? বারণ করি নি?'

কথা কানেও তুলছে না সুবীর। একটা খাতার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কী লিখছে তো লিখছেই। তার মাথা ধরে নেড়ে দিয়ে সুকান্ত বললে, 'এ তোর টেবিল চেয়ার?'

'আমার টেবিল চেয়ারও তো এই ঘরে ছিল। কে এক নতুন লোক এসে সব ওলটপালট করে দিল।'

'মুখ সামলে কথা বল বলছি।' সুবীরের মাথায় গাঁট্টা মারল সুকান্ত : 'যা এ ঘর থেকে।'

মুখ তুলে সুবীর বললে, 'আমাকে কোথাও পড়তে হবে তো?'

'যে ঘরে তোর শোবার জায়গা হয়েছে, সেই মা'র ঘরে পড়বি। ওঠ, ওঠ বলছি শিগগির—'

'মা'র ঘরে টেবিল চেয়ার ফেলবার জায়গা নেই।' আবার লেখায় মন দিল সুবীর।

'জায়গা নেই তো মাটিতে বসে পড়বি।'

'তুমি পড়ো গে।'

আর কথা নেই, সুকান্ত সুবীরের মাথায় প্রচণ্ড চাঁটি মেরে বসল। এক হাত ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল বাইরে। শেষ পর্যন্ত আরেক হাতে সুবীর তার বইখাতাগুলো গুটিয়ে নিতে যাচ্ছিল, হেঁচকা টানে ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

'মুখের উপর কথা! পাজি, অবাধ্য ছেলে।'

'মা'র ঘরে পড়তে গেলে ছোড়দি চেঁচিয়ে ওঠে।' কান্নাভরা গলায় ফুলে-ফুলে উঠল সুবীর : 'বলে চেঁচিয়ে পড়লে তার ডিস্টার্ব হয়।'

'আহা, কী না মেয়ের পড়া, তার আবার ডিস্টার্ব!'

'কেন, মেয়ের পড়া বুঝি পড়া নয়?' যে প্রতিপক্ষ সেই ছোড়দির হয়েই কথা বললে সুবীর : 'কেন, ছোড়দির বুঝি আর বি-এ এম-এ হতে নেই? যত পাশ তুমি ঐ একজনকেই দেখেছ?'

আরেক পশলা চড় মারল সুবীরের উপর। সুকান্ত বললে, 'যা, দাদার ঘরে যা না।'

'দাদার ঘরের বিছানাই এখনো তোলা হয়নি। মশারির নিচে ঝন্টু-সেন্টু ঘুমুচ্ছে—'

'তবে নিচে যা, গোল্লায় যা—'

'তুমি যেমন গিয়েছ।'

এমন সময় মৃণালিনী এল। বললে, 'নিচে কাকার ঘরে পড়বি। সেখানে অনেক জায়গা। কোণের দিকে দিব্যি তোর টেবিল পড়বে।'

মা যে তার দিকে, অর্থাৎ সুকান্তের ঘরেই সে সুবীরকে পাঠাচ্ছেন না আশ্বস্ত হল সুকান্ত। দীপ্ত স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। সকলকেই একটু-আধটু ত্যাগ না করলে চলবে কেন?'

অতএব বইখাতা কুড়িয়ে নিয়ে সুবীর নিচেই নেমে চলল। আর সে নির্বিবাদ প্রবেশ পায় তা দেখবার জন্যে পিছু নিল সুকান্ত। অদূরে মৃণালিনী।

সিঁড়ির উপর থেকে মৃণালিনী বললে, 'হ্যাঁ, ঐ ঘরটাই সবচেয়ে ফাঁকা। ছেলেপিলের ঝামেলা নেই, নেই পড়াশোনার গোলমাল। তা একজনের পড়া তো শুধু নভেল পড়া, ম্যাগাজিন পড়া। তার ক্লাস তো আসলে দুপুরে গড়ানোর আগে। এখন কি! মর্নিং ক্লাসের জন্যে ঘর তাই খালি পেতে পারে সুবীর।'

বাহিনী নিচে এসে পৌঁছুবার আগেই মুখের উপর ঘরের দরজা দড়াম করে বন্ধ করে দিল বিজয়া।

উনিশ

সুকান্ত যে সুবীরকে মারল নিচে থেকে দৃশ্যটা দেখে নি কাকলি। তবু বেশ ভেবে নিতে পারছে তার মুখের চেহারা কিরকম আরেকরকম হয়ে গিয়েছিল। যে-রকমটি কোনোদিন সে দেখে নি, হয়তো বা কল্পনাও করে নি। হয়তো চোয়ালের হাড় বেঁকে গিয়েছিল শক্ত হয়ে, দাঁতের উপর বসেছিল এসে দাঁত আর চোখের তারা দুটোও স্বস্থানে সুস্থির ছিল না। ভাগ্যিস দেখে নি সে মুখ। যেন না হয় দেখতে।

আহা! নিজেকেই নিজে আবার শাসন করল কাকলি। একটা আস্ত, জ্যান্ত পুরুষমানুষ সময়বিশেষে ক্রুদ্ধ হবে না? সব সময়েই প্রশান্ত-প্রসন্ন হয়ে থাকবে? মাঝে-মাঝে খেপে উঠবে না, জ্বলে উঠবে না, না না, রাগ চাই বৈকি। যে পুরুষে রাগ নেই সে পুরুষে স্বাদও নেই। কামার্ত মুখ যদি সুন্দর, ক্রুদ্ধ মুখও সুন্দর।

কিন্তু, তাই বলে, ছেলেটাকে মারলে কেন নির্মমের মত? ও পড়বে কোথায়? এতদিন ঐ ঘরেই তো পড়ে এসেছে, পরিচিত পরিবেশে। আজ যদি ওকে উৎখাত করে দিয়ে থাকো, ওকে একটা বিকল্প ব্যবস্থা করে দেবে তো! তা নয়, উলটে অর্ধচন্দ্র। কেন, বাপু-বাছা লক্ষ্মী-সোনা বলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঠানো যেত না অন্যত্র? স্বার্থের কাছে হৃদয় নেই, তাই বলে সত্যের কাছেও কি বিচার নেই?

তা ছাড়া, উৎখাত তো রাত্রে। দিনের বেলায়, সকালবেলায়, পড়তে দিতে আপত্তি কী! টেবিলচেয়ারে এখুনি কী দরকার সুকান্তর! কতক্ষণ পরেই তো বেরিয়ে যাবে টিউশানিতে। ও, হ্যাঁ, সপ্তাহে তিন দিন সকাল, আজকে বুঝি অফ—ছুটি। তা, বেশ তো, আজ সকালে সুকান্ত থাকলই না

হয় বাড়ি, সুবীরেরও বা কতক্ষণের জন্যে পড়া! এক ঘন্টা? দু ঘন্টা? এই দু ঘন্টা ঘর ফাঁকা না রাখতে পেলে কী এমন চণ্ডী অশুদ্ধ হত! ছি ছি, কিরম বলছিল মায়ের কাছে : 'নতুন বিয়ে হয়েছে, বউয়ের একটা প্রাইভেসি থাকবে না?' ছি ছি, কী প্রসঙ্গে কেমন কথা! ঘরের দরজায় মোটা করে পর্দা ঝুলিয়েছে সুকান্ত, তা বেশ করেছে, কিন্তু সকালে-বিকালে কখনো সে পর্দা গুটোনো যাবে না, অর্ধায়িত শীর্ণায়িত করা যাবে না, এ কী অত্যাচার! ঘুম থেকে উঠে বেলা না বাড়তে এখুনিই আবার প্রাইভেসি কী! সুকান্ত বোধ হয় ভেবেছে রান্নাঘরে খানিকক্ষণ থেকেই ঘরে আসবে কাকলি, অনভ্যস্ত শরীরকে আরাম দেবার জন্যে, আর সেই শৈথিল্যের সুযোগে সুকান্তও একটু অসাবধান হবে। পারে তো বারে-বারেই হবে। সুকান্ত যেন কী! মুখে গম্ভীর থাকলেও মনে-মনে না হেসে পারল না কাকলি। অবোলা শিশুর যেমন হয়, ওরও যেন তেমনি। ও-ও যেন একটা রঙিন ঝুমঝুমি পেয়েছে. কখনো দেখবে, কখনো ধরবে, কখনো বাজাবে। কিন্তু ঝুমঝুমিও চালাক হতে জানে হাতের থেকে আলগোছে দূরে সরে থেকে। ও দু ঘন্টা কাকলি কক্ষনো যেত না উপরে, থাকত নিশ্চয়ই সংসারের কাছে-কাছে। এটা পাচ্ছি না, ওটা কোথায় গেল, সুকান্তের শত হাঁকাহাঁকিতেও কান পাতত না।

'কাকিমা, দরজা খুলে দাও, আমি পড়ব।' সুবীর ঘন-ঘন ধাক্কা দিতে লাগল দুয়ারে।

যদিও কথাটা মায়ের, মৃণালিনীর শেখানো, তবু সুবীরের দিক থেকে তার ব্যবহারের যা হোক একটা সমর্থন ছিল। সে তার কাকিমার কাছে করতে পারে, তাই অনুনয় করছে, আবদার করছে, আখ্‌খুটেপনা করছে। তার কাকিমা বুঝবে তার মিনতি রাখবে কিনা, খুলবে কিনা দরজা। কিন্তু তুমি সুকান্ত, তুমি কোন ভিত্তিতে দুম-দাম কিল মারো। কী যুক্তিতে বলো চেঁচিয়ে, 'ভালো চান তো খুলুন দরজা, বেরিয়ে আসুন, নইলে ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যান—'

ছি ছি ছি'! রান্নাঘরের দরজা দিয়ে সব দেখা যাচ্ছে। বসে ভালো উপভোগ হচ্ছে না বলে উঠে দাঁড়াল বন্দনা। ভয়ে-ভয়ে তার গা ঘেঁষে কাকলি।

পিছনে শক্তি দিচ্ছে মৃণালিনী। তা হোক, কিন্তু যদি একবার এখন এদিকে চোখ ফেলত সুকান্ত, তাকে শতকটাক্ষে কণ্টকিত করে নিষেধ করত, নির্বিষ-নির্জীব করে দিত। এত বড় কাকা, তার সম্পর্কে কিনা এই মনোভাব! আর যে কিনা তোমার জন্যে এত করল, এত হট্টগোল, এত স্বস্ত্যয়ন। একবার ইচ্ছে হল হাত ধরে জোরে টেনে নিয়ে আসে সুকান্তকে। কিন্তু শাশুড়ির সামনে এই হঠকারিতা নতুন বউকে মানাবে না, শাশুড়ির প্ররোচনার বিরুদ্ধে এই আচরণ স্পষ্ট নিরস্ত্রীকরণের মত দেখাবে, তাই ভেবে নিরস্ত থাকল। রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল নিষ্পলক।

'কী গোঁয়ার! কী গোঁয়ার!' বলে উঠল বন্দনা। 'এখুনি তার দেখেছ কী?'

বন্ধ দরজা যে খুলছে না, ঈশ্বর করুন, এখন অন্তত এইটুকু তো দেখি। চোখ বুজল কাকলি।

'বাড়ির একটা ছেলে পড়ার জন্যে জায়গা পাচ্ছে না, আর এঁরা, এঁদের একটাও বাচ্চাকাচ্চা নেই, দিব্যি একটা আস্ত ঘর দখল করে বসে আছেন!' আশ্চর্য, বলতে পারল সুকান্ত। এতেই থামল না, আরো একটু যোগ করল : 'বলি নিজেদের একটা থাকলে কী করতেন? ঘরের কোণে পড়ার জায়গা করে দিতেন না?' বলেই আরো ক'টা করাঘাত।

হেমেনের মতে ঘুমুনো একটা পরিশ্রমের ব্যাপার, এবং ঘুম ভাঙার পর এই যে আরো খানিকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকা, এটা হচ্ছে ঘুমোনোর ক্লান্তি দূর করার জন্যে বিশ্রাম। সেই বিশ্রামে বুঝি ছেদ পড়ল। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল বিজয়ার দিকে।

'কি, এখনো উঠবে না?' উড়ন তুবড়ির মত হলকা ছোটাল বিজয়া : 'পড়ে-পড়ে অপমান সইবে?'

'তোমাকে বলেছি না আপমান ভাবলে যন্ত্রণা, পাগলামি ভাবলে মহাশান্তি।' পাশ ফিরল হেমেন : 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। স্তব্ধতাই প্রচণ্ড উত্তর। আর বন্ধ দরজার উত্তর প্রচণ্ডতর।'

'যে অকর্মণ্য কাপুরুষ সে তো এ কথা বলবেই।' দরজা বন্ধ করলে কি হয় জিভ বন্ধ করতে পারছে না বিজয়া : ' তোমাকে এত সব কঠিন কথা বলছে আর তুমি বাইরে বেরিয়ে মুখোমুখি একটাও প্রতিবাদ করবে না?'

'প্রতিবাদ? বাইরে বেরিয়ে অর্বাচীনটার মুখে সটান এক চড় বসিয়ে দিতে পারি।'

'পারো?' উৎফুল্ল হয়ে উঠল বিজয়া।

'গায়ের জোরে পারি। সম্পর্কের জোরে পারি।' স্বস্তিতে হাই তুলল হেমেন : 'কিন্তু সুকুকে মারতে গেলেই, আর তো কিছু নয়, বউটার অপমান।'

'আহাহা, কী আমার দরদের দোকানদার!'

'আচ্ছা, তুমিই বলো না, নতুন বউ এসেছে সংসারে, এরই মধ্যে তার সামনে একটা শুম্ভ-নিশুম্ভ ঘটে গেলে কী ভাববে বলো তো! কারু প্রতি তার আর শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকবে?'

'তার শ্রদ্ধাভক্তির জন্যেই দেখছি বেশি ভাবনা। নিজের স্ত্রীর শ্রদ্ধাভক্তি—'

'সে তো করেই খুইয়েছি। তার জন্যে আর ভাবি না। নতুন একজন যে এসেছে সংসারে, সুন্দরকে দেখতে ভদ্রকে দেখতে, তারই কাছে এক নিমেষে সবাই দেউলে হয়ে যাই কেন?' মাথার বালিশটাকে বুকের নিচে টেনে এনে হেমেন বিশ্রামে আরো প্রসারিত হল : 'কথায় বলে, বলীর ঘাম, নির্বলীর ঘুম। ভুল বলে। আমি বলি নির্বলীর ঘাম, বলবানের ঘুম।'

গুম হয়ে বসে রইল বিজয়া।

'কে, কে পড়বে? কার পড়ার জায়গা হয় না?' বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল ভূপেনবাবু। সুবীরকে লক্ষ্য করে বললে, 'নিয়ে আয় তোর বই, ইংরিজি আর বাঙলা, দেখি কেমন পড়েছিস, কেমন তোর পড়ার জায়গা দরকার।'

সুবীর শুকনো মুখে মা'র পিছনে গিয়ে দাঁড়াল আর সুকান্ত নিস্পৃহের মত উপরে উঠতে-উঠতে দাঁড়াল সিঁড়ির উপর।

'আহা, কী চমৎকার ওকালতি!' মৃণালিনী টিটকিরি দিয়ে উঠল : 'পড়ার ঘর নিয়ে কথা হচ্ছে আর উনি এলেন পড়ার বই নিয়ে কথা কইতে! জায়গা নেই তো পড়া তৈরির কথা ওঠে কী করে? এমনিধারা উকিল হওয়ার জন্যেই তো এই দশা!'

'অ্যাদ্দিন পড়ছিল কোথায়? শূন্য চোখে তাকাল ভূপেন।

'ন্যাকা! জানে না কিছু। কেন, উপরের কোণে ছোট ঘরটাতে—দু' ভাই যেটাতে ছিল একসঙ্গে।'

'বাঃ, সেইখানে পড়লেই তো হয়।

'সেইখানে পড়লেই তো হয়? গা জ্বলে যায় কথা শুনে।' মৃণালিনীর মুখে মমতার রেখামাত্র নেই : 'বাড়িতে নতুন বউ এসেছে না?'

'এলেই বা। তাই বলে ঘর তো আর উড়ে যায় নি।'

'কী বুদ্ধি! কী বিদ্যে! এই না হলে আর্গুমেন্ট!' বাঁকা মুখ আর সিধে হচ্ছে না মৃণালিনীর : 'বলি নতুন বউ সংসারে একটা আলাদা ঘর পাবে না?'

'আলাদা ঘর!' এতেও যেন বিস্ময় ভূপেনের।

'সাধে কী আর মক্কেল ছেড়েছে! বাহাত্তর না হতেই ধরেছে ভীমরতি। বিবাহিত ছেলে-বউয়ের যে একত্রে একটা আলাদা ঘর দরকার সেটুকুও খেলে না বুদ্ধিতে?'

'খেলে। সেটুকু খেলে।' মাথায় একবার হাত বুলোল ভূপেন। বললে, 'কিন্তু আমি ভাবছি শাস্ত্রে যে স্ত্রীকে দারা বলেছে ঠিকই বলেছে। ভায়ে-ভায়ে দীর্ণ 'না করে তার শান্তি নেই।

'আর সোয়ামীকে কী বলেছে?'

কিছু বলেছে নাকি? অতটা শাস্ত্রজ্ঞান হয় নি এমনি নির্লিপ্ত মুখ করল ভূপেন।

'মেড়া বলেছে। মাকালের ঢিপি। অকর্মণ্য।'

তা বলেছে হয়তো। নীরবে সায় দিল ভূপেন।

'বড়-সড় দেখে একটা বাড়ি করতে পারে না, ছেলে-মেয়েকে পড়বার জন্যে ঘর দিতে পারে না, তার আবার বড়ফট্টাই! আগন্তুক নতুন বউ, তার দোষ ধরতে এসেছে! লজ্জা নেই একটুও?' মানুষের নয়, কেউটের জিভ মুখে ধরেছে মৃণালিনী।

হাত বাড়িয়ে ভূপেন ধরল সুবীরকে। বললে, 'আমার বৈঠকখানায় বসে পড়বি।'

ভয়-ভয় লাগছে তবু নাকে কেঁদে উঠল সুবীর। বললে, 'ও ঘরে সব লোকজন আসবে, সারাক্ষণ আজে-বাজে কথা কইবে,' একটুও মন বসবে না পড়াতে।'

ভূপেনের ইচ্ছে হল বাগিয়ে একটা চড় কষায় সুবীরের উপর। কিন্তু, না, প্রেসার বাড়তে দিয়ে লাভ নেই। তা ছাড়া, মৃণালিনী বুঝতে পারবে সহজেই, এ চড়ের লক্ষ্য সুবীর নয়, আর কেউ। তুমুল শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং চেপে যাওয়াই সমীচীন। হাত ছেড়ে দিল ভূপেন। বললে, 'না, একটুও গোলমাল নেই বৈঠকখানায়। তোর মা বলে, আমার ধড়ে আক্কেল নেই, ঘরে মক্কেল নেই। তাই বেশ পড়তে পারবি নিরিবিলিতে। যা, বই নিয়ে আয়।'

তবু পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না সুবীর। বললে, 'কখন কে কী পরামর্শ নিতে আসবে, শুরু হবে ক্যাঁচকেঁচি—'

'যা, নিয়ে আয় বই।' গর্জে উঠল মৃণালিনী : 'বৈঠকখানাতেই পড়বি এখন থেকে। আর, শোন খবরদার, ছোড়দার ঘরে কক্ষনো গোলমাল করতে ঢুকতে পাবি না। মনে থাকে যেন।'

নাকে কাঁদতে-কাঁদতে সুবীর বৈঠকখানায় প্রবেশ করল।

সুকান্ত-কাকলির ঘর মাঝে-মাঝে মৃণালিনী নিজেই গুছিয়ে দিয়ে আসে। কীভাবে কোন জিনিস রাখলে না-রাখলে এই ঘরের মধ্যেও একটু বেশি অবকাশ আসবে তারই হিসেব করে। এ ঘরটাতে আলো যদিও বা আসে হাওয়া যে ঢোকে না, এ সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান হতে ছটফট করে বেড়ায়। জানলার ওপারে ঐ যে একটা নিমগাছ ডালপালা মেলে রয়েছে—হলই বা না শুভ গাছ—কাটিয়ে-ছাঁটিয়ে দিয়েছে। এইবার দেখ কেমন আরো সাদা হয়েছে ঘর। কেমন আরো ফাঁকা হয়েছে আকাশ। আলোর পথ ধরে হাওয়া বা কোন-না একটু আসবে এখন অলক্ষ্যে। রেন-পাইপ ধরে এখন এই মালতীর লতাটা তুলে দিই না জানলার দিকে। বেশ হবে। বেশ মানাবে।

সংসারের হাওয়া এখন উত্তাল কাকলির দিকে। কাকলি প্রমাণ করে দিয়েছে, যে অকথা রটেছিল তার সম্পর্কে তা নিতান্ত নিরর্থক। সে বয়ে-যাওয়া ঢিলে-আলগা মেয়ে নয়। আর সুকান্তও নয় কিছু অপরিচ্ছন্ন। না বা অসহিষ্ণু।

মূল্যমানের পারা খুব উঁচুতে উঠে গিয়েছে দু' জনের।

মৃণালিনীর যত রাগ বন্দনার উপর। 'বলেছিলে কেমন বৃক্ষ ফলই তা ভালো কইবে। কই, কওয়াও এবার। বৃক্ষ থেকে পেড়ে আনো ফল!' দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করে উঠল মৃনালিনী।

'ওমা, আমি আবার কখন ওসব বললাম?' বন্দনা ফোঁস করে উঠল।

'কখন বললে! তখন সকলের কত গুজগাজ, কত ফিসফাস। আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে কত লুকিয়ে-লুকিয়ে হাসা। টেরিয়ে-টেরিয়ে তাকানো। যত ছোট মনের ছোট কথা। উনিও কম যান না।' বিজয়ার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল মৃণালিনী : 'কেমন বৃক্ষের ফল তোমরা তা আর বলে কাজ নেই।'

'বাঃ, আমি তো বরাবর উলটো কথা বলেছি।' বিজয়া বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

'উলটো কথা বলেছ? এখন সাধু সাজছ সকলে। বলো নি, আপনার কীর্তিমান ছেলে, কত বড় কীর্তি রাখল ভারতে—বলো নি?'

'সে তো ভালো অর্থে বলেছি।'

'ভালো অর্থে বলেছ! এখন কালো অর্থ হয় নি কিনা তাই ভালো অর্থ।'

'মোটেও তা নয়। আমরা বরং বলেছি, সুকু এক বেকার ছেলে—'

'বেকার ছেলে?' ঝলসে উঠল মৃণালিনী।

'না, ভুল হয়েছে। টিউশানি-করা ছেলে। হরে-দরে সে একই কথা। সেই সুকু কেমন দিব্যি এক বড়লোকের এম-এ পাশ মেয়ে সজ্ঞানে বিয়ে করে আনল।'

'হ্যাঁ, এম-এ পাশ।' লকলক করে উঠল মৃণালিনী : 'তোমাদের মত কোনো রকমে মুখস্থ-করে স্কুল-সারা মেয়ে নয়।'

'তবেই বুঝুন কত প্রশংসা করেছি। বরং বলেছি, আমার পিল, আমার যেমন করে খুশি তেমনি করে খাব। গুলে খাই কি গিলে খাই, চুষে না চিবিয়ে—তাতে কার কী মাথাব্যথা!'

বিজয়া-বন্দনা এখন এক দিকে, তাই তাক বুঝে বন্দনা টিপ্পনী ঝাড়ল : 'আর ঢোঁক গিলতে গলায় যদি আটকায় তো আমার আটকাবে!'

'তবে যে বলছিলে জেলে যাবার কথা, কোমরে দড়ি পরাবার কথা'—মৃণালিনী আবার বন্দনার উপর উদ্যত হল।

'সেসব প্রশান্ত বলেছে।' গম্ভীরমুখে বিজয়া বললে।

'প্রশান্ত বলেছে!' তবু সমস্ত দোষ বন্দনার এমনিভাবে বন্দনার দিকেই আক্রোশে তাকিয়ে রইল মৃণালিনী। বললে, 'ভাই হয়ে ভাইকে জেলে পাঠাতে পারলেই খুশি।'

'তবেই বুঝুন', যেন একটা তুরুপের তাস তক্ষুনি হাতে পেল বন্দনা, ঝলসে উঠল : 'তবেই বুঝুন, কেমন বৃক্ষের কেমন ফল।'

এ একেবারে মৃণালিনীকেই ছুঁড়ে মারা। প্রশান্ত ক্ষুদ্রাত্মা কেন? যেহেতু মৃণালিনী ক্ষুদ্রাত্মা।

'মুখ সামলে কথা বলতে শেখো বড় বউ।' মৃণালিনী চেঁচিয়ে উঠল।

ব্যাপারটা আর বেশি গড়াতে দিল না বিজয়া। বন্দনা আর সে এখন এক দল, এক পার্টি, তাই বন্দনাকে অনায়াসে নিয়ে এল নিজের ঘরে। আর, সমস্ত কলহের মীমাংসা, দরজাটা বন্ধ করে দিল।

মৃণালিনীর ইচ্ছে হল ঘর দুটো এখুনি বদলাবদলি করে দেয়। প্রশান্তদের বড় ঘরটা সুকান্তদের দিয়ে সুকান্তদের ছোট ঘরটাতে প্রশান্তদের পুরে রাখে। মাথা নিশ্চয়ই ঠিক নেই, মৃণালিনী সেই মতলবেই উঠল উপরে। ঠাট করে বন্দনা এখন বিজয়ার শামিল হয়েছে, এই সুযোগেই নয়-ছয় করে ফেলবে। দুপুরবেলা, ধারে-পারে কেউ নেই, অন্তত বন্দনা এখন ঠাঁইনাড়া—এই তো সোনার সুযোগ।

বন্দনার ঘরে ঢুকতেই মৃণালিনীর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কী আশ্চর্য, ক্রোধের ক্ষণকালের চূড়ায় উঠে ঝন্টু-সেন্টুকে সে আর দেখতেই পায় নি। একেবারে মুছে দিয়েছিল মন থেকে।

দেখল, আজ বুঝি ঝন্টুর স্কুলের ছুটি, ঝন্টু পড়ে-পড়ে ঘুমুচ্ছে মেঝের উপর। যা গরম, বিছানা ছেড়ে মেঝেকে সম্বল করেছে। কিন্তু সেন্টু, সেন্টু কোথায়?

পাশের ঘরে, কাকলির ঘরে, দু আঙুল পর্দা সরিয়ে উঁকি মারল মৃণালিনী। সুকান্ত কলেজে নয় লাইব্রেরিতে গেছে। খাটে পাতা বেডকভারের উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে কাকলি, নিরীহ ছোট্টটি হয়ে ঘুমুচ্ছে। তার বাহুর কাছে তালগোল পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে সেন্টু। ক'দিনেই কেমন আপন হয়ে গেছে ছেলেটা। কিছুতেই ছাড়বে না বুকের আঁচল। মা'র জন্যে অপেক্ষা না করে কাকিমার গায়ের গরমেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

কোমরের কাছে ছোট্ট এক টুকরো জাঙিয়া ছাড়া আগাগোড়া উলঙ্গ সেন্টু, কিন্তু অব্যাহত আবৃত কাকলি। এত গরমেও, দুপুরের নিভৃতি সত্ত্বেও, বেশেবাসে এতটুকু লঘুতা নেই। ঘামে ভিজে গেছে তবু কেমন ঘুমুচ্ছে দেখ না। হাত-পাখা করছিল, সেটা হাতের মুঠি থেকে শিথিল হয়ে খসে রয়েছে এক পাশে। কেমন দুঃখী-দুঃখী দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। কিন্তু যাই দেখাক, অন্তরে তৃপ্তি না থাকলে বাইরের এত সব ক্লেশ-কষ্ট উপেক্ষা করে পারে কেউ ঘুমুতে? তবু, বাবা-মা বর্জন করল, একবার ডাকল না, নিয়ে গেল না বাড়ি, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন কেউ একবার দেখা করতে এল না—এতে মন বুঝি কারু ভালো থাকে? একটা কান্না-কান্না ভাব সব সময়েই বুঝি চোখে-মুখে লেগে থাকে না? তবু সব সময়ে হাসছে মেয়েটা, কয়লা ভাঙা থেকে শুরু করে বালতি-ঝাঁটা নিয়ে রান্নাঘর ধোয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজে হাত দিচ্ছে অম্লানে। তার অপরাধের মধ্যে তো এই যে, সে এমন পাত্র বেছেছে যে ওদের বাপের বাড়ির মতে হরিজন। কেন, সুকু এমন কী অপাঙ্‌ক্তেয়? পাকাপাকি না হোক, দু' শো টাকার একটা স্কলারশিপ তো পাচ্ছে। তারপর রিসার্চের খাতিরে তার টিউশানির বাজারও না কোন তেজী হবে আজকাল। শাঁসালো তো একটা জুটিয়েওছে এরই মধ্যে। একটা গাড়ি-বাড়ি হাঁকড়ানো বিলিতি কেতার অফিসার না হতে পারলে বুঝি আর মানুষ বলে গণ্য হবে না? ওদের সমাজ না পারুক, কাকলি যে তার ছেলের মর্যাদা বুঝেছে, তাকে দিয়েছে সবচেয়ে উঁচু দাম—তার জন্যে মায়ায় ভরে গেল মৃণালিনী।

আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকে পাখাখানা কুড়িয়ে নিল আলগোছে। পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু-মৃদু একটু পাখা

করলে দু' জনকে। আহা, বড় ভালো মেয়ে, আরো একটু ঘুমুক। কিন্তু, কে জানে, হাওয়া পেয়ে ঘুম না ভেঙে যায় অকালে। পাখা আবার নামিয়ে রেখে আস্তে-আস্তে চলে গেল মৃণালিনী।

না, ঝন্টু-সেন্টুকে এ ঘরে ঠেলা যাবে না, তবে যেমন বোঝা যাচ্ছে, বিজয়ারাই চলে যাবে বাড়ি ছেড়ে। এ ফ্ল্যাট না ও ফ্ল্যাট, বাছাবাছি করতে প্রায়ই ওরা বেরুচ্ছে এক সঙ্গে। একেবারে বেরিয়ে যায়, আর না ফেরে, শান্তি হয় সংসারে। আহা, বড় ঘরে কাকলি-সুকান্ত একটু থাকতে পারে হেসে-খেলে, ফেলাছড়া করে। পাশের বাড়ির দেয়াল পড়ে না বলে কেমন আপনা থেকেই হাওয়া আসে জানলা দিয়ে। আহা, দগ্ধ-ভস্ম মেয়েটার একটু গা জুড়োবে, দু' দণ্ড বসে একটু বা করতে পারবে পড়াশুনো। কী এমন অসুবিধে হবে যদি হেমেনের টাকাটা মাস-মাস না আসে? সুকান্তই তা পূরণ করে দিতে পারবে। আর, সুকান্ত কি একা? তার সহায়-সঙ্গী নেই? কাকলি নেই?

ফিরে এসে ঘরে ঢুকেই গায়ের জামাটা খুলে ফেলল সুকান্ত। 'আমার আর ভয় কী!' বলে গেঞ্জিটাও উৎখাত করল সবলে।

'বোসো। হাওয়া করি।' হাত-পাখাটা কুড়িয়ে নিয়ে হাসিমুখে বললে কাকলি।

'পাখা তো আমি করব। এবং তোমাকে।' পাখাটা কেড়ে নিল সুকান্ত। বললে, 'তুমি আমার মত এমন বিদ্রোহী হতে পারো না?'

'বিদ্রোহী?'

'হ্যাঁ, আমার মত এমনি আদিম-অকৃত্রিম।' কাকলিকে লক্ষ্য করে জোরে হাওয়া করতে লাগল সুকান্ত : 'এমনি নির্ভার-নিশ্চিন্ত।'

'পাগল না মাথাখারপ!' হাওয়ার ঢেউয়ের বাইরে চলে গেল কাকলি।

'এমন লোহাগলানো গরম, অথচ সাধ্যি নেই নিরঙ্কুশ হও। একটা পার্পিচ্যুয়াল হ্যাণ্ডিক্যাপ থেকে ভুগছ। তোমরা আবার পুরুষের সমান হবে!' করুণায় উদ্বেল শোনাল সুকান্তকে : 'এমন যে বিধাতার হাওয়া তার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত রইলে চিরদিন। গা ভরে স্নান-পান কিছুই করতে পারলে না। একটা ছাত্রীজীবন শাসন-বসনের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রইলে। উঃ, কী ভয়ানক! এখন তো আর সেই ছাত্রীজীবন নেই, এখন তো পত্নীজীবন—এখন আর তবে ভয় কী!'

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কাকলি বললে, 'বোধ হয় বৃষ্টি আসবে।'

'ছাই আসবে! তুমি যে এই মাঠফাটা গরমেও ধোপার পিঠের আস্ত একটা বস্তা হয়ে থাকবে এ আর আমার সহ্য হয় না। তোমার কাপড়ের গরম আমাকে হাঁপিয়ে মারে। কেন, হালকা হতে পারো না?'

'চলো, আজ সন্ধ্যায় একটু কোথাও ঘুরে আসি।'

'তা চলো। কিন্তু বাইরেটা তো ভীষণ সভ্য, ভীষণ সাধু। কিন্তু এই ঘরের মধ্যে আমি আর তুমি, স্বামী-স্ত্রী, ধারে-কাছে কেউ নেই —'

'আমরাই বা পরস্পরের কাছে কম সভ্য আর সাধু নাকি?'

'রাখো। আমরা পরস্পরের কাছে নিঃস্ব, অনাবৃত। তবে কিসের তোমার কুসংস্কার?' সুকান্ত উঠে কাকলিকে ধরেতে গেল।

কাকলি হুট করে সরে এল দরজার কাছে। বললে, 'সব কিছুরই একটা প্রস্তাব আছে, প্রসঙ্গ আছে। ক্ষেত্র-পাত্র আছে।'

'আছেই তো।'

'যদি এই গ্রীষ্ম সম্পর্কে কিছু থেকে থাকে, তা হলে আর কিছু নয়, একটা শুধু ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান কিনে আনো।' কাকলি ঘর থেকে বেরিয়ে এল বারান্দায়। বললে, 'দাঁড়াও, আমি গা-টা ধুয়ে আসি। পরে দু'জনে বেরুব একসঙ্গে। সেই আমাদের ময়দান, নয়তো সেই ভিক্টোরিয়া স্কোয়ার। সেই ঠুনঠুন রিক্‌শা। এখন আর রিক্‌শাতে চড়তে ভয় নেই।'

কাকলি চলে গেল বাথরুমে। অঢেল জলে স্নান করতে লাগল।

বাথরুমটা এত বড় নয় যে, সেইখানে বসেই পরিপাটি সাজগোজ করবে। তাই স্নানান্তে শাড়ি-সেমিজের একটা এলোমেলো হিজিবিজি হয়ে নিজের ঘরের দিকেই ছুট দিল কাকলি।

ঘরে গিয়ে দেখল সুকান্ত বসে আছে চুপ করে। পাখা নাড়ছে।

'দয়া করে একটু বাইরে যাও', মিনতির সুরে বললে কাকলি, 'আমি ঠিকঠাক হয়ে নিই।'

'আমি কোথায় যাব!'

'বাঃ, তা কী জানি! বারান্দায় যাও, নয়তো ছাদে যাও। নয়তো বাথরুমে গিয়েই ঢোকো।'

নড়ল না সুকান্ত। বললে, 'আমার যাবার জায়গা নেই।'

'সে কী কথা! ড্রেস করবার যখন আলাদা ঘর নেই, আমাকে এখন একটু একলা থাকতে দেবে তো?'

'আমার কাছে তোমার কোনো সংকোচের কারণ নেই।'

'এ সংকোচের কথা নয়, এ শ্লীলতার কথা।' ঝলসে উঠল কাকলি : 'ওঠো, সরো, এ কী অন্যায়, আমাকে খানিকক্ষণ একলা থাকতে দাও।'

যেমন-কে-তেমন বসে রইল সুকান্ত। চোখ বুজে হাওয়া খেতে লাগল।

সেই একস্তূপ বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে কাকলি ঝাঁজিয়ে উঠল : 'ছোটলোক!'

কুড়ি

মাসিক কিস্তিতে একটা সিলিঙ ফ্যান কিনেছে সুকান্ত। সাদা পাখা মেলা একটা উড়ন্ত রাজহাঁস।

'টাকা? টাকা কোত্থেকে দিলে?' জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'এবারেরটা ম্যানেজ করেছি।' এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে বললে সুকান্ত।

'কী ভাবে করলে?' কাকলির ইচ্ছে, কিছু না গোপন থাকে তার কাছে। আয়ের বা আনন্দের কোথায় কী উৎস থাকতে পারে পুরুষের, সেটি তার রমণীর কাছে, রমণীয়ার কাছে, স্পষ্ট থাক, মুক্ত থাক। তার হিসেবের খাতার সাদা-কালো দুই পৃষ্ঠাই খোলা থাক তার চোখের সামনে।

কাকলির মনের ইচ্ছেটা বুঝে নিয়ে সুকান্ত বললে, 'ছাত্রের কাছ থেকে আগাম নিয়েছি।'

'কেন, মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিলেই তো পারতে।' হয়তো চায় নি, কিন্তু অজান্তেই কাকলির গলায় ঝাঁজ এসে গেল।

করুণ করে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'হাত খরচের দুটো-চারটে টাকা হয়, সহজেই চেয়ে নিতে পারি, কিন্তু যেখানে এক থোকে বেশ মোটা একটা টাকা, তখন কেমন বাধো-বাধো ঠেকে।'

'বাঃ, তোমর নিজের টাকাই তো চেয়ে নিচ্ছ।' যদিও টাকার কথা, টাকা নিয়ে কথা, বলতে গেলেই কেমন একটু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শোনায়, তবু না বলে পারল না কাকলি। গলা না খাঁকরেই বললে, 'বাহাদুরি করে রোজগারের সমস্ত টাকাটাই মা'র হাতে তুলে দেবার কী হয়েছিল!'

সুকান্ত হাসল। বললে, 'সংসারের কাছে পপুলারিটি কেনবার ঐটেই প্রথম স্টান্ট।'

প্রত্যুত্তরে হাসল না কাকলি। বললে, 'সংসার বলতে শুধু মা, বেচারা স্ত্রী নয়? স্ত্রীর কাছে আর পপুলার হবার দরকার নেই?'

মানে, একটু কি থমকাল সুকান্ত, কাকলিরও নিজের এক্তিয়ারে এক থোকে একটা টাকা চাই? সুকান্তর উপার্জনের এক অংশ, অধিকাংশ যদি সংসার বা মৃণালিনী গ্রাস করে নেয়, আরেক অংশ, অন্তত একটা ক্ষীণ অংশ, কাকলি রাখবে তার নিজের আয়ত্তে। সমস্ত টাকা সংসারের কাছে গচ্ছিত রেখে তার থেকে কালেভদ্রে ভিক্ষে চেয়ে নেওয়ার কোনো মানে নেই। শ্রী নেই সেই দীনতায়। বরং সে টাকা থাকবে কাকলির চাবির অধীনে, তার ক্ষয়-ব্যয়ের মধ্যে থাকবে একটা স্বাধীনতার সম্পদ আর, স্বাধীনতার মত স্বাদ কী! মা'র কাছে ফিরতি টাকা চাইতে গেলেই যেন ব্যাখ্যার একটা বাধ্যতা থাকবে, কিন্তু কাকলির টাকায় নেই কোনো জবাবদিহির যন্ত্রণা। চলো আজ সিনেমায় যাই, সার্কাসে যাই, গঙ্গায় যাই হাওয়ায় খেতে, এ কি মা'র টাকায় বলা চলবে? কিংবা লাঞ্চ খেয়ে আসি হোটেলে? বড় জোর বলা চলবে, চুল ছাঁটাই, জুতো সেলাই, ডাইং-ক্লিনিং, শালকর, ট্রাম-বাস, নয় তো স্ট্যাম্প-

পোস্টকার্ড। যন্ত্রপাতি দূরের কথা, সামান্য ওষুধ-বিষুধের কথাও বলা যাবে না। মা'র কাছের টাকায় সুখ কই। স্ত্রীর কাছের টাকায়ই সুখ।

বুঝেও গভীরে গেল না সুকান্ত। তরলকণ্ঠে বললে, 'তোমার কাছে আমি পপুলার—পপুলার কথাটা তো চলবে না, কেননা, অনেকগুলি তো স্ত্রী নেই—তোমার কাছে আমি প্লীজিং, প্রেমে।'

'আর আমরা প্রেমে নেই। অনেক নেমে এসেছি।'

'অনেক নেমে এসেছি? বলো কি?' অবাক হবার মুখ করল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, আমরা এখন চলে এসেছি উদরে। স্থূল করে বলতে পারো, পেটে। আর শুকনো পেটে যদি ভগবান নেই, তা হলে প্রেমও নেই। সুতরাং—'

'সুতরাং-এ দরকার নেই।' আদর করবার জন্যে হাত বাড়াল সুকান্ত। বললে, 'বলো তোমার কী চাই? স্নো-পাউডার, তেল-সাবান—ন্যাপকিন?'

সরে গেল কাকলি। বললে, 'নিজের হাতখরচের টাকার মধ্যে আমার এসব খুচরো প্রয়োজন না-হয় ম্যানেজ করলে, কিন্তু আমার যদি হঠাৎ কোনো সময় এক থোকে একটা মোটা টাকার দরকার হয়—'

'যথা, আচ্ছাদন? শাড়ি?'

'শুধু শাড়ি কেন, কত কিছুই তো দরকার হতে পারে। শখ হতে পারে।'

'যথা, আভরণ? কঙ্কণ-কিঙ্কিণী?'

'নয়ই বা কেন? লজ্জা কিসের? অপরাধ কোথায়? তখন পাবে কোথায়? তখন কী বলবে?'

অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত জোড় করল সুকান্ত। বললে, 'বলব, ফিজিশিয়ান, হিল দাইসেল্‌ফ।'

'তার মানে?' কর্কশ রেখায় ভুরু কুঁচকোল কাকলি।

'তার মানে, বাঙলা করে বলব, হে সবলা, হে সক্ষমা, তুমিই তোমার মেধা-মজ্জা খাটিয়ে নিজের ব্যবস্থাটা নিজেই করে নাও।'

'মানে, আমকে চাকরি করতে বলবে?' চোখ প্রায় গোল করল কাকলি : 'মানে নিজে খেটে নিজের আচ্ছাদন-আভরণ সংগ্রহ করতে হবে? মশাইকে তবে বিয়ে করলুম কেন?'

'ও, হ্যাঁ, বিয়ে করেছি।' চিন্তান্বিতের মত চিবুকে হাত বুলোল সুকান্ত : 'মাঝে-মাঝে কিরকম ভুল হয়ে যায়। মনে হয় যেন তেমনিই আছি দু'জনে।'

'তেমনিই আছি! তেমনিই রেখেছ! আমার কপালে-মাথায় এ অকীর্তি কিসের? কার? সিঁদুর কি অহংকারের, না কি কলঙ্কের চিহ্ন?'

'আহা, কলঙ্কই তো অহংকার।'

'কাব্য করতে তো পয়সা লাগে না।' মুখ বেঁকাল কাকলি : কিন্তু এ কলঙ্কের শর্ত ছিল কী? কী শর্তে বিয়ে করেছি শ্রীমানকে? মনে নেই?'

'আছে।'

'কী?'

'আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটব, চাকরি করব, আর তুমি পড়ে-পড়ে ঘুমোবে।'

'হ্যাঁ, ঘুমুব।'

'আর, ঘুম যাতে ভালো হয়, যাতে গায়ে মাথায় ঘামতে না হয় তারই জন্যে ফ্যান কিনে এনেছি।'

'আরো অনেক কিছুই হতে পারে কিনতে।' সাদাসিধে গদ্যের ভাষায় কাকলি বললে, 'সুতরাং সব টাকাই সংসারে গুঁজো না। রিসার্চের টাকাটা মাকে দাও, আর টিউশানির টাকাটা আমার হাতে রাখো।'

'তাও তো মোটে এক শো। খরচ করতে চাইলে এক টিপ নস্যি।'

'আহা, তাই বা মন্দ কী! নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভালো।'

'কিন্তু, তুমি তো চটবে, নইলে সবিনয়ে বলতাম, কানা-মামাকে কি সুস্থ করা যায় না, দু-চোখো করা যায় না?' ইঙ্গিতটা কাকলি এখনো স্পষ্ট করে বুঝতে পারে নি বুঝে সুকান্তর সাহস হল। বললে, 'আমার এক হাতে ঢাল আরেক হাতে তলোয়ার, আমি লড়ি কিসে? তাই তুমি যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াও, তুমিও যদি লড়ো—'

'দেখ, আমাকে খেপিও না।' আবার সেই পুরোনো কথা, বুঝতে পেরেছে কাকলি। তাই আবার সে জ্বলে উঠল। বললে, 'আমাকে শান্ত থাকতে দাও। বিবাহিত মেয়েদের সনাতন যে অধিকার, সংসারের খাটা-খাটনির পরে দুপুরবেলায় লম্বা ঘুমুনো, যা এ বাড়ির আর সবাই উপভোগ করছে, তাতে আমাকেও মশগুল হতে দাও। নইলে স্ত্রীর চাকরিতে স্বামী সচ্ছল হবে এর মধ্যে স্বামীর আর যাই থাক, তেজ-বীর্য নেই। দয়া-মায়া তো নেই-ই।'

শুকনো রেখায় হাসল সুকান্ত। বললে, 'এরকম করে দেখা আজকের দিনে আছে নাকি?'

'সব সময়েই আছে।' ধমকে উঠল কাকলি। 'স্বামী আনবে, আর স্ত্রী বুনবে। উপার্জন করে টাকা আনবে স্বামী আর তাই দিয়ে সংসারে শ্রীর আলপনা আঁকবে স্ত্রী। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার যা কথা—' কাকলি বুঝি আবার ফণা তোলে!

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি ফ্যানের হাওয়া খাও, আর অঢেল ঘুমোও। আর আমি সারাদিন টো-টো করে ঘুরি।'

'তাই তো ঘুরবে।'

'আর স্ত্রী?'

'সেও ঘুরবে বোঁ-বোঁ করে সংসারের ঘানিতে।' হাসিমুখে সুকান্তের এক পা কাছে এল কাকলি। বললে, 'শোনো। একটা সদ্য এম-এ পাশ ছেলে তিন শো টাকা কামাচ্ছে, এ দেখতে-শুনতে কিছু খারাপ নয়। সে যদি সংসারে দু' শো টাকা দিয়ে এক শো টাকা নিজের জন্যে—'

'নিজের জন্যে মানে?'

'নিজের জন্যে মানে, তোমার আর আমার জন্যে।' পুরোনো দিনের একটা কথার সুর বুঝি বেখাপ্পা হয়ে কানে লাগল। হাসির ঝাপটায় স্বচ্ছন্দে সেটা উড়িয়ে দিল কাকলি। বললে, 'যদি এক শো টাকা নিজের জন্যে রাখা যায়—যুক্তিযুক্তই দেখাবে।'

'তাই রাখব এবার থেকে।' হেসে সায় দিল সুকান্ত।

কলেজ যাচ্ছে, মানিব্যাগ প্রায় খালি, হন্তদন্ত হয়ে মৃণালিনীর কাছে হাত পাতল সুকান্ত। বললে, 'মা, একটা টাকা দাও।' তখুনি-তখুনি দিতে হল কৈফিয়ত : 'বাস ভাড়া নেই।'

মৃণালিনী বললে, 'আমার হাত জোড়া, তোর কাকিমার কাছ থেকে চেয়ে নে গে।'

চকিতে কাকলির সঙ্গে চোখচোখি হল সুকান্তর। কাকলির চোখ বললে, 'বেশ হয়েছে। সুপুত্রের মত সব টাকা মা'র জিম্মায় রাখো! আহা, সুকান্ত আমার কেমন হীরের টুকরো ছেলে। রোজগারের সমস্ত টাকা মা'র হাতে তুলে দেয়। বউয়ের আঁচলে গোঁজে না। বেশ, এখন ঠেলা সামলাও। কিছু টাকা স্বাধীনমত নিজের হাতে, মানে স্ত্রীর হাতে থাকলে, ঠেকতে হত না, দাঁড়াতে হত না কাকিমার কাছে। হলই বা না ধার, ক্ষণকালের ধার, তাই বা কে চায়। যে মানী, সে আপনজনের কাছেও হাত পাতে না।'

কাকলি নিচেই ছিল, সুকান্ত তাকে বললে মিনতির সুরে, 'তুমি গিয়ে চেয়ে আনো।'

'আমি পারব না।' স্বচ্ছন্দে বললে কাকলি। প্রায় ধর্ম-দেখার ভঙ্গিতে।

অসুবিধেটা বুঝল মৃণালিনী। তাই নিজেই সে অন্তরঙ্গ সুর খেলিয়ে ডাকল বিজয়াকে। বললে, 'বিজয়া, সুকুকে একটা টাকা দে তো। আমি মাছ ভাগ করছি, আমার হাত জোড়া, পরে গিয়ে তোকে দিয়ে দেব।'

বিজয়া, ডিমওয়ালার টাকাটা দিয়ে দে তো। সবাই খেতে বসেছে, পাঁচ খুরি দই আনা তো চাকরকে দিয়ে। জয়ন্তীর কী পেইন্টিং বক্স কিনতে হবে দিয়ে দে তো এখনকার মত। আর সুবীরের কী গেম ফি না ম্যাগাজিন ফি। জমাদার কী বকশিশ চায় দ্যাখ তো। ওমা, রিক্শা ভাড়া কবে আবার বাকি ছিল? আচ্ছা, তুই দে তো এখন মিটিয়ে।

এমনি থেকে-থেকেই খুচরো খরচের টাকা বিজয়ার কাছ থেকে চেয়ে নেয় মৃণালিনী। সব সময়েই ফেরত দেবার কথাটা মনে রাখে না। বিজয়া অবশ্যি ফেরত চায় না মুখ ফুটে কিন্তু কবে ও কোথায় কত টাকা বাকি পড়েছে, দিব্যি মনে করে রাখে।

দিদির ভালোবাসায় আবার বান ডাকল বুঝি। ভালোবাসার বান ডাকলে দিদি অমনি তুই বলে, ডাকে নাম ধরে।

বিজয়া ঘরের বাইরে এসে বললে, 'আমার কাছে দশ টাকার নোট আছে। ভাঙানি নেই।'

ঠকে না হোক, ঠেকে শিখেছে বিজয়া। মৃণালিনীর যেমন 'হাত জোড়া', বিজয়ারও তেমনি 'নোটের ভাঙানি নেই।'

আবার সুকান্তর দিকে কৌতুকগর্ভ চাউনি ছুঁড়ল কাকলি। কেমন, হল? পূর্ণ হল আকাঙ্ক্ষা?

অগত্যা হাত ধুয়ে উপরে উঠতে হল মৃণালিনীকে। সুকান্তকে একটা টাকা দিতে হল আলমারি খুলে।

একটা টাকার জন্যে দশ মিনিট দেরি। কাকলির নীরব দৃষ্টির কাঁটা পিঠে যেন বিঁধল সুকান্তর।

আলমারি খুলে টাকা গুনছে মৃণালিনী, সুকান্ত বললে, 'কিছু টাকা নিজের হাতে রেখে দেব ভাবছি।'

শুনেও শুনল না মৃণালিনী।

এক টাকার নোটটা ভাঁজ করে ব্যাগে পুরতে-পুরতে সুকান্ত বললে, 'তোমাকে, সংসারকে, দু' শো টাকা দেব আর এক শো টাকা রাখব নিজের কাছে।'

'নিজের কাছে মানে বউয়ের কাছে।'

এই নাও! এই আবার আরেক প্যাঁচ!

যেতে-যেতে থামল সুকান্ত। বললে, 'কেন, দাদাও তো তাই করছে। খানিক দিচ্ছে, খানিক রাখছে।'

'তার কতই বা মাইনে!' যুক্তি ধরে কথা বলার তো দায় নেই, ফট করে বলে বসল মৃণালিনী। আর তা বন্দনাকে শুনিয়ে।

'কত মাইনে তা নিয়ে কথা হচ্ছে না।' বললে সুকান্ত, 'কথা হচ্ছে যতই মাইনে হোক, কিছু টাকা রাখতে হচ্ছে হাতখরচের জন্যে।'

'তার ছেলেমেয়ে আছে।' আবার এক যুক্তি-ছুট কথা বলল মৃণালিনী।

'তার ছেলেমেয়ে না থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত খরচরে জন্যে আলাদা একটা টাকা দরকার।'

'ছেলেমেয়ে না থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত খরচের জন্যে আলাদা একটা টাকা দরকার।' সিঁড়ির মুখে এসে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে সুকান্ত।

কথা বলার কী দরকার! কাকলি উপস্থিত না থাকলেও তার অনুযোগ-ভরা কাতর চোখ যেন দেয়ালে ফুটে রয়েছে। যেন বলছে, কথাই বিষ, কথাই শত্রু। কথা না বলে পরের মাসে আলগোছে এক শো টাকা কম দিলেই চলে যেত। মা কিছুই বলতে আসতেন না।

কিন্তু এখন জলে ঢেউ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মৃণালিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, 'তা যখন-তখন এটা-সেটা বলে আকছারই তো নিচ্ছিস—'

'হ্যাঁ, বারে-বারে তোমাকে শুধু বিরক্ত করা. নিজেরও সময় নষ্ট। সেদিন টাকার দরকার, শুনলুম তুমি বাড়ি নেই। কালীঘাট গিয়েছ।'

'কবে আবার কেওড়াতলা যাব। তার চেয়ে এবার থেকে সব টাকা বউয়ের হাতেই তুলে দিস।'

'কী কথায় কী কথা! শুধু-শুধু সময় নষ্ট।'

'সময় নষ্ট করতে গেলি কেন? বউয়ের কাছ থেকে টাকা একটা চেয়ে নিলেই হত।'

'বউ? বউ টাকা পাবে কোথায়?'

'এমনই বাউণ্ডুলে বউ, একটাও তার টাকা নেই? বাপের বাড়ি থেকে কিছুই এদিক-সেদিক আনতে পারে নি, এ কখনো হতে পারে?'

'ঐ একটা মাত্র স্যুটকেস নিয়ে তো এসেছে। আর তোমরা কাস্টমসের পুলিসের মত তা তন্নতন্ন করে দেখেছ, একটা ফুটো আধলাও পাও নি।'

'কিন্তু অদৃশ্য হয়ে তো থাকতে পারে।'

'অদৃশ্য হয়ে?' এক সিঁড়ি থামল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, ব্যাঙ্কে-পোস্টাফিসে। বাবা কি মেয়ের জন্যে কোনো প্রভিশনই করে নি বলতে চাস?'

ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুকান্ত। কাকলির দূরত্বটা অনুমান করে কণ্ঠস্বর স্তিমিত করল। বললে, 'সে দুঃখের কথা শুনো আরেক দিন।'

'কিন্তু তার হাতে একেবারে টাকা নেই, এ আমাকে তুই বিশ্বাস করতে বলিস? টাকা নেই তো ফ্যান কিনল কী দিয়ে?

হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না সুকান্ত। নামতে-নামতে বললে, 'ফ্যান কেনবার টাকা ছাত্রের কাছ থেকে আগাম নিয়েছি।' তারপর কাকলি যাতে শুনতে পায়, তেমনি বুঝে গলা উত্তেজিত করল : 'আর বউয়ের যদি নিজস্ব টাকাও থাকে, আমি তা নিতে যাব কেন? আমি নিজে রোজগার করি না? আমার দুই হাত আর মাথা নেই?'

পাখা শুধু কেনাই হয়েছে, এখনো টাঙানো হয় নি। মিস্ত্রি এসেছে টাঙাতে।

'কোন ঘরে ফিট হবে?' জিজ্ঞেস করল মিস্ত্রি।

কাকলি এগিয়ে এল। শ্বশুর-শাশুড়ির ঘর দেখিয়ে দিল।

মৃণালিনী অস্থির হয়ে বললে, 'সে কী কথা? আমাদের ঘরে কী!'

'হ্যাঁ, আপনাদের ঘরের জন্যেই তো—' সরল জোরের সঙ্গে কাকলি বললে।

'বলো কী! সুকু জানে?'

'বাঃ, জানে বৈকি। ওই তো বলে গেল।'

তবু যেন বিশ্বাস করা যায় না। মৃণালিনী ভয়ে-বিস্ময়ে, দ্বিধায়-আনন্দে তালগোল পাকিয়ে গেল। বললে, 'না, সুকু আগে আসুক। আগে বলুক। পরে দেখা যাবে।'

'কতক্ষণে ফিরবে তার ঠিক নেই। ততক্ষণ থাকবে না মিস্ত্রি।' কাকলি হাসল : 'ফ্যান থাকতে এক রাত্রির কষ্টই বা সওয়া কেন?'

ভূপেন-মৃণালিনীর ঘরেই টাঙানো হল পাখা। রেগুলেটার বসল। বন্দী, অথচ উড়তে লাগল রাজহাঁস। চুল আর আঁচল একসঙ্গে সামলাতে না পেরে মৃণালিনী বিহ্বল হয়ে শিশুর মত হাসতে লাগল।

সবচেয়ে বেশি খুশি জয়ন্তী আর সুবীর। কমাও, বাড়াও, ফুল ফোর্স দাও, ইচ্ছে করে তো বন্ধ করে রাখো। দেখ দেখ একেবারে নট-কিচ্ছু।

'কি, সুবীরকে এবার পড়তে দেবে তো এ ঘরে?' জয়ন্তীর চিবুক ধরে সস্নেহে জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'বাঃ, আমি কখন বারণ করেছি? তবে জানো ছোট বউদি, ও ভারি চেঁচায়। তবে এখন যখন ফ্যান হয়েছে—' জয়ন্তী পাখার দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে রইল।

'তবে এখন যখন ফ্যান হয়েছে চেঁচাবার দরকার হবে না।' সুবীর বললে, 'আর ঐ চেঁচানো কি পড়া নাকি? ওটা হচ্ছে প্রতিবাদ। গরমের বিরুদ্ধে, ছোট ঘরের বিরুদ্ধে, কিছু মনে রাখতে না পারার বিরুদ্ধে। তাই না?' কাকলির দিকে সমর্থনের আশায় তাকাল সানন্দে।

'কিন্তু যাই বলিস সুবীর, কাগজচাপা লাগবে।' বললে জয়ন্তী, 'নইলে শান্তিতে খাতা-বই মেলে বসতে পারবি নে।'

'তুই তো কাকিমার মেয়ে। তবে কাকিমার থেকে কিছু নিয়ে আয় না চেয়ে। কাঁচের নয় পেতলের আনিস। কাকাকে বললেই নিয়ে আসবে ঠিক আফিস থেকে।' সবজান্তার মত ভঙ্গি করল সুবীর।

জয়ন্তী ভার-ভার গলায় বললে, 'কাকিমারা চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে—'

তাতে সুবীরের কিছু যায় আসে না। কিন্তু অন্য দিক থেকে ভয় আছে ভেবে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'তখন ছোড়দারা নিচে যাবে, আর তুই তোর সাধের ঘরে, একা ঘরে, পড়বি চেঁচিয়ে।' হাসল জয়ন্তী : 'মানে ফের তোর প্রতিবাদের ঝড় তুলবি।'

'আমি আর নড়ছি না।'

'দেখি তখন কে নড়ে।' নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বললে জয়ন্তী।

'তখনকার কথা তখন। আজ তো আচ্ছা করে খেয়ে নিই হাওয়া।' কাঁটা পুরো ঘুরিয়ে দিল সুবীর। পরে বললে, 'তবে কাকিমাদের যাওয়া যদি না হয়! তুই তো পরীক্ষা ছাড়াও ভগবানকে ডাকিস। একবার ডেকে বল না তাঁকে। কাকিমারা যেন না যায়। সুবীরের মাথার উপরে পাখাটা যেন বহাল থাকে।'

'না রে, ফ্ল্যাট ঠিক হয়ে গিয়েছে। কাল সকালে লরি আসবে মালপত্র নিতে।'

জয়ন্তীর চোখ প্রায় ছলছল করে উঠল : 'একটুও ভালো লাগে না। জানিস, আর সেই বাড়িটা এখান থেকে অনেক দূরে। হেঁটে যাওয়া যাবে না ইচ্ছেমত। পাখা হল বটে, কিন্তু ভারি মন কেমন করবে কাকিমার জন্যে। তোর করবে না?'

'যা-যাঃ!' শেষ গেঞ্জিটাও গা থেকে খুলে ফেলল সুবীর। বললে, 'আমার মন খারপ হবে যদি সত্যি ঐ কোণের ঘরটাতে সরতে হয়।'

কিন্তু সেণ্টুর কথা অন্য ধরনের। সে কাকলির কোলে চড়ে বলছে, 'পাখাটা তোমার ঘরে নিলে না কেন কাম্মা?'

বাপ-মা বা নিজের ঘর ভাবছে না সে, ভাবছে কাম্মার ঘর।

কাকলি বলল, 'এই তো ভালো হল। তুমি একদম ঠাকুমার কাছে যাও না। এখন ঠাকুমার ঘরে পাখা হল, তুমি ঠাকুমার কাছে শুয়ে ঘুমুতে পারবে।'

'ভালো হবে না কিন্তু—' কাকলির একগুচ্ছ চুল মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল সেণ্টু।

'কে বললে ভালো হবে না?' শাসনের মাত্রাটা আরো বেশি হোক এমনি সরস আশা করতে-করতে কাকলি বললে, 'ভালোই তো হল। দুপুরে ছটফট করতে আমার কাছে, পাখার বাড়ি খেতে, এখন ফ্যানের হাওয়ায় এ ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমুবে।'

'না, না, আমি কক্ষনো থাকব না এ ঘরে।' শাসন-পীড়ন না করে দু হাতে সেণ্টু কাকলির গলা জড়িয়ে ধরল। বললে, 'তুমি আমাকে এ ঘর থেকে নিয়ে যাও। হোক গরম, দুপুরে আমি তোমার কাছে ঘুমুব। জানো কাম্মা, তোমার পাখার বাড়ি আমার একটুও লাগে না।'

বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরলে ভূপেনের আগে ঘরে ঢুকল মৃণালিনী। সগর্বে বললে, 'নিজে যা কোনোদিন পারো নি, পারতে না, তাই দেখ একবার চোখ তুলে।'

ভূপেন দেখল। বললে, 'কে দিল?'

'সুকু।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ভূপেন।

'তোমার গুণধর যে ভাই সেও দেয় নি তার দাদাকে। উদার হতে পারে নি। নিজে যখন ফ্যান কিনে আনল নিজের ঘরেই শামিল করল। দাদার কথা আর ভেবে দেখল না। সুকু সেরকম নয়। স্বার্থপর নয়।'

'না, না, নিজের ঘরে না টাঙিয়ে এখানে, এ ঘরে, দিয়েছে কেন?' তড়পাতে লাগল ভূপেন : 'আমার ফ্যানের দরকার নেই। ওর ফ্যান ওকে ফিরিয়ে নিতে বলো।'

'ভীমরতি আর কাকে বলে।' মৃণালিনী বসে গেল কাপড় কাচতে : 'ঘরের একটা ছেলে সংসারের উন্নতি করবে তা পর্যন্ত সহ্য করতে পারবে না। এ ঘরে তুমি একলা থাকো না। আমি থাকি, আমার ছেলে-মেয়ে থাকে। আমাদের ফ্যান চাই। আর মেজরিটি মাস্ট বি গ্র্যান্টেড। কাজেই দন্তস্ফুট কোরো না। চুপ করে হাওয়া খেয়ে যাও। নয়তো কম্বল জড়াও। সুকুর ঘরে যে ফ্যান দরকার, তা তুমি কুয়োর ব্যাঙ, তুমি বুঝবে কী। সেই ফ্যান আমি বন্দোবস্ত করে দেব।' পরে নিচের তলাকে শোনাবার জন্যে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল : 'ভাই যে কিছুই করল না সংসারের জন্যে তার জন্যে নালিশ নেই আর ছেলে সমর্থ হয়ে আরাম দিচ্ছে সেবা দিচ্ছে, তাতেই যত অকথা!'

অন্ধকারে ঘরে ঢুকে পরিচিত সুইচ টিপে আলো জ্বালাল সুকান্ত। এ কি, পাখা কই?

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সরোষে : 'ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আসে নি?'

জয়ন্তীদের ঘরে ছিল কাকলি, গল্পে-গোলমালে শুনতে পায় নি সুকান্তর পায়ের শব্দ। এখন হাঁক শুনে বারান্দায় ছুটে বেরিয়ে এল, ততক্ষণে সুকান্তও বারান্দায় এসে দেখতে পেল কাণ্ডটা। বললে, 'এ কি, মিস্ত্রি ঘর ভুল করল নাকি?'

মৃণালিনী নিচে, পূজার ঘরে। তাকে শুনিয়ে, জগজ্জনকে শুনিয়ে কাকলি বললে, 'না। ভুল করবে কেন? তুমি যেমন বলে দিয়েছিলে মা-বাবার ঘরে হবে তেমনি হয়েছে।' বলে সুকান্তর প্রায় হাত ধরে টানতে টানতে নিজের ঘরে নিয়ে এল কাকলি। গম্ভীর স্বরে বললে, 'মা-বাবার ঘর খালি রেখে নিজেদের ঘরে ফ্যান টাঙানো অত্যন্ত অন্যায়, অত্যন্ত দোষের। তুমিও সেটা বুঝবে। তাই প্রথমটা ওঁদের ওখানে চালান দিয়েছি। পরে যদি আবার আসে তখন দেখা যাবে।'

'কিন্তু কী দুঃসহ গরম এই ঘরে!' সুকান্ত আপত্তি তুলল : 'ওদের ঘরের দক্ষিণ খোলা, হাওয়া থাকলে কার্পণ্য করে না।'

ওসব কথা কানেও তুলল না কাকলি। সারা শরীরে লাস্যের হাসি ঢেলে বললে, 'পাখা নয়, তোমার জন্যে নতুন একটা জিনিস করেছি।'

'কী?' সমুদ্রের পারে পথহারা শিশু, এমনি দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুকান্ত।

'আলোটা নেবাও।' খাটে উঠতে-উঠতে শুতে-শুতে বললে কাকলি।

কী যেন অন্ধ আকস্মিকতায় সমস্ত অস্তিত্ব ঝংকৃত হয়ে উঠবে তারই উদগ্র আশায় সুকান্ত আলো নিবিয়ে দিল।

আর তক্ষুনি বেডসুইচ টিপে ঘরে একটি নীলাভ মৃদু আলোর নীরব মোহ সৃষ্টি করল কাকলি। বললে, 'তোমার জন্যে এই বেডসুইচটা করেছি। কি, পছন্দ?'

লালসে-বিলাসে অপূর্ব দেখাচ্ছে কাকলিকে। কাকলিকে মানে কাকলির শরীরময়তাকে। যেন ও আগুনে-ভরা শমীলতা। ডালে ফল কাঠে আগুন। উমা আর অমা একসঙ্গে। শুক্ল আর কৃষ্ণ দুই পক্ষ বিস্তার করে যেন ঢাকবে সুকান্তকে। দুই শক্তিতে বাঁধবে নিটুট করে। এক শক্তি আবরণ, আরেক শক্তি উন্মোচন। ব্যক্ত আর অব্যক্ত। সত্য আর রহস্য, কুণ্ঠা আর কৃতার্থতা।

সেই বন্ধনে-আচ্ছাদনেই সুকান্ত শান্তি পাবে, আরোগ্য পাবে, পাবে তার আত্মার উপশম। তার সমস্ত দৈন্যের মোচন হবে এখানে, সমস্ত ন্যূনতার পরিপূর্তি। এইখানেই সুকান্তের সমস্ত জিজ্ঞাসার সমস্ত আকূতির উত্তর। সমস্ত জীবনের জয়ধ্বনি।

পরদিন সকালে তৃপ্তমুখে সুকান্ত বললে, 'তোমার বেডসুইচ ভালো দিনের সূচনা করেছে। কাকারা আজ চলে যাচ্ছে। এসে গেছে লরি। আমরা এবার বিস্তৃত স্থান পাব।' জানলায় দাঁড়াল সুকান্ত। কাকলি নেমে গেল নিচে।

দুটো কুলি মাল তুলছে লরিতে। সব খবরই ভূপেন দেরিতে পায়, এও জানতে পারল যখন লরি প্রায় অর্ধেক বোঝাই হয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে চোখ চড়কগাছ করে তাকাল হেমেনের দিকে। বললে, 'এ কী হচ্ছে?'

'একটা ফ্ল্যাট পেয়েছি। সেখানে উঠে যাচ্ছি।'

'কেন, সেখানে কেন?'

'এখানে সুকু আর তার বউয়ের অসুবিধে হচ্ছে, খোলামেলা ঘর পাচ্ছে না—'

'যাদের অসুবিধে হচ্ছে তারা চলে যাক। তুই কেন?' ভূপেন গর্জন করে উঠল।

দাদার মুখের দিকে এক পলক তাকাল হেমেন। পরে একটু আড়াল করে নিয়ে বললে, 'আরো একটু কথা আছে। ছোট বউ ফ্ল্যাট-ফ্ল্যাট করে। ওকে একটু দেখিয়ে নিয়ে আসি কাকে বলে ফ্ল্যাট হওয়া। শূন্য বাড়িতে একলা থাকার আনন্দ!'

'না, কাউকে দেব না আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ভাঙতে। কাউকে না। লরি থেকে শিগগির জিনিস নামা বলছি। কে আসতে বলেছিল লরি? কুলিরা গেল কোথায়?' নিজেই মাল নামাতে লাগল ভূপেন।

'সেলামি দেওয়া হয়ে গিয়েছিল—' হেমেন নিরস্ত্রের মত বললে।

'যাক সেলামি। তার চেয়ে মান বড়, আদর্শ বড়।' ভূপেন ফিরে এল ঘরের দিকে : 'সেলামিই বা যাবে কেন? আর কাউকে বন্দোবস্ত করে দেয়া যাবে। আর যেই ডুবুক, আমরা নয়, আমাদের দু' ভায়ের কেউ নয়। কেউ নয়। কি রে, নামালি?'

'নামাচ্ছি।' বললে হেমেন।

একুশ

'বাবা কী বললেন, শুনলে?' জিজ্ঞেস করলে সুকান্ত।

'কী বললেন?' কাপড় কুঁচোচ্ছিল কাকলি, চোখ তুলে তাকাল।

'শোনো নি?'

'না।' যতদূর সাধ্য চোখমুখ সরল করল কাকলি।

'নিচে এত গোলমাল চেঁচামেচি কানে ঢুকল না তোমার?'

'গোলমালের জন্যেই হয়তো ঢোকে নি। বলো না কী বললেন?' কাকলি দাঁড়াল স্থির হয়ে।

'বললেন যাদের এ বাড়িতে অসুবিধে হচ্ছে তারাই চলে যাক বাড়ি ছেড়ে—'

'মানে?'

'মানে আমাদেরই চলে যেতে বললেন।' টেবিলের সামনে চেয়ারটায় বসল সুকান্ত।

'তোমার মুখের উপর বললেন? স্পষ্ট হুকুম করলেন?' কাকলি খাটটা ধরল।

'না, তেমন করে নয়। বাপ হয়ে তেমন করে পারেন নাকি বলতে?'

'পারেন নি। কেউ-কেউ পারেন। মনে করলেই পারেন।' কাকলি চোখ নামাল।

কথার সুরটা ঘুরিয়ে দিল সুকান্ত। বললে, 'ঠিক তেমনি করে না বললেও পরোক্ষ এখানে প্রত্যক্ষের মতই কাজ করছে।'

'তা হলে কী করবে?' হাতের কাজ ফেলে খাটের উপর বসল কাকলি।

'চলে যাব।'

মৃদুরেখায় হাসল কাকলি। 'তা হলে কাকা যে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিলেন, নিলেন না, সেটা গিয়ে ধরো।'

'ওরে বাবাঃ! সেটা ধরব কী! সেটার ভাড়া দু' শো টাকা।' সুকান্ত প্রায় হতাশের মত মুখ করল।

'তোমার রোজগারের আদ্ধেকেরও বেশি বেরিয়ে যাবে শুধু বাড়ি ভাড়াতেই। তারপরে খাবে কী? খাওয়াবে কী?'

'হ্যাঁ, সমস্যা কি একটা?' চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিয়ে সিগারেট ধরাল সুকান্ত। 'এখন আর শুধু খাওয়া নয়, খাওয়ানো। আর কে জানে, হয়তো বা একাধিক।'

শব্দ করে হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'দয়া করে যে মনে রেখেছ কর্তব্যটা!'

চুপ করে ধোঁয়া ওড়াতে লাগল সুকান্ত।

দুষ্টু-দুষ্টু মুখে কাকলি বললে, 'তা হলে কী হবে?'

'এক শো টাকার মতন একটা ছোটখাট ফ্ল্যাট দেখে চলে যাব। আজ থেকেই বেরুব খুঁজতে। সকলকে বলব। দরকার হলে দালাল লাগাব।'

'ছোটখাট ফ্ল্যাটে কী আর এমন সুসার হবে? এখন যেমন এখানে আছি তার চেয়ে আর কী উন্নতি হল?' কাকলি দু' হাত টান করে সোজা হয়ে বসল। 'ছোট-ছোট দুখানা ঘর, এক চিলতে বারান্দা, আলাদা একটু রান্না আর স্নানের জায়গা—সহজেই অনুমান করতে পারি এক শো টাকায় এর চেয়ে আর কতদূর কী হবে! তা হলে আর কী জিতলাম! এখন থাকবার ঘরটা ছোট হলেও সমস্ত উপর-নিচ, ছাদ-বারান্দা, এ-ঘর ও-ঘর সব ঘরেই আমাদের আনাগোনা—'

'তবু ওখানে গিয়ে আমরা স্বাধীন হব।'

'একা-একা থাকাই বুঝি স্বাধীন হওয়া?' বাঁকা করে তাকাল কাকলি।

'নিশ্চয়ই। এক শো বার। কাপড় বুঝে নিজের কোট কাটা। নিজের কাঁচিতে নিজের কাটছাঁট।' আবার একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সুকান্ত: 'তোমার জেলখানার সমস্ত উপর-নিচ ছাদ-বারান্দার চেয়ে ছোট ঘরের স্বাধীনতা ঢের ঢের লোভনীয়।'

'কিন্তু', লঘু করতে চাইল কাকলি: 'পরে যদি কিছু একটা আমাদের হয়-টয়?'

'হবে না।' চেয়ার থেকে ছিটকে উঠে দাঁড়াল সুকান্ত।

'ভীষ্ম বুদ্ধিমান ছিল।' হাসতে হাসতে কাকলি বললে, 'সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল বিয়ের আগে করেছিল, বিয়ের পরে নয়। বিয়ের পরে হলে আর তার সাহস হত না।'

'যদি হয় তো হবে।' হেরে গিয়ে সুকান্ত ফের চেয়ারে বসল। বললে, 'যারা একা-একা থাকে তাদের শিশু কি আর মানুষ হয় না?'

'হয়। ঝি-এর হাতে হয়।' ব্যঙ্গের সুর আনল কাকলি।

'তা হলে সেখানেও তাই হবে।' বলে ফেলল সুকান্ত।

'কোন দুঃখে? এ শিশুর ঠাকুমা থাকবে না? এরই জন্যেই তো সংসারে ঠাকুমার দরকার।' মুখ হাসি-হাসি করেই রাখছে কাকলি: 'ঠাকুমা থাকতে শিশুকে আমরা একটা ঝি-এর হাতে সঁপে দেব না। আর ঠাকুরদা থাকতে যে শিশু তার নাতির আদর পেল না তার মত হতভাগ্য আর কে আছে!'

'মূর্খের মত কথা বোলো না।' সিগারেটের শেষ টুকরোটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সুকান্ত: 'তোমার সেই শিশু কোথায়?'

'শরীরে এখনো না আসুক কিন্তু আকাঙ্ক্ষায় তো আছে। আর বলতে এখন বাধা কী, তার জন্যেই তো বিয়ে। যেমন প্রণামের জন্যেই পুজো।' কাকলি ধরতে চাইল সুকান্তর চোখ। বললে, 'সুতরাং ভাবনা থেকে তাকে বাদ দিলে চলবে না। বরং সকলের আগে তার কথাটাই—'

'ইডিয়ট!' ঘৃণায় ঝাঁজিয়ে উঠল সুকান্ত।

'ইডিয়ট আমি না তুমি?' কাকলিও পাল্টা ঝাপটা হানল।

'তুমি।'

সুকান্ত ফের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল: 'নইলে আজকের দিনে কোনো শিক্ষিত লোক পচা পুরোনো দিনের শ্বশুরশাশুড়িওলা সংসারকে আদর্শ ভাবে?'

'দিন পুরোনো হলেই পচা এ তোমার কুসংস্কার।' কাকলি নামল খাট থেকে: 'নচেৎ তুমি যে ভাবছ তুমি শিক্ষিত সেটা তোমার ভুল।'

'ভুল?' সুকান্তর ইচ্ছে হল কাকলির গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

'এ তো কম করে বলেছি। রোজগেরে উপযুক্ত ছেলে বাপ-মাকে ফেলে বউ নিয়ে আলাদা সংসার করছে এ খুব একটা আদর্শের কথা?'

'কিন্তু বাপ-মা যদি তাড়িয়ে দেয়?' মুখিয়ে উঠল সুকান্ত।

'দেয় নি তাড়িয়ে।'

'দিয়েছে। যে ভাবে বলেছে তাতে তাড়িয়ে দিয়েছেই একমাত্র মানে।'

'না, কক্ষনো না।' কাকলিও জোর আনতে জানে: 'তা ছাড়া কারু একটা রাগের কথাই তার সমগ্র কথা নয়। শেষকালে বাবা কী বললেন শোনো নি? ঢোকে নি কানে? বললেন, পারতপক্ষে আমাদের এই একান্নবর্তী পরিবার আমরা ভাঙতে দেব না।'

'একটা ফসিলের মত কথা।'

'ফসিল আবার কথা কইল কবে?' গাম্ভীর্যের মধ্যে চাপল্যের সুর আনল কাকলি।

'না, কথা নেই। উত্তাল কালস্রোতের কাছে দাঁড়াবে না কারু কান্না বা কোলাহল, কারু বা প্রতিবাদের স্পর্ধা। সমস্ত মধ্যবিত্ত ইমারত ধসে ভেসে গলে যাবে।'

'বেশি বাহাদুরি কোরো না।' কাকলি জানলার দিকে এগিয়ে গেল: 'স্রোত যা নেয় তাই আবার ফিরিয়ে দেয়। ভাঙন নদীতে আবার চর জাগে। একটা জিনিস ভেঙে যাচ্ছে বলেই সেটা মন্দ?'

'নিশ্চয়ই। মন্দ বলেই তো ভেঙে যাচ্ছে, দাঁড়াতে পারছে না, থাকছে না টিকে।'

'কী যুক্তি! জীবন যেহেতু টিকছে না, গোটা জীবনটাই খারাপ।' কাকলি ঝাঁজিয়ে উঠল: 'আর যা

দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধত স্বার্থপরতার মত ঘোলাটে অহং-বুদ্ধির মত তাই একেবারে ভালোর অবতার!'

এত তিক্তও কাকলি হতে পারে নাকি? সুকান্তর মনে হল যেন এক তাল কাদা তার মুখের উপর পড়ল ছিটিয়ে। অবতার কথাটার মধ্যে পরিহাস নয়, তীক্ষ্ণমুখ ঘৃণার দংশন।

যে দৃঢ় সে তপ্ত হবে কেন? সুকান্ত তাই গম্ভীর গলায় বললে, 'নীতির কথা হচ্ছে না, পরিস্থিতির কথা হচ্ছে।'

'পরিস্থিতি এমন কিছু খারাপ হয় নি।' পিঠ-পিঠ জবাব দিল কাকলি।

'যথেষ্ট খারাপ হয়েছে। কাকা উঠে যাবে ঠিক করেছে, দস্তুরমত ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে, ট্রাক এসেছে মাল নিতে, এমন সময় বাড়ির কর্তা বাবা গদগদ হয়ে বললেন, তুই আমার ভাই, তুই যাস নে। ঐ ছোঁড়া যে নতুন বউ নিয়ে এসেছে, হলই বা না সে পুত্র, সে ব্যাটা বেরিয়ে যাক—'

'যদি তার অসুবিধে হয়!' সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিল কাকলি।

'অসুবিধে হয়!' সুকান্ত ভেঙচে উঠল : 'অসুবিধে হচ্ছে না বলতে চাও?'

'হচ্ছে।' চোখমুখ স্নিগ্ধ করল কাকলি : 'কিন্তু মোটমাট অসুবিধের চেয়ে সুবিধেই বেশি হচ্ছে। ঢের ঢের বেশি।'

'বেশি?' সাধ্য কি তুমি তপ্ত না হয়ে পারো? সুকান্ত তাই খিঁচিয়ে উঠল : 'নিজের রোজগারের টাকায় নিজের কর্তৃত্ব ফলানো চলবে না, সর্বকর্ত্রী মা'র হাতে তুলে দিয়ে ভালো মানুষ সাজতে হবে, মা'র সুপুত্র সাজতে হবে—এ কী ঝকমারি! তার উপরে একটা এজমালি বাড়ির খাওয়া আর পরিবেশন একজনের মর্জির উপরে নির্ভর। তিনি যেদিন ইচ্ছে করবেন সেদিন বাটিচচ্চড়ি, যেদিন ইচ্ছে করবেন সেদিন ঘ্যাঁট। বাড়ির আর কারু রুচি চলবে? আর কারু ফরমায়েশ?'

'তুমি—তুমি মা'র সম্পর্কে এ কথা বলছ?' মুখ ঘুরিয়ে গালে হাত রাখল কাকলি : 'তুমি মা'র লাট ছেলে, তোমার জন্যে সব লাটী বাটি। স্পেশ্যাল ডিশ, আলাদা মেনু। কোনদিন স্টু, কোনোদিন মোগলাই। তোমার জন্যে তো এলাহি ব্যবস্থা। সংসারে আর কেউ নয়, তুমি—তুমি বলছ এ কথা?'

'হ্যাঁ, আমি বলছি। আমি তো বলব।' সুকান্ত অসহায়ের মত আরেকটা সিগারেট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল : 'একজনকে বেশি আরেকজনকে কম, একজনকে স্পেশ্যাল আরেকজনকে অর্ডিনারি— এইটেই তো একান্নবর্তী পরিবারের দোষ। কড়া থেকে দু' হাতা দুধ তুলে নিজের ছেলেদের খাইয়ে দেওরের ছেলেদের জন্যে দু' হাতা জল ঢেলে রাখা। আমার স্পেশ্যালের সামনে বসে আরেকজন অর্ডিনারি খাবে এটা আমার পক্ষে কম অস্বস্তিকর? আমার নিজের সংসার হলে এসব তারতম্যের কোনো ভয়ও নেই, অশান্তিও নেই। স্পেশ্যাল হলে স্পেশ্যাল, অর্ডিনারি হলে অর্ডিনারি।'

'উঃ, তুমি কী সাংঘাতিক লোক।' উল্টো গালে হাত রাখল কাকলি : 'বেশি খেয়েও তোমার অসুবিধে।'

'হ্যাঁ, বেশিতেও অসুবিধে, যদি আরেকটা লোক মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে। আর, বেশি হলেই বা কী। খুশি মতন আছে কিছু? যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিন ফাউল খেতে পারো? খেতে পারো চিংড়ি মাছ?'

ও-হো-হো করে হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'চিংড়ি আবার মাছ নাকি? ও তো পোকা, ইনসেক্ট। যার মধ্যে রক্ত নেই সে মাছ হয় কী করে? তবে তো টিকটিকিও খেতে পারো। আর যা সব পুরুষ্টু টিকটিকি ঘোরে তোমার দেয়ালে। হয়তো ফড়িং ধরে। উচ্চিংড়ে। চীনাদের মত আরশুলা।'

'বোকা নিয়ে যাদের ঘর করতে হয় তাদের পোকা না খেয়ে উপায় কি।' কথার মধ্যে যে হাসি না ফুটে জ্বালা ফুটছে সেটা বুঝে তাড়াতাড়ি সুর পাল্টাল সুকান্ত। বললে, 'চিংড়ি মাছ খেলে দাদার এলার্জি হয় বলে বাজার থেকে আসতেই পারবে না এ কী জুলুম। একেই বলে একান্নবর্তিতার অত্যাচার। তুমি হাঁচবে বলে আমরা বাঁচব না। তুমি—তুমি এত চিংড়ি মাছ ভালোবাসো।'

'আহা, কী ভালোবাসা। থাক, আমার জন্যে তোমার সোনাদিদি হতে হবে না।' অনেক গভীরে, চিবুকে টোল ফেলে হাসল কাকলি : 'সোনাদিদির আদরে সর্ব শরীর বিদরে।'

'তা একটু বিদীর্ণ হলে ক্ষতি কী। তবু, যাই বলো, আপরুচি খানা, আপরুচি গানার মত সুখ নেই।'

'আপরুচি গানা মানে?'

'নিজের ইচ্ছেমত গান গেয়ে ওঠা। সাধ্য আছে এ বাড়িতে তুমি বাবা-কাকার সামনে গলা ছেড়ে গান গাও, কালোয়াতি সুরে ভাঁজো? বেয়াদবি, স্রেফ বেয়াদবি! দেখ দেখি ব্যক্তিস্বাধীনতার উপরে কত বড় হস্তক্ষেপ!'

কথার সুরটা লঘুতার দিকে যাচ্ছে দেখে আশ্বস্ত হল কাকলি। বললে, 'তার মানে নিজের সংসারে *ভীষ্মলোচন শর্মা হয়ে দিল্লি থেকে বর্মা পর্যন্ত আওয়াজ ছুঁড়বে!'*

'ছুড়ব। যাকে বলে স্বাধীনতার জয়োল্লাস। যখন খুশি গান যেমন খুশি বাজনা। আনন্দের আর এর চেয়ে বড় প্রকাশ কী আছে?' কাকলিকে দলে পেয়েছে ভেবে সুকান্তও হালকা হল : 'যেদিন ইচ্ছে চিংড়ি, যেদিন ইচ্ছে ভেটকি। যেদিন ইচ্ছে ইলিশ। খুশি হলে টাটকা, খুশি হলে বাসি।'

'সঙ্গে সঙ্গেই কলেরা। মাপ করো,' অজান্তে একটু গম্ভীর হল কাকলি : 'যদি ধরো, ঈশ্বর না করুন, তোমার কোনো অসুখ হয়?'

'হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে।'

'আমার অসুখ হলে?'

'মেটারনিটি হোম।'

'ইয়ার্কির কথা নয়।' কাকলিই লঘুতার সুর কেটে ফেলল : 'যদি কারু অসুখ হয়, আর তা বাড়াবাড়ি হয়, তখন নিদারুণ বিপদের মুখে গিয়ে পড়তে হবে। উপায় নেই তোমার বাবা-মাকে গিয়ে না খবর দিই। যদি আসতে না চান হাতে-পায়ে ধরে না রাজি করি। যদি বলেন, বাড়ি ফিরে চলো, তাই না কোন গিয়ে হাজির হই। সেই যদি লোকই হাসাব তবে মিছিমিছি মল বসাই কেন?'

'তবু তুমি এ সংসারে ছোট মনের নিত্যিকার ঝগড়াঝাটির মধ্যেই থাকবে?' রুখে দাঁড়াল সুকান্ত।

'এ হাঁড়িকুঁড়ির ঠোকাঠুকি, নড়ে চড়ে সরে বসে এরাই আবার এদের সাম্য ও স্থিতি বজায় রাখে। এ দু'জনের ঝগড়া ও দু'জনে মেটায়। ও দু-জনের ঝগড়া এ দু-জন। আর কাল যারা ঝগড়া করেছিল, আজ তারা একত্র বসে হাসে, আর আজ যারা ঝগড়া করছে দেখছ, কাল তারা পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখবে। কিন্তু তোমার ঐ একলার সংসারে যখন ঝগড়া হবে?'

'ঝগড়া হবে মানে, আমাতে-তোমাতে ঝগড়া হবে?' অবাক হবার ভাব করল সুকান্ত।

'তা তো হতেই পারে। ও আর এমন অসম্ভব কী!'

'তুমি যে এমন ঝগড়াটে তা তো জানতাম না।'

'আর তুমি যে অমন গোঁয়ার, তাই বা কি আমি জানতাম?' তবু কষ্ট করে মুখে হাসি আনল কাকলি। বলল, 'শোনো। কথাটা তা নয়। স্বামী-স্ত্রী থাকলেই ঝগড়া হবে, আর সে ঝগড়ার ক্রিয়া কী, তাও শাস্ত্রে বলা আছে। ক্রিয়াটা লঘু হওয়া তখনই সম্ভব, যদি সংসারটা এজমালি হয়। মা, কাকিমা, দিদি থাকতে তুমি কত আর হামলা করবে আমার উপর? আর শ্বশুর-ভাসুর থাকতে আমিই বা কত অশালীন হতে পারব? তখন এজমালি সংসারই মিটিয়ে দেবে, মিলিয়ে দেবে আমাদের! তখন আবার ঘরের সাদা আলোটা নিবে গিয়ে বেডসুইচের নীল আলোটা জ্বলে উঠবে দেখো।'

শেষ দিকে হাসিটা প্রাঞ্জল হয়ে উঠলেও সুকান্তকে পারল না স্পর্শ করতে। সুকান্ত কাঠখোট্টার মত বললে, 'আর ঐ একক সংসার হলে?'

'ওরে বাবাঃ, তখন তো খোলা মাঠে খোলা অস্ত্রে যুদ্ধ।' কাকলি হাসির জের টেনে বললে, 'তখন তো তুমি ভি এম-এ পাশ হাম ভি এম-এ পাশ!'

'তুমি আমাকে এমনি অবিশ্বাস করো?' থমথমে মুখ করল সুকান্ত।

'এ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা কী! এ একটা সম্ভাবনার কথা। যদি'র কথা। যদিও,' আবার হাসল কাকলি : 'যদিও যদি'র কথা নদীর পার।'

'তার মানে, তোমার আর আমার ভালোবাসায় আস্থা নেই।' সুকান্ত মুখ ফিরিয়ে বললে, 'তুমি আর বিশ্বাস করো না যে, ভালোবাসাই সমস্ত বিরোধের থেকে আমাদের রাখতে পারে বাঁচিয়ে। তার মানে তুমি বলতে চাও, একা হতে গেলেই আমাদের ঝগড়া আমাদের ভালোবাসার চেয়ে বড় হয়ে উঠবে।'

'কি জানি কী হবে! এখনো তো হই নি একা-একা, শুধু তুমি আর আমি।'

'সেই পরীক্ষার জন্যেই একা হওয়া দরকার।' সুকান্ত একটা ঘাই মারল: 'আমি আজ থেকেই বাড়ি খোঁজা শুরু করে দেব।'

'গরু খোঁজা করে বাড়ি খোঁজা।' কাকলিও মুখ এবার থমথমে করল 'কিন্তু আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এখুনি-এখুনি এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? তুমি ভাবছ, একা বাড়িতে গিয়ে ঝগড়া করার লোকের তোমার অভাব হবে? পাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী, হয়তো বা বাড়িওলা স্বয়ং। চলন-বলন পাড়ার ছেলেদের পছন্দ না হলে তারাই পিছনে লাগতে পারবে সদলে। একা ফ্ল্যাটে দেখতে পাবে বা চাকরের দুষ্কাণ্ড। একদিন হয়তো বা ফ্ল্যাটে ফিরে এসে দেখবে, চাকর উধাও, আমি দড়ি-বাঁধা অবস্থায় খুন হয়ে পড়ে আছি—'

'তুমি বাড়ি থাকবে কেন? তুমি বেরুবে।'

'কী বুদ্ধি! আমিও বেরুব? তোমার সঙ্গে, না? আর ফিরবও একত্র? বেশ তাই। তা হলে একত্র ফিরে এসে দেখব ঘরের তালা ভাঙা, সমস্ত লোপাট।'

'ডোন্ট বি সিলি! আর কি কেউ স্বামী-স্ত্রী থাকে ফ্ল্যাটে?' সুকান্ত দাঁতে দাঁত ঠেকাল।

'থাক। কিন্তু এ কে না বলবে যে এজমালি পরিবারে সিকিউরিটি, নিরাপত্তা, বেশি। বাইরে বেরুবার ফ্রিডমও বেশি। তুমি যখন খুশি বেরোতে পারো এ বাড়ি থেকে, তুমি জানো, কেউ না কেউ দেখবে তোমার ঘর-দোর। তোমার জিনিসপত্র। ফ্ল্যাট বাড়িতে এ নিশ্চিন্ততা হবে কখনো? একার সংসারে? তারপর ধরো একদিন রাতে তোমার ফিরতে অনেক দেরি হচ্ছে, আমি কোথাই যাই, কাকে বলি কাকে পাঠাই খোঁজ করতে। এজমালি সংসারে আমার চিন্তা হলেও আমার চিন্তার ভাগীদার আছে জেনে আমি অনেক আরামে থাকব। যেখানে মনের আরাম নেই, সিকিউরিটি নেই যেখানে সব সময়ে উদ্বেগ, দুর্ভাবনা, সেখানে যায় কে থাকে কে।'

'তুমি থাকো তোমার সিকিউরিটি নিয়ে, আরাম নিয়ে, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।' সুকান্ত দরজার দিকে এগোতে চাইল।

কাকলি দরজা আগলাল। বললে 'না তোমার এখুনি চলে যাবার কোনো কারণ হয় নি।'

'বেশ তো, তুমি থাকো এজমালি সংসার আলো করে, আমি যাই।'

'ডোন্ট বি সিলি! এবার পাল্টা হানবার সুযোগ পেল কাকলি। বললে, 'তুমি জানো তুমি যেখানে যাবে, আমাকেও সেখানে যেতে হবে। আমাকে এখানে রেখে তোমার একা সরে পড়বার কোনো মানে হয় না, কোনো শাস্ত্রে লেখে না। কিন্তু শোনো, একটা কথা তবু বলি। আমার এক গৃহ গেছে, কাকলির গলা ছলছলে হয়ে উঠল 'আরেক গৃহ আমি সহজে খোয়াতে প্রস্তুত নই।'

'সহজে প্রস্তুত কি আমিই ছিলাম?' সুকান্ত সরল না দরজা থেকে 'কিন্তু যে চলে যাবার জন্যে ইচ্ছুক, তাকে আটকে রেখে যারা অনিচ্ছুক-আগন্তুক, তাদের চলে যেতে বলাটা অসহ্য।'

'মোটেই অসহ্য নয়। মোটেই সেভাবে বলা হয় নি। কিন্তু', ডান হাত মেলে দরজা ধরে প্রত্যক্ষ বাধা বিস্তার করল কাকলি। বললে, 'এত যে আস্ফালন করছ, বলি তোমার টিউশানির টাকার জোর কত?'

যেন বিষ ঢেলে বলল কথাটা। তোমার আয় বা উপার্জন কত তা নয়, তোমার টিউশানির টাকা।

'কেন, তুমি জানো না?

'জানি বলেই তো বলছি এত উল্লম্ফন আসে কিসে? বেশ তো, এক শো টাকাতেই না হয় ফ্ল্যাট নিলে, তারপর? চাকরে-মেথরে-ইলেকট্রিকে রোপায় আরো ধরো পঞ্চাশ। কি, বাকি টাকার থেকে কিছুই তো দেবে বাবা-মাকে—নইলে আর পুত্রবত্ব বলবে কেন—সবই ঢালবে নিজের উদরে। কিন্তু বাকি দেড় শো টাকাতে চলবে তোমার সংসার?

'কেন, তুমি রোজগার করতে পারবে না?' প্রায় মুখের উপর তেড়ে এল সুকান্ত।

'আবার, আবার আমাকে টানছ?'

'কেন টানব না? উদরে যে ঢালব, সে উদর কি শুধু আমার একার? সংসার বলতে কি শুধু একা

আমি? তারপর যদি একটা হয়-টয়, তার দায়িত্বও কি একা আমি বইব? সব সমান-সমান। এক হাতে তালি বাজে না, বাজে নি। সুতরাং তোমাকেও লাগতে হবে। আনতে হবে। হাত মেলাতে হবে।'

'আমার বয়ে গেছে!' দরজার থেকে হাত নামিয়ে এনে কলা দেখাল কাকলি।

'তবে এম-এ পাশ করেছিলে কেন?'

'এম-এ পাশ করেছিলাম কি চাকরি করব বলে?' কাকলি ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল।

'তবে চিৎপাত হয়ে ঘুমুবে বলে? একটা আধুনিক মেয়ে—লজ্জা করে না বলতে?' সুকান্তও মুখটাকে শীর্ণ করল : 'একটা ডিগ্রি পেয়েছ, সেটা কাজে লাগাবে না? নিজে ইউজফুল হবে না? মরচে পড়ে পড়ে ক্ষয় হয়ে যাবে?'

'ইউজফুল হবার অর্থ বুঝি চাকরি করে তোমার পেট ভরানো?'

'আমার নয়, তোমার নিজের পেট ভরানো।'

'এমন কোনো কথা ছিল না।'

'কী আবার কথা থাকবে। এ কি কনট্রাক্ট সই করে বিয়ে হয়েছে যে, শর্তগুলি স্বচ্ছ ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকবে? এ তো কমনসেন্সের কথা। যার যতটুকু যোগ্যতা আছে, সে ততটুকু প্রয়োগ করে আয় করে। সব ঝিনুকে মুক্তো হয় না, কিন্তু ঝিনুকেরও তো কিছু দাম আছে, চাকচিক্য আছে। এম-এ পাশ যখন, তখন একটা মেয়ে-স্কুলে ষাট-সত্তর টাকা না কোন আয় করা যায়। বাড়তি ঐ টাকাটা পেলে বাবা-মাকে দেওয়া যায় কিছু-কিছু।'

'কী আমার আহ্লাদের চাঁদ!' কথার গরমে কাকলির চোখমুখ ঝলসে উঠেছে, আঁচল দিয়ে ঘাম মুছে বললে, 'ষাট-সত্তর টাকার জন্যে আমি এখন গিয়ে স্কুল করি। নিজে টিউটর কিনা, তায় মাস্টারনীর বেশি ভাবতে পাচ্ছে না। আর কী বিবেচক ছেলে! সংসারে থেকে খোদ দু' শো টাকা যেখানে দিতে পারত, সাধ করে বার হয়ে গিয়ে ষাট-সত্তর পাঠাচ্ছে! হাউ মিন!'

'ছাড়ো, ছাড়ো বলছি দরজা।' কাছে এসে হুঙ্কার ছাড়ল সুকান্ত।

একচুল নড়ল না কাকলি। লকলক করে উঠল : 'সব ঝিনুকে মুক্তো হয় না, এ সকলেই জানে, কিন্তু সব নুড়িই যে শালগ্রাম হয় না, এটাও জানা দরকার।'

প্রায় ধাক্কা দিয়েই চলে যাচ্ছিল সুকান্ত, হঠাৎ ছুটতে ছুটতে সুবীর এসে খবর দিল, ছোড়দা, নিচে তোমাকে কে ডাকছে।

দরজা থেকে আস্তে সরে গেল কাকলি, আর সুকান্ত ভদ্রভাবে নিষ্ক্রান্ত হল।

আরে, বরেন যে। সুকান্ত উথলে উঠল উচ্ছ্বাসে।

বাইরের ঘরে বসাল সসম্ভ্রমে। বরেন বললে, 'ভাই, মাপ কর। সত্যি সত্যি বলছি, তোর দুটো তারিখই স্রেফ ভুলে গিয়েছিলাম। তারপরেও কি সময় পাই যে, প্রায়শ্চিত্ত করি। শোন, তোর স্ত্রীকে ডাক। আসছে রবিবার গ্রেট ইস্টার্নে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবি দু'জনে। নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। ঠিক সময়ে গাড়ি আসবে এখানে, তোদের নিয়ে যাবে। কই, খবর দে ভিতরে। তাঁকে ও বলে যাই।'

সুকান্ত নিজেই গেল। খাটে যথারীতি গা ঢেলে শুয়ে ছিল কাকলি, তাকে লক্ষ্য করে হঠাৎ আরেক রকম সুরে সুকান্ত বললে, 'ওঠো, নিচে চলো, বরেন এসেছে আমাদের দু'জনকে নিমন্ত্রণ করতে।'

তড়াক করে উঠে পড়ল কাকলি। নেমে পড়ে উজ্জ্বল মুখে বললে, 'এমনি যাব, না একটু সাজগোজ করব?'

'এই একটু ফিটফাট হয়ে এসো।' দুই চোখে আরেক রকম আলো নিয়ে তাকাল সুকান্ত : 'এই চুলটা মুখটা একটু ঠিক করো—আর শাড়িটা না-হয় বদলাও। সাজা পান আছে নাকি বাড়িতে? থাকলে একটা খেয়ে নাও।'

বিহ্বল চোখে তাকাল কাকলি। চোখে বুঝি বা সেই বেডসুইচের নীল-নীল আলো জ্বেলে।

সুকান্ত আগে নামল আর বেশ খানিকটা পরে কাকলি।

'এই যে নমস্কার। মার্জনা ভিক্ষা করতে এসেছি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বরেন। প্রার্থনাটার

পুনরাবৃত্তি করল। 'যাবেন কিন্তু দয়া করে। আমার গাড়ি এসে নিয়ে যাবে আপনাদের। সুকু আমার কতদিনের বন্ধু। সু আর কু এক-সঙ্গে।'

'আমি তো জানতাম উত্তমরূপে, উৎকটরূপে কু।' সপ্রতিভের মত বললে কাকলি।

সকলে হেসে উঠল।

এখানে আসতে আসতে বরেন ভাবছিল শুধু নিমন্ত্রণ খাওয়ানো নয়। একটা উপহারও দেওয়া উচিত নববধূকে। ফুল, বই, প্রসাধনের বাক্স, একটা টি-সেট বা অমনি কিছু। এখন ফিরে যেতে-যেতে ভাবল সোনার স্পর্শ ছাড়া আর কিছু কি মানাবে কাকলিকে?

বাইশ

একখানা বাংলা, একখানা ইংরিজি—দু'খানা খবরের কাগজ আসে। সকালবেলা বাইরের ঘরে চায়ের আগে, পরে, মাঝখানে সবাই টানাটানি, কাড়াকাড়ি, ভাগাভাগি করে পড়ে নেয়। সবাই মানে বাড়ির ছেলেরা—পুরুষেরা। তারপর তারা যে-যার কাজে বেরিয়ে গেলে বন্দনা কাগজগুলি কুড়িয়ে ভাঁজ করে উপরে শাশুড়ির ঘরে নিয়ে আসে। ইংরিজি বাংলার সের-করা দাম আলাদা বলে তাকের উপর দু'ভাগ করে সাজিয়ে রাখে। শেষ সাজিয়ে রাখবার আগে বাংলা কাগজটা উল্টে-পাল্টে একটু চোখ বুলিয়ে নেয়, তেমন কোনো পাশবিক বা উত্তেজক সংবাদ আছে কিনা। যদি থাকে রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলে। যদি না থাকে—বেশির দিনই থাকে না—বাসি খবরের কাগজের মত মুখ করে রেখে দেয় এক পাশে।

ভোজনান্তে মৃণালিনী বাংলাটা নিয়ে বসে বিস্তৃত হয়ে। বসে, মানে, বসতে না বসতেই শুয়ে পড়ে। বুদ্ধির আয়ত্তে আসুক না-আসুক, যতক্ষণ ঘুম না আসে, খেলার পৃষ্ঠাটা ছাড়া খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ে আগাগোড়া। অবশ্য পাত্র-পাত্রী, নিরুদ্দেশ, জমি-বিক্রি, বাড়ি-ভাড়া, শোক-সংবাদ, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—এগুলিই তাকে বেশি টানে, বেশি আটকায়, নয়তো সিনেমার বিজ্ঞাপন, নয়তো কাছাকাছি আজ কোথায় পাঠকীর্তনের বৈঠক। কেলেঙ্কারি কিছু থাকলে সে তো সোনায় সোহাগা—ষোলর উপর আরো দুই।

পড়তে-পড়তে ঘুমি পড়ে মৃণালিনী, খবরের কাগজ তখন বিছানার চাদর হয়ে যায়। এখন ফ্যান হবার পর পতাকা হয়ে উড়ছে এখানে-ওখানে।

স্কুল থেকে জয়ন্তী আসুক, সে এসে আরেক প্রস্থ গুছিয়ে তুলবে।

ঘুম পাড়াবার জন্যে বিজয়ার খবরের কাগজের দরকার হয় না, তার গল্প-উপন্যাসের সচিত্র-বিচিত্র পত্রিকা আছে। নামের দরকার নেই, লেখকের দরকার নেই, কী ভাবে লিখছে তার দরকার নেই, একটা কিছু ঘটনা আর খানিকটা কথা-কাটাকাটি থাকলেই যথেষ্ট। কী গল্প কী বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করতে এসো না। ঘুমুতে পারা দিয়ে কথা। গল্পের ভালো-মন্দ নেই, ভালো হলেও ঘুম, না হলেও ঘুম, কোনোটা ঘুম পাড়িয়ে দেবে কোনোটা বা ঘুম পাইয়ে দেবে।

'খবরের কাগজ কি তুমিও পড়ো না নাকি?' মৃণালিনী জিজ্ঞেস করল কাকলিকে।

কাকলি প্রথমটা হকচকিয়ে গেল।

'কি, পড়ো?'

'পড়ি বৈকি।'

'কই, একদিনও তো দেখি না নাড়তে চাড়তে।' মৃণালিনী প্রায় তিরস্কারের সুর আনল : 'এতদিন ধরে এসেছ, মুখে নিয়ে দু' দণ্ড বসা দূরের কথা, একদিনও তো একনজর উঁকিঝুঁকি মারতেও দেখলাম না।'

'হাতাহাতি হতে হতে কাগজ যে শেষ পর্যন্ত কোথায় চলে যায়—' দুর্বল স্বরে কাকলি বললে।

'যাক না চলে। তোমার যদি সত্যিকার পিপাসা থাকে কাগজ তুমি নিজেই খুঁজে বার করবে। কাগজ ছাড়া তোমার ঘুম হবে না, মুখে খাওয়া রুচবে না, সর্বক্ষণ কেমন খালি-খালি মনে হবে।'

'তারপর আবার কাগজের জন্যে পিপাসা!' বলে ফেলল কাকলি।

'হ্যাঁ, খবরের জন্যে, জ্ঞানের জন্যে।' মৃণালিনী জোর দিয়ে বললে, 'তুমি শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, তোমার এ আগ্রহ তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিক না হোক উচিত তো এক শো বার। পৃথিবীতে কোথায় কী ঘটছে না ঘটছে তা তুমি জানবে না? বাড়ির আর-আররা উদাসীন, বুঝি, ওরা অশিক্ষিত, অসমর্থ। কিন্তু তুমি তো ওদের দলের নও। তুমি বিদ্যালয়, শুধু বিদ্যালয় নয়, বিশ্ববিদ্যালয় পার হয়ে এসেছ। তুমি তো হেঁজিপেঁজি নও, তোমার কেন অরুচি হবে? তা হলে কী লাভ হল লেখাপড়া শিখে?'

নাও, এখন আবার দেখিয়ে-দেখিয়ে নিত্যি খবরের কাগজ পড়ো। এ আবার আরেক ফ্যাচাং। কী হয় খবরের কাগজ না পড়লে? এ বাড়িতে এসে এতদিন যে পড়ে নি, জানে নি খবরাখবর, তাতে জগৎসংসারে কার কী অসুবিধে হয়েছে? নিজেই বা সে ঠকেছে কতটুকু? ভারতবর্ষ যে স্বাধীন হয়েছে এ খবরের কাগজ পড়ে না জানলে কী এমন ক্ষতি হত?

পরদিন খুঁজে পেতে বাংলাখানা সংগ্রহ করে গভীর মনোযোগে পড়তে লাগল কাকলি।

মৃণালিনী দেখুক এ নিশ্চয়ই তার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নেবে এ কল্পনাও করতে পারত না।

'এ কী পড়ছ?' মুখিয়ে উঠল মৃণালিনী।

'কেন, খবরের কাগজ—'

'খবরের কাগজ! বাংলাটা তোমাকে কে পড়তে বলছে? তুমি এম-এ পাস না? তুমি ইংরিজি পড়বে।' মৃণালিনী নিজেই বাংলার বদলে ইংরিজিটা এনে দিল কাকলিকে।

কোনটা আনতে কোনটা এনেছে। মৃদু হেসে কাকলি বললে, 'এটা কালকের মা।'

ইংরিজি জানে বলেই তো ভুলটা ধরতে পেরেছে কাকলি। তাই মৃণালিনী খুশিই হল। বললে, 'খুঁজে পেতে তুমিই দেখ না আজকের তারিখের ইংরিজিটা কোথায়! তুমি ছাড়া এ ব্যাপারে আর কারু দাঁত ফোটাবার কেরামতি নেই। আর সকলে তো অঘাচণ্ডি। তুমি তো আর ওদের খাতায় নাম লেখাও নি। তুমি ডিগ্রিধারী। তুমি কত পড়বে, জানবে, বলবে, বোঝাবে আমাদের, বক্তৃতা দেবে, দাবড়ে বেড়াবে সবাইকে—'

ইংরিজি কাগজের আড়ালে সলজ্জ মুখে হাসতে লাগল কাকলি।

মৃণালিনী সেদিন জিজ্ঞেস করল সুকান্তকে, 'সত্যি বলছিস ছোট বউমা এম-এ পাস করেছে?'

'তাই তো শুনেছি।' বোকা-বোকা মুখ করল সুকান্ত।

'তোর সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়ত না বলেছিলি?'

'সেইরকমই তো দেখতাম ছায়া-ছায়া।'

'আমার মনে হয় নিশ্চয়ই কোথাও ধোঁকা আছে।'

'কেন বলো তো?' চমকে ওঠবার ভাব করল সুকান্ত।

'নইলে এম-এ পাস করেছে মেয়ে, কথায়-বার্তায় একটাও ইংরিজি বলবে না? একটুও তার দাব নেই, দাবাট নেই এ কখনো হতে পারে?' মৃণালিনী আপন মনে বলতে লাগল : 'লোকে বউ দেখতে আসে, কেউ এম-এ. পাশ বলে বিশ্বাস করে না। নিরীহ, নিস্তেজ, এতটুকু জেল্লাজমক নেই, উঁচু-নিচু কথা নেই একটাও। ঘরে ঢুকে এমন একটাও মোটাসোটা ইংরিজি নভেল-টভেল খুঁজে পাই না যে বলতে পারি ছোট বউমা পড়ছিল! লোকে যে বিশ্বাস করতে চায় না দোষ কী। আমি প্রমাণ করি কী করে? ছোট বউমাই বা কী করে প্রমাণ করে? এই যদি দশা তবে বড় বউ আর ছোট বউয়ে তফাত কী?'

'সব সমান।' নিস্পৃহের মত মুখ করল সুকান্ত : 'হরে দরে হাঁটুজল।'

'কার সাধ্য তফাত করে।' অনুতপ্ত মৃণালিনীর কণ্ঠ : 'এমন জানলে বড় বউয়ের বেলায় বলে দিতাম বি-এ পাস।'

তবু যা হোক একটু কম করে বলত। মনে মনে হাসল সুকান্ত।

'তুমি যদি সেই বড় বউয়ের মতই হেঁসেল ঠেলো, কালিঝুলি মেখে থাকো আর ছত্রাকার হয়ে ঘুমোও, কী দরকার ছিল বিদ্যের জাহাজ হয়ে?'

এই কথাটাই সেদিন সাড়ম্বরে বলছিল আবার সুকান্ত।

'মা বলছিলেন, তুমি যে এম-এ পাস করেছ তার কোনো প্রমাণ নেই।'

'কেন?' তরলস্বরেই প্রশ্ন করল কাকলি।

'তুমি কথায়-কথায় ইংরিজি বুকনি দাও না—'

'ইংরিজি বুকনি দিলে এম-এ বোঝা যেত কী করে? আই-এ বি-এও তো হতে পারত।'

'তবু কিছু একটা অনুমান করা যেত সহজে।'

'আর?'

'মোটাসোটা দেখে ইংরিজি নভেল-টভেল পড়ো না।'

'সে তো অনেকে পাস-টাশ না করেও পড়ে। তাতে আর কী প্রমাণ হত?'

'তবু কিছুটা মান বাড়ত সংসারের। কেমন দেখ এম-এ পাস বউ সব সময়ে বই, আউট-বই নিয়ে মশগুল। কেমন সুন্দর সংসারকর্মে উদাসীন!'

'সুন্দর?' কাকলি হাসবে না গম্ভীর হবে ভেবে পেল না।

'নইলে, মা বলছিলেন, বড় বউ আর ছোট বউয়ে তফাত কী! ছোট বউ যদি সেই হাঁড়িই ঠেলে, বাসনই মাজে, কাপড়ই কাচে, ঝাঁটপাটই দেয়, তা হলে এম-এ পাসে আর কী এগুল?'

'তুমি কী বললে?'

'আমি আর কী বলব! আমি বললাম, সব সুবোধের এক গোয়াল।'

'তার মানে যে মেয়ে এম-এ পাস করেছে সে সংসারের কাজকর্ম করবে না?' কাকলি প্রায় কোমর বাঁধল এবার।

'করবে কিন্তু অমন করে দু হাতে নয়। অষ্টাঙ্গে নয়।'

'তার মানে, এমন-এ পাস বলে হাঁ করে খাব না?'

'খাবে কিন্তু হাঁ-টা একটু ছোট করবে।'

'কোন দুঃখে? আমার খিদে কি কম রাক্ষুসে? আমার কি পাখির ঠোঁট?' কাকলি ঘুরে দাঁড়াল : 'বেশ, আমি খাব না, রাঁধব না, চুল বাঁধব না—'

'চুল বাঁধবার দরকারই হবে না।'

'কেন?'

'চুল ঘাড়কাটা করে ফেলবে। মানে বব করবে। শ্যাম্পু করে ফাঁপিয়ে রাখবে। বাঁধাবাঁধির মধ্যে যাবে না।' সুকান্ত কাকলির চুলে হাত রাখতে গেল, কাকলি সবেগে ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে নিল মাথা। হাসতে লাগল সুকান্ত। 'এমনি করে বারে-বারে মাথা ঝাঁকাবে, ঢেউ খেলাবে ঝাঁকড়া চুলে। বারে-বারে কানের পিঠে তুলে দেবে আঙুলে করে।'

'তা হলেই প্রমাণ হবে আমি এম-এ পাস?'

'জানি না। তবে এটুকু বুঝছি, প্রমাণ একটা দেওয়া দরকার। সংসার চাইছে, মা চাইছেন। আত্মীয়-প্রতিবেশী যাঁরা দেখতে আসছেন তাঁরা চাইছেন।'

'তবে ডিপ্লোমাটা তাঁদের দেখাও গে।'

'তা হলে তো কনস্টিটিউশন দেখিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রমাণ করতে হয়।'

'তা নইলে কী করে হবে?'

'কাজ দিয়ে হবে। নইলে যদি জল শুকিয়ে যায়, গাছে ফুল-ফল না ধরে, হাওয়া বিষিয়ে ওঠে ব্যাধিতে, শস্যের জমি বন্ধ্যা হয়, তা হলে আর দেশকে স্বাধীন বলি কি করে, বা, বলেই বা প্রবোধ কোথায়?' অন্য দিকে মুখ করল সুকান্ত।

'তার মানে?' কথাটা আবার কোন দিকে যাচ্ছে, যেন আঁচ করতে পেরেছে কাকলি।

'তার মানে ডিপ্লোমার কাকলি কোন কাকলি তার সাব্যস্ত হবে কিসে?'

'কিসে?'

'এমন একটা কাজে যা একমাত্র এম-এ পাস মেয়েই করতে পারে। যা বউদি পারে না, কাকিমা পারে না, মা পারে না।'

'মানে এমন একটা চাকরি যা শুধু এম-এ ডিপ্লোমাধারীর পক্ষেই করা সম্ভব।'

'এই তো, এই তো প্রমাণ তুমি এম-এ পাস!' উল্লসিত হয়ে ওঠবার ভাব করল সুকান্ত : 'অনেক বিদ্যা না হলে কি এতটুকু বুদ্ধি হয়?'

ঘৃণার চোখে তাকাল কাকলি। অনবরত খোঁচাচ্ছে, নানাভাবে কোণঠাসা করছে ঠেলে দিতে চাইছে টাকা রোজগারের রাস্তায়। দু' দণ্ড ঠাণ্ডায় থাকতে দিচ্ছে না। একটা শুধু যন্ত্র বানাতে চাইছে, এখন উপার্জনের যন্ত্র।

'তা হলেই খালে-বিলে জল আসবে, ফল ধরবে গাছে, হাওয়া রোগমুক্ত হবে আর জমিতে ফলবে ফসলের স্বপ্ন?' কাকলি ঘাড় বাঁকা করে দাড়াল।

'তখন তোমাকে অন্য এক মূর্তিতে দেখব।' হাত বাড়িয়ে আদর করতে চাইল সুকান্ত, নাগালে পেল না, তবু বললে গাঢ়স্বরে, 'নিশ্চয়ই। তুমিই তো আমার ফসলের স্বপ্ন?'

'আর এই যে সংসারের কাজকর্ম করছি, রাঁধছি-বাড়ছি, বাটনা বাটছি, কুটনো কুটছি ও আমার অন্য এক মূর্তি নয়? বাপের বাড়িতে কোনোদিন রেঁধেছি আমি, না বসেছি বঁটি পেতে? না কি উনুন ধরিয়েছি?'

'নিশ্চয়ই এ অন্য মূর্তি। কিন্তু নতুন-নতুন অন্য মূর্তি চাই।'

'নতুন-নতুন?'

'হ্যাঁ, তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে। এম-এ পাস মেয়ে সংসারের হাঁড়ি ঠেলেছে, নিশ্চয়ই এ নতুন মূর্তি, মধুর মূর্তি। কিন্তু ঐখানেই ঠেকে থাকলে চলবে না। আবার আরেক মূর্তি ধরো। এবার রান্নাঘর ছেড়ে ধরো আফিস-ঘর। হাতা-খুন্তি ছেড়ে খাতা-কলম। আরেকরকম সাজসজ্জা। বেঁটে ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে হিল-উঁচু জুতোয় খুট্ খুট্ করে হেঁটে চলো ফুটপাথে।'

এত সহজে হাসে কাকলি, এখন এক ফোঁটা হাসল না। বললে, 'সেখান থেকে আবার আরেক মূর্তি ধরতে হবে না?'

'যদি পারো তো জগৎসংসার অভিনন্দন দেবে। হয়তো সেই আফিসের কর্মীসংসদের তুমি নেত্রী হলে, ব্যক্তিত্বে আনলে একটু রাজনীতির ঝাঁজ, সেখান থেকে আবার আরেক শাখায় হাত বাড়ালে। বিস্তৃত হলে দেশসেবার কাজে। জননায়িকা হলে। ভোটে দাঁড়ালে। মন্ত্রী হলে।'

'কেন, সিনেমা স্টার হলাম না?'

'হায়, তত সুকৃতি কি আছে সিনেমা স্টারের স্বামী হব! তার মোটরগাড়ির ড্রাইভার হব!' সুকান্ত কলেজে বেরুচ্ছিল, পাঞ্জাবির উপর কাঁধে একটা ভাঁজ-করা চাদর জড়িয়ে নিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'শোনো। আমাদের সত্তার পদ্মের অনেকগুলি পাপড়ি। একটা-একটা করে যতই তার পাপড়ি খুলবে ততই তার গন্ধ বাড়বে, বর্ণ বাড়বে, শোভা বাড়বে। বাড়তে-বাড়াতে কে না চায়! দেহের স্বাদ যেমন ভঙ্গির নতুনত্বে, জীবনের স্বাদ তেমনি ব্যক্তিত্বের নতুনত্বে। বলো তাই নয়? একঘেয়ে হয়েছ কি পোকায় ধরেছে। সেই বেঁচে থাকে যে নতুন হয়ে থাকে। নতুনই ফুরোয় না, হারায় না—'

'খুব তো বক্তৃতা মারছ কিন্তু তোমার নিজের কই নতুন হওয়া?' খেঁকিয়ে উঠল কাকলি।

'আগে শুধু পাঞ্জাবি পরতাম, এখন একটু পৃথক, সম্ভ্রান্ত হয়েছি বলে কাঁধে চাদর নিয়েছি।' ম্লানমুখে হাসল সুকান্ত।

'কেন, স্যুট নয় কেন, ফুল-স্যুট?' প্রায় মুখের উপর ছুঁড়ে মারল কাকলি : 'পাঞ্জাবি-চাদরেই কেন ঠেকে থাকবে? সত্তার আর একটা পাপড়ি খোলো। প্রাইভেট টিউটর থেকে মার্কেন্টাইল ফার্মের অফিসর হয়ে যাও। শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি। একটু দেখি তোমার ব্যক্তিত্বের ঝিলিক, চক্ষু সার্থক করি। আমাকে তো বব করিয়ে হিল-উঁচু জুতোয় খুট্ খুট্ করে হাঁটাচ্ছ ফুটপাথে, তুমিও ফুল-স্যুটে ট্রিম্‌ড় হয়ে গ্যাট-ম্যাট করে হাঁটো না আমার পাশে-পাশে। নিজের বেলায় আঁটিশুঁটি। আমাকে তো মন্ত্রী বানাচ্ছ, তুমি নিজে কেন রাজা হও না? এক রাখাল তো হয়েছিল রাজা—'

মানে তুমি রাখালেরও অধম। তুমি এক সামান্য প্রাইভেট টিউটর। এমনি করেই শুনল যেন সুকান্ত। যেতে-যেতে থামল। বললে, 'এ স্বপ্নের কথা হচ্ছে না, সাধ্যের কথা হচ্ছে। যদি কারু সাধ্য থাকে, প্রশ্ন হচ্ছে, সে থাকবে কিনা নিষ্ক্রিয় হয়ে। যদি গুণ থাকে সে থাকবে কেন মুখ বুজে?'

কাকলি বললে, 'কখনো-কখনো মুখ বুজে থাকাটাই গুণ। নিষ্ক্রিয়তাই প্রকাণ্ড শক্তি।'

আশ্চর্য, ছেলের সঙ্গে মা মিলেছে।

সকালবেলা বন্দনার সাহায্যে রান্নাঘরে এসেছে কাকলি, দেখল, ঠাকুর রাখা হয়েছে।

'বাঃ, ভেবেছিলাম আমি আজ রাঁধব—' কাকলি করুণ মুখ করে বললে।

'না, না, তোমাকে রাঁধতে হবে না। ধোঁয়ার গরমে কষ্ট করতে হবে না।' ঠেস দিয়ে নয়, অশেষ সান্ত্বনার সুরে বলল মৃণালিনী, 'তুমি যোগ্য মেয়ে, বিদুষী মেয়ে, তোমার ফিল্ড্ রান্নাঘরে নয়—'

'দিদির কাছ থেকে দু' একটা করে বেশ রান্না শিখছিলাম—' কাকলি অস্ফুট আপত্তি করতে চাইল।

'অনেক শিখেছ, কত বই পড়েই না পরীক্ষার ঐ শেষ চুড়োটা পার হতে হয়েছে— এ থোড়-বড়ি-খাড়া না শিখলেও চলবে।' সন্দেহ কি, সম্ভ্রমের সুরেই কথা বলছে মৃণালিনী: 'এম-এ পাস মেয়ে হাঁড়ি ঠেলবে কী! তার অন্যরকম কাজ, বড়রকম কাজ। ফেন গালতে হাত-পা পোড়ানো তাকে সাজে না। তাই ঠাকুর রাখলাম।'

সহ্য হচ্ছিল না বন্দনার। বললে, 'তবু যা হোক এম-এ পাস বউ এসেছিল বলে তার খাতিরে ঠাকুর হল।'

'এম-এ পাস বউ একটা কথার কথা?' ধমকে উঠল মৃণালিনী: 'তুমি একটা ম্যাট্রিক পাসই হয়ে দেখাও না। সে আর তুমি, আর, যারা সব আছে, সব এক ক্লাস, এক নমুনা? যদি ঠাকুর আসে, যে কারণেই আসুক, তোমারও তো উপকার হল। তবে হিংসেয় বুক অত চচ্চড় করছে কেন? এরই জন্যে লেখা-পড়ার দরকার।'

ভূপেনের আপত্তি অন্য কারণে। সে বললে, 'দিব্যি এক-আধটু ভালোমন্দ খাচ্ছিলাম, কোত্থেকে এক ভূত চালান করে আনলে। এত হঠাৎ বড়লোকি দেখাবার শখ হল কেন?'

'না, তোমার মত চিরকাল গরিবি চালেই চলতে হবে!' হাত থেকে মেঝেতে একটা কাঁসার বাসন পড়ার মত করে চেঁচিয়ে উঠল মৃণালিনী: 'সংসারের অবস্থা ফেরাবার চেষ্টা করতে হবে না? এ বড়লোকি তোমার টাকায় নয়, ছেলের টাকায়, সুকুর টাকায়। তোমার সাধ্য ছিল হেঁসেলের খিটকেল থেকে তোমার স্ত্রীকে মুক্তি দাও? সুকু যখন টাকা দিচ্ছে, বেশ মোটা টাকা—আগে পুরোপুরি তিন শো-ই দিত—আমিই বলে-কয়ে পঞ্চাশ টাকা কম নিচ্ছি, বলেছি, ওটা ছোট বউমাকে দে, ওরও তো নিজের খরচ বলে কিছু আছে— সেই মোটা টাকা থেকে সামান্য একটা ঠাকুর হবে না সংসারে? যার এতখানি দান তার স্ত্রীকে রিলিফ দেব না, তাকে ঝলসাপোড়া করে মারব? তাইতে আরেকজনের লেগেছে। প্রশান্ত তো মোটে ষাট টাকা দেয়: তার কবে কী মাইনে বাড়ল জানতেও পারি না, ষাটের উপর একষট্টি হল না কোনোদিন। বড় বউ যে বড় চিমটি কেটে কথা কইল, প্রশান্ত একস্ট্রা দিয়ে রাখত একটা ঠাকুর, কবেই তবে তার বউকে রান্নাঘর থেকে উইথড্র করে দিতাম। নিজের মুরোদ নেই, পরের দেখে দোহাই পাড়া।'

ভূপেন দেখল, ক্রমে-ক্রমেই ঘরদোরের ভোল ফিরছে। ঘরে শুধু পাখা হয় নি, দরজা-জানলায় পর্দা হয়েছে, দরজার বাইরে ওয়েলকাম লেখা পাপোশ হয়েছে, টেবলক্লথ হয়েছে, বসেছে ফুলদানি। কেউ বেড়াতে এলে মেঝের উপর মাদুরের উপরে পাতা যাচ্ছে কার্পেট। নতুন বাসন-কোসন হচ্ছে, পিরিচ-পেয়ালা। মেঝেতে আসন পেতে না বসে টেবিলে চেয়ারে বসে খাওয়া যায় কিনা তাই এখন ভাবছে মৃণালিনী।

ভূপেন বিরক্ত হয়ে বললে, 'তুমি সুকুর টাকাটা সব এমনি নয়-ছয় করছ নাকি?'

'নয়-ছয় মানে?' দপ করে জ্বলে উঠল মৃণালিনী: 'সংসারের একটু শ্রী ফেরানো মানে টাকা নয়-ছয় করা? নিজের আমলে হল না, যদি ছেলের আমলে হয়, লোকে খুশি হয়! এর আবার বিপরীত, সব তাতেই বাদ সাধা।'

'সে কথা হচ্ছে না।' ভূপেন বললে, 'সুকুর এটা এমন কোনো থাকিয়ে রোজগার নয়। তাই সমস্তই সাজনে-ভোজনে বার করে না দিয়ে কিছু-কিছু জমানো উচিত। কখন কোন উৎপাত এসে চিৎপাত করে দেয় তার ঠিক নেই।'

'তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তার জমার ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।'

'সে আবার কী!' চোখ কপালে তুলল ভূপেন।

'তার বউ। ইচ্ছে করলে সেই কত পারবে আনতে-থুতে। এ তোমার পছন্দ করে আনা নয়। তোমার পছন্দে চললে লক্ষ্মীর বদলে পক্ষী আসত।'

শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল ভূপেন। মুখে খড়কে নিয়ে উঠে গেল উপরে।

লক্ষ্মীকে ফ্যান কিনে দিয়েছে মৃণালিনী।

'দেখলে সংসার তোমার উপর কত প্রসন্ন।' গর্বের মুখে বললে সুকান্ত। 'তোমাকে কত প্রশ্রয় দিচ্ছে, কত আনুকূল্য। কত সম্মান।'

'আহা', উড়িয়ে দিতে চাইল কাকলি : 'এ গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো। আমাদেরই টাকায় আমাদেরই জিনিস কেনা।'

'একান্নবর্তী সংসারে এটুকু ঘটনাতেই কত বিঘ্ন।' সুস্থ সহজ নিশ্বাস ফেলল সুকান্ত : 'দেখ দেখি কেমন মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ঘুরছে এখন পাখাটা। এখন এই হাওয়া কত আরামের, কত শান্তির।'

নতুন আরেকটা পাখা ঘুরছে বাড়িতে, জয়ন্তী সুবীর দেখতে এসেছে উদ্দীপ্ত হয়ে। সেন্টুও এসেছে।

সুবীর সেন্টুকে বললে, 'দ্যাখ সব ঘরে পাখা, শুধু তোদের ঘরই ফাঁকা।'

সেন্টুর মুখখানি ম্লান। করুণ স্বরে বললে, 'কী করে হবে? মা বলেছে আমার বাবা খুব গরিব।'

'দেখ এ খুব অন্যায় হল।' ঘর ফাঁকা হতে সুকান্তকে বললে কাকলি, 'এ পাখা দিদিদের ঘরে যাওয়া উচিত।'

কথাটা সুকান্ত কানেও তুলল না।

'তুমিই বলো না, তাই ঠিক ছিল না? ওঁদের ছেলেপুলের ঘর—সেন্টু এত ফ্যান ভালোবাসে—'

'তা মাকে গিয়ে বলো না।' ধমকে উঠল সুকান্ত।

'আমার কাছে যদি টাকা থাকত আমি ওদের একটা কিনে দিতাম।'

'বেশ তো, টাকা থাকলেই হয়। নিজে করলেই হয় রোজগার। আটকাচ্ছে কে?' সুকান্ত দাঁড়াল মুখোমুখি।

'আচ্ছা, তুমি কী! মোটে পঞ্চাশ টাকা রাখছ!'

'পঞ্চাশ টাকা কম কী হাতখরচ!'

'হাতখরচ? বারে-বারেই তো নিজে এসে আবার হাত পাতছ! মাকে কাছে না পেলেই আমার আঁচল চেপে ধরছ। তুমি কী!'

'এক হিসেবে ওও তো আমারই টাকা। এ-কাউন্টার থেকে না নিয়ে ও-কাউন্টার থেকে নেওয়া।'

'তবে আমার হাতখরচ বলছ কেন? বললাম এক শো টাকা রাখো। একটু সচ্ছল বলে অনুভব করি।'

'একটু দান-খয়রাত করি দু' পাঁচজনকে!' ব্যঙ্গের সুর আনল সুকান্ত।

'মন্দ কি যদি পারা যায়।'

'বেশ তো করো না, রাখো না। নিজে একটা কাজ-টাজ নিয়ে শক্ত থাবায় মোটা রোজগার করো না। কে বারণ করছে? তারপর নিজের টাকা বিলোও স্বচ্ছন্দে। পঞ্চাশ-এক শো কেন, ঢের ঢের অনেক—'

'রোজগার করা যেন কত সোজা—' চোখ নামাল কাকলি।

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী! যদি রাজি থাকো তো আমিও খুঁজতে পারি, বলতে পারি এদিকি সেদিক—'

না—তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে পারল না কাকলি। সে কি হেরে যাচ্ছে? সরে যাচ্ছে কোণের দিকে? চাপে পড়ে দুর্বল, নির্বাক হয়ে যাচ্ছে? দুপুরের ঘুম ছেড়ে, নিভৃতি ছেড়ে সে কি চলে আসছে

রাস্তায়, ধুলোমাখা রোদ্দুরে, মানুষের ধুলোমাখা কৌতূহলের সামনে? না, সে ঘুমুচ্ছে তার ঘরে, ঘুরন্ত পাখার নিচে, সেন্টুকে বুকে নিয়ে। এখনো ঘুমুচ্ছে।

পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে বন্দনা।

সেও মেনে নেয় নি অপমান, শূন্যতার অপমান। প্রশান্তকে দিয়ে পাখা করিয়েছে। কেনাতে পারে নি, ভাড়া করিয়েছে। আর তাই এখন ঘুরিয়েছে সতেজে।

সেন্টুও কম যায় না। যে ক'দিন মা'র ঘরে পাখা হয়নি কাকলির কাছে আসে নি শুতে। তানানানা করে ফিরিয়ে দিয়েছে। মা'র ঘরে পাখা হতেই আবার আঁকড়েছে কাকলিকে। তার মা ঠিক থাকলেই কাকিমার কাছে তার ঠিক থাকা।

দরজা ঠেলে মৃণালিনী ঘুমন্ত দুই ঘর একবার দেখে নিল। তারপর আস্তে আস্তে ঢুকে বন্দনার ঘরের সুইচটা অফ করে দিল। অফ করে দিয়ে আবার সরে গেল ধীরে ধীরে।

কতক্ষণ পরেই ঘুম ভেঙে উঠে বসল বন্দনা। এ কি, পাখা বন্ধ কেন? কে বন্ধ করল?

উঠে পাশের ঘরটা দেখে নিল উঁকি মেরে। সে ঘরে দিব্যি পাখা ঘুরছে। সে ঘরের পাখা কেউ বন্ধ করে নি।

'এ আমার নিজের পাখা, এ আমি যত ইচ্ছে ঘোরাব।' জ্বলন্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল বন্দনা। সুইচটা ফের অন করে দিয়ে বললে, 'অন্যের ঘরে ঘুরতে পেলে আমার ঘরেই বা পারবে না কেন?'

'এ শুধু পাখা ঘোরানো নয়, এ কারেন্ট খরচ হওয়া।' রাগে গরগর করতে করতে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল মৃণালিনী। বললে, 'এ পয়সা ওড়ানো। যাদের ষাট কখনো একষট্টি হবে না তাদের আবার কিসের ফুটুনি!'

তেইশ

আবার কী সুন্দর মেঘ করেছে দেখ। আবার বৃষ্টি নামবে ঝমঝম করে। পথ-ঘাট ভেসে যাবে। অস্ফুটে থরথর করে কাঁপবে বুঝি কদমগাছটা। সারা গায়ে কুঁড়ি ধরি-ধরি করবে।

মেঘ দেখলেই মন কেমন উড়ু-উড়ু করতে থাকে। ইচ্ছে করে কোথাও চলে যাই। দূরে, নিরালায়, নাম-না-জানা নির্জনে। কিংবা অন্তত বিয়ের আগের পুরোনো বাড়িটা একবার একটু ঘুরে আসি।

কাকলি টের পেল তার চোখের পাতা অজান্তে ভিজে উঠেছে।

লুকিয়ে লাভ কি, সত্যি ভারি মন কেমন করে বাবা-মা'র জন্যে। কতদিন দেখি না কত দিন শুনি না। কী সুরে না জানি ডাকতেন নাম ধরে। কী না জানি ফাই-ফরমাশ করতেন। কিংবা কে জানে করতেনই না বোধ হয়। আহা, পড়ছে পড়ুক, ঘুমুচ্ছে ঘুমুক একটু শান্তিতে। মা কী করে বুঝতেন, থেকে থেকে এসে মুখে খাবার পুরে দিতেন, খাব না বললেও শুনতেন না। বলতেন, না খেলে গায়ে জোর থাকবে কি করে, গায়ে জোর না থাকলে পড়াগুলিকে স্মৃতিশক্তির দড়ি দিয়ে কি করে বেঁধে রাখবি? আশ্চর্য, মা'র একবারও এখন জানতে ইচ্ছে করে না তার গায়ের জোরের খবর কী, এখনো সে তেমনি ঘুমকাতুরে কিনা, অকারণে খিদে পায় কিনা আগের মত। মা না খোঁজ নিন, পত্রালিও তো একটা চিঠি লিখতে পারে। নরুকাকা তো বলেই দিয়েছেন, আমি শুধু বিপদের দিনেই স্মরণীয়, আর, ঈশ্বর করুন, তোদের সম্পদের সব ক'টা পা-ই যেন বজায় থাকে। নরুকাকা না আসুন, কিন্তু ভাইয়েরা? তারা তো কত রাজ্য টহল দিয়ে বেড়ায়, পথ ভুলেও একবার আসতে পারে না এদিকে?

একদিন বাইরে বেরিয়ে বাড়ি ফেরবার আগে সুকান্ত বলেছিল, 'চলো না তোমার বাপের বাড়িতে।'

মুহূর্তে একটা সমুদ্র বুঝি দুলে উঠেছিল বুকের মধ্যে। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিল কাকলি। পরে বললে, 'না।'

'তুমি একা গেলে বরং কথা ছিল।' প্রবোধের সুরে সুকান্ত বললে, 'দু'জনে একত্রে গিয়ে সবিনয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালে ভোজবাজি হয়ে যেতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে এমনি হয়েছে বলে শুনেছি। এখন

আর অস্বীকার করবার মানে হবে না। ঘটানোকে কি করে আর খণ্ডানো যাবে? ইট ইজ নো ইউজ ক্রাইঙ ওভার—চলো।'

'না।' কাকলি আবার বলল সংক্ষেপে।

বাবা-মাকে সে পরাভূত করে এসেছে। এখন যদি সে যায় তাকে নিশ্চয়ই তাঁরা জয়ীর চোহারায় দেখবেন না। হয়তো দেখবেন কাকলি নিজেই কেমন স্তিমিত, নীরস, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। হয়তো প্রচ্ছন্নে শুনবেন তার একটি নিরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস। হয়তো বা অনুমান করবেন খাবার পরেও তার খিদে থাকে, ঘুমুবার পরেও তার ক্লান্তি যায় না। হয়তো বা আবিষ্কার করবেন তার সাজগোজ গরিব, চলাবলা নিরীহ। মুখচোখ কাঙাল-কাঙাল।

দরকার নেই। ধরা পড়ে যাবে। সবাই বুঝবে, যে পরাভব করেছিল সেই আসলে পরাভূত।

যখন দিন হবে তাদের, মোটর গাড়ি হবে, অত না হোক, যখন সুকান্তর একটা সুশ্রী চাকরি হবে তখন নিজের থেকেই একদিন যুগলে উপস্থিত হবে না-হয়। কাকলির তখনই হবে ঠিক উজ্জয়িনীর চেহারা, তখনই মানাবে তার উদার অবতরণ।

মুখে বললে সে অন্য কথা। বললে, 'যারা অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে সেধে তাদের সোহাগ কুড়োতে যাব না। দরকার হয় তারা ডাকুক। তারা নিমন্ত্রণ করুক।'

হ্যাঁ, আমরাও নিষ্ঠুর হতে জানি। প্রিয়তাতে যেমন ছিলাম তেমনি শত্রুতাতেও আছি। কাকলির দৃপ্ত ভঙ্গিটা যেন তাই আরো বলল সুকান্তকে।

সুকান্ত বললে, 'তা হলে নরুকাকার বাড়িতে চলো। তাঁরা তো আর লাঠিমারা নন।'

কাকলি হাসল। বললে, 'কিন্তু আমরা তো এখনো সম্পদেই আছি।'

'সম্পদে আছি মানে?'

'নরুকাকা বলে দিয়েছিলেন শুধু বিপদেই তিনি স্মরণীয়। আমাদের এখন যখন কোনো বিপদ নেই তখন তাঁকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না।'

'আমাদের বিপদ নেই কে বললে?'

ভয়ে-ভয়ে সুকান্তর মুখের দিকে তাকাল কাকলি। বললে, 'আমাদের আবার কী বিপদ?'

কেমন করে কথাটা বলবে বুঝতে পারছিল না প্রথমে। খানিকটা আমতা-আমতা করে বললে, 'এই আমাদের অসচ্ছল অবস্থা—'

'অসচ্ছল অবস্থা মানে?'

'একেবারে নির্বাত গ্রীষ্ম হয়তো নয় কিন্তু দক্ষিণ হাওয়ার দাক্ষিণ্যই বা কোথায়?'

'তা নরুকাকা কী করবে?'

'নিজে কিছুই করবে না। শুধু তোমার বাবাকে ধরবে। ধরে একটু নাড়া-চাড়া করবে। তা হলেই—'

'তা হলেই—'

'হঠাৎ গুমোট ভেঙে হাওয়া ছুটবে হু-হু করে।' হু-হু করেই সুকান্ত বলে ফেলল কথাটা : 'উড়িয়ে নিয়ে আসবে তোমার দশ হাজার টাকার সার্টিফিকেট ক'খানা! এক গাছি পারিজাতের মালা।'

কাকলির কানের মধ্যে যেন কে গলানো সিসে ঢেলে দিল। সুকান্তের মুখের থেকে ফিরিয়ে নিল চোখ। দৃঢ়স্বরে বললে, 'বাড়ি ফিরে চলো।'

'তা যাচ্ছি। কিন্তু আত্মীয়ক্ষেত্রে ঝগড়া জিইয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। বিশেষত সে আত্মীয় যখন দমে ভারি।' কিরকম করে হাসল সুকান্ত : 'একটু জপ তপ করলেই হয়তো মিলে যায় যোগসিদ্ধি। একটু পূজন-ভজন, একটু স্তবস্তুতি।'

মুখের দিকে তাকাবে না ভেবেও তাকাল কাকলি। কেমন বেনে-বেনে দেখাচ্ছে সুকান্তকে। আর তার হাসিটা ঠিক প্রতারকের হাসি।

কিন্তু আকাশে আজ নতুন মেঘ দেখেও সুকান্ত সেই টাকার কথাই ভাববে, বলবে, ভাবতে পারত না কাকলি।

উপরে আসতেই কাকলি বললে, 'কী সুন্দর মেঘ করেছে দেখ!'

জানলায় কোথায় একটু কাকলির পাশ ঘেঁষে দাঁড়াবে, তাকাবে বাইরে—সুকান্ত গ্রাহ্যও করল না। আকাশে মেঘ করেছে তা আবার দেখবার কী! হয় ঝরবে নয় উড়ে চলে যাবে নভান্তরে।

'তোমার আর কি।' বললে দিব্যি সুকান্ত, 'তোমাকে তো আর বেরুতে হয় না, ঘুরতে হয় না টাকা রোজগারের ফিকিরে। বৃষ্টি হলে দিব্যি গোল হয়ে ঘুমুবে দুপুরবেলায়। আর আমি? আমার না আছে ছাতা না আছে ওয়াটার প্রুফ। আমার খাড়া ধারাস্নান।'

'বেশ তো, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো না, আমিও ভিজব।' ছোট মেয়ের মত প্রায় নেচে উঠল কাকলি।

এ কিরকম সুর; সন্দেহের চোখে তাকাল সুকান্ত। এ তো তার সঙ্গে রোজগারের রুক্ষ রাজপথে বেরুনো নয়, এ প্রায় শূন্যে ওড়া!

'তোমাকে কোথায় নিয়ে যাব?' থমকে দাঁড়াল সুকান্ত।

'চলো না দু'জনে ক'দিন বাইরে থেকে ঘুরে আসি। সমুদ্রের পারে নয়তো কোনো পাহাড়ের দেশে।' চুলে-আঁচলে যেন সেই দূরের চাঞ্চল্য নিয়ে এল কাকলি : 'নয়তো কাছাকাছি এমন কোনো একটা সুন্দর জায়গায় যেখানে অখ্যাত বলে সভ্য মানুষেরা কেউ যায় না। তোমার আর কী ভাবনা, তুমি ছুটি করলেই তোমার ছুটি। সত্যি, চলো না লক্ষ্মীটি—'

চলো—মুখে এটুকু বলতে কী হয়েছিল? ক্ষণকালের জন্যে হলেও ভঙ্গুর একটি কল্পনার মান রাখা যেত না? লোকে কি সব সময় ট্রেনেই যায়, মনে-মনে যায় না?

গম্ভীর হল সুকান্ত। বললে, 'টাকা নেই।' পরে হঠাৎ হাত পাতল কাকলির কাছে : 'দেবে কিছু টাকা?'

'কোন দুঃখে?'

'একবার তা হলে বিলেত যেতাম। দুঃখ ফেরাতাম।'

'টাকা থাকলে আমি তো নিজেই যেতে পারি, একটা অপদার্থকে দিতে যাই কেন?'

'আমি অপদার্থ?'

'যে টাকার জন্যে স্ত্রীর কাছে হাত পাতে তাকে আর কী বলে!' কাকলি নিজেকে আর সংবরণ করল না।

হঠাৎ সুকান্ত হরিপদকে তারস্বরে ডাকতে লাগল কিন্তু হরিপদর সাড়া-শব্দ নেই। কী কাজে ওকে বাইরে পাঠিয়েছে, তাই বলতে এল মৃণালিনী। এমন গাঁক গাঁক করে চিৎকার করছিস কেন? ঘরে ডাকাত পড়েছে, না কি এ-সি কারেন্টে আটকে গেছিস কেউ? কী ব্যাপার?

'আমার জুতোতে কালি দেয় নি কেন?' খেঁকিয়ে উঠল সুকান্ত।

'দেয় নি তো নিজে দিয়ে নে।' মৃণালিনী পালটা বললে, 'সংসারে একটা মাত্র চাকর কত দিক সামলাবে। নিজেদের হাত-পা নেই?'

'সেই হাতে কলম পিষব, না জুতো ঘষব? বলি, আমার সময় কই?'

'বাঃ আমাকে বলো নি কেন?' কাকলি উঠে পড়ল। জুতো কালি বুরুশ নিয়ে দিব্যি বসল মেঝের উপর। বললে, 'যা বৃষ্টি আসছে তাতে জুতোতে কালি লাগানো বৃথা। এমনিতেও ঢোল অমনিতেও ঢোল।'

'বটেই তো। সুকান্ত ব্যঙ্গের টান দিল। 'শিক্ষার প্রসাধনে আর দরকার কী! এমনিতেও মেয়ে অমনিতেও মেয়ে।'

'হ্যাঁ, তাই। কিন্তু জুতোয় কালি দেবার জন্যে বাড়িতে কেউ এমনি হামলাদার হয় না। আজকাল রাস্তার মোড়ে জুতোবুরুশ পাওয়া যায়—'

'পয়সা লাগে, পয়সা।'

'ক'টা বা পয়সা!' তাচ্ছিল্যে ঠোঁট ওলটাল কাকলি।

'রোজগার তো করতে হয় না, তাই লাগে না বলতে। ক'টা পয়সাই বা আমাকে দেয় কে।'

'শোনো।' গম্ভীর হল কাকলি : 'পয়সার কথা যখন উঠেছে তখন এখনই বলি—'

'কি?' মুখচোখ সন্দিগ্ধ করল সুকান্ত।

'আমাকে পাঁচটা টাকা দাও।' কাকলি চোখ নামাল।

'কী হবে?'

'কিছু কেনাকাটা আছে।'

'কী কেনাকাটা?'

ভেবেছিল, বলে, হকার্স কর্নার থেকে দুটো ব্লাউজ কিনবে। কিন্তু সুকান্তর জিজ্ঞাসার খোঁচাটা কোথায় যেন গিয়ে বিঁধল। বললে, অতশত বলতে পারি না। টাকার ন্যায্য দরকার হয়েছে, বলেছি, তুমি এখন তার ববস্থা করবে।'

'করব। কিন্তু তোমার হাতে যে পঞ্চাশটা টাকা দিয়েছিলাম গোড়াতে—'

'ঐ দেখ তার হিসেব।' টেবিলের উপর বাঁধানো একটা নোটবইয়ের দিকে ইঙ্গিত করল কাকলি : 'কড়ায়-ক্রান্তিতে বিতং দেওয়া আছে। একটা আধলাও নেই আর তবিলে।'

'সব গেছে?'

'যাবে না তো কী! ঐ টাকার থেকেই তো নিজে আবার নিচ্ছ নানা কায়দা করে! বিশ্বাস না হয় দেখ না খাতা খুলে।'

সত্যিই খাতাটা খুলল সুকান্ত। বললে, 'আহা, হাতের লেখাটি কী সযত্ন!'

'তোমার কীর্তিই তো লিখেছি, যত্ন না করে উপায় কী!' সংস্কৃত জুতো পায়ের কাছে পাশাপাশি রেখে উঠে পড়ল কাকলি। এগুল টেবিলের কাছে। বললে, 'দেখ, একবার দিয়ে পরে আবার নিয়ে যাবার মতলবে তোমার থাবাগুলো দেখ। একটা টাকা শান্তিতে খরচ করার মত সামান্য যে একটু স্বাধীনতা তাতেও তোমার হিংসে।'

'তাই তো দেখছি।' পায়ে জুতো গলিয়ে চলে যাবার উদাসীন ভঙ্গি করল সুকান্ত।

'সে কি, টাকাটা দিয়ে যাও।'

'মা'র থেকে চেয়ে নিও।'

'বাঃ, মা'র থেকে চাইব কেন? আমি—আমি তোমার থেকে চাইব।'

'আমার হাত তোমার ঐ ললাটের মতই শূন্য।' যেতে যেতে থামল সুকান্ত : 'শাখাপ্রশাখা যখন নিঃশেষ হয়ে যায় তখন মূল কাণ্ড—মূল কাণ্ডের কাছেই প্রার্থনা জানাতে হবে। সুতারাং মা'র কাছে হাত না পেতে উপায় নেই।'

'আমি তা জানি না। আমি স্ত্রী, আমি শুধু তোমার কাছে হাত পাতব। তখন তুমি জানো তুমি কোত্থেকে এনে দেবে। চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে করে, না সমুদ্র সেঁচে?'

'তুমি শুধু স্ত্রী? তুমি আবার কন্যা না? তবে বাপ-মা'র কাছে চাইতেই বা তোমার লজ্জা কিসের?'

মনের মধ্যে কোন ঘা নিয়ে এই কথাটা বলছে অনায়াসে বুঝতে পেরেছে কাকলি। তবু সে হাসল। বললে, 'বাব-মা কী দেবে, কত দেবে? যে যা দেবে তাই পরিমিত। একমাত্র স্বামীই অপরিমিত দিতে পারে স্ত্রীকে। তোমার কাছে তাই আমার আকাঙক্ষাও নির্লজ্জ, তোমার দানও অফুরন্ত।'

'দাঁড়াও, মাকে বলে যাচ্ছি। কত বললে? পাঁচ? আচ্ছা—' দিব্যি পাশ কাটিয়ে পিছনে চলে গেল সুকান্ত।

'নিচে মৃণালিনী তাকে ধরল। বললে, 'তুই একটা কী বল তো!'

'কেন?' হাঁ হয়ে গেল সুকান্ত।

'তুই বউকে দিয়ে জুতো-বুরুশ করাচ্ছিস?'

'কেন, তাতে দোষের কী! বউ যদি জামায় বোতাম লাগাতে পারে, ছেঁড়া জায়গাটা টেঁকে দিতে পারে, জুতোয় একটু কালি বুলোলে এমন অধর্ম কিসের?'

'নিশ্চয়ই অধর্ম।' মৃণালিনী কণ্ঠস্বর তপ্ত করল : 'একটা এম-এ পাস মেয়ে—'

কথাটা শেষ হবার আগেই হেসে উঠল সুকান্ত। বললে, 'দেখ না এম-এ পাস মেয়ে—কেমন

নিখুঁত হিসেব রেখেছে, আর কেমন পারিপাটি হস্তাক্ষর। চুলের ফিতে চৌদ্দ পয়সা। তেলেভাজা দু' আনা। শীতলার থালা পাঁচ পয়সা—'

মৃণালিনী ধমক দিয়ে উঠল : 'না। নিজের জুতো নিজে বুরুশ করবি। আগে করতিস কী?'

ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুকান্ত। বললে, 'আগে স্বাধীন ছিলাম, জুতোও তাই স্বাধীন ছিল, মানে স্যাণ্ডেল ছিল। তার স্নো-পমেটমের দরকার হত না। এখন বন্ধন মেনেছি, জুতোও তাই হাঁ করে গিলে ধরেছে। সম্ভ্রান্ত হবার যন্ত্রণাই ঐ। এখন পায়ে-মাথায় দু' জায়গায় অ্যালবার্ট—'

'তুই সম্ভ্রান্ত—তোর বউ সম্ভ্রান্ত না?' মৃণালিনী আবার ধমকাল।

'হ্যাঁ, এম-এ পাস। মাঝে মাঝে কেমন ভুলে যাই। তুমি যদি মনে করিয়ে না দিতে, কে বলত তার ঐ নবনীত চেহারা দেখে! মেঝের উপর কেমন লেপটে বসে তালে-তালে বুরুশ ঠুকছে। বুরুশ ঠুকছে তো নয়, গীটার বাজাচ্ছে।' সদরের দিকে ছুটল সুকান্ত।

মৃণালিনী পিছু ডাকল। বললে, 'ভীষণ মেঘ করেছে। একটু দাঁড়িয়ে যা।'

'ও মেঘ ছলনা, মা। যত দর্শায় তত বর্ষায় না।' সদর পেরিয়ে আবার ফিরল সুকান্ত। বললে, 'কাকলিকে পাঁচটা টাকা দিও তো, মা। ও চাইছিল। ওর কী যেন দরকার—' দ্রুত বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

কতক্ষণ পরে হুড়মুড় করে এসে পড়ল বৃষ্টি। উপরে জানলায় দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গে খুশি হয়ে উঠল কাকলি। নিশ্চয়ই পৌঁছয় নি বাস-স্টপে। নিশ্চয়ই ভিজেছে। নয়তো কোথাও আটকা পড়েছে। হয় কোনো মুদি-দোকানে, নয় সেই খড়-বিচালির আড়তটায়, নয়তো বা গাড়ি-বারান্দার নিচে। গাড়ি-বারান্দার নিচে চলে ক'টা দড়িছুট গরুও নিশ্চয়ই দাঁড়িয়েছে তার গা ঘেঁষে। কিংবা ভনভনে মাছি ওড়ানো ক'টা আঢাকা খাবারের ফিরিওলা। আগে-আগে, মনে আছে, সুকান্ত বৃষ্টিতে পড়লে কত দুর্ভাবনায় পড়েছে কাকলি, ওর যেন অসুখ না করে, ওর যেন অসুবিধে না হয়। নিজে ইচ্ছে করে ভিজে রাত্রিতে শিয়রের জানলা খুলে রেখেছে গোপনে, যেন ওর গায়ের ঠাণ্ডা নিজের গায়ে এসে জড়ো হয়। কিন্তু আজ, এখন, কেন কে জানে, মন সর্বক্ষণ উলটো চাওয়া চাইছে। ও জব্দ হোক, ও অসুবিধেয় পড়ুক, হ্যাঁ, মন্দ কি, বিপদেই পড়ুক। ওর কষ্ট হোক, জ্বর হোক, ওর সম্ভ্রান্ততার জুতোর কালি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।

কাকলিকে টাকা দেবার কথা মৃণালিনী অবশ্য ভুলে গিয়েছে, কিন্তু ক'দিন পরে চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটা বাঙালি চাকর সে সুকান্তর ঘরে ঢুকিয়ে দিল। নে, ঐ তোর ঘর। ঐ তোর সাম্রাজ্য।

'কে তুই?' জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

ঝাঁটা হাতে কালো ছেলেটা ঝকঝকে দাঁতে হেসে উঠল। বললে, 'আমি এ ঘরের চাকর।' বলেই মেঝেতে ঝাঁটা বুলোতে লাগল।

'এ ঘরের চাকর মানে? এ বাড়ির চাকর নয়?' জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'বাড়ির চাকর তো হরিপদই আছে। আমি শুধু এ ঘরের চাকর।'

'শুধু এ ঘরের?' কথাটা যেন তখনো কাকলির কানে অবিশ্বাস্য লাগছে।

'উপায় কী তা ছাড়া। মাইনে যে মোটে দশ টাকা।'

'তোর নাম কী?' খুশি মনে জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'ভগলু। আদর করে ভগু বলে ডাকতে পারেন—'

'আর রাগ হলে ভগা—'

আকর্ণ বিস্তার করে হাসল ভগলু। বললে, 'আমার কাছে এমন কাজ পাবেন, রাগ কাকে বলে মনেও থাকবে না।'

'বটে? কিন্তু তোর কাজটা কী?'

'যা করতে বলবেন তাই। বুড়ি-মা তাই হুকুম দিলেন ঢালাও।'

'যদি কিছু করতে না বলি?' প্রশ্ন করল কাকলি।

'তা হলেও কিছু কাজ আমার থাকবেই। ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঝাড়াপোঁছা, বিছানা পাতা, জুতো বুরুশ করা, কাপড়চোপড় কাচা—আর', সুকান্তর চোখের দিকে চেয়ে হাসির ঝিলিকি দিল ভগলু : 'আর

এমন গা-হাত-পা মাথা টিপতে পারি—গঙ্গার ঘাটের নাপিতও দেখবেন হার মানবে।'

'বলিস কী!' উৎফুল্ল দুই পা প্রসারিত করে দিল সুকান্ত : 'ঝাঁটা গাছটা তা হলে রাখ হাত থেকে। গঙ্গার ঘাটের নাপিতদের একবার হারিয়ে দে দেখি।'

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে সুকান্তের পা টিপতে লাগল ভগলু।

'লাভলি!' আরামে চোখ বুজল সুকান্ত। বললে, 'তোর নাম যে ভগলু এই এখন আমার ভয়।'

'কেন বাবু?' ভগলুর হাত স্তব্ধ হল ক্ষণকাল।

'ভগলু মানেই তো তুই কেবল ভাগিস, পালিয়ে যাস। তুই যদি পালিয়ে যাস তা হলে বাঁচব কেমন করে?'

'না, না, পালাব না, ছাড়ব না আপনাদের। আপনি আর ঐ বউদিদি। আর মাথার উপরে খোদ বড়বাবু। বড়বাবুর ভাত আর আপনাদের মাইনে। ও আমি সব বুঝে নিয়েছি।' আবার টিপতে লাগল ভগলু : 'এ তো কিছু নয়, তার উপর যখন আবার কোমর টিপব—'

'সত্যি?' উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সুকান্ত।

'কী কুৎসিত!' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কাকলি।

'শোনো!' চেঁচিয়ে ডেকে উঠল সুকান্ত। বললে, 'কোথায় যাচ্ছ আর ঘরের বাইরে? এ সংসারে তোমার আর কাজ নেই। রান্নাঘরে ঠাকুর, শোবার ঘরে চাকর, নিজস্ব চাকর। কুটোটিও আর দু'খানা করতে হবে না। যদি এখন কাজ থাকে তো ঘরের বাইরে নয়, বাড়ির বাইরে।'

ফিরল না কাকলি। দরজার বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

'এত আরাম এত আলস্য নিয়ে করবে কী! সামান্য বিছানাটা পর্যন্ত তোমাকে আর পাততে হবে না।' দলাই-মলাই খেতে-খেতে বলতে লাগল সুকান্ত, 'আরাম কুৎসিত সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু পুরুষের বেলায় নয়, স্ত্রীলোকেরও।'

সুকান্তর ঘর থেকে ছাড়া পেয়ে এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মারছিল ভগলু। ভূপেন জিজ্ঞেস করল, 'কে ও?'

মৃণালিনী বললে, 'সুকুর জন্যে চাকর রেখে দিলাম।'

'শুধু সুকুর জন্যে?'

'না, না, আপনারও আমি সেবা করব।' ছুটে এসে ভগলু ভূপেনের পায়ের কাছে বসে পড়ল। শুরু করল পা টিপতে।

চমকে উঠে পা সরিয়ে নিল ভূপেন। সশব্দে ধমকে উঠল : 'ভাগ, আমার সেবা করতে হবে না।'

'তুমি না নাও আমার নিতে হবে। কত সময়ে কত রকমের ঠেকা, হাতের লক্ষ্য একটা লোক নেই।' বললে মৃণালিনী, 'কাছেপিঠে কোথাও যেতে হলে চলনদার খুঁজে পাই না। সেদিন জর্দা ফুরিয়ে গেছে, উঃ সে কী যন্ত্রণা, একটা কেউ নেই আপনার লোক ছুটে চলে যায় দোকানে, উদ্ধার করে আমাকে!'

'তুমি সংসারে এ কী বিলাসের বন্যা আনছ বলো তো—'

'চুপ করো। যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। বিলাসের স্রোত!' লকলক করে উঠল মৃণালিনী : 'ঠাকুর-চাকর রাখা বিলাস! বলিহারি আর্গুমেন্ট। মানুষ তার অবস্থার উন্নতি করবে না, এম-এ পাস বউকে দিয়ে হাঁড়ি ঠেলাবে, জুতো বুরুশ করাবে? এই না হলে আপিলের গ্রাউণ্ড! তা তোমার লাগে কেন? এ তোমার টাকা নয়, আমার ছেলের টাকা। সুকু কী আন্দাজ সংসারে দিচ্ছে তার খেয়াল আছে? বিনিময়ে সে একটু আরাম নেবে না, দেবে না তার স্ত্রীকে, তার মাকে? মানে, তোমার কথা হচ্ছে একবার যখন গামছা পরেছ চিরকালই গামছা পরো। মাঝে যদি টাকা কিছু রোজগার হয়ও তা হলে সেটা উদরস্থ না করে কবরস্থ করো। মানে, হাড়কিপ্পনের মত শুধু জমাও, জমিয়ে যাও। যক দাও। এই না হলে এই দশা!'

বৈঠকখানায় গিয়ে চুপচাপ বসে আছে ভূপেন, একটা হাত-পাখা নিয়ে ভগলু এসে উপস্থিত। বড়বাবুকে সেবা সে করবেই। টেপা না নিন হাওয়া নিন একটু।

'আমার হাওয়া লাগবে না।' বললে ভূপেন।

তবু ভগলু কথা শোনে না।

তেড়ে গেল ভূপেন। বললে, 'যদি হাওয়া করবি তো পাখাটা কেড়ে নিয়ে দু' ঘা বসিয়ে দেব।'

কিন্তু প্রশান্ত লম্বা হাতে সটান দুটো চড় বসিযে দিল।

বারান্দায় বসে সুকান্তের জুতো বুরুশ করছিল ভগলু, বন্দনা প্রশান্তের শূ-জোড়া এগিয়ে দিয়ে বললে, 'এ জোড়াও করে রেখো।'

'পারবে না।' ভগলু কাঠখোট্টার মতন বললে।

'পারবে না?' থ হয়ে রইল বন্দনা।

'না। আমি শুধু এ ঘরের চাকর।' সুকান্তের ঘর দেখিয়ে দিল ভগলু : 'আমার দশ টাকা মাইনে। দশ বাড়িয়ে পনেরো করুন, উপর-নিচ সব ঘরেরই আমি চাকর বনে যাচ্ছি।'

'অতশত আমি জানি না।' বন্দনার অন্যরকম যুক্তি : 'তুমি যদি ও ঘরের জুতো সাফ করতে পারো এ ঘরেরও পারবে।'

'তেমন কোনো কথা নেই।' প্রায় কলা দেখাল ভগলু।

বন্দনা গিয়ে প্রশান্তর কাছে নালিশ করল।

কোমর বেঁধে মুখিয়ে এল প্রশান্ত। হুকুম করল ভগলুকে। ভগলু কানেও তুলল না। তুমি মুনিব নও, তুমি বলবার কে? হুকুম প্রত্যাখ্যান করলে।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই মার।

ছি ছি, সুকান্ত এল ঝগড়া করতে। লড়তে চাকরের হয়ে।

'ওকে মারছ কেন? ওর দোষ কী? মা ওকে শুধু আমার ঘরের জন্যে রেখেছেন।'

'তোর ঘরের জন্যে রেখেছেন তো বারান্দায় বসে কাজ করছে কেন?' রাগের মাথায় মুখে যা এল বলে ফেলল প্রশান্ত।

'বারান্দা কারু একলার জায়গা নয়। জায়গা যদি তোমার হয় তো আমারও।' সুকান্ত বললে, 'আসল কথাটা হচ্ছে ওর মাইনে কে দিচ্ছে—ওর মাইনে আমি দিচ্ছি। সুতরাং ভুল নেই, ও আমার একলার চাকর।' ওকে আরো দাও না পাঁচটা টাকা। তারপরে নাও না কাজ আদায় করে।'

'বয়ে গেছে।'

ঘরে এসে ঢুকলে সুকান্তকে নম্রকণ্ঠে ধিক্কার দিয়ে উঠল কাকলি : 'ছি ছি তুমি ওসব কথা বললে? বললে তোমার দাদাকে?'

'কেন, অন্যায় কী বলেছি!'

'জঘন্যতম অন্যায়। ভগলুকে তোমার বলা উচিত ছিল, দাদার জুতো আমারই জুতো।'

'যা সত্য নয় তা আমি বলি না।'

'কেন, তোমার দু' জোড়া জুতো থাকতে পারত না? থাকলে দু' জোড়াতেই কালি দিত না চাকর?' প্রায় মরীয়ার মত কাকলি বললে, 'তুমি—তুমি কেন দাদার থেকে নিজেকে আলাদা করলে?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সুকান্ত বললে, 'বেশ তো, দাদা ওর পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেই পারেন।'

'আমি বাড়িয়ে দেব মাইনে। তুমি দাও আমাকে পাঁচ টাকা।' দাবির ভঙ্গিতে হাত পাতল কাকলি।

'আমি পাব কোথায়?'

'সেদিন যে চেয়েছিলাম, তুমি তোমার মাকে বলবে বলেছিলে, অন্তত দাও সেই টাকাটা।'

'কেন, মা তোমাকে দেন নি?'

'না।'

'তা আমি কী জানি। তুমি তবে মা'র কাছ থেকে চাও গে।'

কাকলি গুম হয়ে রইল।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সুকান্ত দেখল ভগলু প্রশান্তের জুতোতে নির্বিঘ্নে কালি দিচ্ছে। ঝন্টু-সেন্টুরগুলোও বসেছে সারি সারি। আর ওটা কি বউদির?

'এ কী রে!' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল সুকান্ত : 'এত মারধোরের পর?'
ঝকঝকে দাঁতে আকর্ণ হাসল ভগলু। বললে, 'ছোট বউদিদিমণি পাঁচটি টাকা দিয়েছেন।'
'দিয়েছেন?'
'অন্তত এক মাসের মতন তো হল। এক মাস তো খেটে দিই।'
'ছোট বউদিদিমণি গেল কোথায়?'
'তা আমি কী করে বলব?'
মৃণালিনীর কাছে গেল সুকান্ত।
'মা, তুমি কাকলিকে পাঁচ টাকা দিয়েছ?' একান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল গোপনে।
'না তো।'
'ও চেয়েছিল তোমার কাছে?'
'কই? কখন?'
'তবে ও যে ভগলুকে পাঁচ টাকা বাড়তি দিলে, ভগলু বলছে দিয়েছে, ও সে টাকা পেল কোথায়?'
মুহূর্তে মায়ে-ছেলেয় তীক্ষ্ণ চোখাচোখি হল : পেল কোথায়?

চব্বিশ

মৃণালিনীর ব্রত সাঙ্গ হয়েছে, ক'জন ব্রাহ্মণভোজন করাবে। একটু বিস্তৃত বাজার দরকার। সেইজন্যেই দরকার একজন কর্ণধারের।

রবিবারটাই বাছা হয়েছে। বাড়িভর্তি থাকবে সবাই উপস্থিত। স্বামী-সন্তান নিয়ে বাসন্তীও আসবে নিমন্ত্রণে।

'তুই বাজারে যা না।' প্রশান্তকে বললে মৃণালিনী।

ছুটির দিন হলে কী হবে, খবরের কাগজের আদ্যকৃত্য শেষ করে যেমন-কে-তেমন দাড়ি কামাতে বসেছে প্রশান্ত। আয়নার থেকে চোখ তুলে মা'র দিকে তাকাল সবিস্ময়ে। বললে, 'আমি আবার বাজার করলাম কবে?'

'সে তো আফিস থাকে বলে। আজ যখন তোর ছুটি—'

যে কথাটা কর্ককোলা ওষুধের ঝাঁজের মত প্রথমেই বেরিয়ে আসতে চাইছিল, সেটা চাপা দিল প্রশান্ত। আয়নার শান্তিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললে, 'তোমার সংসারে এখন দু' দুটো চাকর, তাদের পাঠাও না।'

'ওরে ব্বাবা, ওদের একটা খর আরেকটা দূষণ। ওরা দামে-ওজনে তো খাবেই, জিনিসও খারাপ আনবে।' মৃণালিনী ঘরের মধ্যে আরো একটু ঘনিয়ে এল : 'আফিস-ডের বাজার করে, সে প্রায় বাঁধাধরা বরাদ্দ বাজার। আজ যখন বিশেষ উৎসব, তখন কারু একটু দেখাশোনা করা দরকার। তোর আর কাজ কী—'

উদগত কথাটা আর চাপা দিতে পারল না প্রশান্ত। আয়নাতে দৃষ্টি স্থির রেখে বললে, 'তোমার সুকুকে বলো না।'

স্বরও শান্ত রাখবে ভেবেছিল, কিন্তু অলক্ষ্যে ঝাঁজ এসে গেল। যেন শোনাল মাকেই সে উলটো হুকুম করছে।

'কেন, তোকে বলতে পারি না?' ঝামটে উঠল মৃণালিনী।

'আমাকে বলে লাভ কী! আমি কি স্মরণীয় অতীতে বাজার করেছি কোনো দিন? বরং তোমার সুকুই কিছুদিন আগে পর্যন্ত করেছে। ছুটি তো আজ ওরও।'

'ও কোথায় যেন বেরুচ্ছে—' বললে বটে কিন্তু বলেই মৃণালিনী বুঝল কথার সুরে যেন সত্যের টান লাগল না।

'আমিও বেরুব এক্ষুনি।' সজোরে ব্লেড ঘষতে লাগল প্রশান্ত।

'তোর কতক্ষণই বা লাগবে।' মৃণালিনী প্রায় একটু অনুনয় মেশাল।

'সুকুর তো আরো কম। ও অনেক ওয়াকিবহাল। ওই দরদাম ফিকিরফন্দি ভালো জানে। ওই পারবে জিতে আসতে। আমার অদৃষ্টে তো শুধু ঠকা।' বন্দনা ঘরেই ছিল—ঠাকুর রাখার পর সে আর নিচে তত মোতায়েন নয়—মুখ তুলে প্রশান্ত তার দিকে তাকাল করুণ চোখে।

'বলছি জরুরি কাজে সুকু বাইরে বেরুচ্ছে—' সত্যের টান আনবার জন্যে কথায় মিথ্যে জোর দিল মৃণালিনী।

'আচ্ছা আমি দেখছি কেমন ওর জরুরি কাজ। দাঁড়াও, আমিই বলছি ওকে।' নড়ে-চড়ে উঠল প্রশান্ত।

'থাক, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না।' ঘরের ওপাশ থেকে চাপা নিশ্বাস ছেড়ে ফোঁস করে উঠল বন্দনা : 'এম-এ পাস করা বউয়ের স্বামী কি কথা বলতে কী কথা বলে অপমান করে বসবে তার ঠিক নেই।'

'মায়ে-পোয়ে কথা হচ্ছে, তুমি বউ, তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে আসো কেন?' দপ করে জ্বলে উঠল মৃণালিনী। মুখে-চোখে আগুন নিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এম-এ পাস করা বউয়ের স্বামী, তার পক্ষে র‍্যাশন-ব্যাগ হাতে নিয়ে মাছ তরকারির বাজার করা চলে না।'

'সে চলে আমাদের পক্ষে।' আবার নতুন করে গালে বুরুশ ঘষতে লাগল প্রশান্ত : 'যাদের বউয়েরা নন-ম্যাট্রিক আর যারা নিজেরা আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট।'

ছেলে কী বলছে তার দিকে নজর না দিয়ে বউ কী বলেছে তাতেই জ্বলছে মৃণালিনী, 'হ্যাঁ, এম-এ পাস স্বপ্নেও কোনো দিন হতে পাবে না।'

'বাস্তবেই বা এ কী হয়েছে!' বন্দনা পারল না চুপ করে থাকতে : 'শিংও বেরোয় নি, ল্যাজও গজায় নি। হাত-পাও চারখানা করে নয়।'

'থামো। মুখের উপর কথা বলতে এসো না। তোমার মধ্যে কী আছে? ঐ তো কাঠামোর ছিরি।' মৃণালিনী মুখ বেঁকাল। তারপর থমথমে গলায় বললে, 'তবু ছোট বউয়ের মধ্যে একটা সম্ভাবনা আছে, ফিউচার আছে। তোমার? তোমার তো আয় নেই, শুধু ব্যয়ের বাহার।'

মৃণালিনী সুকুর ঘরের দিকেই গেল না, নিচে নামতে লাগল অবাধে।

ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে বন্দনা কাঁদতে লাগল।

সেন্টু প্রশান্তর কাছে এসে ভীতু-ভীতু চোখে জিজ্ঞেস করলে, 'বাবা, মা কাঁদছে কেন?'

'তোমার মায়ের নাকটা কাটা গেছে।'

'না, না, নাক কাটবে কেন?' সেন্টু তো ঘরের মধ্যেই ছিল। কই দেখে নি তো তেমন আক্রমণ। সেন্টু প্রথমটা চাইল না বিশ্বাস করতে।

'নাক কাটা না গেলে কি অমনি নাকি সুরে কাঁদে কেউ?' প্রশান্ত উঠে পড়তে চাইল : 'দেখছ না মা কেমন আঁচল দিয়ে নাক-মুখ চেপে ধরে আছে।'

এবার যেন প্রায় বিশ্বাস্য হল ব্যাপারটা। সেন্টু প্রশান্তর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে, 'কে কাটল, বাবা? ঠাকুমা?'

'না। একটা টুনটুনি।'

'টুনটুনি? পাখি?' চোখ দুটো বড়-বড় করে তাকাল সেন্টু।

'হ্যাঁ, শোনো নি সেই টুনটুনির গল্প?' প্রশান্ত ছেলেকে কোলে তুলে নিল : 'সেই যে 'এক টুনিতে টুনটুনাল, সাত-ও রানীর নাক কাটাল'—সেই টুনি পাখি। মনে নেই সেই গল্পটা?'

কত জনের কত গল্প শুনেছে সেন্টু, বয়ে গেছে তার সব মনে করে রাখতে। তার শৈশব কৌতূহলে যেটা সমূহ অস্বস্তি তারই থেকে সে প্রথম প্রশ্ন করল : 'সেই পাখিটা কোথায়, বাবা?'

'তার তো উড়ে যাবার কথা। কিন্তু যায় নি এখনো। আনাচে-কানাচে ঘুরছে। সকলের নাক কাটিয়ে দিয়ে তবে যাবে।' প্রশান্ত ছেলেকে দু' বাহুর মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

'বাঃ, সবাই মিলে আমরা সেই পাখিটাকে তাড়িয়ে দিতে পারি না?' বাহুর মধ্যে ছটফট করে উঠল সেন্টু : 'ছেড়ে দাও, নিচে থেকে দাদুর লাঠিটা নিয়ে আসি। আর তুমি—তুমি নাও তোমার ছাতাটা।' জোর করে নেমে পড়ল কোল থেকে : 'তারপরে দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।'

প্রশান্ত বললে, 'এ টুনিকে তাড়ানো খুব শক্ত। জানিস, এ শিক্ষিত টুনি। এর প্রকাণ্ড ল্যাজ। এর জন্য বাড়িতে ফ্যান আসে, লাল-নীল আলো আসে, পর্দা আসে, কার্পেট আসে। ঠাকুর আসে, চাকর আসে, ডিনারের টেবিল-চেয়ার আসে—ক্রমে ক্রমে আরো কত আসবে তার ঠিক কী! একে তাড়ানো কি আমাদের সাধ্যি?'

বাবার এ যুক্তি মানতে রাজি নয় সেন্টু, কিন্তু সে কথায় কান দেবার আগে তার চোখ গিয়ে পড়ল মায়ের উপর। নাক-মুখের থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়েছে বন্দনা।

'দেখ, দেখ,' উৎফুল্ল হয়ে উঠল সেন্টু : 'আছে, আছে, মা'র নাক আছে।'

'ও, আছে নাকি?' প্রশান্ত নির্লিপ্ত মুখ করল : 'কিন্তু ফিউচার নেই।'

সে আবার কী জিনিস জানতে ব্যস্ত নয় সেন্টু। মা'র নাক যে রক্ষা পেয়েছে, তাতেই সে আপাতত খুশি। টুনি তো রানীদের নাক কাটিয়েছিল। আমরা তো গরিব। আমার মা তো আর রানী নয়।

মা'র দিকেই এগুচ্ছিল, প্রশান্ত তাকে টেনে ধরল। বললে, 'না, ফিউচার নেই এ ঠিক নয়। তুমি যাও, মাকে গিয়ে বলো, মা, আমিই তোমার ফিউচার।'

অনাবশ্যক একটা দুর্বোধ্যের সামনে এসে পড়েছে—সলজ্জ করুণ মুখে হাসল সেন্টু। বাবার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে কথাটার অর্থ প্রার্থনা করল। অর্থ না বুঝলে যোগ্য সান্ত্বনা মাকে সে দেয় কী করে?

প্রশান্ত বুঝল সেন্টুর যন্ত্রণা। বললে, 'মাকে গিয়ে বলো, আমাকে দিয়ে যখন তুমি বউ আনবে, শাশুড়ি হবে, তখন এর প্রতিশোধ নেবে।'

সেন্টু গিয়ে পৌঁছুবার আগেই বন্দনা ঝংকার দিয়ে উঠল, 'আমি ততদিন অপেক্ষা করতে রাজি নই, আমি এক্ষুনি-এক্ষুনি এর বিহিত চাই।'

'আমিও। কিন্তু কী বিহিত বলো?'

'আমাকে কয়েক মাস বাপের বাড়িতে রেখে এসো।'

'তাতে লাভ কী? সেখানেও নো ফিউচার।' বললে প্রশান্ত, 'সেই যদি ফের ফিরেই আসতে হয়, তা হলে ঐ যাওয়ায় তেজ কী?'

'তা ছাড়া তুমি প্রায় নিত্যরুগী,' আশ্চর্য সায় দিল আবার বন্দনা : 'তোমাকে একলা ফেলে বেশিদিন দূরে থাকাও চলবে না।'

'আর তোমারই যেন খুব স্বাস্থ্য।' চোখে মমতা আনল প্রশান্ত : 'সেই তো সেদিন বলছিলে তোমার পেটে চিনচিনে একটা ব্যথা।'

'সে তোমার প্রতি সহানুভূতিতে।' একটু হাসল বুঝি বন্দনা। তারপর সব মেয়ে যেমন বলে তেমনি বিস্বাদ মুখে বললে, 'কিন্তু আমার এমন অদৃষ্ট কী হবে যে ঐ ব্যথাতেই—এই অপমানের ব্যথাতে নয়—শিগগির-শিগগির মরে যাব। আর তোমার সামনে, তোমার কোলে মাথা রেখে।'

জোরে হেসে উঠল প্রশান্ত। বললে, 'সে আশা বৃথা। তোমার চেয়ে আমার বয়েস যেহেতু বেশি, আমারই আগে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু মরা-টরা কোনো কাজের কথা নয়। কাজের কথা হচ্ছে লড়া। বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকাই সমস্ত যন্ত্রণার বিরুদ্ধে মহৎ প্রতিবাদ।'

'তা হলে তুমি কী ভাবছ?' উৎসাহে দু' পা এগিয়ে এল বন্দনা।

'ভাবছি না, ভেবে ঠিক করে ফেলেছি।'

'কী?'

'এই বাড়ি, এই সংসার ছেড়ে দেব। অন্যত্র ঘর ভাড়া নেব।'

ঠিক মনের মত কথা। বন্দনার মুখ চোখ ঠোঁট সমস্ত শরীর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, 'যারা গরিব তাদের গরিবের মত থাকতে অমর্যাদা কী!'

'কিছুমাত্র না। দুখের ভাত সুখের করে খাব।'

'আমাদের চেয়েও কম মাইনের লোক কত থাকে দেখেছি আলাদা বাড়ি করে।' বললে বন্দনা, 'আমরাও থাকব। দড়ির দু' প্রান্ত একত্র করতে যদি ক্লান্ত হয়েও পড়ি, ভগবান কৃপা করবেন।'

'ভগবান-টগবান বুঝি না।' উঠে দাঁড়াল প্রশান্ত : 'এই যে সসম্মানে বাঁচবার পণ নিয়েছি এইটেই সমস্ত। মাকে বলেছিলাম আমিও এক্ষুনি বেরুব, ঠিকই বলেছিলাম। এখুনি বেরুব বাড়ি খুঁজতে। এক্ষুনি।'

'কিন্তু বেরুনোমাত্রই যদি বাড়ি না পাও—' কী যেন আরো বলবে তার আভাস দিয়ে এগিয়ে এল বন্দনা।

'ঐ যে কার নাম বললে—টগবান না কী—সে যদি জুটিয়ে দেয়—'

'রসিকতাও তো করতে পারে।' হাসল বন্দনা : 'এক্ষুনি-এক্ষুনি না দিয়ে যদি ক'দিন পরে জোটায়? তা হলে কী হবে?'

'তাও আমি ঠিক করে ফেলেছি।' প্রশান্ত জামার জন্যে হাত বাড়াল। 'তোমার বাবা মফস্বলে—সেটা খরচের রাস্তা। ওখানে গিয়ে থাকবার কোনো মানে হয় না। সেটা মামুলি বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকবার মত দেখায়। কলকাতায় তোমার বাপের বাড়ির দিকের যেসব আত্মীয় আছে—তোমার দিদি, মাসি, খুড়তুতো কাকা—তাদের বাড়িতে, দফায় দফায়, ধর্মশালার মত, তোমাদের রেখে আসব, যতদিন না ঘর পাই সুবিধেমত। সে থাকাটাই বরং খানিক বিদ্রোহের মত দেখাবে।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।' জামাটা এগিয়ে দিল বন্দনা : 'কিন্তু তুমি?'

'সম্প্রতি এখানেই থাকব। মাসকাবারি দরামাহা তো দেওয়াই আছে। এখানে থেকেই খবরাখবর করব তোমাদের। তুমিও নিত্যি দেখতে পাবে চোখের উপর।'

'খুব ভালো হবে। খুব ভালো হবে।' প্রশান্তর পরা জামায় বুকের বোতামগুলি একে একে পরিয়ে দিল বন্দনা।

খবর নিয়ে সেন্টু আগেই ছুটেছে, প্রশান্ত এবার বাইরে বেরুল।

'তোমার কিন্তু বাজারে যাওয়া উচিত।' কাকলি বললে সুকান্তকে।

'তোমার কথায়?' খাটে শুয়ে বই পড়ছিল সুকান্ত, চট করে চটে উঠল।

'আমার কথায় হবে কেন? তোমার মা'র কথায়।'

'কই, মা বলল আমাকে? এল এ ঘরে? বলল, যা বাজার করে নিয়ে আয়?'

'বলা উচিত ছিল।' গম্ভীর হল কাকলি।

'কী বলা উচিত না-উচিত তুমি মোড়লি করতে এসো না।' পাশ ফিরল সুকান্ত : 'নিজের চরকায় তেল দিচ্ছ তাই দাও গে।'

কোথায় বিঁধছে সুকান্তকে তা যেন বুঝতে পেরেছে কাকলি। কিন্তু কথাটা সরাসরি না-ওঠা পর্যন্ত সেদিকে যাচ্ছে না কিছুতেই। সরলতা থাকে তো তোলো কথাটা। খোলাখুলি জিজ্ঞেস করো।

'তোমার মায়ের এ পক্ষপাতিত্ব সমর্থন করা যায় না।' বললে কাকলি, 'তোমারই উচিত ছিল নিজে থেকে এগিয়ে আসার। কেমন শোভন হত বলো তো!'

'ছাই হত।'

'মা না বলুন, দাদা তো চেয়েছিলেন বলতে—'

উত্তেজিত কথাবার্তা। সব শোনা গেছে এ ঘর থেকে। তাই মুখের উপর বলতে পারল সুকান্ত : 'কই, বলল কই? বউদিই তো মুখ চেপে ধরল। দাদাই বা শুনল কেন বউদির কথা? ছোট ভাইকে হুকুম করলেই পারত।'

'কী আমার ছোট ভাই। এক পায়ে খাড়া। একেবারে ধরো লক্ষ্মণ!'

'তুমি অত তড়পাচ্ছ কেন! দাদাকে তো আর যেতে হল না!'

'না। তোমাকেও না। এই অবস্থায় কাকে এখন যেতে হবে বুঝতে পাচ্ছ?'

'খুব পাচ্ছি। বাবাকে।' নিশ্চিন্তে আবার পাশ ফিরল সুকান্ত : 'তাই তো মা সটান বলতে গেল নিচে।'

'আর তারই জন্যে ম্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছি। কী উপযুক্ত পুত্র। তাকে কি কিছু আদেশ করা যায়? তার চেয়ে স্বামীকে, গৃহস্বামীকে বিরক্ত করা সোজা। ছি ছি।' জিভের ডগাটা ছুঁচলো করল কাকলি।

সুকান্ত চোখ বুজে রইল। কথা কইল না।

যা অবধারিত, নিচে গিয়ে ভূপেনকে ধরল মৃণালিনী : 'ওঠো, রাখো এসব জঞ্জাল।'

প্রুফ দেখছিল ভূপেন, চমকে উঠল। তবু অস্ফুট প্রতিবাদ না করে পারল না, জঞ্জাল!'

'আদালতের প্রুফ তো নেই, ছাপাখানার প্রুফ। জঞ্জাল ছাড়া আর কি। ওঠো, বাজারে যাও। ছেলেদের একজন নবাব আরেকজন বাদশা। তারা পাদমেকং ভূমিও নড়বে না—'

'অগত্যা আমিই নড়ছি। কিন্তু একটা কথা—' ভূপেন জড়তা কাটিয়ে উঠতে চাইল : 'আমি ভাবছিলাম কী—'

'কী?'

'সমাজ-সংসার কত এগিয়ে গিয়েছে। ঘরে-ঘরে শিক্ষিত শাশুড়ি, শিক্ষিত বউ। কোথাও কোথাও বউয়েরা আবার এম-এ পাস। বাসে-ট্রামে ভিড়ে-ভাড়ে হাটেমাঠে কত তাদের অগ্রগতি। তা ছাড়া ঠাকুর-চাকর হওয়াতে তারা তো এখন প্রায় কাজছুট—বিছানা পাতা দূরের কথা, মশারিটা পর্যন্ত তাদের খাটাতে হয় না—'

'মোদ্দা কথা কী?' হুমকে উঠল মৃণালিনী : 'মোদ্দা কথাটা তো বলবে।'

'বলছি। বলছি, তোমরা মেয়েরাই তো পারো এখন দৈনিক বাজার করতে। তোমাদের হাতে আরএখন কাজ কই। সেদিন দেখলাম উঠোনের তুলসীমঞ্চের প্রদীপটাও চাকর জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। একটা কিছু তোমরা করবে তো! কোনো ভারি কাজ শক্ত কাজ আর না থাকে, অন্তত বাজারটা করো। কি, পারো না করতে?'

'খুব পারি।' মৃণালিনী বজ্রনির্ঘোষে বললে।

'আমার মা কিন্তু পারবে না।' কখন অগোচরে বৈঠকখানায় চলে এসেছিল সেন্টু, গম্ভীর স্বরে বললে।

'না, তোমার মা পারবে না।' সেন্টুকে হাত বাড়িয়ে ধরল ভূপেন। মৃণালিনীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু, ছোট বউমা তো পারেন। প্রথমে শাশুড়ি-বউয়ে দু' জনে একসঙ্গে গেলে, শেষে রপ্ত হয়ে গেলে এক দিন বউ আরেক দিন শাশুড়ি। সঙ্গে চাকর নিলে তো নিলে, নয়তো রিকশা।'

'আমি এক শো বার রাজি। কিন্তু তোমার ছোট বউ একটি আলস্যের স্তূপ, কোনো কিছুতে উৎসাহ নেই, কী বলে না জানি কথাটা—অ্যাডভেঞ্চার নেই।' মৃণালিনী যেমন-কে-তেমন বলতে লাগল অনর্গল, 'কে বলবে এম-এ পাস। এম-এ পাস না ঘেমে পাস! আমি যে সেকেলে মানুষ, রেগুলার স্কুল-কলেজে পড়ি নি, আমি বরং কথায়-কথায় ইংরিজি বলতে পারি, শুনে শুনে শিখেছি, আর আমার এম-এ-ওয়ালীর মুখে একটাও ইংরিজি ওয়ার্ড নেই গা! একেবারে সাদামাটা। হাবাগোবা।'

'তোর মা কেন পারবে না রে দাদু?' সেন্টুর চিবুকে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল ভূপেন।

সেন্টু বললে, 'আমি আর দিদি, মা আর বাবা, আমরা অন্য বাড়িতে উঠে যাব।'

ভূপেন শুনল, অন্য বাড়িতে বেড়াতে যাব। মৃণালিনীকে বললে, 'দেখলে তো, বড় বউমার হাতে কাজ নেই, তাই আত্মীয়বাড়িতে বেড়াতে চলেছে।'

'কাজ নেই কী? আমি কত বলি ছেলেটাকে সকালবেলাকার কোনো ইস্কুলে-টিস্কুলে—ঐ যে কী কে-জি না হেজি বলে—অমনি একটা কোনো হিজিবিজিতে ভর্তি করে দাও। তারপর রোজ ছেলেকে স্কুলে দিয়ে এসো আর ছুটি হলে স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে এসো। আজকাল তো ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া আর বাড়িতে ফিরিয়ে আনাই আধুনিক মায়েদের কাজ হয়েছে। তা এ বাড়িকে কি আধুনিক করবার জো আছে? সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো হয়েই থাকা চিরকাল—'

'সেই বাবাই গেলেন শেষ পর্যন্ত।' উপরে নিজের ঘরের জানলা থেকে দেখতে পেল কাকলি : 'আর তাঁর উপযুক্ত পুত্র নির্জীবের মত শুয়ে রইল।'

'শুধু পুত্র উপযুক্ত নয়, পুত্রবধূও উপযুক্ত।' বললে সুকান্ত, 'আর সুদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকাটাই জীবনের লক্ষণ নয় পুরোপুরি।'

'হ্যাঁ, চলা, এগিয়ে যাওয়াই জীবনের লক্ষণ। চরণযুগলের আকৃতিও সেই প্রতীকে তৈরি। কিন্তু,' ঘুরে দাঁড়াল কাকলি : 'দেবে, দেবে আমাকে বাজারে যেতে?'

'বাজারে যেতে নয়, বাজার করতে।' সুকান্ত সংশোধন করতে চাইল।

'ও একই কথা। বাজারে না গেলে যায় না বাজার করা। কিন্তু দেবে অনুমতি?'

'যেন তোমার সব যাওয়া সব করাই আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখে।' কোন দূরে সূক্ষ্ম-তীক্ষ্ণ একটা ইঙ্গিতের বাণ ছুঁড়ল সুকান্ত।

'রাখা উচিতও নয়। স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিতে চেয়ে এ তুমি আশাও করতে পারো না।' আজকাল কথা বলতে গেলেই কেমন একটা ঝগড়া-ঝগড়া সুর এসে যায়, সেই সুরটাকে শাসন করল কাকলি। বললে. 'কিন্তু কতগুলি নিশ্চয়ই ব্যাপার আছে, যেখানে স্বামীর মানে সংসারের মত নেওয়া দরকার। বিশেষত যেগুলির সঙ্গে সংসারের, পরিবারের সম্মান জড়ানো। যেগুলি বিশেষরূপে ব্যক্তিগত নয়—'

'তার অর্থ? ভুরুর কুঞ্চনে সেই একটা ঝগড়ার টান আঁকল সুকান্ত।

'অর্থ সোজা।' মনে মনে হাসল কাকলি : 'অর্থ, আমি যদি সংসারের দৈনিক সওদা করতে বাজারে যাই, তুমি, তোমার বাবা-মা তাতে মত দেবে?'

'কেন দেবে না? বেকার বসে আছ, নড়ে-চড়ে সংসারের যদি একটা উপকার করলে তো মন্দ কি।'

'উপকার?'

'তা ছাড়া আবার কী! চাকরের চুরি বন্ধ হবে সেইটেই মস্ত লাভ।'

'আর এদিকে আমি যে কত ঠকব, তার খেয়াল আছে?'

'ঠকতে-ঠকতে শিখবে।' প্রায় বাণী দেওয়ার মত করে বলল সুকান্ত।

'আমার ঠকাটা সংসার মানবে কেন? ক্ষতিটা কেন ক্ষমা করবে? বলবে, এক টাকা সেরের জিনিস তুমি পাঁচ সিকে হারে আনবে কেন?' তরল হবার আশায় হাসল কাকলি : 'তখন ঐ চার আনা পয়সা আমাকে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। বারে-বারেই হয়তো নানা জায়গায় ভরতে-পুরতে হবে। উল্টা বুঝলি রাম করে ছাড়বে।'

'ছাড়লেই বা। দেবে ক্ষতিপূরণ।' চিৎ হয়ে শুয়ে বইয়ে হঠাৎ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে সুকান্ত। গায়ে লাগল না এমনিভাবে বললে।

'দেব? কোত্থেকে দেব? নিরীহ মুখ করে হাসতে চাইল কাকলি।

'তোমার হাতে তো টাকা আছে। বাড়তি টাকা।'

'বাড়তি টাকা?'

'হ্যাঁ. গোপন উপার্জনের উৎস।'

'কথাটাকে প্রাঞ্জল করতে গিয়ে বুঝি অমনি করে বললে।' ঝগড়া করবে না তখনও কাকলির প্রতিজ্ঞা।

'তা ছাড়া আবার কী।' খাটের উপর উঠে বসল সুকান্ত : 'ভেবেছিলাম শ্বশুর মশায়ের দশ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে এসেছ, তুমি শূন্য ছাড়া কিছু নও। এখন দেখছি ও ছাড়াও তোমার আরো অনেক লুকোনো তবিল আছে।'

'লুকোনো তবিল?' ঘাড় কান মুখ গলা একসঙ্গে গরম হয়ে উঠল কাকলির।

'নইলে ভগুর বাড়তি মাইনের টাকাটা তুমি দিলে কোত্থেকে?' বইটা ফেলে রেখে খাট থেকে নেমে পড়ল সুকান্ত : 'মা সেদিন আমার জন্যে একটা ওভালটিন কিনে আনল, তুমি সর্দারি করে আরেক কৌটো কিনে আনলে দাদার জন্যে।'

'ভীষণ বিশ্রী দেখাচ্ছিল। চায়ের টেবিলে মা তোমার দুধের পেয়ালার দু-দু ভর্তি চামচ ওভালটিন মিশিয়ে দিলেন আর দাদার বেলায় কণিকামাত্র না—অথচ তিনি সামনে বসে—এ আমার কিছুতে সহ্য হচ্ছিল না।'

'ওভালটিন যে দাদার পছন্দ নয় তা জানো?'
'কী করে জানব। যখন কিনে এনে দিলাম তখন তো দিব্যি নিলেন হাত পেতে। পরদিন থেকে দিব্যি খেতে লাগলেন দুধের সঙ্গে।'
'তা লাগুন। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর কই? বাড়তি টাকাটা পেলে কোথায়?'
'বরেনবাবু যে ঘড়িটা উপহার দিয়েছিলেন তার সোনার ব্যান্ডটা বেচে দিয়েছি।' স্পষ্ট, সরল মুখে কাকলি বললে।
'আমাকে বলো নি কেন?' জবাবদিহি চাইবার মত করে জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।
'কখন বলব? বেচবার আগে, না বেচবার পরে?'
'বেচবার আগে।'
'এ এমন একটা কিছু ব্যাপার নয় যে, তোমার অনুমতি নিয়ে করতে হবে।'
'নয়?'
'না। এ আমার একলার জিনিস, আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ঘটেছে, আমি বেচে দিয়েছি।'
কীরকম জ্বালা করে উঠল সুকান্তর। বললে, 'বেচবার পরেও তো বলো নি।'
'কথা ওঠেনি বলিনি। আজ কথা উঠল বললাম। নইলে ঐ তো ঘড়িটা পড়ে আছে টেবিলে। গায়ে সেই সোনার ব্যান্ডটা নেই, একটা সাধারণ লেডিস ব্যান্ড লাগানো, দেখলেই বোঝা যায়।'
'দেখলেই বোঝা যায় ওটা বিক্রি হয়ে গেছে? ওটা থেকে মোটা হাতে মুনাফা কুড়িয়েছ?'
তবুও চটবে না, চটল না কাকলি। বললে, 'ন্যাড়া ঘড়িতে প্রশ্নটা সব সময়েই প্রকট হয়েছিল সংশ্লিষ্ট ব্যান্ডটা গেল কোথায়? ব্যান্ডটা হারিয়েও ফেলতে পারতাম, কাউকে পারতামও বা দিয়ে দিতে। আজ ঠিক-ঠিক প্রশ্ন তুললে, ঠিক-ঠিক উত্তর দিলাম, নিজের প্রয়োজনে বিক্রি করে দিয়েছি। হ্যাঁ, ভগুর মাইনে, ওভালটিনের কৌটো—নিশ্চয়ই নিজের প্রয়োজন।'
একটা কিছু ঘা মারতে খুব ইচ্ছে করছে সুকান্তর। বললে, 'অঙ্গে তো দু' এক খণ্ড আভরণ আছে, দয়া করে তা বেচলে না কেন?'
আমার খুশি—এভাবে গেল না কাকলি। বললে, 'যেটা অবান্তর, অনাবশ্যক—বোতামের চেন বা হাতের আংটির মতই ঘড়ির ব্যান্ডটাও অশালীন—সেটাই আগে বিদায় করলাম।'
'শুধু সেই কারণে? না কি ওটার মধ্যে একটা জ্বালা মাখানো ছিল?'
'জ্বালা? জ্বালা কিসের!'
'একজনের করস্পর্শের জ্বালা।'
আপাদমস্তক পাথর হয়ে গেল কাকলি। নিরেট স্তব্ধতার পাথর।

লাঞ্চের টেবিলে পকেট থেকে ঘড়ির কেসটা বের করল বরেন। খুলে দেখাল, ঘড়িটা কত সুন্দর কত কুলীন কত দামী, আর তার বন্ধনীটা নিটোল নিখুঁত সোনার।
কাকলি হাত বাড়িয়েই নিতে চেয়েছিল কেসটা।
'না, না, তা কি হয়? আমি নিজের হাতে পরিয়ে দেব।' বরেন বললে দৃঢ়স্বরে।
কাকলি তবু আড়ষ্ট হয়েছিল। স্বামীর দিকে তাকাল আশ্রয়ের জন্যে।
সুকান্ত উদার ভঙ্গিতে বললে, 'তাতে কি? ঘড়ি তো পরিয়েই দিতে হয়। দেবেই তো পরিয়ে।' তারপর আরো একটু টিপ্পনী জুড়লে : 'গলায় মালা দিতে এলে কি হাতে করে নেয়? যার মালা সে গলায়ই দুলিয়ে দেয়।'
বরেন হাসিতে ফেটে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই নিজের হাতের মধ্যে কাকলির বাঁ হাত টেনে নিল। কালীঘাটের শাঁখারিরাও এত সময় নেয় না বা পরিশ্রম করে না শাঁখা পরাতে।
'নিন, ছাড়ুন, আমিই পরছি নিজে-নিজে।' ব্যস্ত হয়ে উঠল কাকলি।
'ধৈর্য ধরতে শিখুন—' যাক এতক্ষণে পেরেছে বরেন। বললে, 'ঘড়ির জন্যে হাত নয়, সন্দেহ কি, হাতের জন্যেই ঘড়ি। দেখবেন ব্যবহার করবেন। বাক্সে তুলে রাখবেন না।'
'কী যে বলেন! ঘড়ির কত দরকার।' মামুলি শোনালেও কথার পিঠে বলতে হল কাকলিকে।

'হ্যাঁ, যেখানকার জিনিস সেখানে রাখবেন।'

'কিন্তু ঘড়ি দেখবার কত যে সময় হবে বলতে পারি না।' কাকলি স্মিত-স্নিগ্ধ চোখে তাকাল সুকান্তর দিকে : 'কেননা সময় এখন ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে। সাধ্যি কি ঘড়ি তার সঙ্গে পাল্লা দেয়।'

দার্শনিক বরেনও কিঞ্চিৎ হতে জানে। বললে, 'ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াই শেষে একদিন ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া হয়ে যাবে। তখন ঘড়ি দেখবার সময় পাবেন।'

'তখন সময় বুঝি আর কাটতে চাইবে না।' কাকলিকেই বেশি কথা কইবার আশকারা দিচ্ছে সুকান্ত, তাই কাকলিই বললে।

হোটেলে যাবার সময় কাকলির ইচ্ছে ছিল না পস্টাপস্টি কিছু সাজ করে। কিন্তু উপায় কী সুকান্তকে তুমি সম্পূর্ণ হতাশ করো। ধনী-মানী বন্ধুর কাছে একটু উজ্জ্বল হয়ে দেখা দাও এ কোন স্বামী না চায়। আর যদি বন্ধুর একটু সুনজরে পড়ে, আর তার ফলে স্বামীর যদি একটা সুরাহা হয়, তা হলে তা তো পরম পাতিব্রত্য। স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর বিজ্ঞাপনের সাইনবোর্ড। তার বইয়ের প্রচ্ছদপট। ইংরেজ আমলে দিল্লির দরবারে সুন্দরী স্ত্রী দেখিয়ে অনেকেই আগে-আগে গুছিয়ে নিয়েছে। এখন আমল বদল হলেও দিল্লির দরবার উঠে যায়নি। এখনও অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর রূপই স্বামীর রুপোর নির্ণায়ক। স্ত্রী যদি পাতে দেবার মত, তা হলে স্বামীও জাতে ওঠবার।

কিন্তু কী তোমার আছে যে সাজবে! অনেকখানি বাহু দেখানো ও এক-চিলতে পেট-পিঠ দেখানো আঁটসাঁট জামা নেই, নেই বা দেখা-না-দেখায় মেশা ফিনফিনে একটা নাইলন। তবে কি দিয়ে কী হবে। দরকার নেই, যা আছে তাই এদিক-ওদিক উড়িয়ে-ঘুরিয়ে পরে নাও। অন্তত চোখের কোলে কোণ বরাবর রেফ মেরে সুর্মাটা তো আঁকো আর লিপস্টিক তো একটু বুলোও আলগোছে। ব্যক্তিত্বের আসল জাদু চোখে, চোখের কটাক্ষে, আর সেই জ্র'র কথা মনে আছে? তোমার নাম রেখেছিলাম মৃগশাবকলোচনা।

কাকলি হেসে বললে, 'সাজগোজে ত্রুটি থাকা ভালো। বিজ্ঞাপনের বানান ভুল থাকলেই বেশি আকর্ষণীয় হয়।'

'হ্যাঁ, আকৃষ্ট করা নয়, আকর্ষণীয় থাকাই বড় কথা।'

এত সব হিতকথা সেদিন যে বলেছিল, সেই সুকান্তরই এখন কিনা এই ভাষা। চোরকে ভাঙা বেড়া দেখিয়ে এখন আবার চোরের উপরেই রাগ।

যে কথাটা চলছিল তার ফের খেই ধরল সুকান্ত। বললে, 'তা হলে ঘড়ির ব্যান্ডটা যখন বেচেছ তখন একে একে গায়ের দু' একখানা গয়না যা আছে, তাও বেচে দিতে পারো।'

'অনায়াসে। দরকার পড়লেই।' কাকলি বললে দৃঢ়স্বরে।

'কারুর অনুমতির অপেক্ষাও করবে না?'

'কেন করব? আমার নিজের জিনিস বেচব তাতে কার কী মাথাব্যথা?'

'স্ত্রী তার গায়ের গয়না বেচবে স্বামী জানবে না?'

'তুমি বুঝি ভেবেছ স্ত্রীর গয়না চিরকাল শুধু স্বামীর প্রয়োজনেই যাবে, স্ত্রীর নিজের প্রয়োজনে যাবে না? যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় দই মারবে।'

'তা হলে তো দেখছি তোমার নিজের টাকা আছে।'

'আছেই তো।'

'তা হলে আর আমার কাছে হাত পাতবার তোমার দরকার নেই।'

'এক বিন্দু নেই।'

'তুমি নিজেই তা হলে নিজেরটা চালাতে পারবে।'

'এক শো বার।'

সুবীর গিয়েছিল বাসন্তীকে আনতে। বাসন্তী আসেনি। মাকে একটা চিঠিও দেয়নি, কেন এল না। মৃণালিনী জিজ্ঞেস করল সুবীরকে, 'কেন এল না?'

সুবীর বললে, 'জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। তুমুল ঝগড়া।'

পঁচিশ

সেন্টু এবার এসেছে ছোড়দাদুর ঘরে খবর দিতে।

'জানো বিজু, আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' বিজয়াকে বিজু বলে সেন্টু।

'কোথায় যাচ্ছিস রে? মামার বাড়ি?' হাত বাড়িয়ে কোলের কাছে টেনে নিল বিজয়া : 'ঝিকঝিক ট্রেনে করে?'

'না, না, তুমি কিচ্ছু বোঝো না।' খুব গম্ভীর মুখ করল সেন্টু : 'আমার বাবা যে খুব গরিব। অত রেলভাড়া দেবার পয়সা কোথায়? দুটো ফুল আবার দুটো হাফ্! ওরে বাবাঃ!' ঘাড়টা ছোট করে মুখ ভেঙচিয়ে অসম্ভবের ভঙ্গি করলে সেন্টু।

'তবে কোথায়? শ্যামবাজার? মাসির বাড়ি?'

'তোমার মাথায় কিচ্ছু নেই।' সরাসরি রায় দিল সেন্টু : 'মাসির বাড়িতে তো মোটে দু'খানা ঘর। সেখানে গুষ্টি-গাষ্টি নিয়ে থাকব কি করে? আর মাসির ছেলেটা যা বিচ্ছু না, দাদা বলে একটুও মানতে চায় না আমাকে। তা মারামারি করতে চাস তো কর, দেখি তোর কত জোর। তা বুঝলে, ওকে কিছু বলা যাবে না—মাসি উল্টে তেড়ে আসবে আমাকে। ছেলেটা আহ্লাদের নাড়ুগোপাল।'

'আর তুই? তুই কী?' ছুরি দিয়ে নখ কাটছিল হেমেন, জিজ্ঞেস করল।

'আমি শুধু গোপাল। আমার হাতে নাড়ু কই? আমার বাবা যে গরিব।'

'আমি তোকে নাড়ু দেব। ক্ষীরকদম্ব দেব।'

'আগে দাও।'

এনামেলের কৌটোয় মিষ্টি মজুত করে রাখে বিজয়া। কেউ আদর করে ডেকে খাওয়াবার নেই, তাই নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়। মন প্রসন্ন থাকলে, যখন যে তার পক্ষ নেয়, তাকে বিতরণও করে। নচেৎ নিজে খায় বা স্বামীকে খাওয়ায়।

সেন্টুকে দিল একটা মিষ্টি। বললে, 'এখন বল কোথায় যাচ্ছিস?'

'যেখানে যাচ্ছি সেখানে এমন মিষ্টি পাব না।' লুব্ধ জিভে আঙুল চাটতে লাগল সেন্টু : 'তা হলে আরেকটা দাও।'

কৌটো থেকে বিজয়া আরেকটা মিষ্টি দিল। বললে, 'এবার বল।'

আর পাবার নিশ্চয়ই সম্ভাবনা নেই। তবু কৌটোর দিকে তাকিয়ে হতাশ মুখে সেন্টু বললে, 'আমার বাবা আলাদা বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে—এখানে আর আমরা থাকব না।'

'কেন রে, কেন?' যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল বিজয়া।

'ঠাকুমা কেবল মাকে বকে।'

'কে বকে?' সূক্ষ্ম চোখে নখ কাটতে ব্যস্ত, যেন শুনতে পায়নি হেমেন।

'ঐ যে ঝগড়াটে বুড়ি আছে একটা, ডাকাত-গিন্নি—'

'কী বললি?' হো-হো করে হেসে সেন্টুকে বুকে নিয়ে খাটের উপর গড়িয়ে পড়ল বিজয়া। সেন্টু বুকের মধ্যে খলবলিয়ে উঠল।

'দেখছ না কিরকম থপথপ মোটা হচ্ছে দিন-দিন—'

'কী হচ্ছে?' বিজয়ার আবার প্রমত্ত হাসি। হাসতে-হাসতে চোখে প্রায় জল আসার জোগাড়।

'হাসছ মানে?' ছুরির ধারটা কণ্ঠে আনল হেমেন।

'বাঃ, মজার কথায় হাসব না?' বিজয়া উঠে বসল, সেন্টুকে নামিয়ে দিল খাট থেকে।

'মজার কথা! এসব কথা ঐটুকু ছেলে শিখল কোথায়?'

'বলো আমি শিখিয়েছি।' বিজয়া ফোঁস করে উঠল।

'কেউ কি আর শেখাব বলে শেখায়! ওরে শেখ, ঠাকুমাকে ডাকাত-গিন্নি বলবি, ঝগড়াটে বুড়ি

বলবি। কখন কে রাগের মাথায় বেফাঁস স্বগতোক্তি করে তাই ছেলেটার কানে যায়। সেই থেকেই শিখে নেয়, কুড়িয়ে নেয়—'

'আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন? ওর মাও তো বলতে পারে।'

'পারে। কিন্তু তোমার অমনি হেসে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয়নি। একটু শাসন করা উচিত ছিল—'

'তোমাদের বংশের ছেলে, তুমি করো না।' বিজয়া নেমে পড়ল খাট থেকে: 'খারাপ কথা কিছু নয়, একটা মজার কথা বলেছে তাই একেবারে শাসনের হুমকি।'

'হ্যাঁ, তাই, এসব কারণেই গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা হচ্ছে না ছেলেদের—'

'ঠিক বলেছ ছোড়দাদু, ঠাকুমাটার শ্রাদ্ধ হচ্ছে না—' বললে সেন্টু, 'কেন যে দেরি হচ্ছে?'

আবার হেসে উঠল বিজয়া। আবার ছেলেটাকে বুকে নিয়ে খলবল করে উঠল। আবার গড়িয়ে পড়ল খাটে। বললে, 'ছেলেটা কী সুন্দর! যাই বলুক, কিন্তু কী সুন্দর করে বলে!'

'আর তুমি কী সুন্দর করে হাসো!' নখ কাটতে-কাটতে বললে হেমেন।

'হাসব না?' মারমুখো ভঙ্গি করে উঠে বসল বিজয়া: 'হাসবার কথা হলেই হাসব।'

'প্রশান্ত আলাদা বাড়িভাড়া করে চলে যাবে এটা খুব সুখের কথা?' ছুরির দিকেই চোখ রাখল হেমেন।

'নিশ্চয়ই সুখের কথা। এ বাড়ির একটা ছেলের যে তবু আত্মসম্মানের বোধ আছে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সংকল্প করার যে সৎসাহস আছে—তার জন্যে সে অভিনন্দনের যোগ্য।' বিজয়া নেমে দাঁড়াল: 'সে ছেলেকে নিয়ে গৌরব করতে হয়, আনন্দ করতে হয়।'

এখন ডান হাতের নখ ধরতে হবে। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের নখ কাটাটা অপারেশনের মত কঠিন। পাঁচ-পাঁচটা নখ পাঁচ-পাঁচটা অপারেশন। সেই দুরূহ কাজেই মন দিল হেমেন। সুতরাং প্রশ্নটাও একটু দুরূহ শোনাল। বললে, 'সংসার ছেড়ে চলে যাওয়াটাই বুঝি খুব সম্মানের কাজ?'

'নিশ্চয়ই। এক শো বার। যে সংসারে নিত্য ঠোকাঠুকি, মারামারি, প্রতি পদে ছোট মনের পরিচয় সেখানে থাকাটা ঘোর—ঘোর অসম্মান। সবাই তো আর তোমার মত ঠুঁটো জগন্নাথ নয়—'

'তার মানে তুমি বলতে চাও বিজয়া-দশমীর পর প্রশান্ত আর বড় বউমা এ বাড়িতে আমাদের প্রণাম করতে আসবে?'

এ আবার কী প্রশ্ন। তবু, কথার পিঠে উত্তর, সরাসরি বললে বিজয়া: 'নিশ্চয়ই আসবে।'

'আর কোনো কারণে যদি আসতে দু' দিন দেরি হয় আমরা ওদের ত্রুটি ধরব!'

'ধরলামই বা।'

'আর ওরাও আশা করবে যেহেতু জয়ন্তী-সুবীর ছোট, তারা ওদের বাড়ি যাবে প্রণাম করতে?'

'আশা তো করতেই পারে।'

'আর যদি কোনো কারণে সুবীর-জয়ন্তীর যেতে দু' দিন দেরি হয় ওরা ত্রুটি ধরবে?'

'ধরুক। ধরলে কী হয়?'

'কী হয় মানে?' এবার ছুরির থেকে চোখ তুলে বিজয়ার চোখের দিকে তাকাল হেমেন: 'তার মানে তুমি বলতে চাও আমাদের আত্মীয়স্বজন যারা বিজয়া-দশমীর পর এসে এক থালা মিষ্টি খেত তারা দু' বাড়ি গিয়ে দু' থালা মিষ্টি খাবে?'

হাসি পেলেও হাসল না বিজয়া। বললে, 'খেলেই বা! তাতে তোমার কী! আমাদের কী?'

'আমাদের কী মানে! আর সেই মিষ্টি ঝন্টু-সেন্টু কিনে আনবে ঠোঙা করে? বাড়ির থেকে কত দূরে ময়রার দোকান হয় তা কে বলবে।'

'বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে এমনিধারা ছোটখাট বাজার করেই থাকে।'

'ওরা ঠোঙায় পুরে যা আনবে তা ওরা নিজেরা খেতে পাবে না, কোন রাক্ষস এসে খেয়ে নেবে। রাক্ষসটা খাবে আর ওরা দুই ভাই-বোন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকবে।'

'চেয়ে থাকবে কেন? ওরাও খাবে।'

সেন্টুর মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল, এবার হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, খাবে? জোটাতে পারবে প্রশান্ত? অতিথিকে খাওয়াতে গিয়ে নিজের সন্তানদের একেবারে অনশনে না হোক, রাখবে ক্ষীণাশনে। তাতে খুব সুখ, খুব হাসি?'

'অমন অতিথি-আপ্যায়নে দরকার নেই।' সজোরে মাথা ঝাঁকাল বিজয়া : 'অতিথিকে দেবে না মিষ্টির থালা।'

'দেবে না?' আবার ছুরিতে মনোনিবেশ করল হেমেন : 'ঐ যে, কী না জানি বললে কথাটা? সম্মান। মধ্যবিত্ত সম্মান। পথে কুড়োনো শালপাতা, সেই শালপাতার ঠোঙায় করে আনা দেখন-মিষ্টি। মানে, বাইরে থেকে দেখতেই মিষ্টি, কিন্তু ভিতরে—' একটা ভয়াবহ দীর্ঘশ্বাস ফেলল হেমন।

'কী ভিতরে?'

'ভিতরে সন্তানের উপবাস, স্ত্রীর হাহাকার।'

'রাখো। আর কেউ অল্পবিত্ত স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করে না? যার যেমন অবস্থা তার তেমনি ব্যবস্থা করতে হবে। ছেলের দুধ অতিথির চায়ে যাবে এ অসম্ভব।'

'বললে তো অসম্ভব, কিন্তু তাই যাচ্ছে, যাবে। ঝন্টু-সেন্টুর দুধ জুটবে না। ক্ষীরকদম্ব দূরের কথা, খুরিতে পড়ে থাকা রসগোল্লার সিরেটুকুও পারবে না ধরতে। ওদের মা তাই উনুনের উপরে তরকারির কড়াতে ঢেলে দিয়েছে। ব্যবস্থা?' একটা নখ সেরে দ্বিতীয় নখে যাবার আগে চোখ তুলল হেমেন : 'ধান বাঁচাবার জন্যে অনেক ব্যবস্থা করেছিল চাষা, কিন্তু বুলবুলির ঝাঁককে রুখতে পারেনি। তবুও সেই চাষার আশা ছিল, ভবিষ্যৎ ছিল, মাঠে তার রশুন বোনা ছিল। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া প্রশান্ত-বন্দনার কিছু নেই। শুধু একটা ফাঁকা স্বপ্ন।'

'স্বপ্ন দেখতে সাহস লাগে।'

'দুঃস্বপ্ন দেখতেও।' জুড়ে দিল হেমেন।

'এ জাগ্রত দুঃস্বপ্নের চেয়ে সে কল্পিত দুঃস্বপ্ন অনেক সহনীয়।'

'বটে? তবে তুমি দয়া করে একটা স্বপ্ন দেখ না।' অনুরোধে সুরটা সিক্ত করল হেমেন।

'আমি স্বপ্ন দেখব?'

'ক্ষতি কী! দেখ না। তুমিই বা কম সাহসী কী! স্বপ্ন দেখ এ বাড়িতে এ ছেলেটা, সেন্টুটা নেই। আর তার কথা শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না তার হাসির খিলখিল। তার দৌড়ঝাঁপ, হৈ-চৈ, উপরে-নিচে দাপাদাপি। কথায় কথায় তার নালিশ করে ওঠা। রান্নাঘর থেকে পড়ার ঘর—সকলের কাজে-কর্মে ব্যাঘাত হওয়া। এখানে-ওখানে লুকিয়ে থেকে সমস্ত সংসারকে সন্ত্রস্ত করা। তারপর নিজের থেকেই বার হয়ে ধরা পড়ে বিজুর ঘর থেকে ক্ষীরকদম্ব খাওয়া। দেখ, দেখ, দুষ্টুর শিরোমণিটা কেমন হাসছে দেখ—'

তার শেষ দিকের বর্ণনাটায় সেন্টু বিশেষ খুশি হয়েছে, তাই মৃদু মৃদু হাসছে, মৃদু মৃদু হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করে রেখেছে।

প্রশ্রয়ভরা চোখে তাকে দেখছে হেমেন ; কিন্তু বিজয়া চোখ তুলে যে তাকাবে, তার সামর্থ্য নেই। ইতিমধ্যে একটি বই তুলে নিয়েছে, তারই পৃষ্ঠায় দৃষ্টিকে সে আশ্রয় দিল।

'কই দেখ, দেখ স্বপ্নটা। যে ছেলেটা সমস্ত ঘর-দোর ছাদ-বারান্দা সদর-খিড়কি ওতপ্রোত করে জড়িয়ে ছিল, স্বপ্ন দেখ, তার আর বিন্দুমাত্র সাড়াশব্দ নেই। সকালে নেই, দুপুরে নেই, রাত্রে নেই। কী, দেখছ? আজ নেই। কাল নেই। তাকে দুটো ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেছে।'

সেন্টুর হাসি-হাসি মুখটা চকিতে উড়ে গেল। ফ্যাকাশে সুরে বললে, 'ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেল কী বলছ?'

'হ্যাঁ। একটা নয়, দু' দুটো ছেলেধরা। একটা তার বাবা আরেকটা তার মা।'

আশ্বস্ত হল সেন্টু। আবার স্নিগ্ধ-স্মিত বিজ্ঞ-বিজ্ঞ মুখ করল। বিজুর কষ্ট হচ্ছে বলেই যে বিজু চুপ করে আছে, এটুকু বুঝতে পেরে নিঃশব্দ সহানুভূতিতে তার পাশ ঘেঁষে শুল।

বিজয়া ঘেঁষল না, ঝুঁকল না এতটুকু। নির্লিপ্ত স্বরে বললে, 'তা কী করা যাবে। যাদের ছেলে তারা যদি নিয়ে যায় তুমি কী করতে পারো?'

'যাদের ছেলে মানে?'

বিস্ময়ও কম নয় বিজয়ার : 'ওদের ছেলে নয় তো কাদের ছেলে?'

'সমস্ত সংসারের ছেলে।' তৃতীয় নখ ধরল হেমেন : 'বউ যখন একটা ঘরে আসে, তখন সে কার বউ?'

'আহা, কী প্রশ্ন! যে বিয়ে করে এনেছে তার।'

'না। সে ব্যক্তিবিশেষের স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু সমস্ত সংসারের বউ।' নখটা একটু বেশি কেটে গেল কিনা তাই পর্যবেক্ষণ করতে লাগল হেমেন। বললে, 'তাকে একটা ব্যক্তি বিয়ে করেনি, একটা প্রতিষ্ঠান বিয়ে করেছে। সে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবার।'

'কী সর্বনাশের কথা! দ্রৌপদীর বেলায় শুধু পাঁচ ভাই ছিল, আর তুমি একেবারে পঞ্চজন বানিয়ে ফেললে।' হাসতে লাগল বিজয়া।

আর নির্মল ছেলেটা শুধু বিজুর মুখের হাসি বুঝল ; তার অতিরিক্ত কোনো ইঙ্গিত নয়, কোনো ব্যঞ্জনা নয়, আর তাই হাসল নিরর্গল। হাসল নিরর্থক।

'স্বপ্ন দেখ, তুমি এই হাসিটা আর শুনতে পাচ্ছ না।' হেমেন আবার মনে করিয়ে দিল।

'তুমি কী বলছ ছোড়দাদু!' বিজয়ার গায়ে ভর দিয়ে উঁচু হল সেন্টু। বললে, 'আমি তো প্রায়ই আসব এ বাড়ি। আর তোমরা, তুমি আর বিজু, তোমরাও তো যাবে আমাদের ওখানে।'

'হ্যাঁ, জানি। আর তোমার দুধটুকু দিয়ে দু' জনে দু' বাটি চা খেয়ে আসব।'

এটার মধ্যেও বা হাসবার কী ছিল, শিশুটা দুর্বার আনন্দে নির্বারিত হল।

'সংসারে এই একটা শুধু কলকণ্ঠ ছিল তাও নিয়ে যাবে প্রশান্ত?' যেন নখ কাটার চেয়েও সহজ তেমনি নিটোল গলায় হেমেন বললে, 'কই, এতদিনে ছোট একটা ভাই আসবে সেন্টুর—তা নয়—'

সহসা মুখ-চোখ কাঁদো-কাঁদো গম্ভীর করে তুলল সেন্টু। বললে, 'ভালো হচ্ছে না কিন্তু ছোড়দাদু—'

ভাইয়েতে সেন্টুর ঘোরতর আপত্তি। ভাই এলে তার আদর কমে যাবে এই তার ভয়। তাই হেমেনের প্রতি তার এই ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি।

'তোমার আদর কে কাড়ে।' তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল হেমেন : 'তবু একটা ছোট ভাই হলে দেখবে তোমার নিজেরই কত ইচ্ছে করবে আদর করতে। এখন জামাগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে বলে পরতে চাও না, তখন কত ভালোবেসে দিয়ে দেবে ছোট ভাইকে। বলবে, তোর আর মুরোদ কী। তুই তো তোর দাদার জামা পরেছিস।'

'ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।' স্ফীত নাক-ঠোঁট প্রকৃতিস্থ করল না সেন্টু। বললে, 'আবার কিন্তু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রেডিওটা ভেঙে দেব।'

'তুমি যদি চলে যাও তবে শুধু এই ভূতের রেডিও নয় সমস্ত অদ্ভুতের রেডিওই বন্ধ হয়ে যাবে।'

'হঠাৎ তোমার আবার আরেকটা শিশুর জন্যে বাসনা কেন?' চোখ চোয়াল ঘাড় কথা—সব একসঙ্গে বাঁকা করল বিজয়া।

তর্জনীর নখটা বুঝি কিছুতেই বাগানো যাবে না। এদিক-ওদিক ছুরি ঘুরিয়ে অবশেষে কায়দা করতে পেরেছে ভেবে হেমেন বললে, 'আমার নিজের জন্যে নয়, সংসারের জন্যেই আমার বাসনা। আরেকটা নতুন শিশু এলে বেশ হত, নতুন শ্রী ফিরত ঘরদোরের। চিৎ হয়ে ফোকলা দাঁতে হাসত আর রঙিন বল ঝুলতে দেখে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করত—'

'দাঁড়াও, ছুরি দিয়ে তোমার আঙুল কেটে দিচ্ছি এখুনি—' ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে খাট থেকে নেমে পড়ল সেন্টু।

'কেটে দেবে কী—কেটে গিয়েছে।'

'কই, দেখি। দাঁড়াও, আইডিন দিয়ে দি।' টেবিলের কোন কোণে আইডিনের শিশি আছে, সর্দার ছেলে তাই নিয়ে এল কুড়িয়ে।

শিশির ছিপিটা আইডিনে ডুবিয়ে হেমেন সেন্টুর হাতে দিল। ছুঁই-কি-না-ছুঁই করে কাটা জায়গাটায় ছিপিটা লাগাল সেন্টু। আর যত না সত্যি জ্বলল তার চেয়ে বেশি তড়পাল হেমেন। আর সেই তড়পানি দেখে সেন্টুর মহা আনন্দ।

'আর বলব না, বলব না তোর ছোট ভাইয়ের কথা।' সেন্টুকে আরো খুশি করবার জন্যে তড়পানির মধ্যেই অভিনয়ের ভঙ্গিতে বললে হেমেন।

'নিজের আর কি। গায়ে তো লাগে না। ঝামেলা তো পোয়াতে হবে না এক কড়া। উনি শুধু আদর করবেন।' আরো যেন অনেক দূর কেটেছে আর বিজয়ার গলায় যেন আরো বেশি আইডিন : 'উনি আদর করবেন বলে পেটে বাচ্চা ধরতে হবে!'

'পেটে বাচ্চা এসেছে শুনলে প্রথমটা খুব বিরক্ত লাগে, কিন্তু বাচ্চাটা সত্যি যখন জন্মায়, তখন সেটা কী অপরূপ বস্তু বলো তো!' বললে হেমেন।

'তা ওর নিজের ভাই না চেয়ে ওর একটা খুড়তুতো ভাই চাইলেই তো পারো।' বিজয়া হেমেনের দিকে না তাকিয়ে তাকাল সেন্টুর দিকে।

'ভালো হবে না বলছি, বিজু। তোমাকেও তা হলে আইডিন লাগাব।' খুড়তুতো ভাইয়েতেও সেন্টুর আপত্তি।

'তা তোমরা তো বিয়ের আগে থেকেই তার জন্যে বরণডালা নিয়ে বসে আছ।' এবার পায়ের দিকে নজর দিল হেমেন : 'তোমাদের ভয়েই সে আসেনি। আর তড়িঘড়ি যখন আসেনি তখন আদৌ আসে কিনা তার ঠিক কি।'

'আহা, কথার কী নমুনা!'

'এমনি সুখে-শান্তিতে থাকতে দিলে হয়তো আসত। কিন্তু সুকু আর তার মা যেসব কাণ্ড করে ছোট বউমাকে চাকরি করতে পাঠাচ্ছে তাতে আর সে অসাবধান হতে চাইবে না।'

'তুমি তো কত বোঝো!'

'তা ঠিক। এ শাস্ত্র বুঝেছি এ কথা দেবতারাও বলতে পারে না। তবু সম্ভাবনার একটা চেহারা আঁচ করছি মাত্র। ছোট বউমা চান বা না চান, তার আফিস চাইবে না।'

'আফিস কী চাইবে না?'

'বারে-বারে মেটারনিটি লিভ গ্র্যান্ট করতে।'

বইয়ে মন দিল বিজয়া।

পদচর্চায় নিবিষ্ট অবস্থায় হেমেন বললে, 'আর তোমার তো ইটারনিটি লিভ!' বলেই চট করে অন্য কথায় লাফ দিল : 'কাজে কাজেই আরেকটা ছোট্ট শিশুর যখন সম্ভাবনা নেই—'

আবার শিশু কথা উঠেছে এবং নিশ্চয়ই তা হলে সেটা সেন্টুর প্রতিকূলে যাবে, তাই সে ফের আইডিনের শিশি কুড়িয়ে এনে হেমেনকে তাড়া করল। নতুন করে না কাটুক, ঐ পুরোনো কাটার জায়গায়ই লাগাব আবার।

'আরে কী মুশকিল, আমি তো তোর পক্ষেই বলছি।' হেমেন সেন্টুকে নিরস্ত করতে চাইল। বললে, 'তুই তো পুরুষমানুষ, সমস্ত কথাটা তো আগে শুনবি। নাকি আদ্ধেক শুনেই, কথা শেষ না হতেই, মেয়েদের মত তেড়েফুঁড়ে আসবি ঝগড়া করতে? কথাটা কী বলছি আমি? বলছি সেন্টুই আমাদের সর্বস্ব। সেন্টু ছাড়া আমাদের যখন আর কেউ নেই, আর কেউ আসবেও না, আসতেও পারবে না, তখন সেন্টুকে আমরা ছাড়তে পারব না কিছুতেই। কী, কথাটা কি ভালো, না মন্দ?'

সলজ্জ মুখে হাসতে হাসতে সেন্টু হেমেনের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

'সারা বাড়িতে একটা শিশু থাকবে না, তার কলকণ্ঠ শোনা যাবে না', বললে হেমেন, 'তাকে সংসার বলে না, মরুভূমি বলে।'

তক্ষুনি, সহসা, উপরে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল।

লাফিয়ে উঠল বিজয়া : 'শোনো, শোনো তোমার সংসারের কলকণ্ঠ।'

দরজার সামনে পর্দা ধরে দাঁড়াল। একসঙ্গে, কখনো বা একের পরে আরেক, শুনতে পাচ্ছে চারজনকে। প্রশান্ত আর বন্দনা, সুকান্ত আর কাকলি।

আর কাঁদছে কে?

কাঁদছে ভগলু। নেমে আসতে আসতে কাঁদছে।

ভয় পেয়ে হেমেনের আরো নিবিড়ে এসেছে সেন্টু। আর হেমেন ভাবছে, সেলুনে কেন নখ কাটার ব্যবস্থা নেই? থাকলে, সকালের দিকেও থাকতে পারত বাইরে—এ প্রভাতী আরত্রিক শুনতে হত না।

ভগলু কাঁদতে কাঁদতে নামছে সিঁড়ি দিয়ে : 'আগে কাজ করলাম না বলে মার খেলাম। এখন কাজ করলাম বলে মার খেলাম। আমাকে রামেও মারে রাবণেও মারে। এখন আমি যাই কোথায়?'

'কী হয়েছে?' ভগলুকে কাছে ডাকল বিজয়া।

'তুমি ব্যাপারটা শেষকালে চাকরের কাছ থেকে শুনবে?'

'কেন, ও তো উৎপীড়িত। ওর নিজস্ব একটা ভার্সন আছে। আর কে না জানে এ ক্ষেত্রে ও ই নিরপেক্ষ।'

ভগলু বললে ঘটনাটা। সকালে উঠেই, মানে বাবুরা বিছানা ছাড়লে, বউমারা তো আগেই ছেড়েছেন, প্রশান্ত সুকান্ত দু' ভায়েরই ঘরে ঢুকে ঝাঁটপাট দিয়েছে নির্বিবাদে। ঝন্টু-সেন্টু উঠে গেলে বিছানাও তুলেছে পরিপাটি। প্রশান্ত তখন নিচে চায়ে-খবরের কাগজে মশগুল, তাই জানে না কিছু। এখন বেলা হয়েছে, বালতিতে জল আর ন্যাকড়া নিয়ে ঘর মুছতে গিয়েছে ভগলু, আর দেখুন, পা ছুঁয়ে বলছি, প্রথমেই ঢুকেছি বড় দাদাবাবুর ঘরে। তা তিনি আমাকে দেখেই খেপে উঠলেন। বললেন, এ ঘরে ঢুকবি তো ঠ্যাঙ ভেঙে দেব।

'তুই কী বললি?' জিজ্ঞেস করল বিজয়া।

'আমি বললাম, আমি তো চোর নই, কেন আমার ঠ্যাঙ ভাঙবেন? আমি সংসারের চাকর।'

'সংসারের চাকর?' শূন্যে ছোঁড়া বর্শার ফলার মত লাফিয়ে উঠল প্রশান্ত: 'তোর মাইনে কে দেয়?'

ভগলু বললে, 'এস্টেট দেয়।'

'এস্টেট দেয়! মিথ্যেবাদী। সব টাকা তুই মা'র কাছ থেকে পেয়েছিস হতচ্ছাড়া?'

'যেখান থেকে পাই আমার হিসেব মিটলেই হল।' ভগলু অবাক হবার ভাব করল।

'দশ টাকা মা'র কাছ থেকে আর পাঁচ টাকা ও ঘর থেকে পাসনি?' প্রশান্তর গর্জন।

'ও ঘর বলে অস্পষ্ট রেখে লাভ কী?' এটা বন্দনার টীকা : 'পাঁচ টাকা এম-এ-ওয়ালীর নিজের রোজগারের থেকে দেওয়া।'

'সুতরাং তুই পুরোপুরি এজমালি চাকর নস। ওঠ, বেরো ঘর থেকে—' প্রশান্ত লাথি ওঁচাল।

বন্দনাকে ঘরের বাইরে আসতে দেখে কাকলিও বেরিয়ে এল। বললে, 'টাকার মধ্যে কারু নাম লেখা থাকে না। বাড়তি পাঁচটা টাকা আমি দিয়েছি, মা দেয়নি এর মধ্যে মহাভারতটা অশুদ্ধ কোথায়? টাকাটা মা'র হাত দিয়ে এলেই সংসারের টাকা, আমার হাত দিয়ে এলে সেটা সংসারের টাকা নয় এ তারতম্য কোনো উর্বর মস্তিষ্কে ঢুকবে না সহজে।'

বন্দনা তখন অন্য পথে গেল। ভাসুর গুরুজন, সে চাকরকে শাসাচ্ছে, তার মধ্যে তুমি, ভাদ্রবউ, তুমি ফোড়ন দাও কেন? একটু হায়া নেই গা? তার উপরে গুরুজনকে বোকা বলে ঠেস মারা।

এবার সুকান্ত এল। যা কোনোদিন করেনি, দাদার পক্ষ নিল। কাকলিকে অভদ্র বলল। বলল, 'নিশ্চয়ই ও এজমালি চাকর নয়। দাদা ঠিকই বলেছে। ভগলুকে এজমালি করতে হলে তোমার উচিত ছিল ঐ পাঁচ টাকা মা'র হাতে দেওয়া। মা'র হাতে দিয়েই ওটাকে সংসারের টাকা করে তোলা। তারপরে মা দিতেন ভগলুকে, সংসারের দেওয়া হত। ভদ্রতার ধার ধারলে না তুমি। তারপর এসেছ দাদা-বউদির সঙ্গে ঝগড়া করতে—'

'কি রে, উঠলি? ছাড়লি ঘর?' ভগলুর দিকে মুখিয়ে এল প্রশান্ত।

'কী আশ্চর্য, কাজটা আগে সারতে দিন না। কাজটা শেষ না হলে ঘর ছাড়ি কী করে? কেউ ছাড়ে?'

বলা-কওয়া নেই দমাদ্দম মার শুরু করল প্রশান্ত।

এতটা আবার সহ্য হল না সুকান্তর। সে প্রশান্তকে ছাড়িয়ে নিল। বললে, 'এখন যদি চাকরটা তোমাকে মারে? আর যার দিক থেকেই হোক, ওর দিক থেকে তো কোনো ত্রুটি হয়নি, কোনো অন্যায় নয়। তবে ও মার খাবে কেন? কেনই বা এখন ও প্রতিশোধ নেবে না?'

'তার মানে তুই চাকরের সঙ্গে একজোট হয়ে আমাকে এখন মারবি, আমার উপরে প্রতিশোধ নিবি?' প্রশান্ত উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

এই নিয়েই তারপরে বিতণ্ডা।

হু-হু শ্বাসে নিচে নেমে এল প্রশান্ত আর হনহনিয়ে এগোল সদরের দিকে।

ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে উঠে হেমেন তাকে নিরস্ত করল। বললে, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'বাড়ি খুঁজতে।'

'দাঁড়া, আমিও যাব তোর সঙ্গে।' সেন্টুকে বিজয়ার জিম্মায় দিয়ে দু' মিনিটে তৈরি হয়ে নিল হেমেন : 'দেখি, আমিও খুঁজব।' ভগলুকে বললে, 'তুই থাক। যেতে পারবি নে। তোর সমস্ত মাইনে আমি দেব।'

স্বামীর পিছু-পিছু ব্যস্ত পায়ে নেমে এসেছিল বন্দনা, এখন এ কথা শুনে মনে-মনে বললে, 'তা হলে কাকিমাই তো সমস্তটা গ্রাস করবে। চাকরের টিকিটাও জুটবে না আমাদের।' কিন্তু মুখ ফুটে পারল না উচ্চারণ করতে।

ছাব্বিশ

'কদ্দূর যাবি?' বাড়ির বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল হেমেন।

প্রশান্ত আমতা-আমতা করতে লাগল : 'এই এদিক-সেদিক।'

'এদিক না সেদিক একটা ঠিক করবি তো? ডাইনে না বাঁয়ে? উত্তরে না দক্ষিণে?' বাধা দিল হেমেন : 'তুই তো আর লাট্টু নস, উত্তর-দক্ষিণ তো আর একসঙ্গে ঘুরতে পারবি নে।'

অন্যমনস্কের মত ডাইনের দিকে পা বাড়াল প্রশান্ত। হেমেন পিছু নিল। কয়েক পা গিয়েই প্রশান্ত থেমে পড়ে জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি চলেছ কোথায়?'

'কেন, কোনো অন্যায় জায়গায় যাচ্ছিস যে আমি সঙ্গে গেলে সঙ্কোচের কারণ হবে?' আচমকা হেমেনও থেমে পড়ল।

প্রশান্তর মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সত্যি কোনো অন্যায় জায়গাতেই চলেছে বোধ হয়। পায়ে নইলে কেন জোর পাচ্ছে না, গায়েই বা লাগছে না কেন স্ফূর্তির বাতাস? অপরাধীর মত ভঙ্গি করে বললে, 'গাবতলার ঐ বস্তিটার দিকে যাচ্ছি।'

'মানে ডাবতলার দিকে না গিয়ে গাবতলার দিকে যাচ্ছিস।' প্রশান্তর চোখের উপর চোখ রেখে হেমেন বললে।

'তার মানে?'

'ডাব গাবের চেয়ে বড় তো? আর উপকারীও? তার মানে, বড় ছেড়ে ছোটয় যাচ্ছিস, উঁচু ছেড়ে নিচুতে।' হেমেন আরো স্পষ্ট হল : 'কোঠাবাড়ি ছেড়ে বস্তি!'

'তার কী করা যাবে!' প্রশান্ত ঝংকার দিয়ে উঠল : 'ডাবও অনেকের সহ্য হয় না। কী উপকারী তা কে জানে। তাই লোকে হাত বাড়িয়ে প্রথমে উপাদেয়কেই গ্রহণ করে।'

'কী উপাদেয় শুনি?' কোমরে হাত রেখে প্রায় রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গি করল হেমেন।

'উপাদেয় সম্মান। উপাদেয় স্বাধীনতা।'

'সেই সম্মান আর স্বাধীনতা শুধু ঐ গাবতলার বস্তিতেই গ্যারান্টি দেওয়া? বলি ক'দিনের ক'বেলার গ্যারান্টি।' মুখোমুখি দু' পা এগিয়ে এল হেমেন : 'আইনের জোর দেখিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বেরিয়ে যাওয়াটাই স্বাধীনতা, আর সংসারটাকে টেনে নোংরা বস্তিতে নামিয়ে নিয়ে আসাই সম্মান? কেন, কেন,

ছোট নজর কেন? বস্তি আর ভাগাড় আর আঁস্তাকুড়? কেন, বাড়িটাকে বড় করতে পারিস নে? প্রাণটাকে বড় করতে পারিস নে?'

প্রশান্ত এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল।

'একজনের প্রাণ একটু বড় হলেই আর সকলের মনও একটু একটু করে বড হতে থাকে।'

'কিন্তু কি করি, আয়ই যে অল্প।' হেঁট মাথা চুলকোতে লাগল প্রশান্ত।

'সেটা লজ্জা নয়? আয় যেহেতু কম সেহেতু থাকব গিয়ে নর্দমায়, সেটা খুব বাহাদুরি। খুব বুক-ফোলানো। আর আয় বাড়াবার চেষ্টা দেখাটাই লজ্জা, লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়া—'

'আয়ের আর পথ কোথায়?' প্রায় যেন দিগন্তের দিকে তাকাল প্রশান্ত : 'কোথায় আর আয় বাড়ানো?'

'কোথায়?' প্রশান্তর হাত কঠিন মুঠোয় চেপে ধরল হেমেন। বললে, 'এই একসঙ্গে একত্রে হাত মেলানোয়। এজমালি সংসারে থেকে কত তোর আয় বেড়েছে তার হিসেব রাখিস? শুধু তোর নয়, তোর স্ত্রীর, তোর ছেলেমেয়ের। আর আয় কি শুধু টাকা? আয় মানে কি আরাম নয়? সহমর্মিতা নয়?'

'কিন্তু এজমালি সংসারে জায়গা কই?' পাশ কাটাতে চাইল প্রশান্ত।

'যত জায়গা তোমার বস্তিতে, কলকাতার ভূস্বর্গে।' হেমেন ধিক্কার দিয়ে উঠল : 'শোন, যদি তোর বুকের মধ্যে জায়গা না থাকে, রাজপ্রাসাদেও জায়গা নেই। আর যদি থাকে, তবে বড় বাড়ির ছোট ঘরই রাজপ্রাসাদ। ঘর ছোট কি নয়, এটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে যে বাড়ির সেটা ঘর সে বাড়িটা বড় কিনা।'

'কিন্তু বড় বাক্যযন্ত্রণা।' প্রশান্ত প্রায় নাক সিঁটকাল।

'আর তুই যেখানে যাচ্ছিস সেখানে নিরন্তর কাব্য ঝরে পড়ছে। আর সেই কাব্যযন্ত্রণা যে কী ভয়ানক, দু'দিন পরেই বুঝবি যখন ঝন্টু-সেন্টু গালাগাল শিখবে। কান ভরে যাবে, প্রাণ গলে যাবে। সংসারে থেকে অন্তত যে গালিগালাজটা শিখছে না—সেটাও তো তোর একটা আয়—'

'তা আর কী করা।'

'কী করা মানে?' লাফিয়ে উঠল হেমেন : 'তুই ভেবেছিস ও ছেলেমেয়ে তোর নাকি?'

প্রশ্ন শুনে প্রশান্ত তো অবাক।

'বউ তোর একার হতে পারে, কিন্তু ঝন্টু-সেন্টু তোর একার নয়। ঝন্টু-সেন্টু সংসারের। সাধ্যি কি তুই ওদেরকে সংসারের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাস? সাধ্যি কি তুই ওদেরকে নষ্ট করিস? নিজেরা তোরা দু' জনে যত খুশি বয়ে যা, কিন্তু ওদেরকে কিছুতেই বয়ে যেতে দেব না। না, দেব না। কি করবি, কী করতে পারিস তুই? থানায় যাবি? কোর্টে? তোর যেখানে খুশি সেখানে যা। আমরা ছাড়ব না ছেলেমেয়ে। তোর মনের শান্তি উকিলে-পুলিসে কুরে-কুরে খাবে।' বাড়ির দিকে পা চালাল হেমেন।

দেখল প্রশান্তও গুটিগুটি আসছে পিছু-পিছু।

বেরুনো মাত্রই বাড়ি পাওয়া যাবে এ অবশ্য আশাতীত কিন্তু প্রশান্ত যে তার দুঃখ বুঝেছে এবং তার প্রতিবিধানে যে লেগেছে কোমর বেঁধে তাইতেই বন্দনা খুশি। আশাতীত খুশি। বললে, 'তুমি একনাগাড়ে বেশি হেঁটো না, অসুস্থ হয়ে পড়হে—'

'না, আমি হাঁটব না। আমি দালাল লাগাব।'

'তাই ভালো।' আশ্বস্ত হল বন্দনা।

'আফিসে বন্ধুবান্ধব আছে তারা কোন না সাহায্য করবে—'

'নিশ্চয়ই করবে। তারাও আমাদের মত গরিব। গরিবের দুঃখ গরিবের অপমান গরিব ছাড়া কেউ বুঝবে না। আমরা গরিবেরা থাকব একসঙ্গে। একে-অন্যেরটা দেখব একে-অন্যে। একজোট হব।'

প্রশান্তর কানে কিরকম অদ্ভুত শোনাল কথাগুলো। বললে, 'তেমনটি পেতে, হয়তো একটু দেরি হবে।'

'তা হোক। তবু মন যা চায় তা পায়।' বন্দনা প্রেরণা দেবার মত করে দীপ্তকণ্ঠে বললে, 'তুমি যখন অপমানের প্রতিকার চেয়েছ তখন আসবেই প্রতিকার। ধৈর্য ধরেছি, আরো না হয় ধরব।'

'হ্যাঁ, ঝন্টু-সেন্টু বড় হোক।' অস্ফুট কণ্ঠে, প্রায় নিজের মনে-মনে প্রশান্ত বললে।

হেমেন খুঁজছে মৃণালিনীকে।

'তোমার বড় ছেলের কাণ্ড শোনো, বউদি।' হাঁক পাড়ল হেমেন।

'কি?' ভয় পেয়ে মৃণালিনী চোখ প্রায় কপালে তুলল।

'বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।'

'তা যাবে বৈকি। বাঁদরের আর কী কাজ!'

ছেলেকে মা বাঁদর বলবে এতে আর আপত্তি কী! তবু তার কাজটা কী জানতে দোষ নেই। হেমেন তাই কান বাড়াল : 'কী কাজ?'

'বাঁদরের কাজ হচ্ছে ফলা ক্ষেত তছরুপ করা। আর বউদের কাজ হচ্ছে ভরা ঘর ছারেখারে দেওয়া।'

তা হলে বাঁদরের এখানে অন্য ব্যাকরণ। হেমেন চাইল নৈর্ব্যক্তিক হতে, বললে, 'সেই তো যন্ত্রণা। বউ ছাড়া ঘর ভরে না আবার বউ ছাড়া ঘর ভাঙে না। ভরতেও বউ, ভাঙতেও বউ।'

আরো দূরে-দূরে দৃষ্টি ফেলল মৃণালিনী : 'যারা ঢেউনাচানি ঘর ভাঙানি তারা যাক বেরিয়ে, কেউ তাদের না করবে না, কানি পরে পথে-পথে কাঁদলেও না। চুনোপুঁটির ফরফরানি সার। ঘরে ঘটিবাটি নেই, কোমরে চাবিকাঠি ঝুলিয়েছে!'

'কিন্তু দোষ তো প্রশান্তর। ও ওর সংসারকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বস্তিতে, খাটালে, কাঁচা নর্দমায়। তোমার দৃষ্টান্ত চোখের উপর দেখেও শিখল না কিছু—'

'আমার দৃষ্টান্ত?' তলিয়ে বোঝবার দরকার নেই, নিজের প্রসঙ্গ উঠতেই খারাপ ভেবে নিয়ে তেরিয়া হয়ে উঠল মৃণালিনী।

'ভালো কথা বলছি—'

'আমার কথা তোমাদের কাছে আবার ভালো হল কবে?' তবু কথাটা না শুনে স্বস্তি পাচ্ছে না মৃণালিনী। মুখ ফিরিয়ি বললে, 'কিন্তু কথাটা কী শুনি?'

'তুমি কেমন সংসারকে তোলবার চেষ্টা করছ, আর ছেলেরা উলটো, তাকে নামাবার চেষ্টা করছে—' হেমেন মিটমিট করে তাকাল।

'তোলবার চেষ্টা করছি মানে?' ক্রিয়াপদের মানেটা যেন পুরোপুরি স্পষ্ট হয় নি, মৃণালিনী ভঙ্গিটা তাই নিস্তেজ করল না।

'মানে, উন্নত করবার চেষ্টা করছ। চাইছ আধুনিক করতে। জঙ্গল থেকে নিয়ে আসতে শহরে, রাজধানীতে।' কণ্ঠস্বর প্রায় গদগদ করে তুলল হেমেন : 'কার্পেট, পর্দা, ফ্যান, ফ্লুরুসেন্ট, ড্রয়িং রুম, ডাইনিং টেবল, এম-এ পাস বউ—তুমি চাচ্ছ ভোল ফেরাতে, রঙচঙে করতে—আর ছেলেরা—'

'দিচ্ছে না হতে।' মৃণালিনী বুঝল তাকে প্রশংসাই কবা হচ্ছে। তাই গর্বিত আনন্দে বললে, 'আমার সাধনার দুই কণ্টক। দুই শত্রু।'

'হ্যাঁ, দুই মূর্তিমান। প্রশান্ত আর সুকান্ত।'

'মোটেই ছেলেরা নয়। দুই মূর্তিমান মানে তুমি আর তোমার দাদা।' মুখিয়ে এল মৃণালিনী।

'আমি আর দাদা!' হেমেন প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসল।

'হ্যাঁ, দুই শত্রু। একজন অথর্ব, আরেকজন কঞ্জুস।' বললে মৃণালিনী, 'তোমরা দু' জনেই বাদ সাধছ। তোমরাই কিছু হতে দিচ্ছ না। বড় হতে দিচ্ছ না বাড়ি-ঘর, আলো জ্বালতে দিচ্ছ না সব ঘরে। মধ্যবিত্তের মধ্য ধরেই কোনোরকমে আঁকড়ে থাকতে চাইছ। মাথায় উঠে আসবার চেষ্টা নেই। ছেলেরা তো তোমাদের থেকেই শিখবে। তারা পায়ের দিকে নেমে আসতে চাইবে তার বিচিত্র কী।'

'শেষকালে আমাদের দোষ ধরলে!' যেন চড় খেয়েছে এমনিভাবে গালে হাত বুলুতে লাগল হেমেন।

'নিশ্চয়ই তোমাদের। একজন অক্ষম, আরেকজন কৃপণ।' মৃণালিনী আবার চড় ছুঁড়ল।

তাড়াতাড়ি লেজ গুটিয়ে হেমেন ফিরে এল নিজের ঘরে।

বিজয়া জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা হচ্ছিল দিদির সঙ্গে?'

'ওরে বাবাঃ, সে কথা বলি আর আবার একটা প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়ে যাক। যদি আমার দিকে হও তা হলে দিদিকে ধুনবে আর যদি দিদির দিকে হও তা হলে আমাকে ধোলাই। তার চেয়ে পালাই, স্নান করি, মাথায় জল ঢালি—' হেমেন বাথরুমের দিকে ছুটল।

কিন্তু সেদিন দুপুরবেলা এ কী শুরু হল প্রলয়কাণ্ড!

মৃণালিনী আতঙ্কিত কান্নার রোল তুলল : 'চলল, বউ বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলল, চলল একা-একা—'

ঘুমুচ্ছিল বিজয়া, চোখ খুলে কান খাড়া করে রইল।

'ওরে সকলকে ডাক, আমার লক্ষ্মীপ্রতিমা বুঝি বিসর্জনে যেতে বসেছে!'

এপাশে ওপাশে খান তিন-চার বই-পত্রিকা চেপে দুমড়ে উঠে পড়ল বিজয়া। উপরে প্রশান্তের ঘরে এসে তার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে খোলা চুলে কাতরাচ্ছে বন্দনা—কাটা পাখির মত ঝটপট করছে, যন্ত্রণা এত ভীষণ, কথা কইতে পারছে না। জ্ঞানও ঠিক আছে কি না বোঝা কঠিন।

শীত-শীত বলে ফ্যানটা চলছে না, কিন্তু মায়ের জন্যে কিছু একটা করা উচিত এই ভেবে বন্দনার শিয়রে দাঁড়িয়ে ছোট কৃশ হাতে একটা হাতপাখা নাড়ছে ঝন্টু, আর পাশে মেঝের উপর দু' হাতে মাথা ধরে একটা 'কী হল' কী হল' মুখ করে বসে আছে মৃণালিনী।

'কী খেয়েছে?' অভিজ্ঞ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বিজয়া।

'কিচ্ছু খায় নি।' কান্নায় ছুটে-পড়া মুখে ঝন্টু বললে, 'খেয়ে-দেয়ে শুয়েছিল মা। ঘুমিয়েও ছিল। তারই মধ্যে পেটে ব্যথা উঠেছে।'

'বমি করেছে?'

'তা একবার করেছে বাথরুমে গিয়ে।' বললে ঝন্টু, 'বাথরুম থেকে ফিরেই এই অবস্থা।'

'ওরে আমার কী হল', মৃণালিনী আবার ঢেউ তুলল : 'আমার সোনার প্রতিমা কালী হয়ে গেল। ওরে তোরা সব কোথায়? বাড়ি আয়—'

'চেঁচাচ্ছেন কী! থামুন।' বিজয়া ধমক দিয়ে উঠল : 'হয়তো বিষ খেয়েছে। চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে আর এখন কেলেঙ্কারি বাড়াবেন না।'

গাঢ় একটা গোঙানি বের করে মৃণালিনী হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। বিজয়ার চোখের উপর চোখ রেখে নিম্নতম স্বরে বললে, 'বিষ? তাই হবে। বিষই খেয়েছে। বড় বাড়ি বদল করবার শখ ছিল, অভিমানে মা আমার নতুন বাড়িতে চলেছে—একা একা চলেছে—'

'কাকলি কোথায়?

'তার তো এখন পৌষ মাস, সে ঘুমুচ্ছে আরামে।' মৃণালিনী বললে।

'বাড়িতে এত বড় বিপদ, আর সে ঘুমুচ্ছে?' বিজয়া ছটফট করে উঠল।

'সেই তো সমস্ত বিবাদের মূল। কালনাগিনী হয়ে সেই তো ছুবলেছে আমার মাকে।' দিব্যি বলতে পারল মৃণালিনী : 'সেই তো অশান্তির ঝড় নিয়ে এসেছে বাড়িতে। আগে যখন আমরা ছিলাম, সুকু ধরে নিয়ে আসে নি এই বনবেড়াল, সংসারে কোথাও একটা আঁচড় পড়ে নি। তারপরে কী যে হল, কে যে এল—'

পাশের খাটে শুয়ে সেন্টু ঘুমুচ্ছে, এ বেশ বোঝা যায়, দূরের ঘরে জয়ন্তী ঘুমুচ্ছে, এও বেশ ধারণায় আসে, কিন্তু তুমি, কাকলি, সমর্থ আর শিক্ষিত, তোমার কর্তব্যজ্ঞান না থাক, সাধারণ একটু দয়ামায়া নেই? বন্দনার উপর তোমার যত রাগ বা বিরাগ থাক, শত হলেও সে তো সেন্টুর মা, যে সেন্টু তোমাকে এত ভালোবাসে। বন্দনা মরে গেলে সেন্টু কাঁদবে, অন্তত এটুকু কল্পনা করেও কি তোমার একটুও দুঃখ হয় না? লেখাপড়া কি মানুষকে এমনি উদ্ধত করে, স্বার্থপর করে?

কাকলির ঘরের দিকে এগুচ্ছিল বিজয়া, ঝন্টু বললে, 'কাম্মা নিচে গেছে উনুন ধরিয়ে জল গরম করে আনতে।'

থামল বিজয়া। মুখ-চোখ গম্ভীর করে বললে, 'এ জল-গরমের কেস নয়। এ পাম্পিং-এর কেস। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পাম্প করাতে পারলে হয়তো—'

'কী সর্বনাশ হবে! মাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে! আবার সেখান থেকে না-জানি কোথায়! আবার সেখান থেকে—' আরেকটা চাপা কান্নার ভুরভুরি তুলল মৃণালিনী।

'চুপ করুন।' সময় পড়েছে, বিজয়া মনের সুখে ধমকাল মৃণালিনীকে : 'বেশি চেঁচাবেন তো পুলিস এসে পড়বে। তখন কেঁচো খুঁড়তে কোন গর্ত থেকে সাপ বেরুবে বলা যায় না।'

কিন্তু তেমন পুলিস-পুলিস বলেও তো মনে হচ্ছে না। তাই যদি হবে, তবে চরম যা খেয়েছে, তার শিশি কই? অবশিষ্ট একটু রেখে যাবে না প্রমাণস্বরূপ? একটা চিঠি লিখে রেখে যাবে না।? আর কাউকে না হোক, অন্তত স্বামীর উদ্দেশে? পুলিসের উদ্দেশে?

'হ্যাঁ রে; তোর মা কোনো চিঠি লিখে গেছে?' ঝন্টুকে জিজ্ঞেস করল বিজয়া।

'কই দেখি নি তো।'

তবু, বালিশের তলা, তক্তপোশের তলা, ঘরের আগা-পাশ-তলা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে বিজয়া। খুঁজেছে, এমনকি, বাথরুম-পায়খানা। না পেয়েছে একটা টাটকা ভাঙা শিশি, না বা ছেঁড়া একটা চিঠির টুকরো।

পুরোনো ব্যাধি বলে প্রশান্তের নিজেরই ছিল একটা হট-ওয়াটার ব্যাগ, সেটাতে গরম জল ভর্তি করে নিয়ে এল কাকলি। বন্দনার পেটের উপর রাখতে যাচ্ছে, মৃণালিনী তার হাত থেকে ছোঁ মেরে ব্যাগটা কেড়ে নিল। বললে, 'থাক, তোমাকে আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।' বলে নিজে বিছানার পাশে বসে পেটের উপরে আঁচলের ভূর রেখে ব্যাগ চেপে ধরল। বললে, 'যা জানো না, তা এসো না করতে।'

গরমের ছোঁয়া পেয়ে মুচড়ে-মুচড়ে উঠল বন্দনা।

ব্যাগটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে মৃণালিনী বললে, 'কে জানে গরম জলে উলটে অপকার হবে কিনা। যদি কিছু খেয়ে-টেয়ে থাকে—'

কথাটা গ্রাহ্য করল না কাকলি। বন্দনার পায়ে হাত দিয়ে দেখল পা এখনো ঠাণ্ডা। হাত দিয়েই বসল শুকনো মালিশ করতে।

'জয়ন্তী! জয়ন্তী!' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল মৃণালিনী।

কতক্ষণ পরে ধড়মড় করে উঠে আসতেই তার উপরে শতধা হয়ে পড়ল : 'ধাড়ি মেয়ে, এখনো তুই ঘুমুচ্ছিস কী করে? এদিকে তোর বউদি যে ঠাণ্ডা হতে চলেছে। বোস, হাত দিয়ে ঘষে বউদির পা দুটো গরম করে দে।'

কাকলি জয়ন্তীকে ছেড়ে দিল জায়গা। শিয়রের দিকে গিয়ে ঝন্টুর কাছ থেকে পাখাটা চাইল। যদিও বুঝেছে, পায়ের বা মাথার হাওয়ায় কিছু উপশম নেই, তবু রুগীর জন্যে কিছু একটা করা দরকার, তারই জন্যে মাথার দিকে এগুল কাকলি। কিন্তু বিজয়া হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিল ঝন্টুর দিকে, বললে, 'দে পাখাটা আমাকে। তুই ছেলেমানুষ, তুই কতক্ষণ হাওয়া করবি?'

আর যদিও কাকলি আগে এসে পৌঁছেছিল, ঝন্টু পাখাটা বিজয়াকেই দিল। সেও যেন বুঝেছে, কাকলিই এই বাড়িতে বিদেশী, প্রক্ষিপ্ত, তার মায়ের এই বিকৃতির মূলেও সেই।

রুগীর যন্ত্রণার এমন নিষ্ক্রিয় সাক্ষী হয়ে বসে থাকবার কোনো-মানে হয় না, তাই কাকলি বললে, 'কোথাও ডাক্তার পাই কিনা দেখব?'

'তুমি কোত্থেকে দেখবে?' মৃণালিনী ধমকে উঠল।

'এই রাস্তায় বেরিয়ে।'

'চেনা নেই, অচেনা নেই, তুমি ডাক্তারের কি বোঝো।' মৃণালিনী বললে, 'শেষকালে হিতে বিপরীত হোক। যা-ও আশা ছিল, তোমার ডাক্তার এসে ফাঁসিয়ে দিক।'

'তা ছাড়া কী হয়েছে—খেয়েছে একটা কিছু, স্পষ্ট আন্দাজ না করে ডাক্তার ডাকাও মুশকিল।' বিজয়া টিপ্পনী ছুঁড়ল : 'তেমন কিছু হলে ফ্রেণ্ডলি ডাক্তার দরকার। যে রেখে-ঢেকে, সব গুছিয়ে-বাঁচিয়ে চলতে পারবে। তুমি সর্দারি করে কোত্থেকে এক উড়ো ডাক্তার ধরে নিয়ে এলে, সে এক হুলস্থুল বাধিয়ে নিয়ে গেল হাসপাতাল, থানায় খবর দিলে—সে এক মহাকেলেঙ্কারি!'

'না, না, বাড়ির কর্তারা আগে আসুক।' বললে মৃণালিনী।

'তাঁদের আসাটা যাতে দ্রুত করা যায়, অন্তত তার চেষ্টা করি।' অস্থির মিনতি নিয়ে তাকাল কাকলি : 'দাদার আফিসের ফোন নম্বর জানেন?'

'যা না আফিস, তার ফোন নম্বর!' বন্দনা তখন ব্যথায় মুহ্যমান, তাই অনায়াসে বলতে পারল বিজয়া।

'কাকার আফিসে নিশ্চয়ই আছে—' কাকলি বিজয়াকে উদ্দেশ করল।

'আছে মানে? একেবারে তার নিজের টেবলের উপর আছে।'

'দিন না নম্বরটা।'

'আমার এ প্রান্তে কি ফোন আছে যে, তার নম্বরটা মনে রাখব?'

'বেশ, তাঁর আফিসটার নাম বলুন, আর যদি শুনে থাকেন, তবে ঠিকানাটা।'

ঠেকে-ঠেকে ভাঙা-ভাঙা ঝাপসা কী কতগুলো বললে বিজয়া। তাই সই। দেখি, ধরতে পারি কিনা। একটা নিপতিত মানুষের যন্ত্রণার লাঘব ত্বরান্বিত করতে পারি কিনা।

নেমে যাচ্ছিল, মৃণালিনী বললে, 'বার-লাইব্রেরিতেও তো ফোন করতে পারো। সেই বরং সোজা।'

'না, না, বাবাকে ব্যস্ত করতে চাই না।'

'তার আবার ব্যস্ত! লাইব্রেরিতে বসে এখন তাস পিটছে নয়তো পাশা চালছে। আমি বলি কি, যদি জানাতে হয়, উনি যখন বাড়ির কর্তা, তখন ওঁকেই সর্বপ্রথম জানানো উচিত।'

আবার এই নিয়ে মানসম্মান! তালিকায় অনুক্রম।

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল কাকলি। কোথায়, কোন বাড়িতে টেলিফোন, কোন বাড়িতে বা এই দুপুরে তার পক্ষে ঢোকা সহজ হবে, শালীন হবে, ভাবতে-ভাবতে, দেখতে-দেখতে এগুতে লাগল। একটা রিকশা ডেকে নিল। সটান বড় রাস্তায় এসে একটা ওষুধের দোকানে এসে ঢুকল। ফোন করতে পারি? পয়সা লাগবে। তা জানি। তা দিচ্ছি। কত?

বিজয়ার ভুল কেটে-কেটে তিন-তিনবার ডায়ালিং করে হেমেনকে ধরতে পেল কাকলি।

'হ্যালো। কে?'

'আমি ছোট বউমা। কাকলি।'

'কী ব্যাপার?' হেমেন তো বিমূঢ়।

'দিদি, বন্দনা, হঠাৎ পেটে একটা তীব্র ব্যথা হয়ে প্রায় কোল্যাপস করেছে। আপনারা শিগগির বাড়ি আসুন। দাদার আফিসে খবর দিন। যদি সম্ভব হয় একজন ভালো ডাক্তার নিয়ে আসবেন। দেরি করাটা ঠিক হবে না বোধ হয়।'

'যাচ্ছি। এখুনি।' আর কথা বাড়াল না হেমেন। উঠে পড়ল।

ব্যথার তাড়সে আর্তনাদ করে উঠল বন্দনা। ফ্যালফ্যাল করে তাকাল চারদিকে। জানলার বাইরে রোদের দিকে, আকাশের দিকে। আগাগোড়া বিরাট এক অর্থহীনতার দিকে।

তাকে জাগতে দেখে হতাশ হল বিজয়া।

মুখের কাছে মুখ এনে অস্ফুট অন্তরঙ্গতায় বললে, 'কিছু খেয়েছিলে?'

শূন্য, অসার চোখে তাকিয়ে রইল বন্দনা।

'বলি, কিছু বিষ-টিষ?' আরো একান্ত হল বিজয়া।

'আছে? আছে তোমাদের কাছে? থাকলে তাই একটু দাও না। আর পাচ্ছি না সহ্য করতে।' বন্দনা কাতরাতে লাগল।

বিদ্যুৎগতিতে চলে এল হেমেন। চলে এল ট্যাক্সিতে। সঙ্গে প্রশান্ত। উন্নতদর্শন এক ডাক্তার।

একটু দেখে কি না দেখে ডাক্তার বললে, 'এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অ্যাম্বুলেন্সে খবর পাঠান।'

হাসপাতাল শুনেই মৃণালিনী ঘাবড়ে গেল। পাংশুমুখে প্রশান্তকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলে, 'কি, পুলিস-টুলিস আসবে নাকি?'

'কী যে মাথামুণ্ডু বলো তার ঠিক নেই।' প্রশান্ত খিঁচিয়ে উঠল : 'একটা লোকের অসুখ করেছে, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করাতে হবে, এখানে পুলিস আসবে কী ভাবে?'

'না, আসতে পারত, যদি আপনারা ডাক্তার ডাকতে বা রুগীকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে আরো দেরি করতেন।' প্রসন্নমুখে বললে ডাক্তার, 'তখন সেটা ক্রিমিন্যাল হয়ে পড়ত। ঠিক-ঠিক সময়ে ব্যবস্থা হচ্ছে বলে খুব আশা হচ্ছে বেঁচে যাবে রুগী।'

'এর সমস্ত ক্রেডিট আমাদের ছোট বউমার।' সপ্রশংস মুখে বললে হেমেন, 'উনি ঠিক সময়ে আমাকে ফোন করেছিলেন বলেই সব হল। নইলে, উঃ, আরো দেরি হলে কী সর্বনাশ যে হত, ভাবা যায় না। কই গো ছোট বউমা?'

বাড়ি ফিরেই জাগন্ত সেন্টুকে দু' হাতে জাপটে ধরেছে কাকলি। মা কোথায় যাচ্ছে ও কেন, বোঝাচ্ছে হালকা করে। তোমার ভাবনা কী, তুমি আমার কাছে, কাম্মার কাছে থাকবে। আমরা মাকে দেখতে যাব। তারপর মা ভালো হয়ে, সুন্দর হয়ে, মোটাসোটা হয়ে বাড়ি ফিরবে। যেই ডাকবে সেন্টু, টু শোনবার আগেই কাম্মার কোল ফেলে পড়ি-মরি মায়ের কোলের দিকে ছুট দেবে।

হেমেনের ডাকে ডাক্তারের কাছে এসে দাঁড়াল কাকলি। বললে, 'ওপেন না করলেই নয়?'

'নয়। আর যদি বা তা যায়,' ডাক্তার বললে, 'তা, যা শুনলাম, আপনার উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে।'

অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। মোটা হাতে ডাক্তারকে টাকা দিল হেমেন। হ্যাঁ, ক্যাবিন চাই। আর নার্স চব্বিশ ঘন্টা। দিনে-রাত্রে ফালতু অ্যাটেণ্ডেন্ট। যত দিন লাগে। যত টাকার দরকার। সেন্টুর মাকে ভালো করে আনতে হবে। সেন্টুকে যেন কাঁদতে না হয়।

বন্দনার চুলে হাত বুলিয়ে প্রশান্ত বললে, 'কোথায় আমি যাব, না, তুমি চললে! স্যাকরার ঠুকঠুক কামারের এক ঘা। কে জানে হয়তো আমার অসুখই চলে গেছে, তুমি টেনে নিয়েছ তোমার মধ্যে। আর তুমি যখন ভালো হবে তখন আমরা দু' জনেই ভালো হব।'

'আর তখনই নতুন উদ্যমে ছুটব বাড়ি দেখতে।' হেমেন টিটকারি দিয়ে উঠল : 'দেখ না কেমন সুন্দর বাড়ি বদল! বস্তির চেয়ে অনেক সুন্দর হাসপাতালের ক্যাবিন।'

দুর্বল হাত বাড়িয়ে বিজয়ার হাত ধরল বন্দনা। আজকে, এই মুহূর্তে, বিজয়াকেই তার সবচেয়ে আপনার মনে হচ্ছে। কান্নাগলা সুরে বললে, 'আমি আর বাঁচব না।'

'আহা, সে কী কথা! আমারো তো পেট কেটেছে, আর দেখছ, এখনো কেমন বেঁচে আছি, দুর্দাম বেঁচে আছি। আর জানো তো,' কানের কাছে মুখ নামাল বিজয়া : 'সেইজন্যেই কিছু হল না, এল না পেটে।'

শুনতে পেয়েছে হেমেন। সুর করে বলে উঠল, 'এ পেট সে পেট নয়।'

ভূপেন বন্দনার মাথায় হাত রেখে নীরবে জপ করল। ছেড়ে দিল অ্যাম্বুলেন্স।

অনেক রাত করে বাড়ি ফিরল সুকান্ত। বললে, 'শুনলাম তুমি নাকি আজ খুব এফিসিয়েন্সির পরিচয় দিয়েছ?'

'যে যা সে তো তাই পরিচয় দেবে।' প্রথম থেকেই বাঁকা ধরল কাকলি। বাঁকা ধরবে না তো কী। কী এমন কাণ্ডটা কাকলি করেছে যে অমন চিপটেন ঝাড়ো?

'কাকিমার ভুল সত্ত্বেও ঠিক আফিসটা বের করলে গাইড থেকে। দোকানে দাঁড়িয়ে ফোন করলে। এক্সটেনসন জানো না, তাও খুঁজে নিলে। আর খুঁজে নিতে পারলে বলেই একটা প্রাণ বেঁচে গেল।' মুখে-চোখে আভা ফোটাবার চেষ্টা করল সুকান্ত : 'তবে বলো, তোমাকে এফিসিয়েন্ট বলব না? শুধু আমার বেলাতেই তুমি কি না—'

'না। তোমার বেলাতেও এফিসিয়েন্সি দেখাব।' বললে কাকলি।

'দেখাবে? কী ভাবে?'

'তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে।'

'আমার মনোবাঞ্ছা?'

'আর তোমার মা'র। তোমার সংসারের।'

'কী করবে?'

'একটা চাকরি নেব।'

'নেবে? পাবে? সত্যি?' যেন শতকণ্ঠে ইউরেকা করে উঠল সুকান্ত।

'সত্যি। কিন্তু একটা কথা শোনো—' কাকলি তাকাল মাটির দিকে।

'বলো।'

'আমি ক'দিন চাকরির বাজারে ঘুরে দেখছি—'

'ঘুরছ নাকি?'

'না ঘুরলে মিলবে কোথায়?' এবার চোখ তুলল কাকলি : 'এ কি ইউনিভার্সিটির লিফ্‌ট যে যেটা এসে পড়বে হুমড়ি খেয়ে সেইটাকেই তুলে নিতে হবে? মাঝে মাঝে তাই ঘুরছি দুপুরবেলা।'

'কী দেখছ?'

'দেখছি চাকরির বাজারে বিবাহিত স্ত্রীর চান্স খুব কম, অবিবাহিত কুমারীর চান্সই বেশি সুতরাং—'

'সুতরাং?'

'আমি দরখাস্তের ফর্মে নিজের নাম, কুমারী নাম, কাকলি মিত্র লিখেছি। 'ডটার অফ' লিখেছি, 'ওয়াইফ অফ' লিখি নি।'

'বেশ করেছ।' শতকণ্ঠে সায় দিল সুকান্ত।

'নাম কাকলি বসু, ওয়াইফ অফ সুকান্ত বসু লিখতে গেলেই ভরাডুবি হত।'

'হত!' মুখ-চোখ অসহায় করল সুকান্ত।

'নিশ্চয়ই। ওয়াইফ অফ তো চাকরি করে কেন? স্বামী থাকতে কেন এই ঝকমারি? স্বামীটা কি তা হলে গাধা, না গরিব?' কাকলি প্রায় ঝাঁজিয়ে উঠল : 'বাপ গরিব এ ইঙ্গিত না হয় সহ্য হয়, কিন্তু স্বামী গরিব এ ইঙ্গিত সহ্য হয় না।'

'তা খুব ভালো করেছ।'

'কুমারী-কুমারী গন্ধ থাকলে অফিস-বসেরা চঞ্চল হয়।' হাসল কাকলি, 'আর স্ত্রী-স্ত্রী গন্ধ থাকলে নিচু হয়ে ফাইল দেখে। সুতরাং—'

'সুতরাং—'

'আমার যদি ইন্টারভিউর চিঠি আসে আমি কিন্তু কুমারী সাজব।'

'খুব সুন্দর হবে।' দৃষ্টি মদির করল সুকান্ত : 'তারপর আমার সঙ্গে যখন তোমার ইন্টারভিউ হবে তখনো তুমি কুমারী। সেই দেখেছিলাম তোমাদের বাড়ির ছাদে, মাথা কপাল শূন্য, হাত দু'খানি খালি, সারা গায়ে আভরণহীনতার আভা—'

'সিলি! সাধ্য কি তুমি আর চাকুরে কুমারীর কাছে এগোও।' প্রায় ধিক্কারের মত করে বললে কাকলি, 'তার কেরিয়র নষ্ট করো। তার স্বাস্থ্য, শান্তি ও অব্যাহতিতে হাত দাও। যাও, হটো, সরে দাঁড়াও শত হস্ত।'

সাতাশ

এ কী এক নতুন যন্ত্রণার মধ্যে এসে পড়ল কাকলি। এমনটি সে চায় নি, দুপুরের রোদে এমনি টই-টই করে ঘোরা পথে-পথে, আফিসে আফিসে। পাঁকের মধ্যে থেকে গায়ে পাঁক না লাগানো। ভিড়ের মধ্যে থেকে গা-বাঁচানো সরে-সরে। যন্ত্রণা কি শুধু ঐটুকু? শুধু রোদ আর ভিড় আর ক্লান্তি? শুধু খিদে-তেষ্টা? যন্ত্রণা আবার মনোভঙ্গ। যন্ত্রণা আবার এক ঝুড়ি মিথ্যে কথার পসরা নিয়ে ফিরি করা।

তবু তুমি শিক্ষিত, তুমি উপযুক্ত, তোমাকে কি আলস্য করা শোভা পায়? নাকি সেই শোভাটাই সভ্যতা? লোকে কি এম-এ পাস করে ঘুমুবার জন্যে? সন্নেসী হয় ভালো খাবে-দাবে বলে? যুদ্ধে যায়

খবরের কাগজ পড়তে? সমাজ তোমাকে এতদিন যা দিয়েছে, উপযুক্ত হয়ে এখন তার কিছু অংশ ফিরিয়ে দাও। তোমাকে শিক্ষিত করেছে, অন্তত তুমি এখন ক'জনকে শিক্ষিত করো। বেশ, মাস্টারি না পোষায়, অন্য কোনো কাজ নাও। কাজ যত শাঁসালো ততই তো ভালো সমাজের। মোটা আয় করে মোটা ইনকাম ট্যাক্স দাও। সমাজের খরচের টাকা তুমি কুড়োও ঘুরে-ঘুরে।

প্রথম-প্রথম, যে-যে আফিসে চেনাশোনা মেয়ে আছে, তাদের গোয়ালেই ঢুঁ মারতে লাগল কাকলি। যে শেয়ালের ল্যাজ কাটা গিয়েছে সেই শেয়ালের মনের কথা, ও-ও নিষ্পুচ্ছ হোক। যার নষ্ট বলে নাম হয়েছে তার প্রার্থনা হয় ওরও গায়ে একটু কাদার ছিটে লাগুক। পিছলে পড়েই লোকে কর্দমাক্ত হয় না, পাশ দিয়ে চলা অন্যের গাড়ির চাকায় ছিটোনো আকস্মিক কাদাও নিরীহ পথিকের গায়ে লাগে।

'তা বেরিয়েছিস বেশ করেছিস।' বললে চিত্রা।

'এখনো বেরুলাম কোথায়?' মুখ টিপে হাসল কাকলি।

'তার মানেই তাই। ঘুর-ঘুর করতে শিখেছিস যখন, তখন বেরুনোর আর দেরি নেই।'

'যেন ফুরফুর করতে শিখলেই ওড়া যায়!' আবার হাসল কাকলি।

'পসিবিলিটি হয়।' চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল চিত্রা : 'যে ফ্রক পরেছে যতই কেননা সে দেরি করুক, একদিন শাড়ি তাকে ধরতেই হবে। তাই যখন একবার দরখাস্ত লিখতে শুরু করেছিস, তখন দাসখৎ লিখে দিতে পারবিই। একটা কিছু না কোন জুটে যাবে শেষ পর্যন্ত!'

কাজ কি এতই সোজা? পথ কি এতই ঘাসে-ফুলে মনোরম?

হতাশায় নিশ্বাস ফেলল কাকলি। বললে, 'তুলো শুনতে নরম, কিন্তু ধুনতে কঠিন।'

শকুন্তলা বললে, 'দিব্যি বিয়ে করে গেরস্থ বনেছিলি, তোকে আবার এই ঘোরা-রোগ ধরল কেন? ভুল শুনিস নি আশা করি। ঘোড়া-রোগ নয়, ঘোরা রোগ।'

'আহা, স্বামী যদি দুর্বল হয়, কম-রোজগেরে হয়, তা হলে স্ত্রী কি তাকে সাপ্লিমেন্ট করবে না?' পাশের চেয়ার থেকে বলে উঠল মীনাক্ষী।

কিরকম অস্বস্তি করে উঠল কাকলির। ঠিক সুকান্তর জন্যে নয়, স্বামী—এই কথাটার জন্যে। দ্রুতকণ্ঠে বললে, 'না, না, তার জন্যে নয়। স্বামী যদি প্রবলও হয়, তবু সক্ষম স্ত্রী কেন নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকবে? টাকা কি কখনো কারু বেশি হয়? আরামের কি সন্তোষ আছে?'

টিফিন-টাইমে আফিস-পাড়ায় ক্যান্টিনে না কাফেটেরিয়ায় মিলেছে মেয়েরা, মেয়ে-কেরানিরা। সকলে এক গাছের নাই বা হল, পাশাপাশি গাছের থেকেই নেমে এসেছে মাঠে। শালিক-চড়ুই, যাতে যার খুশি, একত্র হয়ে বসেছে কোণে-অ-কোণে। কাফেটেরিয়ায় না হয় তো অলি-গলির রেস্তরাঁয়। পর্দার ঘেরাটোপে।

'আচ্ছা, আমাদের কি আর কোরানি বলা উচিত?' জিজ্ঞেস করল শকুন্তলা।

'কে বলেছে? সরকারি পরিভাষায় আমরা এখন করণিকা।' মীনাক্ষী বললে।

'মালবিকা-মদনিকার ছোট বোন।' চিত্রা টিটকিরি দিয়ে উঠল।

কাকলি বললে, 'কেরানি তো পুরুষ। তাই ওর স্ত্রীলিঙ্গে হওয়া উচিত কে-রাজা। মেয়ে-কেরানিটা শুনতে বিশেষ সম্ভ্রান্ত নয়।'

'অনেকটা শী-গোট শী-ক্যাট-এর মত।' শকুন্তলা ফোড়ন দিল।

'কে-রাজাটাই সব দিক থেকে শুদ্ধ।' মীনাক্ষী বললে, 'আমরা যারা কুমারীরা আফিসে চাকরি করছি, আসলে কে-রাজা কে-রাজাই করছি।'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

'তুই হাসছিস কেন?' শকুন্তলা ঠেলা মারল কাকলিকে : 'তোর রাজা তো জুটেই গিয়েছে।'

'কিন্তু রাজা-জোটানোর আহ্লাদটা সিঁথিতে-কপালে অমন ডগডগে করে রাখলে চাকরি জুটবে না।' চিত্রা মুখ-চোখ ভার-ভার করল : 'বিবাহিত মেয়ের আবার চাকরি কী। তার স্বামীই তো চাকরি।'

'বাঃ, তাই বলে তার জীবনে আর প্রসপেক্ট থাকবে না? কাকলি প্রতিবাদ করতে চাইল।

'কিন্তু তাকে চাকরি দিয়ে বস্-এর প্রসপেক্ট কী?' পেয়ালায় মুখ লুকিয়ে হাসল মীনাক্ষী।

'তবে যদি ত্যাগ-করা স্ত্রী সাজতে পারিস, ডিসকার্ডেড ওয়াইফ, তা হলে কিছুটা আশা আছে।' শকুন্তলা ভাষ্য জুড়ল।

'আর ত্যাগ-করা স্ত্রীরও কুমারী-কুমারী চেহারা।' মীনাক্ষী তাকাল কাকলির দিকে : 'কিন্তু তুই যেমন পরিপাটি দেখতে, নতুন ফোটা ফুলের মত, কিছুতেই তোকে পরিত্যক্ত বলে বিশ্বাস করতে চাইবে না। তাই সোজাসুজি কুমারী সাজাই ভালো।'

'তোর ভাবনা কী।' বললে শকুন্তলা, 'দিন তো সাদাই থাকে, সকাল-সন্ধেটাই লাল হয়; তুই তোর সকালের সিঁদুর স্নানের সময় তুলে ফেলবি। সাদা থেকে চাকরি করে যাবি সারা দিন। আবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে গিয়ে সিঁদুর পরবি টকটকে করে। কিন্তু গোড়াগুড়ি এমন লাল হয়েই যদি আসতে চাস দেখবি চাকরির বাজারে চারদিকে লালবাতি জ্বলছে।'

'সত্যি, তোর ভাবনা কী!' চিত্রা বললে, 'চাকরিতে বাহাল হবার পর, সুবিধে বুঝে বলবি বিয়ে হয়েছে। কে তোকে ঠেকায়, নিশান তুলবি সিঁথিতে। বিয়ে হবার জন্যে প্রসিডিং হতে পারবে না—আইন নেই।'

'ইয়ে হবার জন্যেও নয়।' জুড়ল মীনাক্ষী।

'তবে কুমারী সাজবার একটা ঝামেলা।' চিত্রা বললে।

'কী?' কাকলির প্রশ্ন।

'কতগুলি উৎসাহী নির্লজ্জ পিছু নেয়, ফলো করে। সেদিন কী হয়েছিল জানিস না বুঝি?' রাগবে না হাসবে ঠিক করতে পারছে না চিত্রা : 'আফিস থেকে বেরিয়েছি, কেত্থেকে একটা ছেলে—হ্যাঁ, লোক নয়, ছেলে—পিছু নিয়েছে।'

'তোর নিজের আফিসের কেউ?' আনাড়ির মত জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'নিজের আফিসের লোকের অতটা সাহস হবে না। যদি হেড-অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলে দিই। শত হলেও চক্ষুলজ্জা তো আছে। এ নিশ্চয়ই কোনো এক প্রতিবেশী আফিসের রত্ন। যেখানেই যাই, যে পথেই এগুই, পিছনে ঠিক সেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা। বুঝলাম আমার সিঁথিটা সাদা দেখেই বেচারা এমন লেগেছে আদাজল খেয়ে। তখন কী করলাম জানিস? একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাগের থেকে লিপস্টিকটা বের করলাম। ব্যাগের আয়নায় মুখ দেখে লিপস্টিকটা ঠোঁটে না বুলিয়ে ঘষলাম সিঁথিতে—আগুন করে তুললাম। পরে নিজেই একটু চেষ্টা করে ঘেঁষলাম ওর দিকে, স্পষ্ট হলাম। ও বুঝল, আমি বিবাহিত, আমার সিঁথিতে সিঁদুর—অমনি চম্পট দিল।' বিজয়িনীর মত হাসতে লাগল চিত্রা : 'লোকে স্টিক দিয়ে তাড়ায়, আমি লিপস্টিক দিয়ে তাড়ালাম।'

হাসির ঝড় উঠল। কাকলি বললে, 'কিন্তু সাজ-সজ্জাটা তো পরের কথা। প্রথম কথা হচ্ছে ভেকেন্সি।'

'তুই এখনো অনেক পিছিয়ে আছিস।' শকুন্তলা চোখ নাচাল : 'সব সময়েই ভেকেন্সি ঘটে না, কখনো-কখনো ভেকেন্সির সৃষ্টি হয়।'

'মানে বায়ুকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করতে পারলে—'

'চিত্রাকে থামিয়ে ভাষ্য জুড়ে দিল মীনাক্ষী : 'বায়ুকে মানে বায়ু-দেবতাকে।'

'হ্যাঁ, যথেষ্ট উত্তপ্ত করতে পারলে,' কথাটা শেষ করল চিত্রা : 'মাঝে মাঝে অন্তরীক্ষে শূন্যতা জন্মায়। বিজ্ঞানে ভ্যাকাম বলে, চাকরিতে বলে ভেকেন্সি। আর জানিস তো, নেচার অ্যাবহরস্ এ ভ্যাকাম।'

'এখানে নেচার মানে বস্, দি পার্সন ইন অথিরিটি।' টিপ্পনীতে শকুন্তলাও ওস্তাদ।

'সোজা কথা, তার চোখে যদি একটা ভেকেন্ট স্টেয়ার আনতে পারিস, কখনো-সখনো তা হলেও ভেকেন্সি।' হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল চিত্রা।

'তা হলে বলতে চাস দরখাস্ত করা লাগবে না, ফর্ম ফিল-আপ করা?' কাকলি করুণ মুখে বললে।

'লাগবে। লেফাফা রাখতে হবে।' পুঁচকে রুমালে ঠোঁট মুছল শকুন্তলা। তারপর জ্ঞানীর মত মুখ করে বললে, 'কিন্তু লেফাফাটাই মায়া।'

'প্রপঞ্চ।' ভাষ্য জুড়ল মীনাক্ষী।

'তোরা কি অমনি লেফাফা ফাঁপিয়েই চাকরি জুটিয়েছিস নাকি?' কাকলির প্রশ্নে হঠাৎ ঝাঁজ এসে গেল।

'আমরা তো সদর দিয়ে ঢুকেছি, কত কাঠখড় কুড়িয়ে-পুড়িয়ে, লম্বা কিউতে দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ সাধনাকে অঙ্গীকার করে। আর আমাদের কী সব মাইনে।' বললে চিত্রা, 'কী বা গুণপনা। শকুন্তলাটাই যা আমাদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট। আর আমরা, বাকিরা, সংসারের ঠেলায় কবে থেকেই কলেজ-ছাড়া। তুই বিদ্যার মগডালের পাকা ফল, শুধু স্বাদে সুন্দর নয়, রঙে-গন্ধেও সুন্দর। তুই আমাদের মত ঝুড়িতে করে চালান হবি কেন, তুই টুপ করে খসে পড়বি কোলের উপর—'

সকলে হাসতে হাসতে উঠে পড়ল।

'মোট কথা, তুই যখন দ্রুত সিদ্ধির জন্যে ব্যস্ত, তখন তুই সদর দিয়ে ঢুকতে যাবি কেন,' আরো ব্যক্ত হল মীনাক্ষী, 'তুই ঢুকবি খিড়কি দিয়ে। তোর সেই ধারও আছে, জেল্লাও আছে।'

'আর আমরা সব মসী আর ভুষি।' সর্বহারার মত মুখ করল শকুন্তলা।

তবু, ওরা যাই বলুক, প্রথম প্রথম ওদের মানতে চায়নি কাকলি। শরীরে-সাজে করে নি কোনো ঝাড়া-পোঁছা। কপালটা চুনকাম করলেও সিঁথিতে দিতে পারেনি পোঁচড়া। দু' পাশে চুল ঝুলিয়ে রাখলেও সিঁথির রক্তিমাটা লক্ষণীয়।

'সেন্টু আমার ঘরে ঘুমুচ্ছে। ওদিকে একটু নজর রাখবেন।' মৃণালিনীর ঘরের দরজার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল কাকলি : 'আমি একটু বেরুচ্ছি।'

কখনো-সখনো যা বেরোয়, শাশুড়িকে বলে যায় কবে? শাশুড়ির মনঃপূত হবে না বলেই বুঝি বলে না। আজ ঘটা করে জানাবার দরকার কী! শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল, মুখের থেকে কাগজ সরিয়ে নিয়ে চশমার দু' ভাগ কাঁচের এক ভাগের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে তাকাল মৃণালিনী। কিরকম যেন নতুন-নতুন লাগল কাকলিকে, ঝরঝরে সাজগোজ, হাতের ব্যাগটাও যেন নতুন।

'কোথায় বেরুচ্ছ?'

'চাকরির খোঁজে।'

'বাঃ ভালো কথা।' শোয়া ছেড়ে উঠি-উঠি করে উঠল মৃণালিনী।

'মানে এই একটু আফিস-পাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে।' প্রথম কথাটা বোধ হয় একটু রাগ-রাগ শুনিয়েছিল, এবার একটু নরম করল কাকলি। বললে, 'কিন্তু ঘোরাঘুরি করলেই কি আর জোটে?' একটু বুঝি বা হাসল ঠোঁটের কোণে।

'ঘোরাঘুরি করলেই জোটে।' মৃণালিনী জোর দিয়ে বললে, 'শুয়ে বসে ঘুমিয়ে থাকলে জোটে না। তুমি যাও। আমি দেখব সেন্টুকে।'

সিঁড়ির দিকে কাকলি এগিয়ে যেতেই নিজের মনে বলে উঠল মৃণালিনী : 'অযোগ্য হলে বরং কথা ছিল। যে যোগ্য তার চেষ্টার অসাধ্য কী! জুটুক, না-জুটুক, তবু চেষ্টা করাটা, ঘোরাঘুরি করাটা ভালো। নইলে উচ্চশিক্ষিত মেয়ে দুপুরবেলায় পড়ে পড়ে ঘুমুবে, নাক ডাকাবে, এ অসহ্য। শোনো।' কাকলির উদ্দেশে মৃণালিনী নিচে কণ্ঠস্বর পাঠাল : 'বিজয়াকে বলে যাও। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, ও যেন সেন্টুকে নিয়ে যায় নামিয়ে।'

সংবাদটা বহন করবার দরকার নেই, শুনতে পেয়েছে বিজয়া।

তবু পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল কাকলি। ডাকল : 'কাকিমা।'

কোনটা পড়ে বা না পড়ে মেঝেয় বসে বই বাছছিল বিজয়া। বললে, 'শুনেছি। বেরুচ্ছ বুঝি? চাকরির খোঁজে?'

'হ্যাঁ, খুঁজতে আর দোষ কী।'

'না, দোষ কী! লোকে ভগবানও খোঁজে—'

'আপনি সদরটা বন্ধ করে দিন। চাকররা কেউ নেই।' সদর খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল কাকলি।

বন্দনার অপারেশন হয়েছে হাসপাতালে। এখনো ছাড়া পায় নি। বাড়িতে থাকলে এখন এ নিয়ে দু' জনে একটু গুজগুজ করতে পারত, একটু বা গা-টেপাটেপি। এখন অন্যরকম দল পাকানো হত। শাশুড়ি আর ছোট বউ এক দিকে, বিজয়া আর বন্দনা আরেক দিকে। আহা, ভালো বউটা কত কষ্ট পেল খামোকা। কিছু দোষ করে নি, সাদামাঠা ঠাণ্ডা বউটা, অথচ তার কত শাস্তি। মরেই যাবে ভয় পেয়েছিল, কী আকুল কান্না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে! ব্যাধির চেয়েও বড় যন্ত্রণা, আর বুঝি চোখ মেলবে না পৃথিবীতে। অপারেশনে ভালো হল, তারপরেও কত টানাহেঁচড়া। উপসর্গগুলির উপশম হল, কথা বলতে না দিক, কিন্তু কত দিন ছেলেমেয়ে দুটোকে চোখের দেখা পর্যন্ত দেখতে দিল না। সে আবার আরেক কষ্ট। যে নিরীহ নম্র সে কষ্ট পায়, আর যে উদ্ধত অহংকারী সে ট্যাঙস্-ট্যাঙস করে ঘোরে।

শুধু তাই! আগে জানতাম, কেউ বেরুলে বউই দরজা দেয়; এখন বউ বেরুলে শাশুড়িকে উঠে দরজা দিতে হবে।

দিন কতক ঘুরল কাকলি। সমক্ষ সংস্পর্শই কার্যকর, তাই স্লিপ পাঠিয়ে সুইং-ডোর ঠেলে-ঠেলে আফিসের কর্ণধারদের সঙ্গে দেখা করল। যে দেখে, সত্যিই বলেছে, প্রথমে মাথার দিকে দেখে, আর যেন একটা সাপের জিভ দেখেছে, এমনিভাবে মুষড়ে যায়। কেউ-কেউ বা একটু-আধটু আশার কথা বলে, ইশারা-হদিসের পথ বাতলায়, কোন ডিপার্টমেন্টে কখন কী হতে পারে ফর্ম-টর্ম সই করিয়ে নেয়। কেউ-কেউ বা নিশ্ছিদ্র বধির হয়ে থাকে। আর কেউ-কেউ বা অনেক মিথ্যে কথায় অভ্যস্ত, মসৃণ মধুর কণ্ঠস্বরে বলে, আরেক দিন আসবেন। দেখি কী করতে পারি।

কেউ উদ্যোগে উত্তপ্ত হয় না।

সেদিন টিফিন-টাইমে ক্যান্টিনে ধরল শকুন্তলাকে।

বললে, 'কিছু সুবিধে হচ্ছে না ভাই।'

'ঐ মেক-আপে হবে না। সিঁথিটা সাদা করতে হবে। মফস্বল শহরের লাল সুরকির রাস্তা নয়, একেবারে গাঁয়ের হালট।' শকুন্তলা হাসল : 'সব জানবি ঘরপোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়।'

কাকলি চিন্তিত মুখে প্লেট থেকে তুলে-তুলে বাদাম খেতে লাগল।

'কেন, তোর স্বামী কি কনজারভেটিভ? বেশ তো, তাকে বলবি, সন্ধে থেকে যখন তোমার রাজত্বের শুরু তখন ফের সতী সাজব—'

প্লেট থেকে একটা বাদাম তুলে শকুন্তলার দিকে ছুঁড়ে মারল কাকলি। বললে, 'আমার স্বামী খুব উদার।'

'তা হলে আর ভাবনা কী। শাশুড়ি?'

'না। ঐ আসুরীও আমার দিকে।'

'তবে তো কেল্লা ফতে!' উল্লসিত হয়ে উঠল শকুন্তলা।

'কেল্লার দেখা নেই তুই একেবারে নিশান নিয়ে দাঁড়ালি।' কাকলি ক্লান্ত সুরে বললে, 'প্রতিমা একমেটে করা দূরের কথা কোথাও স্থূল মাটি পেলাম না। বিশেষ কোনো একটা আফিসে বিশেষ কোনো একটা লোকের সন্ধান হল না আজও। তুই আমাকে দে না একটা লিস্ট।'

'দেব, দিচ্ছি।' ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ আর কলম তুলে নিল শকুন্তলা : 'কিন্তু তার আগে তোকে আরেকটা কথা বলি। দুপুরের দিকে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে পান চিবিয়ে-চিবিয়ে খোঁজাখুঁজি করলে হবে না।'

'ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে মানে?'

'ঐ আর কি—আলস্যের ঢেউ তুলে। খুব একটা ত্রস্ত-ব্যস্ত ভাব থাকা চাই। প্রাণ যায়-যায় ভাব। তুই যদি এখন অফিসারদের লাঞ্চ-টাইমে আসিস, তারা স্বভাবতই বুঝবে, তাড়া নেই। আর যেখানে তাড়া নেই, সেখানে সাড়া কোথায়?'

'তুই তা হলে কী করতে বলিস?'

'একেবারে ফার্স্ট-আওয়ারে আসবি। খুনচাপা পাগলের মত আসবি।' কাগজের টুকরোয় নাম লিখতে লাগল শকুন্তলা।

ভয় পেলেও মৃদু-মৃদু হাসল কাকলি। ওরও হাতে ঘড়ি আছে, তাকাল তার দিকে। বললে, 'ভরা আফিস-টাইমে আসতে বলিস?'

'নিশ্চয়ই। পড়ি-মরি ভাব না করলে হবে না। এমন জরুরি যে ভরাকোটাল পার হয়ে এসেছি সাঁতরে। পরিপাটি পোশাকে ছিমছাম থাকলে চলবে না। একটা ছন্নছাড়া ছন্নছাড়া ভাব রাখতে হবে। হন্যে হলেই মিলবে ঠিক মাংসের টুকরো।' ফর্দটা শকুন্তলা পৌঁছে দিল কাকলিকে : 'দ্যাখ চেষ্টা করে, হলেও হতে পারে। না হোক, অভিজ্ঞতা তো হবে।'

তবু ঠিক তুঙ্গ আফিস-টাইমে বেরুতে পারে না কাকলি। পুরুষদের, অন্তত ভূপেন হেমেনের হয়ে যাবার পরেই বাথরুম নেয়। খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে রাখতে পারে বটে, কিন্তু ভোর থেকেই শূন্য সীমন্তে থাকাটা প্রশস্ত মনে হয় না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছি এমনি একটা ভাব আনা যায় না তা হলে। আধ ঘন্টা পরেই না হয় বেরুবে। আধ ঘন্টায় ভরাকোটাল মরাকোটাল হয়ে যাবে না।

'মা, আমি এখন থেকে একটু সকাল-সকাল বেরুব।' মৃণালিনীকে বললে কাকলি।

'বেশ তো, ভালো কথা। রান্নাঘরে বসে তা হলে খেয়ে নাও।' আদর ঢেলে কথা কইল মৃণালিনী। তারপর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল : 'কিচ্ছু সুবিধে-টুবিধে হল?'

একেবারে বিরক্ত বা হতাশের মত মুখ করল না কাকলি। বললে, 'হবে হয়তো।'

'হয়তো কেন, নিশ্চয়ই হবে। লেগে থেকে এতগুলি পাস করতে পেরেছ, আর লেগে থেকে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারবে না?' আশীর্বাদে ঝরে পড়ল মৃণালিনী।

ছন্নছাড়া চেহারা করতে হলেও অবহিত হয়ে অনেক ছন্দ-বন্ধ মানতে হয়। ত্রস্ত-ব্যস্ত দেখাতে হলেও দরকার অনেক মন্থরতার, সতর্কতার।

পরনে আটপৌরে শাড়ি, গায়ে হাতে-কাচা সাধারণ ব্লাউজ, পায়ে রঙচটা স্যাণ্ডেল, হাতে-গলায় গয়নার ছিটেফোঁটা নেই, সিঁথিটা একটা দীর্ঘ হাহাকারের মত সাদা, কাকলি বেরুবার মুখে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সামনে বাধার মত সুকান্ত এসে দাঁড়িয়েছে।

'সরো।' গম্ভীর স্বরে বললে কাকলি।

'চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু সত্যি। অনাঘ্রাতার মত।' লোলুপ শিশুর মত প্রায় ধরি-ধরি করে উঠল সুকান্ত।

ক্ষিপ্র পায়ে পিছু হটল কাকলি। বললে, 'যেতে দাও।'

'তারপর ফিরে এসে যখন রঙ চড়াবে, তখন চলে যাবে এই শুচিতা। রক্তিম হওয়াই বুঝি কলুষিত হওয়া।' সুকান্ত চোরের মত হাত বাড়াল।

'আমি এখন কাজে বেরুচ্ছি।' প্রায় একটা বেত তুলল কাকলি : 'এগারোটার সময় আমার আজ এক জায়গায় দেখা করবার কথা।'

সংবৃত হল সুকান্ত। টেবিলের কাছে সরে গিয়ে বললে, 'দাঁড়াও। তোমাকে ক'টা টাকা দিই।'

'কী বললে?' যেন শুনতে পায় নি, উদ্যত পদক্ষেপ স্থগিত করল কাকলি।

'ক'টা টাকা—'

'খবরদার।' কাকলি স্পষ্ট ধমকে উঠল : 'ও কথা মুখেও এনো না।'

'বেশ; মুখে নাই আনলাম। হাতখানি বাড়িয়ে দাও, গুঁজে দিই।'

'তোমার টাকা আমি ছুঁই না।'

'নাই বা ছুঁলে। ব্যাগটা দাও, ফেলে দিই ভিতরে।' সহানুভূতির সুরে সুকান্ত বললে, 'কতদিন ধরে হাঁটাহাঁটি করছ, কত না জানি খরচ হচ্ছে রোজ-রোজ। জানিও না, জানতে দিচ্ছও না। নিশ্চয়ই তোমার টাকার টানাটানি হচ্ছে। হওয়াই সম্ভব। বাইরে ঘোরাঘুরি করলে খিদে পায়, এক-আধটু টিফিনই বা খাচ্ছ কিনা তা কে জানে। এই যে এগারোটায় দেখা করবার কথা, একটা ট্যাক্সি করে যেতে পারলে কত ভালো হয়। দৈবক্রমে যদি পাও-ও, তবু হয়তো, কে জানে, নেবার মত তোমার সংগতি নেই। না, রাগ কোরো না, নাও নাও ক'টা টাকা—'

'কত?' মাথা তুলে তবু একবার জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'সামান্যই। সম্প্রতি কুড়িটা টাকা দিচ্ছি। তোমার এক্সক্লুসিভ হাত-খরচ—' বলে সুকান্ত এক-মুহূর্ত অসতর্ক কাকলির শিথিল হাতের মধ্যে দু'খানি নোট গুঁজে দিল।

'তুমি এর চেয়ে বেশি আর কী দেবে।' কাকলি নোট দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝের উপর : 'তোমার আর মুরোদ কত? শত হলেও তুমি তো একটা ছাত্র বৈ কিছু নও। যে টাকাটা পাচ্ছ সেটা কোনো স্থায়ী চাকরির বেতন নয়, ছাত্র হিসেবে একটা সাময়িক বৃত্তি। তাই তোমাকে স্পর্ধা না দেখালেও চলবে। কিছুকাল অপেক্ষা করো আমি এর চেয়ে ঢের বেশি আনতে পারব আশা করি। তখন হাত পেতো, দিয়ে দেব দশ-বিশ।' ঘরের দরজা কখন আলগা হয়ে গিয়েছিল, তরতর করে চলে গেল কাকলি।

এমনিই তো চেয়েছিল সুকান্ত। উপযুক্ত স্ত্রী রোজগার করবে আর তাকে দেবে-থোবে, সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু এ যেন সেই চাওয়ার চেহারা নয়। কেমন যেন খালি-খালি লাগল ঘরদোর।

না, তবু যে করে হোক, ও নিজের পায়ে দাঁড়াক। শিক্ষিত হবার মান রাখুক। স্বতন্ত্র হবার স্থান খুঁজে পাক জীবনে।

সুকান্তর সঙ্গে চটাচটি কিছু হয় নি বোঝাবার জন্যে প্রসন্ন স্বরে সেন্টুকে কাছে ডাকল কাকলি। বললে, 'আমি এখন কাজে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে। তুমি আজ তোমার বিজুর কাছে ঘুমিয়ো।'

'আমি আজ আর ঘুমুব না।' ভারিক্কি গলায় সেন্টু বললে।

'কেন?'

'বাঃ, জানো না বুঝি? হাসপাতাল থেকে আজ আমার মা আসবে। বাবা আফিস ছুটি হবার আগেই নিয়ে আসবে মাকে। কী মজা!' সেন্টু নাচতে লাগল।

'কী মজা!' নাচুনে পায়ে বেরিয়ে গেল কাকলি।

বন্দনা বাড়ি ফিরলেও বিছানায় শোয়া। আর তার তদারকি করতে বিজয়া উঠে এসেছে উপরে। এতদিন গুমোট হয়ে ছিল, এবার কথার চালাচালিতে হাওয়া খেলবে।

'বাবুদের সঙ্গেই বসেছেন শ্রীমতী।' বন্দনার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললে বিজয়া।

'বসেছেন—কী করতে?'

'খেতে। ভাত খেতে।'

'এক লাইনে?'

'না। বাবুরা তাদের খাবার জায়গায়, আর উনি রান্নাঘরে।'

'আফিসের ভাত খাচ্ছে কেন? চাকরি পেয়েছে?' পেটের যন্ত্রণা গেছে, বুকের যন্ত্রণা নিয়ে জিজ্ঞেস করল বন্দনা।

'না গো।' হেসে কুটপাট বিজয়া : 'একটা চাকরির ইনটারভিউর চিঠি এসেছে। আজ বেলা সাড়ে দশটায় দেখা করতে হবে। ইনটারভিউর চিঠিতেই এই—কর্ত্রী নিজের হাতে মাছ ভেজে খাওয়াচ্ছেন—সত্যিকার চাকরির চিঠি এলে না জানি কী করবেন!'

'সত্যিকার চাকরির চিঠি এলে ব্যাঙ ভেজে খাওয়াবেন।' এখন আর হাসতে-কাশতে বারণ নেই, হাসল-কাশল বন্দনা।

'যা বলেছ। ব্যাঙ ভেজে খাওয়াবেন।' সায় দিল বিজয়া।
'এবং খাওয়াবেন ছেলেকে।'
এবার দু' জনের সম্মিলিত হাসি।
কিন্তু সেদিন আফিস-টাইমে প্রত্যক্ষ সংসারে সকলের সামনেই সুকান্তে-কাকলিতে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল।
'না, কক্ষনো না।' গলা তুলে স্পষ্ট বললে কাকলি, 'আমি কিছুতেই নেব না এ চাকরি।'
'নেবে না—এ তোমার ক্ষুদ্র মনের প্রেজুডিস।' বললে সুকান্ত, 'হীনতম অন্যায়।'
'তুমি যেটা বলবে সেইটেই ঠিক হবে? আর আমি যেটা অনুভব করব সেটা ঠিক হবে না?' কাকলির চোখে আগুন জ্বলল।
'অনুভব!' ব্যঙ্গ করে উঠল সুকান্ত।
'হ্যাঁ, এখানে আমার অনুভবই প্রধান হবে। তোমার বিচার নয়।' কাকলিও ব্যঙ্গ করতে জানে আর সে ব্যঙ্গের ধারও কম নয় : 'আর তোমার বিচার তো শুধু টাকার বিচার। তোমার কাছে যে কোনো দামেই হোক, টাকাই শেষ কথা।'
'কার কাছে নয়? কিন্তু তাই বলে একজনকে তুমি অকারণে মন্দ বলতে পারো না।'
'চরম ভালো-মন্দ কে বিচার করে? কিন্তু আমার পছন্দ নয় এইটেই আসল কথা। আর যাই হোক, মন্দ-মন্দ গন্ধ লোকটাতে।'
'আর তুমি একেবারে স্বর্গের কুসুম।'
'নিশ্চয়ই, এক শো বার। সে কুসুমে তুমি একটা কীট ঢুকেছ, আর কীট আমদানি কোরো না।'
ব্যাপার কী, মৃণালিনী চাইল মাথা গলাতে।
একটা চাকরি পেয়েছে কাকলি, কেরানির চাকরি। দেড় শো টাকা মাইনে, সব মিলিয়ে প্রায় দু' শোর কাছাকাছি। কিন্তু কাকলি বলছে সে চাকরি নেবে না, যেহেতু তার মতে চাকরি যে দিচ্ছে, যার অধীনে ও কাজ করবে, মানে যে বস, তার চাউনিটা ভালো নয়।
'চাউনিটা ভালো নয়!' চাউনি প্রায় কপালে তুলল মৃণালিনী : 'সে আবার কী কথা?'
'যার মনের মধ্যে পাপ সেই চাউনি খারাপ দেখে।' সুকান্ত বললে।
'যার মনের মধ্যে শুধু টাকা সে সমস্ত পাপকেও বুঝি প্রশ্রয় দেয়।' পালটা বললে কাকলি।
'চাউনি খারাপ, কিন্তু লোকটা করেছে কী।' মৃণালিনীর চাউনি তখনো প্রকৃতিস্থ হয় নি।
'কিছু করে নি।' বললে সুকান্ত, 'শুধু বলেছে, দুপুরবেলা আমার সঙ্গে খাবেন চলুন হোটেলে। আর আফিসের পর যখন বাড়ি ফিরবেন, আমার গাড়িতে আসবেন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেব—'
'আহা এতে আবার অন্যায় কী!' নাবালিকা খুকির সারল্যে উথলে উঠল মৃণালিনী।
'তা তুমি একবার খেয়ে দেখ, চড়ে দেখ, আর কতদূর যায়, কী করে। তা নয়, শুধু শুধু একটা ভঙ্গিতে একটা চাউনিতে, একটা শুধু মৌখিক নিমন্ত্রণেই তুমি খড়্গ তুলবে?'
'তুলব।' কাকলি দৃঢ় স্বরে বললে, 'যেখানে আমি সম্মান পাব না, স্বাচ্ছন্দ্য পাব না, প্রতি পদে নিজেকে আমার অপদস্থ বলে বোধ হবে, সে চাকরি আমি করব না, করতে পারব না কিছুতেই।'
'যে নাচতে নেমেছে তার আর ঘোমটা দেওয়া কেন?' সুকান্ত গর্জে উঠল।
'ঘোমটাই সে ফেলতে পারে, কিন্তু তার বেশি আর কোনো আবরণ নয়।' কাকলি দৃঢ়তর হল : 'তা ছাড়া এ আমার ব্যাপার, আমার চাকরি। আমার খুশি হত নিতাম, খুশি হয় নি নেব না। এর উপরে আর কথা কী।'
'না, আছে কথা—' কী বলতে যাচ্ছিল মৃণালিনী, ওপার থেকে ভূপেন তাকে ডাকতে লাগল চেঁচিয়ে : 'ওগো শুনছ, কোথায় তুমি, কোথায় গেলে?'
মৃণালিনী ছুটে এল। 'কী, তোমার আবার কী হল?'
'কিছু হয় নি। আমি বলছি কী, ওরা স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করছে, তুমি তার মধ্যে নাক ঢোকাচ্ছ কেন?

ওরা ঝগড়া করছে ওরাই আবার মিটিয়ে নেবে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি ঢুকলেই গোলমাল, আরো গোলমাল—শোনো—'

শোনবার পাত্রী নয় মৃণালিনী। তাই স্বামীর উপদেশে কর্ণপাত না করে আবার গেল অকুস্থলে। কাকলির উপরে সব ক'টা দাঁতে মুখিয়ে উঠল : 'তুমি সুকুর আর কত ক্ষতি করবে শুনি?'

'ক্ষতি!' কাকলি থমকে দাঁড়াল।

'তোমার বাবা বিয়ের যৌতুক বাবদ দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল সুকুকে, তুমি তা কায়দা করে ফিরিয়ে দিলে বাবাকে, স্বামীকে বঞ্চিত করলে। এখন আবার এই দেড় শো দু' শো টাকার চাকরিটা ফিরিয়ে দিচ্ছ! যাতে সুকুর একটু সুরাহা হয়, সুবিধে হয়—তুমি চাও না কিছুতেই। এ তুমি কেমনধারা স্ত্রী জিজ্ঞেস করি?'

প্রথমটা স্তম্ভিতের মত হয়ে গেল কাকলি। সেই দশ হাজার টাকার গল্পটা এখানেও ফলাও করে বলা হয়েছে! টীকা জুড়েছে নিজের ইচ্ছেমত। ছোটলোক কোথাকার!

'হ্যাঁ দেব, সব ফিরিয়ে দেব। কিছু রাখব না। শোধ করে দেব সমস্ত।' টেবিলের উপর থেকে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে দ্রুত, দীপ্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল কাকলি।

আটাশ

কাগজের টুকরোতে প্রথমে নাম লিখল : কাকলি মিত্র। পরে ভাবল, চিনতে তো পারবেই, তবে আর ছলনা কেন? মিত্র কেটে বসু করল। না, ছলনা কোথায়? কুমারী নামে চাকরি করতে নেমেছে এ তো ঘরে-বাইরে সকলের জানা। এ পর্যন্ত যত দরখাস্ত ছেড়েছে সব ঐ কুমারী নামে। যে চাকরিটা পেয়েও ছেড়ে দিয়ে এসেছে তাদের খাতায়ও ঐ নাম। এখান থেকেও যদি কিছু সুবিধে নিতে হয় মিত্র হয়েই নিতে হবে। তাই আবার বসু কেটে মিত্র করল।

কিরকম কাটাকুটি হয়ে গেল কাগজটা। নতুন আরেকটা স্লিপ নিয়ে পরিষ্কার অক্ষরে লিখল : কাকলি মিত্র।

পরিচ্ছন্ন দেখানোটাই সুন্দর, সুস্থ।

দারোয়ান দিয়ে স্লিপ পাঠাল ভিতরে।

স্লিপ দেখে বরেন প্রথমটা স্তব্ধ হয়ে গেল। মহিলা-মহিলা শোনাচ্ছে। তবে, যেমন অদৃষ্ট, ঘরে ঢোকালে হয়তো দেখবে মধ্যপদলোপী পুরুষ—নাম আসলে কাকলিকূজন বা কাকলিভূষণ মিত্র। ডাঁট দেখাবার জন্য নামে ছাঁটকাট করে এসেছে।

তবু একবার অনুচ্চে জিজ্ঞেস করলে দারোয়ানকে, 'কে!'

'একজন ভদ্রমহিলা।'

নিজের মনে নিজেই অবাক হল বরেন। এ আবার কে কবে শুনেছে।

শুনতেই বা দোষ কী! বরেন কি কোনো অর্থেই আরাধনীয় নয়, তার কি বয়স নেই বা সামর্থ্য নেই? সে কি কুরূপ বা বিকলাঙ্গ? তার কি নির্ধনের অবস্থা, না কি নিষ্প্রতাপের? না কি সে কারু উপকারেই আসতে পারে না?

না, তবু অহংকার করা ভালো নয়। ধীর-স্থির থাকা ভালো। নম্র হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকা ভালো। উদ্বেগে-উদ্যোগে থেকো না। যা আপনা থেকে আসে আসতে দাও।

দারোয়ানকে বললে, 'ডাকো।'

জলে-টলটল চোখে হাসি-হাসি মুখ নিয়ে ঘরে ঢুকল কাকলি। কোনো কিছু না বলে দুটি সুধীর হাতে নমস্কার করলে।

কী আশ্চর্য! আমি কি নাম-ধাম গোত্র-পদবী মুখস্থ করে রেখেছি? আমি ভাবলাম, কে না কে। কোথাকার কে অজানা-অচেনা!

'কী আশ্চর্য! আপনি?' চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল বরেন : 'আপনি কোত্থেকে?'

বলেই বুঝল এ একেবারে অবান্তর প্রশ্ন। কিছুটা উৎসাহ টের পাওয়া যাচ্ছে। এটা ঠিক নয়। যেখান থেকেই আসুক, কিছু আসে যায় না। এসেছে যে, এটাই বড় কথা। একমাত্র কথা।

নিজেকে সহসা গুটিয়ে নিল বরেন। বললে, 'বসুন।'

কাকলি বসল।

বরেন দাঁড়িয়েই থাকল। বললে, 'আপনার নামটা আমার মনে ছিল না—'

'বিচ্ছিরি নাম। মনে থাকবার কথা নয়। কাক দিয়ে আরম্ভ—'

কিন্তু কলি দিয়ে শেষ—কথাটা পিঠ-পিঠ তখুনি মনে এল না বরেনের। পরে এল—তখন অনুতাপের একশেষ। এই প্রথম নয়, আরো অনেকবার হয়েছে। লাগসই কথা ছিল, জানা ছিল, কিন্তু তর্কের তপ্ত মুহূর্তে মনে পড়ে নি, তাই পারে নি বলতে। সুযোগ ফসকে গিয়েছে।

কিন্তু কথাই সব নয়। স্তব্ধতাও কিছু।

দাঁড়িয়ে থেকেই দরজার দিকে গলা বাড়াল বরেন। বললে, 'সঙ্গে আর কেউ আছে? না, একা?'

এ আবার কী প্রশ্ন! একা না দোকা দেখতেই তো পাচ্ছ চোখের উপর। যা এখনো দেখা যাচ্ছে না বা যা নেপথ্যে আছে, তার জন্যে চাঞ্চল্য কেন?

'একা।' গম্ভীর হয়ে কাকলি বললে।

সত্যি, কিরকম অদ্ভুত তাকে দেখাচ্ছে! বাঁ হাতে সেই ঘড়িটা ছাড়া আর কোনো তার অলংকরণ নেই। কপাল তো শূন্যই, সিঁথিটাও সাদা। রক্তিম আতঙ্কের ক্ষীণ একটু আভাসও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সেদিন, যতদূর বরেন মনে করতে পারছে, মাথায় গোল খোঁপা ছিল, আর আজ পিঠে লম্বা বেণী। সেদিনের তুলনায় আজকের শাড়িটা অনেক বেশি এলোমেলো। চলাবলা অনেক বেশি স্বাধীন।

কী ব্যাপার? বুক ঠেলে প্রশ্ন এল বরেনের : 'সুকান্ত কেমন আছে?'

আহা, কী প্রাণ জুড়োনো প্রশ্ন! সুকান্ত তোমার কত বড় বন্ধু, তার মঙ্গল সংবাদ না পেলে তোমার ঘুম আসে না, রুচি হয় না আহারে! সে বেঁচে থাকলে তোমার কত লাভ, মরে গেলে তোমারই যত ক্ষতি! এখন উত্তরটা শোনো কান পেতে। উনি ভালো আছেন। আমরা দু' জনই খুব ভালো আছি। শোনো।

'জানি না।' চোখ নামাল কাকলি।

হ্যাঁ, তেমন কিছু শোকাবহ নয়। শোকাবহ হলে প্রথমে ঢুকেই হাসত না। রসিকতা করবার ভাব করত না। দেখাবার জন্যে হলেও চোখে জল আনত। আপনি তার কত বড় বন্ধু ছিলেন—এমনিধারা বলত দু' চারটে স্তবস্তুতির কথা।

'তবে?' কৌতূহলের তবু কি শেষ আছে বরেনের?

'আমি কুমারী সেজেছি।' অগাধ শান্তিতে কাকলি হাসল।

বাস, আর প্রশ্ন কোরো না। নিজেকে শাসন করল বরেন, কেন কুমারী সেজেছে চেয়ো না জানতে। শুধু দেখ। দেখে যাও।

আমি অসম্পৃক্ত হয়ে গেছি। ছিঁড়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি অতীতকে। দুর্বহকে। তার মানেই সুকান্তকে।

এ তো আশার কথা। তৃপ্তির কথা।

এতে তোমার আবার আশা কী! তৃপ্তি কিসের!

পৃথিবীর সমস্ত কুমারীই আমার আশা—বরেন মনকে প্রবোধ দিল। কথাটা অন্য দিক থেকেও মোলায়েম। কুমারী হয়েছি মানেই সুকান্তর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে, বিচ্ছেদ না হলেও সংঘর্ষ হয়েছে। অর্থাৎ গোড়ায় যে মূল্য সুকান্তকে দিয়েছিল সে মূল্য থেকে সে নেমে এসেছে। তার মানেই সুকান্ত খেলো হয়ে গিয়েছে, চড় খেয়েছে গালের উপর। মনের কথা বাইরের লোক আর কী করে জানবে, কিন্তু এক স্পর্ধিত বন্ধুর, প্রতিযোগী বন্ধুর হার হয়েছে জীবনে এ নিশ্চয়ই একটা উপভোগের জিনিস। তৃপ্তি তো শুধু লুকোনো জিভে মনের বিষকে মধুর মত চেটে-চেটে খাওয়া।

তবু চোখে-কানে কৌতূহল জাগিয়ে রাখে বরেন। কুমারী সেজেছে মানে স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহছেদের মামলা রুজু করেছে? না কি আপোসে ছাড়াছাড়ি? একত্র বসবাস নেই আর তা হলে? এখন তা হলে কোথায় আছে? ঠিকানা?

পাগল! যে সভ্য যে ভদ্র সে উত্তেজিত হয় না। সে তো শিল্পীও। মনের ভাব সজ্ঞানে লুকিয়ে রেখে মুখে অজ্ঞান প্রশান্তি আনে। বিষয়ের বাইরে যায় না, সর্বাবস্থায় সায় দেয়, সহানুভূতি জানায়। যে মার খেয়েছে তাকেও, যে মেরেছে তাকেও। হস্তক্ষেপ করা দূরের কথা, প্রতিবাদও করে না। বরং সাহায্য করে। চোরকেও করে, গৃহস্থকেও করে। এখন চোরে-গৃহস্থে বোঝো গে। আমাকে কেউ দোষী করতে পারবে না।

তবু আরো কিছু শুনবে, নিজেরই অগোচরে ভঙ্গিটা ঈষৎ উৎসুক করে রইল বরেন।

কাকলি নিজেই বললে। অস্বস্তির মেঘটা উড়িয়ে দিলে : 'কুমারী সেজেছি মানে চাকরি করতে বেরিয়েছি—'

'বাঃ, ভালো কথা। কোথায় চাকরি করছেন?'

'চাকরি পাই নি এখনো।' চোখ-মুখ লজ্জিত করল কাকলি : 'খুঁজতে বেরিয়েছি।'

'বাঃ, ভালো কথা। টেবিলের উপর সিগারেটের দিকে হাত বাড়াল বরেন। সমস্ত লুব্ধ কৌতূহলের মত প্রসারিত হাতও সংযত করল।

'যাই হোক, নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা সব সময়েই ভালো।'

'এক শো বার। আনন্দের তো বটেই, সম্মানের। তার উপর আপনি যখন কৃতী—'

'কৃতী!' কাকলি লজ্জার ভাব করল আবার।

'যে কৃতী তার মুক্তি নেই। সংসার তাকে ছুটি দেবে না, খাটিয়ে মারবে। বললে, নইলে তোমাকে কৃতী করলুম কেন?' আবার সিগারেটের দিকে হাত বাড়াল, আবার হাত গুটোল বরেন : 'তাই আফিসে-আদালতেও দেখি বেশির ভাগ কেরানিই ফাঁকি দেয়, পালায়, কিন্তু দু' একজন কৃতী লোক থেকে যায় কোণে-কানাচে। নাকের ডগায় চশমা রেখে ভুরু পাকিয়ে যারা কাজ করে। যেহেতু তুমি কৃতী হয়েছ সমস্ত বাড়তি কাজ তুমি একা সারো, আর সকলের গাফিলতির জরিমানা দাও।' বরেন হেসে উঠল।

তাতে কাকলিরও শব্দ করে হেসে ওঠবার সুবিধে হল। বললে, 'চাকরির বাজারে বেরিয়ে দেখলাম কুমারীর সাজসজ্জাটাই ভালো কাটে।'

'তাই বুঝি?' যেন কিছুই জানে না এমনি আনাড়ি-আনাড়ি মুখ করল বরেন।

'কেন, আপনারও তাই মনে হয় না?'

'না, না, নিশ্চয়। কুমারী অনেক ক্লীন, অনেক আশাপ্রদ। দেখছেন না কুমারীকেই লোকে পুজো করে, সধবা-বিধবাকে করে না।' এবার হো-হো করে হাসতে পারল বরেন : 'যতদিন কুমারী আছেন ততদিনই ভবিষ্যৎ আছে, প্রমোশন আছে।'

'বলেন কী! যারা ওল্ড মেড, বুড়ো বয়স পর্যন্তও যাদের বিয়ে হয় নি তাদেরও ভবিষ্যৎ আছে?'

'তারা আর কুমারী কোথায়! তারা মহামারী।'

দু' জন এবার যুক্ত হয়ে হাসতে পারল।

কিন্তু হাসির মধ্যেই চট করে বরেনের মনে পড়ে গেল, খুব হাসির ব্যাপার হয়তো নয়। আসলে এই কুমারীর সাজগোজটা ইচ্ছাকৃত ছদ্মবেশ। সুকান্তরই কারসাজি। তাই এটা পণ্ডের ইশারা নয়, ভণ্ডের নমুনা। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কোনো-কোনো স্বামী স্ত্রীকে বিধবা সাজায়, সুকান্ত কুমারী সাজিয়েছে।

আহা সাজুক। সাজতে দাও। ভেক যে ধরেছে তার গায়ে ভস্ম একটু লাগবেই। আর তুমি বরেন, তুমি ছাইভস্ম ছাড়া আর কী। সুতরাং ধৈর্য হারাবার কিছু নেই। শোনো। দেখ। কথার পিঠে মেপেজুকে কথা বলো।

আর যে সাহায্য চায়, যদি চায়, সাহায্য করো।

'কুমারী সেজে ঘুরে কোথাও পারলেন সুরাহা করতে?' বরেন জিজ্ঞেস করল।

'এক জায়গায় পেরেছিলাম। দুনীচাঁদ-গুলজারিলাল ফার্মে পেয়েছিলাম চাকরি। বেশ ভালো চাকরি। স্টার্টিং দেড় শো—'

'করলেন না?'

'না, ম্যানেজারটা স্থূল, অভদ্র। চাউনিটা ভালো নয়, কেমন মাংস-মাংস গন্ধ—'

কে ম্যানেজার, কী করেছে, কী বলেছে, কিছুই জানতে চাইল না বরেন। চুপ করে রইল। জানে চুপ করে থাকলে বাকি কথাটুকু কাকলিই বলবে নিজের থেকে। উত্তরটা সম্পূর্ণ না হলে কখনো-কখনো সেটা শ্রোতার চেয়ে বক্তাকেই বেশি বিরক্ত করে।

'জয়েন করার দিনই বলে কিনা চলুন আমার সঙ্গে লাঞ্চে', কোথায় একটা ভয়ের ভাব করবে মুখে-চোখে, না মুচকে হাসছে কাকলি : 'আর বলে কিনা, ছুটির পর ট্রাম-বাসের দিকে যাবেন না, আমি তো ওদিকেই থাকি, আমার গাড়িতেই আপনাকে পৌঁছে দিতে পারব।' হঠাৎ মুখ-চোখ গম্ভীর করল · 'দেখুন দেখি কী কদাকার!'

'ক্যাড। ভালগার।' মুখে তাই বললে বরেন কিন্তু অন্তরে বললে, শিল্পী। কিন্তু তুই যে ওকে খেতে ডাকছিস ওর খিদে পেয়েছে কিনা খবর না করেই। আগে ওর একটা খিদে-খিদে ভাব করে তোল, তারপরে খেতে ডাক। আগে থেকেই তুই ওকে লিফ্‌ট দিতে চাচ্ছিস কোন সাহসে? গাড়ি কি তোর একারই আছে, না তোর গাড়িই শুধু ওদিকে যায়? তুই গায়ে পড়ে বলতে যাস কেন? ওকে দিয়ে বলা, স্যার, আপনার গাড়িতে একটা লিফ্‌ট দেবেন, আপনি তো ওদিকেই যাচ্ছেন। যাতে বলে, তেমনি একটা অবস্থা সৃষ্টি কর। যদি তাও না পারিস, ধৈর্য ধরে বসে থাক। কখন একটা মিছিল বের হয় ও অঞ্চলে। শুরু হয় হামলা-হামলি। ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যায়।

'বলুন ঠিক করি নি?' চোখ তুলল কাকলি।

'এক শো বার ঠিক।'

'তাই, এখন আপনার কাছে এসেছি—' আঙুল দিয়ে টেবিলের প্রান্তে রেখা টানতে লাগল কাকলি।

হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ—আপনার জন্যে কী করতে পারি, এরকম জোলো বিরস প্রশ্ন করতে মন চাইল না। সিগারেটের জন্যে আবার হাত বাড়াল, আবার নিরস্ত করল হাত। সাদামাঠা গদ্যের গলাতেই বরেন বললে, 'বলুন, কী করব?'

'আমাকে একটা চাকরি করে দেবেন।'

'এখানে?' এটা বরেনের কী সুর, আনন্দের না বিস্ময়ের, অবিশ্বাসের না অসম্ভবের, যেন নিজেই সে বুঝতে পারল না।

আবার গা বুঝি ছমছম করে উঠল কাকলির। পাশ কাটাবার জন্যে বললে, 'আপনাদের এখানে লেডি-এমপ্লয়ির কি স্কোপ আছে? এখানে নাই বা হল। অন্য কোনো সম্ভ্রান্ত আফিসে। আপনি আছেন, আপনার বাবা আছেন—আপনারা চেষ্টা করলে—'

'আর আমার মেসোমশাইও আছেন। তাঁকে জানেন না বোধ হয়। তিনি বাটারওয়ার্থের ম্যানেজার।'

'বিদেশী ফার্ম হলে তো আরো ভালো। যোগ্য মাইনে যা দেয় তাই নেব, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু পরিবেশটা ভালো হওয়া দরকার।' ভালো কাকে বলে চোখের নির্মল আলোতে তাই বোঝাতে চাইল কাকলি।

'নিশ্চয়।' সায় দিতে এতটুকু দেরি হল না বরেনের।

'ক'টা সার্টিফিকেট আছে আমার কাছে।' ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকাল কাকলি : 'গুটি কয় প্রোফেসরের দেওয়া আর এম-এর ডিপ্লোমাটা—'

'লাগবে না কিছু। আপনি যে চাকরি চাচ্ছেন এইটেই যথেষ্ট সার্টিফিকেট।' সিগারেটের দিকে হাত বাড়াই-বাড়াই করেও বাড়াল না বরেন। বললে, 'বলব মেসোমশাইকে। বাটারওয়ার্থ মস্ত আফিস।'

চোখের কালো ফোঁটা দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল কাকলির। বললে, 'একটা দরখাস্ত রেখে যাব?'

'কোনো দরকার নেই।'

'তা হলে ফলাফল জানব কী করে?'

'এর আবার ফলাফল কী! চাকরি চেয়েছেন, পাবেন। আপনার বাড়িতে চিঠি যাবে।'

'না, না, চিঠি নয়, বাড়িতে নয়।' আপত্তিতে প্রখর হয়ে উঠল কাকলি : 'আমি এখান থেকে আপনার কাছ থেকে খবর নেব। বলুন কবে আসব, কত দিন পরে—'

অনেক নিশ্চিন্ত হল বরেন। সুকান্তের ভাবনাটা অনবরতই বিঁধছিল পাঁজরে, এখন অনেক খোলসা হল। তোর বউকে তো আমি এখানে, আমার আফিসেই চাকরি দিচ্ছি না যে তোকে জানাতে হবে। বা, কী ব্যাপার, কেন চাকরি করতে আসে, তোর সত্যি মত আছে কিনা জানতে হবে তোর থেকে। আমার কী মাথাব্যথা! আমার কাছে চাকরির ব্যাপারে সাহায্য চাইতে এসেছে আমি সদ্ভাবে একটা রেফারেন্স দিয়ে দিয়েছি। যদি সেখানে না হয়, আরো না হয় দেব অন্যত্র। যদি কোনোখানে হয়, হয়ে যায়, তবে যারা চাকরি দেবে তারা, আর যে চাকরি করবে সে, মানে তোর বউ, এ দু' পক্ষ বুঝবে। এর মধ্যে আমি কোথাও আসি না, আমার কিছু জানবারও নেই, জানাবারও নেই। আমি শুধু একটা পোস্টাফিস। যদি আমার এখানে চাকরি দিতাম, তোকে না জানিয়ে, তা হলে বলতে পারতিস বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তা যখন নয় তখন আর কথা নেই।

তা ছাড়া ভাবনারও কিছু নেই হয়তো। বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দিতে যখন বারণ করছে তখন সুকান্তের সঙ্গে নিশ্চয়ই ঘোর অবনিবনা হয়েছে। তা যদি হযে থাকে তার আমি কী করব! আমি কেন মৌচাকে ঢিল ছুঁড়ি? কাকলি যদি নিজের থেকেই আসে আমি তাকে কী করে আটকাই? যে আটকাবার সে কী করছে?

তবু আরো একটু গভীরে পরীক্ষা করতে চাইল বরেন। দেখতে চাইল অবনিবনাটা কত দূর গিয়েছে। পরিষ্কার মুখে দিব্যি এক ভাঁওতা মারলে। বললে, 'বাটারওয়ার্থ শুনেছি তার লেডি-এমপ্লয়িদের জন্যে থাকবার বাড়ি তুলছে—এখানে লেডি-এমপ্লয়ি মানে যারা আনম্যারেড, অবিবাহিত। প্রত্যেকের জন্যে একটা করে কামরা। আপনি যখন কুমারী সেজেছেন তখন আপনাকে ঐ একঘরী কোয়ার্টারে থাকতে বাধ্য করতে পারে—'

'বাঃ, এর আবার বাধ্যতা কী! সানন্দে যাব সেই কোয়ার্টারে।' কাকলি চঞ্চল হয়ে উঠল : 'কবে শুরু হচ্ছে কনস্ট্রাকশন?'

'আগে চাকরিটা হোক।'

'ঠিকই তো।' হেসে উঠল কাকলি : 'আমি ভেবেছিলাম চাকরিটা হয়ে গিয়েছে বুঝি।' উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে : 'কবে আসব খবর নিতে?'

'তিন চার দিন বাদ দিয়ে যেদিন আপনার খুশি।' সিগারেটের জন্যে অনেক দূর পর্যন্ত হাত বাড়াল বরেন।

'আচ্ছা আসি আজ। নমস্কার।'

'ক'টা বেজেছে আপনার ঘড়িতে?' নিজের হাতেও ঘড়ি আছে তবু বরেন জিজ্ঞেস করে বসল।

'আমার ঘড়িতে?' সুন্দর করে হেসে কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল কাকলি। বললে, 'দুটো কুড়ি।' একটু থেমে অপাঙ্গে লক্ষ্মী-কটাক্ষ ফুটিয়ে বললে, 'চিনতে পারছেন একে?'

শুধু যেন ঘড়ি নয়, ঘড়ির অতিরিক্ত আর কোনো ইতিহাসের ইঙ্গিত।

'কী করে চিনব? ঘড়ির ব্যান্ডটা কই?'

'ব্যান্ডটা, ল্যাজটা খসে গিয়েছে।'

'খসে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। ঘড়িও কুমারী সেজেছে।'

বেরিয়ে গেল কাকলি। আর বরেন হাত বাড়িয়ে মুঠোর মধ্যে ধরল সিগারেটের টিন।

দীপঙ্কর, খাতা-পত্র হাতে, উঠছে সিঁড়ি দিয়ে আর নামছে কাকলি। মাঝপথে দেখা। এ কী অভাবনীয়, দীপঙ্কর প্রায় উদ্বেল হয়ে উঠল : 'এ কী আশ্চর্য, আপনি এখানে?'

সুন্দর গোপন করল কাকলি। বললে, 'এই বরেনবাবুর কাছে এসেছিলাম একটা কাজে।'

'তা তো দেখছিই। কিন্তু কাজ, আপনার কী কাজ—'

'আমার আবার কী কাজ! আপনার বন্ধু সুকান্তর কাজ।' আরো কয়েকটা ধাপ দ্রুত নেমে গেল কাকলি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নামতে নামতে দীপঙ্কর বললে, 'কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার যে একটা জরুরি কাজ ছিল।'

সিঁড়ির নিচে এসে এক মুহূর্ত থামল কাকলি। কিন্তু দীপঙ্কর তার কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই উপর থেকে দারোয়ান হেঁকে উঠল : 'সাহেব আপনাকে ডাকছেন।'

এ আদেশ কাকে, বুঝতে দেরি হল না দীপঙ্করের। নিমেষে সে জুড়িয়ে গেল, আড়ষ্ট হয়ে গেল। শিথিল খাতাপত্র গুছিয়ে নিয়ে ধীর পায়ে উঠতে লাগল উপরে। কাকলি আর দাঁড়াল না। যেন আবার কী এক ঘুরুলির মধ্যে পড়ছিল, ভাগ্য বাঁচিয়ে দিল।

কিন্তু যতই পথ চলতে লাগল ততই মনে পড়তে লাগল বিন্টুর কথা। দীপঙ্করের সেই পঙ্গু ছোট ভাইটার কথা। যে সেদিন যেতে পারে নি জু-তে, বাড়িতে বন্দী হয়ে ছিল। আর এক পায় কী করুণ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল চোখের উপর। যে পায়ে দাঁড়িয়েছে সেটাও যে শীর্ণ অক্ষম তা তার খেয়াল নেই। দাঁড়াতে যে পেরেছে সেই আনন্দে মুখ-চোখ উদ্ভাসিত করে রেখেছে। এই বুঝি পড়ল, পড়ে গেল, ভেঙে গেল টুকরো টুকরো। প্রতি মুহূর্তে সেই ভয় জাগিয়ে-রাখা দাঁড়িয়ে থাকা। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরি, পড়তে না দিই, দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি জোগাই। আর সে কী হাঁপধরা নিচু চালের বস্তি। অভ্যাস-আবিল পরিবেশ।

কিন্তু আমাকে ওর কী দরকার থাকতে পারে? কাজ নয়, বলে কিনা, জরুরি কাজ, আর সেই জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেল সিঁড়িতে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায়? যদি দৈবাৎ দেখা না হত তা হলে জরুরি কাজটাও জন্মাত না। মনে মনে হাসতে চাইল কাকলি, কিন্তু পুরোপুরি পারল না হাসতে। আপনার সঙ্গে জরুরি কাজ ছিল—কথাটার মধ্যে স্ফূর্তি নয়. প্রচ্ছন্ন আকৃতির সুর। শ্বাস-হারানো কোন এক বিপন্নের ডাক।

আবার তো আসছিই এদিকে। মনকে প্রবোধ দিল কাকলি। তখন দেখা করব। শুনব। করব যা আমার সাধ্য।

'এতক্ষণ দেরি করলেন কেন?' কঠোর স্বরে বললে বরেন। খাতাপত্রের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল।

খাতাপত্রগুলো এগিয়ে দিতে দিতে দীপঙ্কর বললে, 'আপনি এতক্ষণ কার সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন।'

জ্বলন্ত সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বরেন বললে, 'কিন্তু গল্প শুরু করবার অনেক আগেই তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তখন চটপট চলে আসেননি কেন?'

'খাতাপত্র গুছোতে তো সময় লাগে।'

'হুঁ।' প্রসুপ্ত গর্জন করল বরেন। নিচু চোখে খাতা দেখতে দেখতে বরেন বললে, 'কতগুলি এনট্রি তো সদ্য সদ্য করেছেন দেখছি। কালি এখনো কাঁচা আছে।'

টেবিলের পাশ থেকে দীপঙ্কর বললে, 'আপনার দেখবার আগে এনট্রিগুলো আপ-টু-ডেট পেলেই তো হল—'

'না। আপনাকে বলা আছে না যেদিন যা ট্র্যানজ্যাকশান সেদিনই তা পাকা খাতায় তোলা চাই।'

'তোলা না থাকলে কী হত? বলতেন, যাও, তুলে নিয়ে এসো। আপনার দেখার পর তোলার চেয়ে আপনার দেখার আগেই দিব্যি তুলে নিয়ে এসেছি।'

'হুঁ।' ঘুমন্ত হিংসায় আবার গর্জন করল বরেন। বললে, 'যার সঙ্গে গল্প করছিলাম বলছেন সে আপনার চেনা নাকি?'

হঠাৎ থমকাল দীপঙ্কর। সংক্ষেপে বললে, 'হ্যাঁ, চেনা।'

'কী করে চিনলেন?'

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে দীপঙ্কর বাধ্য নাকি? তবু যতদূর পাশ কাটানো যায়, অথচ সত্যের ধার ঘেঁষেও থাকে, দীপঙ্কর বললে, 'ওঁর বিয়েতে নিমন্ত্রণ হয়েছিল।'

মূর্তিমান কালসাপ। বাঁকা চোখে একবার তাকাল বরেন। মানে, দরকাব হলে, লাগাবে সুকান্তের কাছে। বলবে তোমার স্ত্রী আমাদের ছোটবাবুর ঘরে গিয়ে আড্ডা মারেন এবং এমন একটা সাজ করে আসেন যাতে তুমি নেই, তুমি উৎখাত, তুমি উদ্বাস্তু। মানে, সরলকে গরল করে ছাড়বে। ফুটপাথের চারাগাছটাকে গরু দিয়ে খাওয়াবে।

'কিন্তু ওর সঙ্গে আপনার আবার কী জরুরি কাজ?'

কথাটা তখন অতি উৎসাহে জোরেই বুঝি বলে ফেলেছিল দীপঙ্কর। তাই বলে তুমি তাই শুনবে, মনে করে রাখবে? শুনে যদি মনে করেও রাখো, জবাবদিহি চাইবে? গা জ্বলতে লাগল দীপঙ্করের। বললে, 'সে আমার প্রাইভেট কাজ, তা জেনে আপনার কাজ কী?'

'হুম। কিন্তু এ কী? কী এটা?' প্রায় ফেটে পড়েন বরেন : 'ষোলো তারিখেব খালাসি মালের হিসেবটা পাকা খাতায় তুলেছেন কই? আপনার খসড়ায় আছে. ব্যাঙ্কের অ্যাডভাইসে আছে কিন্তু আসল খাতায় ঢু-ঢু?'

নিচু হয়ে দেখতে দেখতে দীপঙ্কর বললে, 'ওটা মিস হয়ে গেছে।'

'সবাই আজকাল মিস হয়ে যাচ্ছে। কেউ মিসেস থাকছে না।' টেবিলের উপর একটা চড় মারল বরেন : 'কিন্তু এরকম মিস হয় কেন?'

'মানুষ মাত্রেই ভুল হয়।' হাত বাড়াল দীপঙ্কর : 'দিন, সেরে দিচ্ছি।'

'সেরে দেবেন, না কি মেরে দেবেন?' বরেন ঝাঁজিয়ে উঠল : 'আপনার কাজকর্ম আজকাল একটুও ভালো হচ্ছে না—'

'যাকে দিয়ে ইনস্পেকশান করান তাকে দিয়েই আবার খাতা লেখান—কী খাটনিটা একবার দেখুন। আর যা মাইনে—'

'মাইনে?' সিগারেটের শেষ প্রান্তটা চিপে পিষে শেষ করে দিল বরেন। বললে, 'মাইনে না পোষায় ছেড়ে দিন চাকরি।'

'চাকরি ছেড়ে দিলে চলবে কী করে?' খাতাপত্রগুলো গুছোতে লাগল দীপঙ্কর।

'খুব চলবে। আপনার প্রাইভেট কাজ করুন গে যান—' বরেন উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

'তুমি তোমার প্রাইভেট টিউশানি করো গে যাও।' কাকলি অনুকম্পার সুরে বললে, 'আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর জানতে এসো না।'

রাত্রে টিউশানি সেরে ঘরে ফেরবার পর, ঘরে দেখা হবার পর সুকান্ত জিজ্ঞেস করেছিল, 'আজ কোথায় কোথায় চেষ্টা করলে?' তারই উত্তরে ঐ বিষ ঢালল কাকলি।

'কোথায় কোথায় গিয়েছিল তাও জানতে পাব না?'

'না। পথ তোমার না. পথ আমার। তোমার শুধু প্রাপ্তি। শুধু টাকা।' ঘৃণায় কাকলির চিবুকটাকে ধারালো দেখাল 'তোমাকে গুচ্ছের টাকা এনে দিলেই হল। তা যে কোনো চাকরি করে হোক, যে কোনো ব্যবসা—'

'হ্যাঁ, শুধু স্কুল মাস্টারিটা বাদ দিয়ে।'

'কেন, স্কুল মাস্টারিই বা বাদ দেব কেন? তেমন যদি পাই চলে যাব মফস্বল।'

'বাঃ, তা হলে আমার লাভ কী?'

'খুব লাভ। মাস মাস পাঠাব তোমাকে টাকা।' আবার ঝাঁজিয়ে উঠল কাকলি : 'কিছু টাকা পেলেই তো তোমার ক্ষুদ্র মনের অভিলাষ পূর্ণ হবে।'

'আমার অভিলাষ মোটেই অত ক্ষুদ্র নয়।'

'নয়?' হাতের কাছে কিছু একটা পেলে ছুঁড়ে মারে প্রায় এমনি ভঙ্গি করল কাকলি।

'না। আমার অভিলাষ, আমরা কায়ে আর আয়ে দুয়েতেই যুক্ত থাকব।'

'মুণ্ডু থাকব।' নিচে, মেঝেতে, বিছানা করছে,—ক'দিন থেকেই করছে, গম্ভীর হল কাকলি : 'অবশ্যি মাস্টারি আমি করব না, কলকাতায় হলেও না—'

'করবে না তো?' যেন আরাম পেল, টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে বসল সুকান্ত।

'না, কারণ মাস্টারনী হলে তোমার সমান-সমানই থাকব, তোমাকে ডিঙিয়ে যেতে পারব না।'

'তার মানে?'

'মানেটা বোধ হয় মাস্টার ছাড়া আর সকলের কাছেই স্পষ্ট। তার মানে, মোল্লা তবু খানিকদূর ছুটেছিল, তোমার দৌড় তো ধারে-কাছে কোনো একটা প্রাইভেট কলেজে লেকচারশিপ পর্যন্ত। লেকচারারের মাস্টারনী বউ, দুয়েরই প্রায় এক স্টেটাস। আমি তোমার উর্ধ্বে থাকব। আমি বিলিতি ফার্মে অফিসার হব। পে আর গ্ল্যামারে তুমি তখন আমার নাগালও পাবে না। তুমি তখন তোমার ঠিক-ঠিক আসন নেবে। আসন নেবে আমার পায়ের নিচে। আর প্রার্থী-প্রার্থী ভক্ত-ভক্ত মুখ করে বললে, রূপং দেহি, রুপেয়াং দেহি—'

'বিলিতি ফার্মে কোনো আশা পেয়েছ নাকি?'

'এখনো চাকরি পাইনি কিনা, অপদস্থ আছি কিনা, তাই গায়ে কিচ্ছু বিঁধছে না। কিন্তু সত্যি সত্যি যখন পাব তখন এই কাঁচকলাং দেহি—'

'বিলিতি গাছের হলে কাঁচকলাও দামী।' একটা মোটা বই খুলে পড়তে বসল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দামী। যদি ওখানে হয়, শুনেছি আলাদা কোয়ার্টার্স পাওয়া যাবে।' মশারির দড়ি টাঙাতে টাঙাতে কাকলি বললে।

'সত্যি?' আরামেও মানুষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তেমনি এক তৃপ্তির নিটোল শব্দ করল সুকান্ত। বললে, 'তা হলে তো আমার সেই আদিম ইচ্ছেটাই পূর্ণ হবে। সেই আমাদের আলাদা ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকা—'

'আমাদের থাকা মানে? তুমি থাকবে কী! ও তো আমার একার ফ্ল্যাট।'

'তোমার একার ফ্ল্যাট?'

'নিশ্চয়। যারা কুমারী মেয়ে, সিঙ্গল, আনম্যারেড, তাদের জন্যেই কোয়ার্টার্স।'

'হোক। তবু তুমি যদি অনুগ্রহ করো, একদিন অনুকূল লগ্ন বুঝে আমাকে খুলে দিলে দরজা!' বইয়ের দিকে মুখ রেখেই বললে সুকান্ত।

'নির্লজ্জ।'

'এ বিশেষণে আর আমার লজ্জা কী! বরং বিবাহিতা নারীর স্বামী হওয়াটাই তো সেকেলে। আমার কতদিনের সাধ কৌমারহর হব—'

'কৌমারহর হবে? অশ্লীলতার একটা সীমা থাকা উচিত।'

'বাঃ, তুমি যদি কুমারী হও, আমার কৌমারহর হতে দোষ কী।'

'যেয়ো একদিন ওদিকে, হুড়ো খাও কিনা দেখো।'

'কিন্তু কুমারী মেয়ে চাকরি পাবার পর তো বিয়ে করতে পারে—'

'বিয়ে করলেই তো কোয়ার্টার্স হারাবে। একটা অকর্মণ্য স্বামীর চেয়ে একটা স্বাধীন ঘর ও সমর্থ চাকরি ঢের ঢের কামনীয়।'

'তেমনি তুমিও তো বিয়ে করতে পারো। আর, সত্যি করে বলতে, আমি তো ঠিক অকর্মণ্য নই। সুতরাং আমাকে বিয়ে করতে বাধা কী!'

'তোমাকে বিয়ে?' কপালে হাত ঠেকাল কাকলি : 'ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।'

মশারির চতুর্থ কোণটা লাগাতে গিয়ে সুকান্তের টেবিলের কাছে এসে পড়ল কাকলি। হঠাৎ সুকান্ত তার হাত ধরে ফেলল। বললে, 'তোমাকে কুমারী অবস্থায় কী সুন্দর যে লাগে—সত্যি—' দুই চোখ উচ্ছল করল সুকান্ত।

'লজ্জা করে না বলতে?' কাকলি সজোরে হাত ছিনিয়ে নিয়ে বললে, 'যার মনে অঙ্গস্পর্শের শুচিতার বোধ নেই, যে আফিস-বসের পাশ ঘেঁষে বসতে বলে মোটরে, ক'টা বাড়তি টাকার জন্যে, তার আবার সুন্দরের জ্ঞান? তা ছাড়া রাত্রে, বাড়িতে, আমি আর কুমারী কই? আমি এখন সধবা, সিন্দুর-কলঙ্কিতা—' মাথাটা ঝুঁকিয়ে দগদগে লাল ঘা-টা স্পষ্ট করে দেখাল কাকলি।

চোখ ফিরিয়ে নিল সুকান্ত।

মেঝেয় পাতা বিছানার মধ্যে গিয়ে কাকলি বললে, 'শুধু বিছানা আলাদা নয়, ঘর আলাদা করতে পারলে শান্তি হত। যদি বাটারওয়ার্থের চাকরিটা পাই—'

'আপনার সেই বাটারওয়ার্থের চাকরিটা হয়ে গিয়েছে।' ক'দিন পরে কাকলি দেখা করতে এলে তাকে বললে বরেন, 'এই আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। শ্রীমতী কাকলি মিত্র, এম-এ। স্টার্টিঙে দু' শো টাকা। আর যদি কাজে ইমপ্রেস করতে পারেন, সম্ভাবনা অফুরন্ত—'

এ কী ইন্দ্রজাল? দুই চোখ বিশাল করে তাকিয়ে রইল কাকলি। চিঠিটা হাতে করে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'একটা ইন্টারভিউও লাগল না?'

'বাঃ, ইন্টারভিউ তো হয়েছে।'

'সে কী? কোথায়, কার সঙ্গে?'

'এই যে সেদিন হল এখানে, আমার সঙ্গে।' হাসতে লাগল বরেন। বললে, 'আমি স্যাটিসফাইড হয়েছি, তাই মেসোমশাইকে বলে এলাম। ব্যস, তাই যথেষ্ট। বললেন মেসোমশাই। সুতরাং যত শিগগির পারেন জয়েন করুন। হোয়াই নট টু-মরো? এনকোয়ারিতে গিয়ে প্রথমে সেক্রেটারির খোঁজ নিন। সেক্রেটারির কাছে রিপোর্ট করলেই সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে। কী নিজে-নিজে পারবেন তো গিয়ে পৌঁছুতে, না সঙ্গে লোক দেব? লোক দিতে হলে তো সেই এক—' একটু থামল বরেন, পরে স্বরে উল্লাস এনে বললে, 'নইলে বলেন তো কাল আমিই নিয়ে যেতে পারি আপনাকে।'

'না, না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।' মমতাঘন চোখে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল কাকলি : 'আমি নিজেই সব খুঁজে-পেতে বার করতে পারব।'

'হ্যাঁ, নিজের রুটি নিজেরই সেঁকে নেওয়া ভালো। লোক লাগা উচিত নয়। যে লোকের কথা ভাবছিলাম—আচ্ছা, আপনি দীপঙ্করকে চেনেন?'

'চিনি।'

'আপনার সঙ্গে কী জরুরি কাজ আছে সেদিন বলছিল—'

'হ্যাঁ, কিন্তু কী যে কাজ তা বলেনি। বলতে পারেনি। আজ জেনে নেব।' উৎসুক হয়ে এদিক-ওদিক দেখল কাকলি : 'আছে আফিসে?'

'আছে।' গলা নামাল বরেন : 'কিন্তু কী সে জরুরি কাজ, জানাবেন তো আমাকে?'

'নিশ্চয়ই জানাব। আপনার মত পরোপকারী বন্ধুবৎসল আর ক'জন আছে? এখন তবে উঠি। দীপঙ্করবাবুকে ধরি।' চিঠিটা ব্যাগে পুরে কাকলি উঠি-উঠি করল।

'একটু চা খাবেন না?'

'পরে আরেকদিন খাব। আরো অনেকদিন খাব।' কাকলি উঠে পড়ল : 'আগে জরুরি কাজটা জেনে নিই।'

কাকলি আফিস থেকে বেরুতেই দীপঙ্কর তার শামিল হল। বললে, 'চলুন একটু হাঁটি। অন্তত ট্রামস্টপ পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিই।'

'চলুন।'

উনত্রিশ

কিরকম নতুন-নতুন লাগছে! কিরকম দূর-দূর! একটু দূর-দূর থাকলেই বুঝি নতুন-নতুন। একটু বিচ্ছেদ-বিরহের সুর লাগলেই বুঝি ভালোবাসায় ধার আসে। তাই বুঝি মেয়েদের বাপের বাড়িটা এত প্রশস্ত। বাপের বাড়িতে কিছুদিনের জন্যে চক্ষের আড় হলেই বুঝি চোখে জমে আবার মমতা, নতুন মমতা। বাহুতে জাগে আবার পিপাসা, নতুন উত্তাপের পিপাসা। দূরে-দূরে চিঠি লেখালেখি হয়। তার ভাষা নতুন, বলবার বিষয় নতুন। চিঠি যদি সাদামাঠাও রাখে, তবে তার আবেগশূন্যতার মধ্যেই নতুন এক আবেগের আস্বাদ।

নতুন হও, নতুন থাকো। অভ্যাসে অব্যবহিত হয়েছে কি, তোমার মৃত্যু ঘটেছে। স্বাদের বাইরে সাধের বাইরে চলে যাওয়াও মৃত্যু।

কাকলির বাপের বাড়ি নেই। তাই সে ব্যবধান তৈরি করেছে তার মনে, তার বৈমুখ্যে। হয়তো বা স্থানেও। কেমন মেঝেতে বিছানা করে মশারি ফেলে শুয়েছে নতুন হয়ে। আশ্চর্য নতুন। দৈন্যে নতুন, দৃঢ়তায় নতুন।

শুধু স্থানে-মনেই নয়, রূপেও। চাকরি খুঁজতে গিয়ে নতুন এক চেহারা নিয়েছে, কুমারী সেজেছে। চলায়-বলায় এনেছে অনেক দ্রুততার দীপ্তি। আবার যখন চাকরি পাবে, তখন না-জানি ধরবে আবার কোন সাজ। সম্ভ্রমের কোন কেয়ূরকিরীট।

তবু তাই, নতুন হোক, নতুনতর হোক কাকলি। তার সম্ভাব্যতার শত-শত পাপড়ি খুলতে থাকুক একে-একে।

সে নতুন থাকলেই তো তাকে অর্চনা করতে ইচ্ছে হয়। সন্ধান করতে সাধ যায়। ভালোবাসা খুঁজে পায় তার আদিম সার্থকতা।

কিন্তু সে নিজে? সে নিজে কি নতুন? সুকান্ত একবার তাকাল তার চারপাশে। খোলা মোটা বইটা বন্ধ করল শব্দ করে।

কাকলি একবার বলে উঠেছিল, 'চোখের উপর আলো জ্বালা থাকলে কী করে ঘুম আসে মানুষের?'

এটাও কি নতুনের সুর?

কোনোদিন বলেনি এরকম করে। কত রাত কাকলিকে আগে শুতে পাঠিয়ে নিজে আলো জ্বেলে লেখাপড়া করেছে। ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে বলে কোনোদিন নালিশ করেনি। মধ্যরাত্রি পার করে দিয়ে পড়াশেষে যখন সুকান্ত শুতে গিয়েছে, দেখেছে তখনো কাকলি বিভোর! যে জেগে আছে, তাকে জাগানোর চেয়ে যে ঘুমিয়ে আছে, তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়াটি কী অপূর্ব!

'সকালে মুখে যদি একটা রাত-জাগা রাত-জাগা ভাব থাকে, তা হলে কিরকম হবে ইন্টারভিউ।' পাশ ফিরল কাকলি।

সত্যিই কি তবে এটা নতুনের সুর, নতুনের ডাক? কাকলি কি তবে এই কথাই বলছে, বলতে চাইছে যে, এই সব দড়িদড়া, ন্যাতাকাতা ছিঁড়ে ফেলো, দূর করে দাও। মশারির ব্যূহ থেকে মুক্তি দাও আমাকে। আমাকে এই একাকিত্ব থেকে মৃত্তিতল থেকে উদ্ধার করো। তোমার বলবান দুই বাহুতে আমাকে তুলে নিয়ে যাও তোমার খাটে। আমার ঔদ্ধত্যকে বিধ্বস্ত করো। ধূলিধূসর করে দাও।

আশ্চর্য, এতটুকুও জোর পেল না সুকান্ত। চোরের মত চুপিচুপি হামাগুড়ি দিয়ে যেতেও লজ্জা করল। মর্মঘাতী কী কঠিন কথা বলে না-জানি প্রত্যাখ্যান করবে! আর কোথাও ভিক্ষে পেলে না, শেষকালে একটা ঘুমন্ত দেহের দুয়ারে এসে হাত পাতো? গলায় দড়ি জোটে না তোমার? ছোটলোক চাষা কোথাকার! ঘৃণায় না-জানি কী বীভৎস নতুন হবে কাকলি! দাঁতগুলি না-জানি কী বন্য দেখাবে! আর জিভ তো নয়, খা-খা আগুনে পোড়া রক্তলোহার ছ্যাঁকা।

সুইচটা অফ করে দিল সুকান্ত।

অন্ধকারে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল চেয়ারে। খোলা জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরেই আসছিল হাওয়া, যেন টের পায়নি। এখন ঘর অন্ধকার করতেই হাওয়ার অনুভবটি মুখে-চোখে সর্বাঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল।

কেউ একটা বাড়ি করলে তার পাশেই যদি সুবিধেমত জমি পায়, তা হলে তাতে একটা পুকুর করে। সুকান্তও একটা পুকুর কাটতে চেয়েছিল। সে পুকুর কেটেছে সে নিজ হাতে। এখন হয়তো তাতে জল আসবে, স্বাদু জল, স্নিগ্ধ জল। আর সেই স্বখাত সলিলে ডুববে সুকান্ত।

তার আর উপায় কী! তাই বলে বাড়তি জমি পুকুর হবে না? অপচয়ে যাবে? না, না, পুকুর হোক। সুকান্ত ডুবুক বা মরুক, কিছু আসে যায় না। ও পূর্ণ হোক, স্নিগ্ধ হোক, ও খুঁজে পাক ওর সম্ভাবনার গভীরতা!

সুইচটা অন করল সুকান্ত। দেখল নিখুঁত, নিটুট শৃঙ্খলায় ঘুমুচ্ছে কাকলি। শ্রীতে নয়, শক্তিতে। বিপদের দেশে একাকী লোক যেমন অস্ত্র নিয়ে ঘুমোয়, তেমনি ও ঘুমুচ্ছে কঠিনতর প্রত্যাখ্যান নিয়ে।

নিজের খাটের দিকে তাকাল। সে সরকারি বিছানা ভগলু তো কখনই করে দিয়ে গেছে। মশারি ফেলে গুঁজে দিয়ে গেছে পরিপাটি। নিচের এই ছোট বাড়তি মশারিটা কাকলি আজ নিজে কিনে এনেছে। কিন্তু লেপ-তোষক-বিছানার চাদর? শতরঞ্জির উপর আধ-ময়লা একটা শাড়ি বিছিয়ে তার তোষক-চাদর, আর কার কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে আনা একটা আলোয়ানে তার লেপ। অনেক, অনেক জোর বেশি আজ কাকলির।

ঘর অন্ধকার করে দিয়ে নিজের বিছানায় ঢুকল সুকান্ত।

সেও নতুন হতে জানে।

সম্ভ্রমে নতুন, গাম্ভীর্যে নতুন, উপেক্ষায় নতুন।

'আপনার অনেক জোর।' এ কথাটা দীপঙ্করও বললে, কাকলিকে নিয়ে পথে এসে।

'জোর? কার উপর?' কাকলি হাসল।

'বরেনের উপর। আপনি বললেই আমার মাইনে ও নিশ্চয় কিছু বাড়িয়ে দেয়।'

'আমি বললে?'

'আমার তো তাই মনে হয়। আমি সুকুকে বলেছিলাম বলতে—'

'বলেছিলেন? তা উনি—'

'আমার মনে হয় বলেনি. হয় ভুলে গিয়েছে, নয় চেপে গিয়েছে।'

'কিংবা এমনও হতে পারে, বলেছিলেন, কোনো ফল হয়নি।'

দীপঙ্কর ঢোক গিলল। বললে, 'যাই হোক, ওর দিকে আর যাচ্ছি না, এখন আসল ধরেছি। ওকে দিয়ে ফল না হোক, আপনাকে দিয়ে হবেই।'

'বাঃ, সুকান্তই তো ওঁর বন্ধু। আমি কেউ নই।' ভীতু-ভীতু অসহায় মুখ করল কাকলি।

'না, বন্ধুর চেয়ে আপনি বেশি। আপনি তার বান্ধবী।'

'তেমন বান্ধবী তো আমি আপনারও।' মুখ দিয়ে কেমন বেরিয়ে গেল কাকলির।

'তাই তো এক বান্ধবের দুঃখের কথা জানাবেন আরেক বান্ধবকে। আর অধস্তনের জন্যে ঊর্ধ্বতনের হাত থেকে আরাম ছিনিয়ে আনবেন।'

আর যেন ফিরে যাবার পথ নেই, কথার [illegible] জড়িয়ে পড়েছে কাকলি। বললে, 'বেশ তো, আমার বলায় যদি হয়, নিশ্চয় বলব। কেন বলব না?

'বলায় যদি হয়—ওরকম নয়। হতেই হবে। আর তারই জন্যে বলবেন।' চলতি ট্রামকে হাতের ইশারায় থামতে বললে দীপঙ্কর, 'আমি বললাম, তবু হবে না? হবেই হবে। এরকম দাবির ভাব দেখিয়ে বলবেন।'

'বেশ তো, তার আগে চলুন, বিষ্টু-আভাকে দেখে আসি।'

'বিষ্টু-আভাকে দেখতে হলে আশেপাশে আরো অনেক কিছুই দেখতে হবে। চলুন, ঘ্রাণ প্রাণ সার্থক করবেন চলুন।'

যেন বান্ধবীকে কোন প্রমোদোদ্যানে নিয়ে যাচ্ছে, এমনি ভঙ্গিতে কাকলিকে পাশে নিয়ে ট্রামে উঠল দীপঙ্কর। যেন কোন রঙিন কার্নিভ্যালে।

নেমে খাবারের দোকান থেকে এক বাক্স সন্দেশ কিনল কাকলি। খালি হাতে শিশুগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর কোনো মানে হয় না—অন্তত আজ তো নয়ই। আজ তার মন মিষ্টি, চোখ মিষ্টি, হাতভরা মিষ্টি আশার পসরা।

বস্তি ও তার পরিবেশের যে চেহারাটা আগে একদিন দেখে গিয়েছিল, আজ যেন মনে হল, আরো কঠিন, আরো কদর্য। ফুটপাথের যে অংশটুকু বাড়ির শামিল করে নিয়েছিল, তার ঠিক সামনেই একস্তূপ আবর্জনা।

সেদিন বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেই চলে গিয়েছিল মনে আছে, আজ ভিতরে এসে বসল। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলো হৈ-চৈ করে উঠল, ঘিরে ধরল কাকলিকে। নন্নড়ে পায়ে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল বিষ্টু। শীর্ণ বুকে ছেঁড়া আঁচল মেলে ম্লান হাসি হেসে সামনে এল আভা।

সেদিন যেন চোখগুলিকে তবু জ্বলজ্বলে দেখেছিল, গায়ে মুখে তাজা আনাজের লাবণ্য। আজ মনে হল অনেক শুকিয়ে-শিটিয়ে গিয়েছে, গলার কাছে এসে কোনো রকমে ধুকধুক করছে প্রাণপিণ্ড। চোখের চাউনিগুলো শূন্য, অর্থহীন। যা ধরে ওরা জীবনসমুদ্রে ভাসছে, ওরাও যেন বুঝতে পেরেছে তা তুচ্ছ একখণ্ড খড় ছাড়া কিছু নয়।

'কী এনেছ আমাদের জন্যে? চিনেবাদাম?' ছেলেমেয়েগুলো আরো ঘন হয়ে এল।

'না, সন্দেশ। হাত পাতো।'

একসঙ্গে অনেকগুলি হাত লকলক করে উঠল। যত হাত তত সন্দেশ যদি হয়, কেউ কেউ দু' হাত মেলে ধরল।

সবাইকে বিলোতে লাগল কাকলি। এক মুহূর্তের জন্যে ওদের চোখে-মুখে এল বুঝি-বা অভিনবের আলো। কিন্তু তা আর কতক্ষণ থাকবে? জলটুকু খেয়ে নিলেই চলে যাবে এই মধুরের গন্ধ। তারপরেও যদি এককণা লেগে থাকে দাঁতের ফাঁকে, ক্ষণকালের জন্যে একটা স্মৃতি এসে দংশন করে যাবে। কাকলির মনে হল, এর চেয়ে ঐ ছোটটার জন্যে যদি একটা জামা এনে দিত তা হলে আস্ত একটা কাজ হত। আর, জামা কি শুধু ছোটটারই জন্যে? এখনো সন্ধে হয়নি, কিন্তু এক্ষুনি কী ঠাণ্ডা এখানটায়! সবাই কেমন কুঁকড়ে কুঁজো হয়ে রয়েছে। শোয় তো বুঝি মাটিতেই। উপরে-নিচে গায়ে না জানি কী দেয় রাত্তিরে। রাত্তিরের কথা ভেবে শিউরে উঠে কাজ নেই, এখন যদি ছেলে দুটোর গায়ে থাকত দুটো শার্ট আর মেয়ে দুটোর দুটো লম্বা ঝুলের ফ্রক। ছেলে দুটোর দুটো হাফ-প্যান্টই বা নয় কেন? আর আভার শাড়িটাই বা এমন কী অঢেল?

'এসো, তুমি নেবে না?' বিষ্টুকে লক্ষ্য করল কাকলি।

দিব্যি দেয়াল ধরে ধরে এগুতে লাগল বিষ্টু। লোভ তাকে সামনে ঠেলছে—লজ্জা চাইছে পিছিয়ে রাখতে। লোভই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে নিশ্চয়। লোভের বস্তু যদি আরো প্রবল হত, হঠাৎ মনে হল কাকলির, বিষ্টুকে আর দেয়াল ধরতে হত না। এক পায়েই হয়তো আসতে পারত লাফিয়ে। কিন্তু হায়, সামান্য একটা ক্রাচ পর্যন্ত তার নেই।

তার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল কাকলি। দেয়াল ছেড়ে দিয়ে বিষ্টু কাকলির হাত ধরল। শুধু বিষ্টুর নয়, সমস্ত খোঁড়া সংসারের দাঁড়াবার লাঠিই যেন এই কাকলির হাত।

'সেই যে সেদিন বলে গিয়েছিলে, আমি বন্ধু, সেদিন থেকে আশাপথ চেয়ে বসে আছি।' দুর্গাবালা প্রথম থেকেই উচ্ছ্বসিত : 'চারদিক যতই নিষ্ঠুর হোক, অনাত্মীয় হোক, এখানে এখনো আছে একজন বন্ধু। তার দেরি হতে পারে কিন্তু তার ভুল হবে না। পথ চিনে একদিন যখন সে এসেছিল আবার আসবে। আলো করে আসবে।'

'আমার সাধ্য কী!' কাকলি মুখ নিচু করে বলেছিল প্রথমে।

'সাধ্যের কথা নয় মা, হৃদয়ের কথা। হাত অনেক কিছুই করতে পারে না হয়তো কিন্তু হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে বাধা কোথায়? সেই অনুভূতিটুকুও খুঁজে পাই না, সেও বোধ হয় পাথর হয়ে গিয়েছে।'

নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হল কাকলির।

'আজ বাইরে থেকে ফিরে যাওয়া চলবে না। আজ ভিতরে এসে বসতে হবে।' প্রায় হাতে ধরেই টেনে আনল দুর্গাবালা। পুরু করে একটা চট বিছিয়ে দিল মেঝের উপর। বললে, 'ভিতরের লোক কি বাইরে দাঁড়ায়?'

স্বচ্ছন্দ আলস্যে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল কাকলি।

সমস্ত দৃশ্যটি মুগ্ধ চোখে দেখছে দুর্গাবালা। এখনো আছে এখানে স্নেহ, অকারণ করুণা। কাকলির বাক্সে কি সন্দেশ না ইন্দ্রজাল?

'তুমিও এসো।' আভাকে ডাকল কাকলি। 'আর আপনি?' দীপঙ্করের দিকে চোখ তুলল।

'আমি খাব কী!' দীপঙ্কর সরে যেতে চাইল।

'না, নিন, মিষ্টিমুখ করুন।' কাকলি হাসল।

'সেই আপনার বিয়েতেই তো মিষ্টিমুখ করেছি। আবাব নতুন কারণ ঘটুক, সুকান্তর পর সুতকান্ত আসুক, আবার মিষ্টিমুখ করব।'

হঠাৎ স্মৃতির একটা শেল দুর্গাবালাকে দ্রুত বিদ্ধ করল। নিঃস্বের কণ্ঠে হাহাকার করে উঠল : 'তোমার তবে এ কী চেহারা? হাত-গলা খালি, কপাল-মাথা সাদা—'

'কিচ্ছু হয়নি মা। ও একটা ছলনা।' খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'একটা নাটকে প্লে করতে গিয়ে এইরকম সাজতে হয়েছে।'

হেঁয়ালির মত লাগছে দুর্গাবালার। ব্যাকুল হয়ে বললে, 'তোমার সেই—সেই বন্ধু ভালো আছে?'

'আমার স্বামীর কথা বলছেন? দিব্যি সুস্থ, হৃষ্টপুষ্ট আছে। কিন্তু স্বামী আবার বন্ধু কবে? ও তো শত্রু।'

'সে শত্রু আমার। ঐ দেখ—মরেও না তরেও না, পড়ে আছে চৌকাঠের উপর।'

একটা হাড়-পাঁজর বার করা রিক্তগাত্র বুড়ো উঠোনের ধার ঘেঁষে পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। ধুঁকছে। নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে।

'ওঁর অসুখ?'

'কিছুমাত্র না। আফিং পায়নি তাই ককাচ্ছে-কাতরাচ্ছে। দীপু কি মাছ-তরকারি কিনবে, না আফিং কিনবে? আর আফিং একবার পেটে পড়লেই সেই সূজ্জের ষাঁড়। ধার করতে ছুটবে। ধার যদি না জোটে তা অন্য কেলেঙ্কারি। বলে, আফিং দিয়েছিস, রাবড়ি দিবি না? তখন আবার জরিমানা দিয়ে ছাড়িয়ে আনো। কত ছাড়াবে? দফায়-দফায় পাওনাদার। কেউ ধরে-বেঁধে জেলে নিয়ে যেতে পারে না? কিংবা ভাগাড়ে? কেউ দু' ঘা জখম পর্যন্ত করে না? বলে, কী দরকার! দীপুর মতন যখন ছেলে আছে তখন কড়ায়-ক্রান্তিতে পাওনা-গণ্ডা সব উশুল হয়ে যাবে।'

শুনতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল কাকলির, শেষ কথাটায় গভীর উপশম পেল। সন্দেশ-সুদ্ধু হাত দীপঙ্করের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'নিন, ঠকবেন না, মিষ্টি-মুখের মত খবর আছে।'

হাত বাড়িয়ে দিল দীপঙ্কর। বললে, 'আছে? কী খবর?'

'আমি একটা চাকরি পেয়েছি।'

'আপনি?' বাড়ানো হাত গুটোনো যায় না, বরং এটাও যে একটা অকুণ্ঠিত আনন্দের সংবাদ এটা সজোরে সাব্যস্ত করা উচিত। 'বলেন কী?' কাকলির সন্দেশ-সুদ্ধু হাতটা ধরে ফেলল দীপঙ্কর : 'কী করে পেলেন? কে দিল?'

সন্দেশটা দীপঙ্করের হাতে চালান করে দিতে দিতে কাকলি বললে, 'মিথে বলব কেন, বরেনবাবুই পাইয়ে দিলেন। ওঁর মেসোমশায়ের ফার্মে। বাটারওয়ার্থে।'

না, মিথ্যে ম্লান হবে কেন? কাকলিকে কেন হিংসে করবে? ওর সঙ্গে সংঘর্ষ কোথায়? বরং এ তো ভরসার কথা। কাকলি জানে আদায় করতে। যখন নিজের জন্যে পেরেছে বন্ধুর জন্যেও পারবে।

গোটা সন্দেশটা মুখে পুরে দীপঙ্কর বললে, 'আমি ঠিকই বলেছি। বরেনের উপর আপনার অখণ্ড প্রতাপ। আপনি যদি তেমন করে বলেন ওর সাধ্য নেই আপনাকে ফেরাতে পারে—'

'যদি তেমন করে বলি—' চোখের কোণে হাসল কাকলি।

'হ্যাঁ। আপনিই তো বলেছেন যে নাটকে যেমন পার্ট। যে রানী সাজতে পারে সে ঝিও সাজতে পারে। মানে যে নিজের জন্যে বলতে পারে সে চাকরের জন্যে—বলতে গেলে আমি তো বরেনের চাকরই—চাকরের জন্যেও বলতে পারে। নিজের চোখে দেখছেন তো আমার সংসার। আমি কেন সন্নেসী হই না? কেন সব ফেলে-ছড়িয়ে চলে যাই না নিরুদ্দেশে? আমার কী দায়! আমি কেন হাতি ঠেলি?'

'না ঠেলে আপনার শান্তি নেই। আপনার স্বভাবই আপনাকে পালাতে দেবে না, সংগ্রাম করিয়ে ছাড়বে।'

'তেমনি যদি আরেকটি স্বভাব পাই যে সে সংগ্রামে আমাকে সাহায্য করতে উন্মুখ, অস্ত্র জোগাতে তৎপর—'

'বলেছি তো, বলব, অজস্র বলব। চেষ্টা করব প্রাণপণে।' কাকলি উঠে পড়ল। দুর্গাবালার হাতে সন্দেশের বাক্সটা—তখনো নিঃশেষ হয়নি—পৌঁছে দিল। বললে, 'এবার বাড়ি যাই।'

'হ্যাঁ, বাড়ি গিয়েই সাজ পাল্টাও।' বললে দুর্গাবালা, 'দেরি কোরো না।'

'শত্রুর শিবিরের শোভা বাড়িয়ে লাভ কী!' হাসল কাকলি : 'বাইরে এই তো ভালো আছি সংগ্রামীর পোশাকে। বাড়িতে ঢুকলেই তো মাথায় পরতে হবে দাসত্বের চিহ্ন, হাতে-গলায় বন্ধনের বেড়ি—'

'কী যে বলো তার ঠিক নেই। সাজলে-গুজলে ঠিক রাজেশ্বরীর মত দেখাবে। জানো তো লক্ষ্মীই রাজেশ্বরী।' কাকলির চিবুক ধরে আদর করল দুর্গাবালা।

কাকলি বললে, 'ঘোরো লক্ষ্মীর চেয়ে বুনো কালীই অনেক ভালো, মা।'

ছেলেমেয়ের দল আবার ঘিরে ধরল কাকলিকে : 'আবার এসো। আবার এসো কিন্তু। কবে আসবে?'

সবচেয়ে ছোটটা বললে, 'এর পর কী আনবে?'

বিষ্টু বললে জ্বলজ্বলে চোখে, 'কিছু আনতে হবে না। তুমি অমনি এসো।'

বাইরে রাস্তায় এসে দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, 'সাজগোজের এই ছলনাটা চাকরি জোগাড়ে সাহায্য করেছে নিশ্চয়ই—'

'নিশ্চয়ই।'

'এতে সুকুর সায় আছে?' প্রশ্নটা করেই দীপঙ্করের মনে হল অপ্রাসঙ্গিক শোনাচ্ছে।

স্বরে ঝাঁজ এনে কাকলি বললে, 'ওর সায় আছে কি না আছে কে তা জিজ্ঞেস করতে গেছে? বিশেষ সিদ্ধির জন্যে বিশেষ কৌশল বিধেয়। আর বিষয় যখন আমার তখন আঙ্গিকও আমার রচনা।'

'তবেই দেখছেন, আপনি ছলনাতেও নিপুণ।'

'তাই তো দেখছি।'

'সুতবাং ছল বল কৌশল যখন যেমন প্রয়োজন, আপনি বরেনের উপর অনায়াসে প্রয়োগ করতে পারবেন। আর আমার আকাঙ্ক্ষা কী সামান্য তা তো জানেন। শুধু মাইনে বৃদ্ধি। তাও অকারণে নয়, কাজ বাড়িয়ে দিয়েছে, তাই।'

'আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না।' পরে একটু বুঝি বা সন্নিহিত হল, বললে কাকলি, 'আমার তূণে যত বাণ আছে ছুঁড়ব একে একে—আপনি বিশ্বাস করুন।'

বাস-স্টপ্ পর্যন্ত এগিয়ে দিল দীপঙ্কর।

সারা রাস্তা কাকলি ভাবতে-ভাবতে এল, কী দেখলাম নিজের চোখে! দারিদ্র্য কী মর্মন্তুদ কুৎসিত, আর এই যে আশ্বাস দিয়ে এলাম আমি এর প্রতিকারের চেষ্টা করব, কে জানে, এও বোধ হয় ছলনারই

নামান্তর। আমার তূণে যত বাণ আছে—কী বাণ আছে? বাণ থাকলেই কি ছোঁড়া যায়, না তা লক্ষ্যকে বিঁধতে পারে? তবু অত বড় পঙ্গুতা ও নিরুপায়তার সামনে কিছু একটা আশ্বাসের কথা না বলতে পারলেও নিশ্বাসকষ্ট হয়। আমি মেয়ে, আমি সংস্কারে সঙ্কীর্ণ, স্বভাবে স্তিমিত, দুনিয়ার হালচাল আমি কী বুঝি, আমার দ্বারা কিছু হবে না—এ বলে সরে পড়লেই কি মর্যাদা পেত মনুষ্যত্ব? আমি মেয়ে বলে কি এতই অকিঞ্চিৎ? সংসারে আছে কী? শুধু দুটো জিনিসই তো আছে। প্রয়াস আর প্রসাদ। নিজের জন্যে প্রয়াস, পরের জন্যে প্রসাদ। পরকে একটু প্রসন্ন করতেও কি নিজে প্রয়াসী হব না?

সারাক্ষণ কি একটানা এই নৈষ্ফল্য আর নৈরাশ্যের কথাই ভাববে? যে লোকটা চৌকাঠের বাইরে উঠোনের ধারে পড়েছিল উপুড় হয়ে তার কথা ছাড়া আর কিছুই কি তার মনে পড়বে না? আর সেই বিষ্টুর দেয়াল ধরে এক পায়ে উঠে দাঁড়ানো? আর আভার সেই গায়ের উপর খাটো আঁচল? আর সেই মেয়েটার জিজ্ঞাসা : এর পর কী আনবে?

তার জীবনে কি কোথাও সুখ নেই, উপশম নেই, অন্ধকার স্লেটে অন্তত একটা সাদা পেনসিলের দাগ?

না, আছে। কাকলির চাকরি হয়েছে। ক'জনের ঘটে এমন সৌভাগ্য? শুধু স্বাধীনতা পাওয়া নয়, স্বাধীনতার পিছনে ক্ষমতাকেও পাওয়া।

কিন্তু ওদের কারু গায়ে একটাও গরম জামা দেখলাম না। গরম দূরের কথা, সম্পূর্ণ জামাও দেখলাম না। কী ভাবে শোয়, কী না জানি খায়। আর নিশ্বাসে কোন পারিজাতের সৌরভ না জানি আস্বাদ করে!

'এত দেরি হল?' মৃদুস্বরেই জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'হয়ে গেল।' মৃদুতর উত্তর কাকলির।

দীর্ঘ রজনী কাটল চুপচাপ।

পরদিন সকালে উঠে, সিঁড়ি দিয়ে নামছে মৃণালিনী, এগিয়ে এসে কাকলি তাকে প্রণাম করে দাঁড়াল এক পাশে। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না দিয়েই বললে, 'আমার চাকরি হয়েছে।'

'বলো কি? সত্যি? কত মাইনে?' সব প্রশ্নের বড় প্রশ্নটাই আগে এল মৃণালিনীর।

'শুরুতেই দু' শো। এদিক সেদিক ফালতুও কিছু আছে হয়তো। তারপরে বছরে বছরে বাড়বেও বলেছে।'

'ওরে তোরা শুনেছিস, বউমার চাকরি হয়েছে—' আহ্লাদে ফেটে পড়ল মৃণালিনী। চারদিকে আনন্দের হাট বসিয়ে দিল।

ঘরে ঘরে আশীর্বাদ কুড়োতে গেল কাকলি।

ভূপেন বললে, 'কোম্পানিটা ভালো আর পোস্টটাও সম্ভ্রান্ত। আশীর্বাদ না করে আর উপায় কী!'

'আর কাজকর্ম খুব বেশি হবে না বলেই মনে হয়।' বললে হেমেন, 'তুমি ম্যানেজারকে বলে আওয়ার্সটা এগারোটা-চারটে করতে পারো কিনা দেখো। দশটা-পাঁচটা হলে স্ট্রেইন খুব বেশি হবে, তারপর আফিস-টাইমের ট্রাম-বাস—'

প্রশান্ত বললে, যাই আওয়ার্স হোক, পেট ভরে টিফিন খেয়ো।'

ঘরে ফিরলে সুকান্ত গম্ভীর মুখে বললে, 'চাকরি হয়েছে, তা আমাকে বলো নি কেন?'

'তোমাকে শেষে বলব।'

'শেষে মানে?'

'মাসের শেষে।'

'মাসের শেষে?'

'হ্যাঁ, যখন মাইনে পাব। যখন হাতে টাকা আসবে।' কাকলি স্নানে যাবে বলে চুল খুলতে লাগল : 'তোমার তো চাকরির খোঁজ নয়, তোমার শুধু টাকার খোঁজ। কোত্থেকে টাকাটা আনলাম তা নয়, কত আনলাম তা।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সুকান্ত। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু চাকরিটা পেল কে? কাকলি বসু, না কাকলি মিত্র?'

'কাকলি বসুর ঐ তো চেহারা!' সুকান্তর দিকে হাত বাড়াল কাকলি : 'চাকরি পেয়েছে কাকলি মিত্র। শ্রীমতী নয়—শ্রীমতী একটা ছলনা—স্পষ্ট কুমারী কাকলি মিত্র।'

তবু মৃণালিনীর মধ্যে যেন দুশ্চিন্তা ছিল। সদরে যদিও আম্রপল্লবে ঢাকা পূর্ণঘট রেখেছে এবং যদিও দোর পেরোবার আগে তা করজোড়ে প্রণাম করেছে কাকলি, তবুও কাঁটাটা যাচ্ছিল না কিছুতেই। এক পাশে সরে এসে প্রায় কানে-কানে বলার মত করে মৃণালিনী বললে, 'মুখের এক কথায় এমন সুন্দর চাকরিটা যেন ছেড়ে দিয়ে এসো না।'

'তেমনিধারা হবে না বোধ হয়। দায়িত্বজ্ঞান আছে এমন লোক আছে পিছনে। তবে, কে জানে, কিছুই বলা যায় না।' রাস্তায় নেমে গেল কাকলি।

দুপুরবেলা, আফিসে, বরেনের ফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো।' বরেন রিসিভার তুলল।

'আমি। আমি কাকলি। কাকলি মিত্র।'

'কী আশ্চর্য! অত কেন? গলার স্বরেই চিনতে পেরেছি।'

'জয়েন করেছি আজ।'

'করেছেন? ও-কে। কেমন লাগছে?'

'ভালো—দেখুন, শুনুন—'

'কোনো ডিফিকালটি হলেই ম্যানেজারকে বলবেন।'

'শুনুন, আপনাকে বলছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন।'

'দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

'বেশ তো, বলুন না কী কথা!'

'আপনার কাছে গিয়ে বলব।'

'সে কথা তো আরো ভালো।'

'সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে আপনি থাকবেন?'

'থাকব।'

'আমি তখন যাচ্ছি আপনার কাছে।' রিসিভারটা রেখে দিল কাকলি।

পিঠ-পিঠ কথাটা বলতে পেল না বরেন। না পেয়ে ভালোই করেছে। হয়তো কিছু উত্তাপ কিছু আগ্রহের সুর আসত। সেটা ঠিক নয়। সমীচীনতা থেকে সে স্খলিত হবে না, নইলে দুপুরের নির্জনে অমন টেলিফোন পেয়ে কেউ অমনি কাঠ-কাঠ কথা কয়? দর্জি হয়ে কাঁচি চালিয়ে কথার মাপজোক করে?

ঠিক সময়ে হাজির হল কাকলি। ক্লান্ত অথচ অম্লান।

'কী, কোনো উৎপাত জোটেনি তো?' নিশ্চিন্ত আলস্যে সিগারেট ধরাল বরেন।

'না। সবাই বেশ ভদ্র, পরিচ্ছন্ন।' কাকলি বসল চেয়ারে।

'শুনুন, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হয়তো হবে, সেটা উপেক্ষা করবেন—'

'হ্যাঁ, গুঁড়ো-গুঁড়ো ঝুরো-ঝুরো বৃষ্টিতে কিছু অসুবিধে হয় না, মুষলধারে হলেই মুশকিল—'

হাসল বরেন, কিন্তু শব্দ হতে দিল না। নিঃশব্দে হো-হো করে হাসবার মত মুখ করলে। বললে, 'তখন আর ছাতাতে শানায় না।'

'তখন ছাতা কী, তখন তার প্রতিকারও মুষল।'

আবার একটা নিঃশব্দ উচ্চ হাসির মৌখিক ভঙ্গি করল বরেন।

সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিবিষ্ট চোখে একটুখানি দেখল কাকলিকে। পরে

ভঙ্গিটাকে হঠাৎ প্রাখর্য এনে টেবিলের কাজকর্ম নিয়ে খানিক নাড়াচাড়া করলে। আবার আলস্যে একটু শিথিল হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কী একটা কথা ছিল বলছিলেন—'

'হ্যাঁ, আজ থাক।'

'থাক।' দিব্যি সায় দিল বরেন।

'আরেক দিন আসব।'

'যেদিন আপনার খুশি। আমি কান পেতে থাকব।'

'হ্যাঁ, ফোন করে আসব। আমার টেবিলের কাছেই ফোন।'

'আমি তো ফোনের জন্যেই কান পেতে থাকব।' সিগারেটের ছাই ঝাড়ল বরেন।

'আজ উঠি।' উঠে পড়ল কাকলি।

'আমিও।' বলে, এমনি একবার লোভ হল বরেনের। চলুন, আমার গাড়িতে করে আপনাকে পৌঁছে দিই বাড়িতে। যা এখন জগদ্দলন ভিড়।

বলল না, স্যাকরার সূক্ষ্ম নিক্তিতে মেপেই বলল না। শুধু বলতে হয়, মামুলি ভাবে বললে, 'বাড়ি ফিরবেন?'

'হ্যাঁ, নইলে আর জায়গা কোথায়?'

বরেন বাইরে একবার আফিস-ভাঙা কোলাহলের দিকে তাকাল। মনে-মনে অনেক ছাঁটকাট করে সূক্ষ্ম করে বললে, 'বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে—'

যদি কাকলি নিজের থেকে বলে! গাড়ির প্রস্তাবটা যদি কাকলির হয়!

গাড়ির কথার ধার দিয়েও কাকলি গেল না। বললে, 'ঘুরতে-ঘুরতে দেরি করে বাড়ি ফেরার আনন্দের কথা শুনেইছি শুধু, অনুমানও করেছি আগে-আগে। এবার প্রত্যক্ষ করব।' মুক্তির পাখায় ঝলমল করতে-করতে আকাশের শূন্যে উড়ে গেল বিহঙ্গ।

উলটো পথের ট্রাম ধরল কাকলি।

দূরের মোড়ে নেমে একটা অন্ধকার মতন জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়াল, যেখানে তার বাড়ি, তার মা-বাবা ভাই-বোনের বাড়ি, তার আশৈশব স্নেহ-নীড়টা দেখা যায়। দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটায় আলো জ্বলছে। পত্রালি পড়ছে বোধ হয়। নাকি মা কিছু করছেন। নাকি অমনিই আলোটা জ্বালা। ঘরে কেউ নেই।

আর ঐ সেই কদম গাছ! অনেক পাতা ঝরে গিয়েছে বোধ হয়।

কতদিন পরে দূরে দাঁড়িয়ে একটু দেখছে। দেখতে ভালো লাগছে।

চাকরির খবরটা মা-বাবাকেই শুধু বলা হয় নি। যেন বলা যায়। যেন খবরটা নিয়ে জয়ীর মত দাঁড়ানো যায় তাঁদের কাছে।

না, দরকার নেই। ওঁরা কি কখনো চেয়েছিলেন মেয়ে চাকরি করুক? স্বাধীন পায়ে সিধে হয়ে দাঁড়াক?

ধীরে-ধীরে ফিরে গেল কাকলি। আবার সোজা পথের বাস ধরল।

ত্রিশ

বাড়ি ফিরতে সর্বপ্রথমে সেন্টুই উল্লাস করে উঠল : 'এই ত্তো। এই ত্তো কাম্মা।' বলে ছুটতে-ছুটতে এসে কাকলির দুই বাহুতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাকলির চিবুকটা ধরে ঘুরিয়ে মুখটা তার চোখের সামনে সম্পূর্ণ করে রেখে সেন্টু বললে, 'তুমি আসতে দেরি করছিলে বলে সবাই ভাবছিল।'

'নানা জনে নানা কথা বলছিল।' পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ঝন্টু; বললে হাসতে হাসতে।

'কে কী বলছিল রে?'

'কেউ বলছিল রাস্তা পার হতে গাড়ি চাপা-পড়েছে। কেউ বলছিল চলতি বাস থেকে নামতে গিয়ে

চিৎপটাং। কেউ বলছিল, বাসে-ট্রামে উঠতে না পেরে হেঁটেই আসছ বুঝি।' যত বলছে ততই হাসছে ঝন্টু : 'আবার কেউ বলছিল একটা ট্যাক্সি নিয়েছ আর ড্রাইভারটা তোমাকে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছে।'

সংসারে থেকে ঝন্টু বেশ চালাক হয়ে উঠছে, তাই কে কোন কথাটা বলেছে নাম দিচ্ছে না। নাম না থাকলে উদ্ধৃতিটা যে নির্দোষ দেখাবে এটা সে বুঝে গিয়েছে।

কিন্তু সেন্টু একতাল সারল্য। বললে, 'কাকাটা ভারি মন্দ। কী বলছিল জানো?'

'কী বলছিল?'

'বলছিল তোর কাম্মা আর ফিরে আসবে না। তোর কাম্মা অন্য দেশে চলে গিয়েছে।'

'যেমন বুদ্ধি তেমনি তো বলবে।'

'এই ত্তো কাম্মা। এই ত্তো।' সেন্টু দু' হাতে কাকলির গলা জড়িয়ে ধরল।

অনেকেই বাইরের বারান্দায় রেলিং দরে দাঁড়িয়েছিল উদ্বেগের চোখ নিয়ে, সুস্থ-সমর্থ কাকলিকে ফিরতে দেখে জুড়িয়ে গেল মুহূর্তে। উত্তেজনাটা সমীচীন উৎসাহ পেল না। সব ডাল-ভাত হয়ে গেল।

সেন্টুকে কোল থেকে নামিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল কাকলি। বারান্দা থেকে সুকান্তও ফিরল। ব্র্যাকেটে ব্যাগটা ঝুলিয়ে রেখে কাকলি বললে, 'আমার জন্যে এত সবার ভাববার কী হয়েছে?'

'তোমার জন্যে কে ভাবে?' সুকান্ত অন্য দিকে মুখ করে বললে।

'আমার জন্যে নয়?'

'না। সবাই ভাবছে সংসারের কথা, তার মান-সম্মানের কথা।'

'মানে?'

'একটা বউ চাকরি করতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফিরছে না, রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে, তখন থানায় গিয়ে ডায়রি করতে হয় তো। আর বউ-পালানোর ডায়রি করতে গেলে মানুষে কী ভাবে? সংসারের মানে টান পড়ে কিনা—'

'কেন, অনেস্ট অ্যাকসিডেন্টও তো হতে পারে।'

'পারে। তার মানেই হাজারগণ্ডা ঝামেলা। এ-হাসপাতাল থেকে ও- হাসপাতাল খুঁজে খুঁজে বেড়াও। যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে সে বাড়িতে গিয়ে খবর দাও।' সুরে দার্শনিকতার টান আনল সুকান্ত : 'হতে তো অনেক কিছুই পারে।'

'হ্যাঁ, অনেক কিছুই পারে।' কাকলি বললে, 'এখন আর ফিরে যাওয়া নেই। সেই যে ফোড়াকে জিজ্ঞেস করেছিল, ফোড়া, তুমি দেখতে কেন ছোট? ফোড়া বলেছিল, আমায় একটুখানি খোঁটো। সেই ফোড়া এখন খুঁটে দিয়েছ। বাড়বেই তো যন্ত্রণা—'

'বেচারা আফিস থেকে এসেছে ক্লান্ত হয়ে, এখুনি আবার কী কথা?' ছেলেকে একটু-বা তিরস্কার করতে চাইল মৃণালিনী : 'ও আগে একটু ঠাণ্ডা হোক, চা-টা খাক।' পরে কাকলিকে লক্ষ্য করল : 'তুমি বাথরুম থেকে এসো, আমি তোমার জলখাবার নিয়ে আসছি।'

'এই যাচ্ছি মা।'

কাপড়চোপড় ছাড়বে, ইঙ্গিত পেয়ে সরে গেল সুকান্ত।

যে প্রশ্নটা মনের মধ্যে কচখচ করছিল সেটা উৎপাটন করল মৃণালিনী : 'এত দেরি হল কেন ফিরতে?'

'এমনি হবে মা দেরি। উপায় নেই। কতগুলি ট্রাম-বাস ছেড়ে দিয়ে তবে একটা পাওয়া যায়। তারপরে দেখা হয়ে যায় কত লোকের সঙ্গে। কলেজের বন্ধু—'

'হ্যাঁ, তা তো হবেই। বাইরে বেরুলেই আরেক জগৎ।' আশ্চর্য সায় দিল মৃণালিনী।

'দেরি হলে ভাববেন না। স্বাধীনতা যখন নিয়েছি তখন দায়িত্বও নিয়েছি।'

'তা তো ঠিকই। তবু মায়ের প্রাণ—' মৃণালিনী নিচে নামল।

'কি, কী নিয়ে গেল রে দিদি?' রান্নাঘরের পাশ থেকে বিজয়া জিজ্ঞেস করল বন্দনাকে।

'এক গ্লাস গরম দুধ আর এক প্লেট জলখাবার। জলখাবারের মধ্যে লুচি আর তরকারি আর দুটো শাঁখ সন্দেশ।'

'কার জন্যে?'

'আহা, এও বুঝতে পারছেন না? ছোট বউয়ের জন্যে। চাকরি করছে বউ, মাস-মাস টাকা এনে দেবে, খাওয়াবে না?'

'ঠাকুরানী চাকুরানীকে খাওয়াচ্ছেন! এ চাকরি টিকলে হয়!' বিদ্রূপে জ্বলে উঠল বিজয়া : 'আর এই যে বড় বউটা অসুখের থেকে উঠে এসে আবার লাগল সংসারে, তাকে কোনোদিন গ্লাসভর্তি দুধ খাইয়েছে, সন্দেশ খাইয়েছে?'

'একটি প্যাঁড়া-গজাও খাওয়ায় নি।' বন্দনা ফোঁস করে উঠল।

'এই একচোখোমি সইবে না। বিজয়া গনগন করতে লাগল।

কিন্তু সহ্য না করে উপায় কী? দেশে ঠাকুরের খুড়ো মারা গেছে, এক মাসের ছুটি নিয়েছে ঠাকুর। অল্প সময়ের জন্যে বলে বদলি জোগাড় করতে পারে নি। সুতরাং, তুমি বন্দনা, বাড়ির বড় বউ, তুমি হেঁসেলে গিয়ে ঢোকো। আফিসের ভাত দাও। সে ভাত ছোট বউও খেয়ে যাবে।

'তুমি রোগা মানুষ, তুমি কেন রাঁধতে এসেছ?' উনুনের পাশ থেকে বন্দনাকে সরিয়ে দিল বিজয়া। বললে, 'এক বউ উনুনে পুড়বে আর এক বউ দিব্যি খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াবে এ কে কবে শুনেছে?'

'এটা কেমনধারা কথা হল?' মৃণালিনী তর্জন করে উঠল : 'তা হলে বলতে চাও অমন চাকরিটা ছোট বউ ছেড়ে দেবে? ছেড়ে দিয়ে তোমাদের খাওয়াবার জন্যে হেঁসেলে গিয়ে হাঁড়ি ঠেলবে?'

'ওরে বাবা, তা কি বলতে পারি?'

'তা যখন পারো না তখন ঠিক সময়ে ওকে দিতেই হবে আফিসের ভাত। নাও, সরো, তোমাদের কাউকে রাঁধতে হবে না। আমিই রাঁধব।' মৃণালিনী বিজয়ার হাত থেকে হাতাখুন্তি কেড়ে নিল সজোরে : 'কী হিংসের কথা! একটা গুণী মেয়ে নিজের জোরে দামী হয়ে উঠেছে তাই জ্বলে যাচ্ছে সকলে! ছি ছি!'

'দামী বলে দামী!' ফোড়ন দিল বিজয়া : 'মাস-মাস দু' শো টাকা।'

'বছরে চব্বিশ শো।' লেজুড় জুড়ল বন্দনা : 'তারপর বছর বাদে যখন আবার দশ টাকা বাড়বে, তখন বারো ইনটু দু' শো দশ—সে আরো বেশি। তারপর পরের বছর—'

'অঙ্ক করতে হলে নিজের ঘরে গিয়ে করো গে।' মৃণালিনী মুখিয়ে উঠল : 'এতই যখন অঙ্কের তুমি বিদুষী তখন মেয়েটাকে তো একটু শেখাতে পারো। ঝন্টুটা তো অঙ্কে ফেল করেছে শুনলাম।'

'ওমা, ঝন্টু আবার ফেল করল কবে!' প্রায় শোকের কান্না তুলল বন্দনা।

'তবে সেই যে জয়ন্তী বললে।'

'ওমা, সে তো নেচার স্টাডিতে কম পেয়েছে।'

'বেশ তো, সেই নচ্ছার স্টাডিটাই পড়াও না গিয়ে মেয়েকে। কোথায় নিজেরা বড় হবে তা নয়, যে বড় হয়েছে তাকে নামিয়ে আনার চেষ্টা। যত সব হিংসের পুঁটলি।' তারপর সময় হলে মধু ঢেলে ডাকল কাকলিকে : 'ছোট বউমা, খাবে এসো। তোমার ভাত বেড়েছি—'

দিব্যি আগ বাড়িয়েই খেল কাকলি। নানারকম অভিযোগ অনুযোগ যে উঠছে এখানে-ওখানে সে তা গায়েই মাখছে না। মহৎ কাজ করতে গেলেই সমালোচনা জোটে। আর যারা ক্ষুদ্র তারা নিন্দে ছাড়া আর কী করবে?

আঁচাচ্ছে, ভূপেন জিজ্ঞেস করল, 'পেট ভরল তো মা?'

'আফিস-টাইমের খাওয়ার আবার পেট ভরে!' হেমেন বললে, 'একটা কাঁটা চুষবার বা ডাঁটা চিবুবার সময় নেই। তা ক্যান্টিনে খেয়ে নিয়ো হেভি টিফিন—'

'তোমাদের আফিসের স্যালারি-পেমেন্ট কি উইকলি না ফোর্টনাইটলি?' এ জিজ্ঞাসা প্রশান্তর।

সবাই একেবারে পঙ্‌ক্তিতে টেনে নিয়েছে। নীরবে দূরে দাঁড়িয়ে অনুকম্পা করতে পাচ্ছে না, প্রত্যক্ষে দিতে হচ্ছে বা মর্যাদার ছাপ! দলের স্বাক্ষর।

'শ্বশুর-ভাসুরের আগেই চললেন!' বললে বন্দনা।

'শাশুড়ি পান সেজে হাতে গুঁজে দিচ্ছে।' বিজয়া ঠোঁট টিপে বললে।

শুধু তাই নয়, সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিল মৃণালিনী। বললে, 'সাবধানে যেও।'

'আর যদি দেরি হয়, মিছে ভাববেন না—' হাওয়াতে আঁচল দুলিয়ে বেরিয়ে গেল কাকলি।

সেদিনও কাকলির দেরি হল ফিরতে।

'আজও দেরি হল? সুকান্ত জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্নটাই যেন কেমন! দোষ-ধরা! কৈফিয়ত-চাওয়া! আজও কষ্ট হল ফিরতে—এমনি করে বলা যেত না? বাসের জন্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে—শুধু এটুকু সহানুভূতি?

কাঁধ থেকে ব্যাগের স্ট্রাপটা মুক্ত করতে করতে কাকলি বললে, 'রোজ দেরি হবে।'

'প্রত্যহ?'

'প্রত্যহ। আমি তো হনুমান নই যে ঝুলতে-ঝুলতে আসব? যতক্ষণ না সিট পাব বুঝি, ততক্ষণ অপেক্ষা করি।'

'ঢের মেয়ে তোমার আগে আসে।'

'আমি অমনি ভিড়ের মধ্যে হাত তুলে রড ধরে আসতে পারব না কখনো।'

'তোমার জন্যে একেবারে ফাঁকা চাই, হাওয়া-চলাচলের রাস্তা চাই।'

'হ্যাঁ, চাই। আর চাই এখন এ ঘর ছেড়ে চলে যাও। আমি খাটে হাত-পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম করি।'

'আমার খাটে?' অবাক হবার ভাব করল সুকান্ত।

'তুমি এ ঘর থেকে সরে গেলেই এ খাট আর তোমার খাট থাকবে না, যার-তার খাট হয়ে যাবে।' বেশে-বাসে হালকা হতে চাইল কাকলি। বললে, 'এখন মেঝেতে কিছু পাতবার আগ্রহ হচ্ছে না—'

'তা আমি যাচ্ছি।' সুকান্ত ঘুরে দাঁড়াল : 'কিন্তু এখন কি তোমার শোবার সময়?'

'শোবার সময় নয় মানে? আমি এখন হাত-পা টান করে বিশ্রাম করব না?'

'কিন্তু, তুমি জানো, বাড়িতে ঠাকুর নেই।'

'ঠাকুর নেই তো আমি কী করব?' ঝিলকিয়ে উঠল কাকলি : 'আমি রান্না করতে ঢুকব?'

'রান্না ঠিক না করলেও বউদিকে তো একটু সাহায্য করতে পারো।'

'আমি হাক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে এখন আবার সাহায্য করতে লাগব? লজ্জা করে না বলতে? কেন, তোমার নিজের হস্ত-পদ নেই? তুমি যাও না, লাগো না সাহায্যে।' সুকান্তকে উপেক্ষা করেই খাটের দিকে এগুল কাকলি। বললে, 'খুব মজা! তরোয়াল দিয়ে যুদ্ধও করবে আবার দাড়িও কামাবে।'

'জানি, সেজন্যেই তো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরো নি।'

'সেজন্যে মানে!'

'যাতে রান্না করতে না হয়—'

'খুব বুঝেছ! আর, বেশ, যদি সেই কারণই হয়ে থাকে তো দোষের কী! ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া দিয়ে তুমি গাড়ি টানাবে? বুদ্ধি খুব খুলছে মগজে। আরো অনেক কারণই খুঁজে পাবে ক্রমশ।' খাটের উপরই এলিয়ে পড়ল কাকলি। বললে, 'তখনই বলেছিলাম বেশি ঘাঁটিও না, খেপিয়ো না আমাকে। সুখে শান্তিতে থাকতে দাও।' চোখ বুজল কাকলি।

কিন্তু শান্তি কি আছে? শাশুড়ি আবার দুধ আর খাবার নিয়ে আসছে।

'আজ কী নিয়ে গেল গো?' নিচে রান্নাঘরে বিজয়া জিজ্ঞেস করল বন্দনাকে।

'আজ পরোটা আর ডিমের ডালনা।'

'তারপর রাত্রে আরেকবার হবে।'

'যে যাই কেননা রাঁধো, ডিস্ট্রিবিউশন কর্ত্রীর হাতে।' বন্দনা বললে, 'মাছের বাটি ঠিক সাজাতে আসবে আর ল্যাজটা ঠিক ছোট বউয়ের বাটিতে। আগে ছেলেকে খাওয়াত এখন বউকে খাওয়াচ্ছে।'

'ল্যাজা তো দেখছি দু'খানা।' বিজয়া বললে।

'দ্বিতীয় খানা নিজে খাবে।'

দু' জনে হাসতে লাগল একত্র হয়ে।

মৃণালিনীকে ঢুকতে দেখে উঠে বসল কাকলি। বললে, 'ও এখন থাক, মা। একটু বিশ্রাম করে নিয়ে গা ধুয়ে একেবারে নিচে গিয়ে খাব।'

'তাই খাবে। কিন্তু বলি শরীর খারাপ হয় নি তো?'

'না।' মৃদু হাসল কাকলি।

'মাথা ধরে নি তো?'

'না।'

'গা-হাত-পা ব্যথা হয় নি তো?'

না, খাটে আর শোয়া গেল না। নেমে পড়ল কাকলি। বেশবাস বদলাতে উদ্যোগী হল। দুধ আর খাবারের প্লেট নিয়ে নিচে গেল মৃণালিনী।

'চাকর দিয়ে পাঠালে চলবে না, নিজে নিয়ে যাবে।' বললে বিজয়া।

'নিয়েও আসছে নিজে।' বন্দনা বললে, 'এখন বসে থাকবে, যতক্ষণ না স্নান করে আসে। কাছে বসিয়ে খাওয়াবে।'

সারাক্ষণই একটা কথা কানের কাছে বাজতে লাগল কাকলির। সাহায্য। কথাটা যেন মন থেকে সরে গিয়েছিল, আবার ফিরে এল জীবন্ত হয়ে। কেন, বন্দনার অসুখের সময় ও সাহায্য করে নি? এখনও করছে না? ওর আয়ে সাহায্য হবে না সংসারের? তোমার—পরমগুরুর?

আমাকে সাহায্য করে কে?

চট করে মনে পড়ে গেল বরেনের কথা।

মানুষের জীবনে দুটো জিনিসই তো আছে। নিজের বিপদে সাহস আর পরের বিপদে সাহায্য।

দুপুরবেলায়ই ফোন তুলে নিল কাকলি।

'আমি কাকলি। কাকলি মিত্র।'

'আবার পদবী কেন?'

'বাঃ, পদবীব জন্যেই তো সব।' কাকলি হাসি মিশিয়ে বললে, 'সভ্যসমাজে সম্মানের দুই পা। এক পা পদক আরেক পা পদবী।'

'কথা আপনি ভারি সুন্দর বলেন।'

'শুধু কথা বলে লাভ কী? চিঁড়েও ভেজে না। আসল হচ্ছে কাজ। আর আপনি কাজ করেন সুন্দর।'

'কেন, কিছু করতে হবে?' মর্ম পর্যন্ত কর্ণ করে তুলল বরেন।

কাকলি আর কথা বাড়াল না। বললে, 'এখন আপনি ফ্রি আছেন?'

'আমি সব সময়েই ফ্রি।'

'এখন একবার আপনার ওখানে যেতে পারি?'

'আসবেন? আসুন—'

'সেই আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল—'

'হ্যাঁ, সেই কথা, নতুন কথা, যে কোনো কথা হোক—চলে আসুন।' নিজেরও অজান্তে উৎসাহ বোধ হয় একটু বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ল। গলায় ফের গদ্য এনে বরেন বললে, 'গাড়ি পাঠিয়ে দেব?'

'না।'

'কী করে আসবেন তবে?'

'হেঁটে। কতটুকুন বা রাস্তা। আর, কত হাঁটছি আজকাল।'

হেঁটে আসা মানেই দেরি হয়ে যাওয়া। যখন মন একবার বলেছে যাই, তখন যত দ্রুত বেরিয়ে পড়া যায়। হেঁটে আসা মানেই আরেকজনকে খাটিয়ে মারা। বসিয়ে বসিয়ে খাটিয়ে মারা। অকারণে দারোয়ান-চাপরাসিরও পায়ের শব্দে চমকিয়ে তোলা।

হেড অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলে দুপুরের রোদেই বেরিয়ে পড়ল কাকলি। দুপুরটাই ভালো। বিজিনেস-টক যখন, তখন আফিস-টাইমটাই প্রশস্ত। আফিস-টাইমের বাইরে হলে কেমন গল্প-গল্প গন্ধ এসে

পড়ে। পিঠতোলা খাড়া চেয়ার না এসে কেমন ইজি-চেয়ার এসে যায়। কিছুতেই যেন কথায় প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য আনা যায় না।

সদ্য বার হওয়া নতুন একখানা উপন্যাসের মত এসে দাঁড়াল কাকলি।

বরেন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। বললে, 'বসুন।'

বসলে নিজেও বসল। কী কথা বলে শোনবার জন্যে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কাকলি একটু অস্বস্তি বোধ করছে বুঝি, কিন্তু এ অবস্থায় অন্য দিকে মুখ করে থাকারও তো কোনো মানে হয় না। অন্য দিকে মুখ করে থাকলে ভেবে নিতে পারে তাকে অগ্রাহ্য করছি। তার কথার কোনো মূল্য দেব না বলে আগে থেকেই আমি প্রস্তুত।

দ্বিধা কিসের, বলেই ফেলো না ঢোক গিলে। জানি তো কী বলবে। নিজের চাকরি জোগাড় হয়েছে, এখন স্বামীর জন্যে একটি জোগাড় হয় কিনা তারই ফিকির খুঁজছ। আছ বেশ। তোমার চাকরি হল, তোমার স্বামীর চাকরি হল, তোমরা দুটিতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর করলে—তার মধ্যে আমি কোথায়? আমার চাকরি কোথায়? আমার মাইনে কী!

'যদি অপরাধ না নেন তো বলি—' কাকলির গলার কাছটা কাঠ-কাঠ লাগল।

'না, না, মেয়েদের আবার অপরাধ কী! পাগল, মাতাল, শিশু আর মেয়ে—পেনাল কোডে এদের কোনো অপরাধ নেই।'

'সে কী কথা?' কাকলি হকচকিয়ে উঠল : 'কত মেয়ে কত অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে জেল খাটছে—'

'খাটুক। কিন্তু যেটা শ্রেষ্ঠতম অপরাধ, অ্যাডালটারি, সেটাতে মেয়েরা নির্দোষ, নির্মুক্ত—আইনের বাইরে।' হেসে উঠল বরেন, সূক্ষ্ম চোখে লক্ষ্য করল, কাকলির মুখটা অনুরূপ উজ্জ্বল হল না। তাই তাকে সাহস দেবার জন্যে বললে, 'কথাটার জন্যে আপনিও যেন আমার অপরাধ নেবেন না। কিন্তু জিজ্ঞেস করছি, সুকু কি আর রিসার্চ করবে না? চাকরি করবে বলছে?'

'না, না, আমি ওর কথা বলতে আসি নি।' কাকলি উজ্জ্বল হল।

'তবে কার কথা বলতে এসেছেন?' আশ্বস্ত হয়েও হতে পারছে না বরেন।

'আপনার এখানে কাজ করে—ঐ যে দীপঙ্কর—দীপঙ্করবাবু—তার কথা বলতে এসেছি।'

মুহূর্তে বরেন পাথর হয়ে গেল। একটা পেপারওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বললে, 'কেন, তার কী হয়েছে?'

এতক্ষণ যখন লঘু ছিল, ভালো ছিল। কিন্তু এখন তার এ কী চেহারা!

তবু, হতাশ হবার এখুনি হয়েছে কী! শেষ পর্যন্ত দেখি।

'তার ঘোর দারিদ্র্য। দেখে এসেছি নিজের চেখে।' কাকলি বললে ঠাণ্ডা হয়ে।

'দেখে এসেছেন? দীপঙ্কর নিয়ে গিয়েছিল বুঝি?'

'হ্যাঁ—' নিজেই গিয়েছিল উদ্যোগ করে, বলতে বাধল যেন কাকলির।

'কী দেখলেন?'

'দেখলাম নোংরা বস্তির মধ্যে রয়েছে। মানুষের বসবাসের উপযুক্ত নয় এমন এক আবর্জনার কুণ্ডে। বাপ-মা, ভাই-বোন তো আছেই, তার উপরে ছেলেমেয়ে সমেত এক দিদি। বাপ অথর্ব আর দিদিটি বিধবা—'

'তাতে আপনারই বা কী, আমারই বা কী!' বরেন পেপারওয়েটটা ধরল মুঠো করে।

গম্ভীর থাকবার কোনো মানে হয় না তাই হাসল কাকলি। বললে, 'আমার কষ্ট, আপনার দয়া।'

'কষ্ট করা সোজা, দয়া করা কঠিন।'

'শীতে ছেলেপিলেগুলোর গায়ে জামা নেই, শোবার বিছানা নেই—'

'তা আমাকে কী করতে হবে?' প্রশ্নটা সুবিধেমত হল না, বলেই বুঝতে পারল বরেন। মোলায়েম করল : 'তা আমাকে কী করতে বলছেন?'

'আমি বলছি না, ও বলছে।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি—ও বলছে। কিন্তু কথাটা কী?'

'কথাটা—' চোখ নিচু করল কাকলি : 'যদি ওর কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেন। বাড়তি কাজ করছে নাকি, তারই জন্যে বাড়তি মাইনে।'

'কত বাড়িয়ে দিতে হবে তা বলে দেয় নি?'

'না।'

'কিন্তু জিজ্ঞেস করি দীপঙ্কর আপনার কে?'

ভয়ে-ভয়ে চোখ তুলল কাকলি। 'কেউ না।'

'আর আমি?'

প্রশ্নের অস্বস্তিটা হাসি দিয়ে ধুয়ে দিতে চাইল কাকলি। বললে, 'কেউ না।'

'তা হলে না-তে না-তে কাটাকাটি হয়ে গেল।' পেপারওয়েটটা ছেড়ে দিল বরেন।

'না, না, কাটাকুটি নয়। আপনি আমার স্বামীর বন্ধু, ও-ও আমার স্বামীর বন্ধু।'

'তা হলে বলতে চান সমান-সমান? আমি আর ও সমান আপনার কাছে?' অভিমানীর মত মুখ করল বরেন।

হাঁপিয়ে উঠল কাকলি।

'যদি সমান-সমানই হয় তা হলেও প্লাস-মাইনাস হয়ে শূন্যই হয়ে গেল।'

'না, আপনি বেশি আমার কাছে।' গলা এতটুকু কাঁপল না কাকলির।

'আর ও যখন তদবির করতে আপনাকেই পাঠিয়েছে তখন ও-ও নিশ্চয় ভেবেছে, আমারও কাছে আপনিই বেশি। শুনুন ওর এ ভাবনাটা অন্যায়। এ ইঙ্গিতটা অশুচি।'

মাটির ঢিপি হয়ে রইল কাকলি।

'নইলে সুকু, যে কমন্ ফ্রেণ্ড, তাকে না পাঠিয়ে আপনাকে পাঠায় কেন? তা হলে কি বুঝব যে আপনি সত্যি করে ওরই লোক?' পেপারওয়েটটা হাতের মুঠোয় নিয়ে ছেড়ে-ছেড়ে দিয়ে ধরতে লাগল বারে-বারে : 'মানে, আমার মার্কেট থেকে কিছু টাকা বেরিয়ে ওর পকেটে গিয়ে ঢুকলেই আপনি খুশি?'

'বাঃ, আপনি দাতা আর ও প্রার্থী।' অনেকক্ষণ পরে কথা খুঁজে পেল কাকলি।

'আমি লুণ্ঠিত আর ও দস্যু।'

আস্তে আস্তে উঠে পড়ল কাকলি। সনমস্কার বললে, 'আচ্ছা যাই, অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম আপনাকে—'

'শুনুন একটা কথা বলি।' মামুলি সরকারি কথার ধার দিয়েও গেল না বরেন। বললে, 'আঁকড়ে থাকুন। পরের জন্যে জায়গা ছেড়ে উঠতে গিয়েছেন কী, জায়গা ফসকে গিয়েছে। পরকে সাহায্য করা অনেক সময় বিপদকে সাহায্য করা—'

'আচ্ছা আসি।' সুইং-ডোরের কাছে এসে আরেকবার ফিরে তাকাল কাকলি।

'যদি আপনার নিজের জন্যে হয়, সুকুর জন্যে হয়, আসবেন। কে না কে এক লোফার—'

দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেল কাকলি।

কলিং বেল টিপল বরেন। হ্যাঁ, দীপঙ্করকে ডাকো।

দীপঙ্কর নেই আফিসে।

রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল, কাকলি এখনো বাড়িতে নেই।

ফিরতে-ফিরতে ন'টা। সেন্টু? সেন্টু ঘুমিয়ে পড়েছে। তা হলে আর ভাবনা কী। এখন যে যাই বলুক, যে যাই জবাবদিহি চাক, কোথাও কাকলি ঠেকবে না, ভয় পাবে না।

'এত দেরি হল?' সুকান্ত কিনা অভিভাবকদের সর্দার, তাই সেই প্রথমে জিজ্ঞেস করলে।

'সিনেমায় গিয়েছিলাম।' চটপট বললে কাকলি।

'একা-একা?'

'একা-একা কেউ যায়? কোনোদিন গিয়েছি?'
'তবে সঙ্গে কে ছিল?'
'তাও শুনবে? আমার আফিস-পাড়ার ক'জন বন্ধু।'
'বন্ধু?'
'হ্যাঁ, মিত্র।'
'কোন লিঙ্গ?'
'ক্লীব লিঙ্গ।'
'মানে?' সুকান্ত প্রায় গর্জে উঠল।
'মিত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।'
নিশ্বাস ফেলে সুকান্ত বললে, 'বাড়িতে একটা খবর পাঠাতে তো পারতে।'
'কী করে পাঠাব? বাড়িতে টেলিফোন আছে?'
ছেলের বউয়ের খবর নিতে আসছে মৃণালিনী—এখন আর জলখাবারে না গিয়ে একেবারে ভাতে যাক—শুনতে পেয়েছে কথাটা। উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আস্তে-আস্তে এবার টেলিফোন বসবে—কী সুন্দর টেলিফোনের বাজনা! বেজে চলেছে তো বেজেই চলছে।'
'বাড়ি হয়েও তো যেতে পারতে।'
'কোন দুঃখে? তুমিও মাঝখানে না এসে এমনি একেবারে সিনেমা দেখে ফেরো নি?'
'আমি তো কতদিন রাত বারোটার সময়ও ফিরেছি।'
'দরকার হলে আমিও ফিরব।'
'যদি আমি একদিন রাত্রে একেবারেই না ফিরি?'
'বেশি কথা কী, দরকার হলে আমিও সারা রাত বাইরে কাটাব।'
'তা কাটাও না, আজ থেকেই শুরু করো না কাটাতে। ন'টা তো কখনই বেজেছে, রাত পোয়াবার তা হলে আর বাকি কী। তবে আর ফিরলে কেন? একেবারে ভোর করে এলেই পারতে।'
'ভোর হলেই বা ফিরব কেন? বাইরেতেই বিভোর হয়ে থাকব।'
'তাই থাকো। ঘর খোঁজো।' ঘর ছেড়ে চলে গেল সুকান্ত।
সেদিন আফিস-ফেরত কাকলি চলে এল বিনতাদের হোস্টেলে।
'বিনতা আছিস?' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতেই হাঁকল কাকলি।
'কে, কাকলি? আয় আয় আয়—' ঢেউয়ের মত কাকলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিনতা। সমস্ত গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে আলিঙ্গন করল। বললে, 'তোকে ধরলে তোকে ছুঁলেও ব্রহ্মাস্বাদের অনুভূতি হয়।'
খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'ব্রহ্ম এখন নিরাকার হয়ে গিয়েছে।'
'ফাজলামো করিস নে।' ভুরু বাঁকাল বিনতা।
'সত্যি, সত্যি আমি ঘর খুঁজতে বেরিয়েছি। তোর এখানে পাওয়া যাবে ঘর?'
'ক'দিন বাদে আমার পাশের ঘরটাই খালি হবে। তখন তোকে ওটা পাইয়ে দেব। তারপর একদিন তোর গতির্ভর্তাপ্রভুসাক্ষীকে নিয়ে আসবি ধরে। দরকার হলে মেয়ে সাজিয়ে। আর আমি আমার বন্ধ-ঘরের দরজায় একটা ছেঁদা করে রাখব। সেই গর্ত দিয়ে উপোসী চোখে দেখব তোদের খাসলীলা। খবরদার, আলো নেভাতে পারবি নে।'
'যদি ধরা পড়ি?'
'হাত জোড় করে বলবি, আর করব না, স্যার। ফার্স্ট অফেন্স, স্যার। টেকনিক্যাল অফেন্স, স্যার। ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেবে।'
দুই বন্ধুনী হাসতে লাগল।

একত্রিশ

দীপঙ্করকে আফিস-ঘরেই ডেকে পাঠাল বরেন।

কোনো ভূমিকা না করেই মুখের উপর ছুঁড়ে মারল প্রশ্ন : 'আপনি এটা কী ভেবেছেন?'

কাঠের পুতুলের মত তাকিয়ে রইল দীপঙ্কর।

'আপনি মিসেস বোসকে দিয়ে ক্যানভাসিং করাচ্ছেন?'

'কে মিসেস বোস?' যেন সাত হাত জলের তলা থেকে দীপঙ্কর বললে।

'সুকান্ত বোসের স্ত্রী। চেনেন না সুকান্তকে?'

'ও, হ্যাঁ, বুঝেছি—' দীপঙ্কর ঢোঁক গিলল।

'বুঝেছেন? তাকে দিয়ে তদবির করাবার মানে?'

'একে ঠিক তদবির বলে না—'

'তবে কী বলে?'

কী বলে ভাষাটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছে না দীপঙ্কর। বললে, 'কাজ আন্দাজে আমার মাইনেটা কম তাই সেটা কিছু বাড়িয়ে দেবার জন্যে আপনার কাছে আবেদন করেছিলাম। আজ নয় কাল বলে আপনি শুধু মুলতুবি রাখছিলেন। কিছুতেই আপনার গা হচ্ছিল না। তাই, মিসেস বোসের সঙ্গে আপনার জানাশোনা আছে দেখে তাঁকে বলেছিলাম আপনাকে অনুরোধ করতে—'

'আমার সঙ্গে কত লোকেরই তো জানাশোনা', প্রায় গর্জে উঠল বরেন : 'কই, আর কাউকে তো পাঠান নি তদবিরে।'

'যাকে পাঠাব তার সঙ্গে আমারও তো একটু জানাশোনা থাকা দরকার। তা সেটা যতই ক্ষীণ হোক—'

'আপনার বেলায় ক্ষীণ আর আমার বেলায় গাঢ়? আপনি ভেবেছেন ভদ্রমহিলা বললেই আমি একেবারে গলে যাব? উথলে পড়ব?' বরেন গমগম করে উঠল।

'কিছুই ভাবি নি স্যার—'

'ভাবেন নি? কিন্তু ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। জঘন্য।'

'ইঙ্গিত?'

'ন্যাকা সাজবেন না। এই বোঝাতে চেয়েছেন, আমার কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, চরিত্র নেই—একজন আগন্তুক ভদ্রমহিলা হেসে-কেশে একটা কিছু অনুরোধ করলেই আমি তেড়েফুঁড়ে তা পালন করব। আমি বুদ্ধির ঢেঁকি, অনুরোধের ঢেঁকি গিলতে আমার বাধবে না—'

'অত তলিয়ে কিছু বুঝি নি।' দীপঙ্কর হাঁসফাঁস করে উঠল : 'তলিয়ে যাচ্ছিলাম, হাতের কাছে একটা খড়কুটো পেয়ে ধরলাম আঁকড়ে।'

'আর ভাবলেন সেই খড়কুটোটা আমার কাছে কাঠ-বাঁশ হয়ে উঠবে। ভুল, আপনার ভুল হয়েছে। অত সহজে হেলে-পড়ার লোক নই আমি। হালকা-পলকা নই।'

'আমাকে মার্জনা করবেন।'

'হ্যাঁ, যান। আপনাকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিচ্ছি। ফার্মের সম্ভ্রমের উপর ছায়া পড়ে এমন কোনো কাজে হাত দেবেন না, আভাসে-ইশারায়ও না।' চলে যাচ্ছিল দীপঙ্কর, ডাকল বরেন। বললে, 'শুনুন। আপনার মাইনে বাড়বে না।'

'বাড়বে না?'

'না। বাড়বার কোনো সংগত কারণ নেই।'

'নেই?'

'না। শত তদবির সত্ত্বেও না।'

যদি এখুনি, এই মুহূর্তে, মুখের উপর চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারত দীপঙ্কর! নিষ্ঠুরতার মুখে ছুঁড়ে মারতে পারত একতাল বিদ্রোহের কাদা!

দুর্বলের মত চলে যাচ্ছে, দীপঙ্করকে আবার ডাকল বরেন : 'শুনুন, যদি ভদ্রভাবে শুদ্ধভাবে কাজ করতে চান তো থাকুন, নইলে অন্যত্র পথ দেখুন। সেখানে যান যেখানে ইউনিয়ন আছে, স্ট্রাইক আছে, ময়দান আছে। দাবি মানাবার ঝাণ্ডা আছে। এখানে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, মর্জির উপরে আর্জি। এখানে বিশেষ সুবিধে নেই, না তদবিরে, না জবরদস্তিতে। সুতরাং—'

বাড়ি এসে মন ভার করে বসেছে দীপঙ্কর। ওর মন আবার ভালো থাকে কবে? ওই তো ওর মুখের স্বাভাবিক রঙ। দুর্গাবালা সাহস করে বসল পাশ ঘেঁষে। বললে, 'তোর তো এইবার মাইনে বাড়বে শুনছি—'

না শুনে উপায় কী। আশার কথা না শুনে মানুষ বাঁচবে কী করে, কী করে তাকাবে সামনে? আশা পূর্ণ হলেও আবার আশা করবে, কেবলই আশা করবে। আকাশে সূর্য থাকলেও চাইবে আরেক স্বপ্নের সূর্য। কিছুতেই আশার শেষ হবে না। কেবল বেড়েই চলবে। দাবি বাড়বে, মাইনেও বাড়বে। মাইনে বাড়লে আবার দাবিও চড়বে। সব সময়ে এক পৃষ্ঠায় বসে শুনবে আরেক পৃষ্ঠার গুঞ্জরন।

দীপঙ্কর চুপ করে থাকবে এ আর নতুন কথা কী।

'যদি বাড়তি কিছু পাস এবার, তিনখানা শাড়ি কিনিস।'

'তিনখানা?' বলে ফেল দীপঙ্কর।

'অন্তত দু'খানা তো বটেই। একখানা তোর দিদির, আরেকখানা আভার।'

'আর তৃতীয় ব্যক্তিটি যে তুমি তা না বললেও বুঝছি। কিন্তু মা, মাইনে বাড়বে না।'

'বাড়বে না?'

'না। বলে দিয়েছে মুনিব।'

'যতই বলুক, ঠিক বাড়বে দেখিস। কাকলি বলেছে চেষ্টা করবে, মুনিবের সঙ্গে ওর চেনা আছে।' দুর্গাবালা তবুও দড়ি ছাড়বে না, ঝড়ের মধ্যেই আলো জ্বালাবে : 'আর ও মেয়ে অসাধ্যকে সুসাধ্য করার মেয়ে—'

'থামো।' ধমকে উঠল দীপঙ্কর : 'কাকলি চেষ্টা করেছিল, আর সে চেষ্টা নিস্ফল হয়েছে।'

হাল তবুও ধরে থাকবে দুর্গাবালা : 'এক চেষ্টায় হয় নি, আরেক চেষ্টা করবে। চেষ্টার কি শেষ আছে? এক দরজা বন্ধ হয় তো আরেক দরজা খুলবে। চালাক মেয়ে, ও ঠিক আদায় করে দেবে দেখিস।'

'না, দেবে না। বাড়বে না মাইনে।' উঠে পড়ল দীপঙ্কর। বললে, 'ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরতে হবে।'

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে কাকলি সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছে। প্রথমেই গেল মৃণালিনীর কাছে। বললে, 'মা, মাইনে পেয়েছি।'

'অ্যাঁ! কই, দেখি।' মুখ ঢেকে খবরের কাগজ পড়ছিল—ধড়মড় করে উঠে বসল মৃণালিনী।

এ কী! কাকলির হাতে তিনটে চৌকো কাগজের বাক্স!

'মাইনের টাকায় তিনখানা শাড়ি কিনলাম মা।' নিচু খাটে মৃণালিনীর পাশে গিয়ে বসল কাকলি। বড় বাক্সটা খুলে বললে, 'এ কড়িয়ালখানা আপনার জন্যে, আর এ দু'খানা কাঞ্জিভরম—কাকিমা আর দিদির জন্যে। কি, ভালো নয়?' বলে প্রণাম করল হেঁট হয়ে।

আনন্দে ঢলঢল মুখে শাড়িগুলি দেখতে লাগল মৃণালিনী। সন্দেহ কি, তার শাড়িটাই অভিজাত। তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, 'মাইনে কত পেলে?'

'ভাঙা মাস তো, তাই পুরো পাই নি।' পাশ কাটাতে চাইল কাকলি।

'তবু থোক কত এল হাতে?' মৃণালিনী লোলুপ চোখে তাকাল।

'তা একুশ দিনের মাইনে—'

'কত?'
'বলবার মতন তেমন কিছু নয়।'
'শাড়ি তিনখানির দাম কত হল?'
'গায়ে টিকিট আঁটা নেই?' স্পষ্ট হিসেবের মধ্যে আসতে চাইল না কাকলি : 'দাম তো ভারি হাতেই নিয়েছে। কি, ঠকেছি বলে মনে হয়? বেশ দামী বলে মনে হচ্ছে না?'
জমিগুলি আবার পরীক্ষা করল মৃণালিনী। বললে, 'এত দামী কেনবার কী হয়েছিল? হাতে তো তা হলে বিশেষ কিছুই রইল না।'
'তা আছে কিছু।'
'কত?' মনে-মনে আরেকবার হাত বাড়াল মৃণালিনী।
'সামান্যই। তা দিয়ে আবার অন্য কেনাকাটা আছে।' কাঞ্জিভরম দু'খানা নিয়ে বেরিয়ে গেল কাকলি।
বিজয়ার ঘরে ঢুকে বিজয়াকে প্রণাম করলে।
'আমার প্রথম মাইনের প্রণামী।' হাসি-মুখে বললে কাকলি, 'কোনটা আপনার পছন্দ?'
'আমাকে দেবার কী হয়েছিল!' চোখটা অন্য দিকে করল বিজয়া।
'সে আমি বুঝব। এখন দেখুন কোনটা দেব?'
'দুটোই তো রঙিন। রঙিন পরবার কি বয়েস আছে?' দৃষ্টিটা তবু সরল করল বিজয়া।
'রঙ কি বয়সে? রঙ মনে। তবু দুটোর মধ্যে এটাই বেশ 'সোবার' মনে হচ্ছে। এটা দিই।' কোলের মধ্যে ফেলে দিয়ে পালাল কাকলি।
'আর, দিদিভাই, এটা তোমার।'
'এই ঝলমলে শাড়ি দিয়ে আমি কী করব?'
'পরবে।'
'পরে, যখন ঠাকুর থাকবে না, তখন রান্নাঘরে বসে হাঁড়ি ঠেলবে। বলো, শেষ করে যাও কথাটা—'
কাকলি পালাল নিজের ঘরে। সুকান্ত মজুত নেই, এ এক এখন শান্তি। ফাঁকা পাওয়া কখনো কখনো টাকা পাবার মতই মোলায়েম।
প্রথমে শামিল হল বন্দনা-বিজয়া।
'বড় গাছেই কাছি বেঁধেছে।' বিজয়া টিপ্পনী কাটল : 'মহারামীকে খোল-বিচালি দিয়ে আমাদের বেলায় শুধু ঘাস-জল। দিবি তো সামন করে দে। সাম্যবাদের যুগ এখন—'
'আপনি এক কাজ করবেন। নেমন্তন্ন-বাড়িতে পরে যাবে বলে সেদিন আপনার সেই মুর্শিদাবাদীটা নিয়ে যেমন আর ফেরত দিল না, আলমারিতে পুরল, আপনিও তেমনি এক বেলা পরবেন বলে নিয়ে বেমালুম বাক্সে ভরবেন।' শাশুড়ির পক্ষপাতিত্বে অসন্তোষে ছিল, তাই সহজেই বলতে পারল বন্দনা : 'তা হলেই জব্দ হবে।'
'আমাদের লাগবে না।' বললে বিজয়া, 'যে গরলডাকিনী বউ এসেছে সেই পারবে জব্দ করতে।'
পরে শামিল হল মৃণালিনী-বন্দনা।
'তোমাকে বুঝি ঝলমলেটা দিয়েছে?' মৃণালিনী যাচাই করতে এল।
'কী করি! কাকিমা একেবারে থাবা বসিয়ে কেড়ে নিলেন ভালোখানা।' বললে বন্দনা।
'তুমি নিলে কেন? বললেই পারতে, আমি ছেলেপুলের মা, গম্ভীর রঙের খানাই আমাকে দাও। আর উনি হাত-পা-ঝাড়া একলা মানুষ, বুড়ি হয়েও ছুঁড়ি-ছুঁড়ি করছেন, উনিই নিন ঝলমলেটা—'
'আমি ওটা পরব না। পর্দা তৈরি করব।'
'দিবি তো আপনজনদের দে, ডিরেক্ট লাইনদের।' বললে মৃণালিনী, 'কাকিমাকে দেওয়া কেন?'
শেষে শামিল হল মৃণালিনী-বিজয়া।
'কী ক'টা টাকা পেয়েছে, আদেখলার মত তছনছ শুরু করে দিয়েছে।' মৃণালিনী নিভৃত হল বিজয়াকে নিয়ে : 'প্রথমেই একেবারে তিনখানা শাড়ি কেন? সেরা দুই গুরুজন, দুই শাশুড়িকেই প্রথমে দিলে হত। বড় বউমাকে গোড়াতেই দেওয়া কেন?'

'ঠিক কথা।' দিব্যি সায় দিল বিজয়া : 'বড় বউমাকে দিতে হলে বাসন্তীকেও দিতে হয়। ওরা এক পর্যায়।'

'আর আমার বাসন্তীর কী কষ্ট!'

'পোশাকি একটাও শাড়ি নেই হয়তো।'

'পোশাকি! আস্ত একখানা আছে কিনা তাই বা ঠিক কী! যদি সত্যিকার কারু দুঃখ দূর করা যায় তা হলে টাকা রোজগারের মানে হয়, নইলে উপর-উপর শুধু বাবুয়ানার জন্যে চাকরি—ছি ছি!'

সুকান্ত যখন বাড়ি ঢুকছে, প্রথমেই, নিচে বিজয়ার সঙ্গে দেখা।

'ছোট বউমা তোমার জন্যে কী আনল?' জিজ্ঞেস করল বিজয়া।

'তার মানে? দাঁড়িয়ে পড়ল সুকান্ত।

'প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে সে যে মোচ্ছব বসিয়েছে। আমাদের তিন অচাকরানীর জন্যে শাড়ি এনেছে তিনখানা। তোমার জন্যে—'

'আমার জন্যে হয়তো দিল্লির সিংহাসন।'

ঘরস্থ হবার আগেই ডাকল মৃণালিনী। বারান্দার নিরালায় নিয়ে গিয়ে নালিশ জানাতে বসল।

'ছোট বউমা কত মাইনে পেল জানতেই পেলাম না।' বললে মৃণালিনী, 'জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরও দিল না।'

'উত্তরও দিল না?'

'না। তিন-তিনটে ফ্যাশনের শাড়ি কিনে এনেছে—কত দাম তাও বললে না।'

'কী বললে?'

'বলবেই না কিছু, তা, কী বললে!' ভেঙচে উঠল মৃণালিনী : 'তারপর নগদ কত টাকা হাতে আছে সে সম্বন্ধেও একেবারে চুপ। টাকা নিয়ে যদি ইচ্ছেমত ছিনিমিনি খেলে, কেউ শাসন করবার না থাকে, তা হলে চাকরি তো নয়, অনর্থ। সংসারেরই যদি সুরাহা না হয় তা হলে আর লাভ কী। কত সাধ ছিল বউয়ের প্রথম মাসের মাইনে থেকে আমার ঘরে একটা রেডিও বসবে। তা নয়, যত সব আজেবাজে জিনিস। শুধু শাড়ি পরালেই তো হল না, ধোয়াবার খরচ দেবে কে? তখন—যখন শাড়ি ময়লা হবে? যখন নেমন্তন্ন-বাড়ির মাংসের ঝোলের দাগ লাগবে? আসলের সঙ্গে দেখা নেই, সুদের পরিপাটি!'

বিজয়ার ঘরের রেডিওতে কাঁটা ঘোরাবার স্বাধীনতা নেই মৃণালিনীর। তার কত দিনের সাধ, সে ঘরে-বারান্দায় কাজে-অকাজে ঘুরে বেড়াবে আর রেডিও বাজবে অবিশ্রান্ত। ঢালাও একটা গোলমাল চলবে একটানা। কখনো বা দুই ঘরে সমস্বরে। ঘরে-ঘরে ফ্যানের মত রেডিও থাকবে এটাই তো বড়লোকির লক্ষণ। একজনের কাঁটায় আরেকজন কন্টক হবে না। তোমার কাঁটা যদি সিনেমার গানে, আমারটা কিত্তনে।

তা অধিকারই দিল না, আয়ত্তি তো দূরের কথা। কবলের মধ্যে না আনলে খাবল মারি কী করে? সমস্ত টাকাটাই যদি বউ নিজের আঁচলে বাঁধে তবে মৃণালিনী তো ফক্কা। মুখ ঘোলা করে বসে রইল মৃণালিনী। শুধু অস্ফুটে একবার বললে, 'অত বাড় ভালো নয়।'

ঘরে গিয়ে আলো জ্বালতেই খাটের উপর কিলবিল করে উঠল কাকলি। এক দণ্ড নিরিবিলি থাকবার জো নেই, চাঞ্চল্যের বুঝি এই বক্তব্য।

'খুব নাকি দানখয়রাত শুরু করে দিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'আপত্তি কী! অব্রাহ্মণে তো দিই নি।' উঠে বসল কাকলি, অনুকম্পার সুরে বললে, 'তোমার জন্যে কিছু আনি নি বলে বলছ? বেশ তো, বলো না কি লাগবে? ব্লেড এক প্যাকেট? শেভিং স্টিক? শ্যাম্পু? না কি'—চোখে এবার মরণকামড় হানল : 'না কি বেডসুইচটা অকেজো হয়ে গেছে সেটা সারিয়ে দিতে বলব?'

'খুব টাকা হয়েছে তোমার?'

'টাকা হলেই দানখয়রাত করা যায় না, কিঞ্চিৎ হৃদয়ও হওয়া দরকার।'

'আর কিঞ্চিৎ অহংকার।'

'নিশ্চয়ই। কিছু ব্যক্তিত্ববোধ। সেই অর্থে অহংকারই তো অলংকার।' টাকা শুধু রোজগার করা নয়, টাকা ব্যয় করার অধিকার। আর অধিকারের মানেই স্বাধীনতা। অহংকারের আর দোষ কী!'

আমতা-আমতা করে সুকান্ত বললে, 'টাকাটা মা'র হাতেই দিলে পারতে।'

'কোন আইনে?' ঝলসে উঠল কাকলি।

'সব আইনই লেখা থাকে না। মা'র হাতে দিলেই শোভন হত।'

'তুমি ছেলে, তুমি দাও গে। তুমি শোভন ছেড়ে সুশোভন হও। আমি দিতে যাব কেন?'

'তা হলে তুমি চাও না তোমার টাকায় সংসারের কিছু সুরাহা হোক?'

'চাইলেও, সেটা একান্তই আমার ডিসক্রিশান। সুরাহাটা কী এবং কতটুকু তা আমি বুঝব, তোমরা নয়। পাঁঠাটা যখন আমার তখন আমি বুঝব কোন দিকে কাটব বা আদৌ কাটব কিনা। তোমরা সাজেশশান দিতে পারো কিন্তু আমি তা মানতে বাধ্য নই।' ঘুরে দাঁড়াল কাকলি : 'এই যে তিনখানা শাড়ি কিনে দিলাম এটা সংসারের সাশ্রয় নয়? তারপর তোমাকে যদি সাবান ব্লেড তেল-শ্যাম্পু কিনে দিই, এক দিক থেকে সেটাও তো উপশম সংসারের—'

'মা'র কত দিনের শখ নিজস্ব একটা রেডিও হয়।' পরিত্যক্ত খাটে শুতে গেল সুকান্ত।

'রেডিও? সেটা ঐ বড় ঘরে বসবে যে ঘরে জয়ন্তী আর সুবীর পড়ে? তাদের কত যে পড়ার সময় গ্রাস করে নেবে রেডিও তার হিসেব করো? ছেলেমেয়েদের যে লেখাপড়া হচ্ছে না তার মূলে বাপ-মায়ের অসাবধানতা, বা ঐ বিলাসপ্রিয়তা। আজকাল বাপ-মারা কী পরিমান সিনেমা দেখছে আর তার আলোচনায় প্রশ্রয় জোগাচ্ছে, একবার নেবে তার স্ট্যাটিস্টিকস? ঘরের বাইরে যে পাপ চিত্ররূপে আছে সে পাপ আর শখরূপে ঘরে এনো না।'

'থাক। তোমাকে আর বক্তৃতা মারতে হবে না।'

'এক শো বার হবে। শেয়ালকে কাঁকুড়ের খেত দেখিয়েছ, এখন লাঠি ওঁচালে চলবে কেন?'

'না চলুক। শোনো।' একটু বা আপোসের ভঙ্গি করল সুকান্ত : বললে, 'বাকি কত টাকা আছে তোমার হাতে?'

'যাই থাক, হিসেব দিতে পারব না।'

'হিসেব কে চাইছে? সংসারে যখন আছ, তখন মা'র হাতে বাকি টাকাটা দিয়ে দাও।'

এক মুহূর্ত থামল কাকলি। বললে, 'সংসারে আছি মানে, পেয়িং গেস্ট হয়ে নেই, তোমার স্ত্রী হয়ে আছি। তাই সে টাকা, তুমি সক্ষম স্বামী, তুমি দেবে। আমার টাকা আমার। বাকি টাকাটা মা'র হাতে দিলেই আমার আর স্বাধীনতা থাকবে না। আমার কত এখনো দানখয়রাত বাকি।'

'তোমার অত দানখয়রাত করবার কী হয়েছে?' ধমকে উঠল সুকান্ত।

'বলেছি না, ও বুঝতে হলে হৃদয় দরকার। তোমার ও বস্তু কোথায়? তোমার তো গলার পরেই পেট। গেলা আর ভরার মধ্যে সামান্য ব্যববধানও তুমি রাখতে চাওনা। তোমার খালি টাকা আর মায়ের ব্যাঙ্কে রাখা। শোনো, তোমার মাকে বোলো, 'ঘর ছেড়ে যাবার উদ্যোগ করল কাকলি : 'পরে যখন আমার আরো মাইনে হবে, তখন তাকে না হয় দেব কিছু সেলামি।'

'আরো মাইনে হবে মানে?'

'বাঃ, আমার আর মাইনে বাড়বে না? চাকরিতে উন্নতি হবে না আমার?' এক পা ফিরল কাকলি।

'এর পর আবার উন্নতিও আছে নাকি?'

'এক শো বার আছে। শেয়াল শুধু কাঁকুড় থেকেই থাকবে? আখ খেতে ঢুকবে না? নিশ্চয়ই ঢুকবে যদি সে সত্যি শেয়াল হয়। উন্নতি করবার যতরকম করণ-প্রকরণ আছে সব সে অবলম্বন করবে। চাকরি মানেই উন্নতি।'

'কিন্তু করণ-প্রকরণটা কী?' শুই-শুই করেও থেমে গেল সুকান্ত।

'ক্ষেত্র বুঝে বিধান। এ তো এক প্রবন্ধ লিখে সারা জীবনের জন্যে ডক্টর হওয়া নয়। এখানে অনেক প্রবন্ধ, অনেক কারুকার্য।'

'এত শিগগিরই কারুকার্য দেখাবে!' একটু যেন বা হুল ফোটাল সুকান্ত।

'সেইটেই তো এফিসিয়েন্সির প্রমাণ। যে নাচতে জানে তার পাক দিতেও জানা উচিত। এ তো তোমারই কথা। সুতরাং—' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কাকলি।

শুয়ে পড়ল সুকান্ত।

ক'দিন পরে কতগুলি জামা নিয়ে কাকলি চলে এল দীপঙ্করের বস্তিতে।

'বয়েস ধরে আন্দাজে কিনে এনেছি মা। কার কোনটা লাগে কে জানে।' একটা মোড়া এসেছে, তাতে বসল কাকলি।

ছেলেমেয়েগুলির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। একে আস্ত জামা, তায় নতুন, তায় আবার রঙদার।

দুর্গাবালা সামলাবার চেষ্টা করল। ঠেলেঠুলে শিশুগুলোকে সরিয়ে দিয়ে বললে, 'চুপচাপ দাঁড়াও সকলে ঠিক হয়ে। উনি যাকে যেটা দেন সেটা সে নেবে। ঝগড়া করতে পারবে না।'

'জামা এনেছে! এবার জামা এনেছে!' ছেলেমেয়েগুলো বলতে লাগল সোল্লাসে।

'এত সব আনবার কী দরকার ছিল?' ওপার থেকে কে বলে উঠল কারুণকণ্ঠে।

'এ কি? আপনি?' কাকলি ব্যস্ত হয়ে তাকিয়ে দেখল দীপঙ্কর শুয়ে আছে তক্তপোশে : 'কী হয়েছে আপনার?'

'কিছু নয়। সামান্য একটু জ্বর আর মাথাধরা।' বললে দীপঙ্কর, 'মাথার আর কাজ নেই, আমার জন্যে মাথাব্যথা।'

'আফিস গিয়েছিলেন?'

'না গিয়ে উপায় আছে? সকাল-সকাল যে আসতে পেরেছি এই ভাগ্যি।'

'কালও যাবেন জ্বর নিয়ে?'

'কাল জ্বর থাকবে না আশা করি। আর যদি থাকেও—'

'না, না, ক'দিন ছুটি নিন। আপনাকে সত্যিই খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে।'

'ও কিছু নয়। তা ছাড়া, বরেন ছুটি দেবে না। সেদিনের পর থেকে ও আমার উপর ভীষণ চটে আছে। পারলে হাতে মাথা কাটে।'

'কোন দিনের পর থেকে?'

'যেদিন আমার হয়ে ওকে বলেছিলেন আপনি। সেই আমার মাইনে বাড়িয়ে দেওয়ার কথা।'

'বাঃ, সে তো আমি বলেছিলাম। চটলে আমার উপর চটবে।'

'না, ও ঠিক বুঝেছে আমিই পাঠিয়েছিলাম আপনাকে। আমার সেটা ঠিক হয় নি, অন্যায় হয়েছিল। ও ভেবেছে আমি ক্যানভাসিং করছি, আপনাকে পাঠিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করতে চেয়েছি ওকে। মাইনে যে বাড়ল না সেটা লাগছে না, কিন্তু আমার জন্যে আপনাকে অপমানিত হতে হল সেইটেই অসহ্য।'

'না, না, অপমান কী!' ঝলমল করে উঠল কাকলি : 'একবার চেষ্টা করেছিলাম, হয় নি। আবার চেষ্টা করে দেখব হয় কিনা। চেষ্টায় বিফল হওয়াকেই অপমানিত হওয়া বলে না। যার যত লড়াই তারই তত বড়াই। কি, ঠিক নয়?'

খুশিতে ছাপিয়ে পড়ল দুর্গাবালা। বললে, 'আমি ঠিক জানি কাকলি বুদ্ধিমতী মেয়ে, পরের দুঃখে ওর প্রাণ কাঁদে, ও ঠিক আদায় করতে পারবে। এক দরজা বন্ধ হয় তো আরেক দরজা খোলা পাবে। ওকে আটকায় এমন কার সাধ্যি?'

'না, না, আর চেষ্টা করতে হবে না।' তপ্তকণ্ঠে নিষেধ করে উঠল দীপঙ্কর : 'আর দরজা খুলিয়ে কাজ নেই। যে চাকরিটুকু আছে সেটুকুই থাকুক টায়েটুয়ে। আর যেন না বিপন্ন হই।'

'তা হলে আমিই দেখছি আপনার বিপদের কারণ।' নত না হয়ে দৃঢ় হল কাকলি : 'তা হলে বিপদ আমাকেই কাটিয়ে দিতে হবে। আর বিপদ যদি নাও কাটে, আমরা সংগ্রামী মানুষ, আমরা কেন ভয় পাব?'

মূঢ়ের মত না মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল দীপঙ্কর।

শিশুগুলির মধ্যে জামা বণ্টন করে, আবার অন্যতর জিনিস আনবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উঠে পড়ল কাকলি।

'হ্যালো—' রিসিভারটা তুলে নিল বরেন।

'আমি কা—'

'বলতে হবে না। আপনি 'কা তব কান্তা'র কা। তার মানে, আপনি কেউ নন, কারুরই কেউ নন।'

একটু কি বেশি বলে ফেলল বরেন? তা কী করা যাবে! কথার পিঠে কথা পেলে সেই সুযোগই বা ছাড়ে কে! কিন্তু ওদিক বুঝি পিঠ দেখাল।

না, বলেছে কথা।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আদিম পরিচয়ই আসল পরিচয়।'

'তাই তো বিজ্ঞাপনে বলে আদিম ও অকৃত্রিম।'

'বিজ্ঞাপনে কী বলে শুনবেন না, আমাকে শুনুন।'

'শুধু শুনব? দেখব না?'

'হ্যাঁ, দেখবেন। আফিসের পর যাচ্ছি আপনার কাছে। একটা কাজ আছে।'

'আজ আর শুধু কথা নয়। আজ কাজ। চলে আসুন।'

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এল কাকলি। উদ্ভাসিত, উচ্চারিত চেহারা। চোখে গাঢ় করে সুর্মা, ঠোঁটে পাতলা করে রঙ। পরনের শাড়ির ফিকে নীল পাড়ের সঙ্গে গায়ের ব্লাউজের সঙ্গতি করা, হয়তো বা জুতোর স্ট্র্যাপের সঙ্গে।

'আপনার উন্নতি কে আটকায়।' বরেন অভিবাদন করল।

লজ্জিত-লজ্জিত মুখ করল কাকলি। বললে, 'সাজসজ্জার উন্নতি দেখে বলছেন?'

'নিশ্চয়ই। ঐ তো উন্নতির প্রথম সিঁড়ি।' বরেন উঠে দাঁড়াল : 'এ তো সরকারি চাকরি নয় যে ব্লাউজের প্যাটার্ন ঠিক করে দেবে, বা হুকুম জারি করবে যে এক চিলতেও পেট দেখানো চলবে না। এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্ম। এখানে যত উড়বেন তত উঠবেন।'

'কী আর করি! যেমন কলি তেমনি চলি। যেমন দেশ তেমনি বেশ।'

'এক শো বার ঠিক।'

'আর চাকরি করতে আসাই মানে উন্নতি করতে আসা। কী বলেন, ঠিক নয়?'

'হাজার বার ঠিক।' একটু নড়ল-চড়ল বরেন : 'তারপর কাজটা কী?'

'বিশেষ কিছুই নয়। আপনার যদি অসুবিধে না হয়, আপনার গাড়িতে একটা লিফ্‌ট দিন আমাকে—'

'বেশ তো, চলুন। আমিও বেরোচ্ছি। কদ্দূর যাবেন?'

'কদ্দূর আবার! বাড়ি পর্যন্ত।'

ড্রাইভার স্টার্ট দিল। পিছনের সিটে পাশাপাশি কাকলি আর বরেন।

বিশেষ কিছুই নয়? ভীষণ বিশেষ। অভাবনীয়েরও বেশি। নিজের থেকেই এসেছে। সেজেগুজে এসেছে। মোটরে বসেছে। বসেছে পাশ ঘেঁষে।

আশ্চর্যের দেশে আছে কত আলাদিনের লণ্ঠন!

চুপচাপ কাটছে রাস্তাটা।

বাড়ির কিছুটা আগেই থামতে বলল কাকলি।

'সে কি, একেবারে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই।' একটু বুঝি চঞ্চল হল বরেন।

'দরকার নেই। কে কী দেখে ফেলে তার ঠিক কী!'

'কে মানে, সুকান্ত?'

'তা ছাড়া আর কে। বচনে উদার, প্রত্যক্ষে হয়তো বিপরীত।' নিখুঁত নেমে পড়ল কাকলি : 'নমস্কার। এমনি কিন্তু মাঝে মাঝে বিরক্ত করব আপনাকে।'

সত্যিই বিরক্ত করা। আড়ষ্ট অসাড় করে রাখা। এক পাত দৃঢ় ইস্পাত ছাড়া আর কিছু নয় কাকলি। রেখা নেই, স্পন্দন নেই, স্ফুরণ নেই। গাম্ভীর্যে ঠাসা এক স্তূপ ঔদাসীন্য।

সেদিন আবার গাড়ি থামিয়ে রেস্তোরাঁয় কফি খেয়ে নিল কাকলি।

একেই বুঝি বলে বোকা বানিয়ে কাজ বাগাবার ফন্দি। দিব্যি বিনা পয়সায় বিনা ঝামেলার বাড়ি ফেরার বন্দোবস্ত।

তা কেন হবে? অক্লেশে বাড়ি ফেরাই যদি উদ্দেশ্য হত তা হলে আফিসেরই কোনো এক শাঁসালো বাবুর গাড়িতেই সোয়ারি হতে পারতাম। মনে-মনে হাসে কাকলি। এ একরকমের তদবির। কথা কয়ে অনুরোধ করেছিলাম বলে চটেছিল, এখন দেখি কথা না কয়ে অনুরোধ করা যায় কিনা। বাড়ে কিনা দীপঙ্করের মাইনে।

'কি, আমার এখন পরিচয় কী?' গাড়ি থেকে নেমে কাকলি বললে, 'আপনার বন্ধুর স্ত্রী, না আপনার শুধু-বন্ধু?'

'শুধু-বন্ধু।'

'হ্যাঁ, শুধু-বন্ধু।' হাসতে হাসতে চলে গেল কাকলি। বলে গেল, 'শুধু-বন্ধুরই জোর বেশি। তার অনুরোধ আপনি আর ফেলতে পারবেন না।'

দাঁড়ান, আস্তে-আস্তে। মনে মনে দীপঙ্করকে লক্ষ্য করলে। প্রায় সাজিয়েছি। এবার কিস্তি পড়বে।

হ্যাঁ, আস্তে-আস্তে। প্রতীক্ষার মত রোমাঞ্চ নেই। প্রাপ্তির চেয়েও প্রতীক্ষা সুন্দর। দেখি না কী ঘটে। কী রটে! কী হয়ে দাঁড়ায়।

তুমিও প্রতীক্ষা করো। অন্তত এক রাত্রি। সুকান্তের দিকে চেয়ে মনে-মনে বললে কাকলি। ভাবছ, আনিনি। তোমার জন্যেও এনেছি।

পরের মাসের মাইনে পেয়ে চারখানা ধুতি কিনল কাকলি। ভূপেনকে, হেমেনকে, প্রশান্তকে একখানা করে দিয়ে প্রণাম করল।

'ঠাকুরপোকে দিলে না?' জিজ্ঞেস করল বন্দনা।

'কী, বস্ত্র? সে তো কবেই একবার দিয়েছি—আর কেন?' কাকলি হাসতে লাগল।

সকালবেলায় বললে, 'ভেবেছিলাম তোমার জন্যে স্যুটের কাপড় আনব। পরে ভাবলাম তোমার তো ওসবে অভ্যেস নেই, তাই প্লেন ধুতি এনেছি। এই নাও।' সুকান্ত হাত বাড়িয়ে নিল না বলে তার সামনে টেবিলের উপর রাখল কাকলি।

ভগলুকে হঠাৎ চিৎকার করে ডাকতে লাগল সুকান্ত : 'কি রে, ঘর মুছেছিস? বেলা হয়ে গেল, শিগগির আয় জল নিয়ে।'

বালতি-ভর্তি জল নিয়ে চলে এল ভগলু। বললে, 'ন্যাকড়া নিয়ে আসি।'

'লাগবে না ন্যাকড়া। এটা দিয়ে ঘর মোছ।' কাপড়খানা বালতির জলে চুবিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল মেঝের উপর : 'নে মোছ ভালো করে।'

কাকলির চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে। কাম্মার দেওয়া নতুন কেনা রেল-লাইনের উপর দিয়ে ট্রেন চালাচ্ছিল সেন্টু, সুকান্ত একটা লাথি মেরে ছত্রখান করে দিল।

'এটা কী হল?' জিজ্ঞেস করল সেন্টু।

অপ্রস্তুত হল সুকান্ত। বললে, 'দেখিনি—না দেখে হয়েছে।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু এটা হল কী?'

'কলিশন।'

'এটা মোটেই কলিশন নয়। এটা ভূমিকম্প।'

বত্রিশ

নীল কাগজে আঁকা একটা নক্‌শা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল হেমেন, বিজয়া জিজ্ঞেস করল, 'কী এটা?'

'বাড়িওলা ছাদের উপর নতুন একখানা ঘর তুলে দিতে রাজি হয়েছে।' হেমেন নক্‌শার উপরে চোখ রেখে বললে, 'সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্ বাথরুম।'

'কী মজা!' উছলে উঠল বিজয়া : 'নতুন ঘরটায় আমরা উঠে যাব। আর নিচের এ ঘরটায় ড্রয়িং রুম হবে।'

কথাটায় বাস্তব রূপ দেবার জন্যে শামিল হল মৃণালিনী। জিজ্ঞেস করল, 'কার খরচে উঠবে নতুন ঘর?'

'বাড়িওলা অপ্‌শান দিয়েছে। আমরা নিজের খরচেও তুলতে পারি, সে ক্ষেত্রে এ বাড়ি ছেড়ে দেবার সময় ও ঘর তার হয়ে যাবে। কিংবা বাড়িওলা নিজেও তুলে দিতে পারে, সে ক্ষেত্রে বাড়তি ভাড়া গুনতে হবে মাস-মাস।'

'কত ভাড়া?'

'তা এখনো ঠিক হয়নি। প্রশ্ন হচ্ছে কোন বিকল্পটা গ্রহণীয়।' মুখচোখ চিন্তিত করল হেমেন।

'বাঃ, এর আর ভাবাভাবি কী! নিজেরাই খরচ করে তুলে ফেলা উচিত।' লকলক করে উঠল বিজয়া : 'মাস-মাস বাড়তি ভাড়া টানার যন্ত্রণা কেন? কবে উচ্ছেদ করবে, কবে বা আমরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে যাব তা ধূসর ভবিষ্যৎ—'

ঐ ব্যবস্থা হলেই তো হয়েছে। চোখে আঁধার দেখল মৃণালিনী। নিজেদের পকেট থেকে খরচ দিতে হলে একমাত্র দিতে পারবে হেমেন। সেই ক্ষেত্রে ঐ ঘর হেমেন, তার মানে বিজয়া দাবি করে বসবে। আমরা গাঁটের টাকা খরচ করে ঘর তুলেছি, এ ঘর আমাদের। এখন যুক্তিকে সহজে ঠেকানো যাবে না। বাড়িওলার খরচে হওয়াই ভালো। না হয় দেওয়া যাবে কিছু বেশি ভাড়া। সেটা এজমালি সংসারের থেকেই দেওয়া হবে। টেনান্সি যখন ভূপেনের নামে তখন ঐ নতুন ঘরেও চলবে তার মালিকানা। এবং সে সূত্রে সে ঘর ধরতে পারবে প্রশান্ত।

'আমি বলি কি, নতুন ঘর যদি হয় তা হলে তা মাসিক ভাড়ার মধ্যেই নিয়ে আসা উচিত।' মৃণালিনী বললে, 'পরের বাড়িতে কে যাবে গুচ্ছের খরচ করতে?'

'আমিও তাই বলি।' বিজয়ার প্রতিবাদপ্রখর নীরব কটাক্ষ উপেক্ষা করে হেমেন বললে, 'নতুন ঘরের জন্যে বাড়তি ভাড়া আর কতই বা হবে। বিশ—ত্রিশ—পঞ্চাশ? যাই হোক, যতই হোক, ছোট বউমা তা দিতে পারবে অনায়াসে। সুতরাং ঐ নতুন ঘর সুকান্তর হবে—'

বোমার মত ফেটে পড়ল মৃণালিনী : 'কক্ষনো না। ঐ ঘরে প্রশান্ত থাকবে। ছেলেপিলেওলা সংসার, বউমা রুগ্ন, ওরই একখানা বড় ঘরের দরকার। তা ছাড়া ও বাড়ির বড় ছেলে।'

'কিন্তু প্রশান্ত মাস-মাস দিতে পারবে ভাড়া?' হেমেন তাকাল ভয়ে-ভয়ে।

'প্রশান্ত দেবে কেন আলাদা করে? সে ভাড়া এজমালি সংসার দেবে। ভাড়া বেশি হয়, এজমালি টাকায় না কুলোয়, তোমরা তোমাদের 'কোটা' বাড়িয়ে দেবে। আর ঐ চাকুরে বউকেও বাধ্য করবে চাঁদা দিতে।'

'চাঁদ পাবে না অথচ চাঁদা দিয়ে মরবে!' হাসল হেমেন : 'নিজে থাকবে ভাপসা ঘরে আর টাকা দেবে অন্যকে ভালো ঘরে বহাল করতে, এটা রীতি নয়।'

'নয়? তবে কোনটা রীতি?' প্রায় কোমর বাঁধল মৃণালিনী : 'চাকরি করে মাইনে আনবে অথচ তা দেবে না সংসারে?'

'কোন সংসার?' প্রায় দার্শনিক হতে চাইল হেমেন।

'কোন সংসার মানে? যে সংসার আনুকূল্য করে তাকে চাকরি করতে দিচ্ছে সেই সংসার।'

'কী বলে ছোট বউমা?'

'কিছুই বলে না। মুখটা আগুনের খাপরা করে রেখেছে, বলবে কী?'

'না, না, বলে।' বিজয়া মৃণালিনীর পক্ষে এসে দাঁড়াল : 'বলে, বলুন তো সুবীরের জন্যে একটা মাস্টার রাখি, কিংবা ছেলেমেয়েদের মাইনেটা আমি দিই, কিংবা ইলেকট্রিকের বিল, কিংবা সেন্টুকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে তার সমস্ত খরচটা আমি টানি। মানে খুচরো কিছু খরচের ভার সে নিতে পারে দয়া করে—'

'চালাক মেয়ে—নাম কেনবার ফিকির!' মৃণালিনী বিজয়ার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল : 'আইটেমের উপর খরচ করতে চায়। এমনি থোক টাকা দিলে এজমালিতে মিশে যাবে, তাতে তো নাম লেখা থাকবে না, তাই তাতে সায় নেই। এমনি ঘুঘু নয়, বাস্তু ঘুগু। বলে বেড়াবে, ইলেকট্রিকের বিল আমি দিচ্ছি, সুবীর ভালো রেজাল্ট করেছে আমি মাস্টার রেখে দিয়েছিলাম বলে, আর সেন্টু-ঝন্টুকে কি ইংরেজি স্কুলে পড়াতে পারত ওর বাপ-মা? আমি ছিলুম বলে রক্ষে। বুঝলে না, চাল মারবার না কিল মারবার গোঁসাই। কেন, সবাই যার-যা কোটা দিচ্ছে, তুইও দিয়ে দে একমুষ্টে। আমি কর্ত্রী, আমি যা ন্যায্য বুঝব, খরচ করব। সংসারকে সাজাব-গোছাব।'

'তা একটা টাকা ধরে চাইলেই পারো সরাসরি।' সমান শত্রুর বিরুদ্ধে দুই জা কেমন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে চোখ ভরে তাই দেখতে-দেখতে হেমেন বললে।

'কোন লজ্জায়? ওগো বউ, টাকা দাও, ইলেকট্রিকের বিল দিতে পাচ্ছি না! ওগো বউ, টাকা দাও, মাসকাবারের মুটে এসেছে। ওগো বউ, টাকা দাও, গাড়ি এসেছে কয়লার, গয়লা ফর্দ এনেছে দু' মাসের। আমি হাত পাততে যাব কেন? ওর নিজের কাণ্ডজ্ঞান নেই? ও এ বাড়িতে থাকে না? খায় না?'

'বাঃ, থাকে-খায় তো, সে দায়িত্ব তার স্বামীর। সুকান্তর।' হেমেন বললে।

'আরে তাকে যে চাকরি করবার জন্যে এত সবাই সুবিধে করে দিচ্ছি তার জন্যে সংসারকে সে ট্যাক্স দেবে না?' এবার বিজয়া মুখিয়ে উঠল : 'দিদি যে এত করে তার আফিসের ভাত তৈরি করে দিচ্ছে, আফিস ফেরত পর্বতপ্রমাণ জলখাবার, তার কোনো বিবেচনা নেই?'

'তার মানে,' হেমেন হাসল, 'চাকুরে বউয়েদের জন্যে দুটো ইনকাম ট্যাক্স। একটা সরকারকে, আরেকটা শাশুড়িকে!'

'কেন নয়?' বললে মৃণালিনী : 'যখন ঠাকুর ছিল না তখন শাশুড়ি রান্না করেনি? রেহাই দেয়নি বউকে? চাকর-বাকর ক'টা কাজ করে? খুঁটিনাটি কাজের কি অন্ত থাকে সংসারে? সেসব কাজে বউয়ের আর ডাক কই? তাকে ছুটি দেয়নি সংসার? তবে সংসারকেই বা সে ট্যাক্সো দেবে না কেন?'

'এক ধোবার হিসেব মেলাতেই এক দুপুর।' বললে বিজয়া : 'ও তো ছোট বউয়ের প্রভিন্স ছিল। তা উনি চাকরি করতে গেছেন আর বড় বউমা তা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। ওকে চাকরিতে পাঠিয়েই তো বড় বউমার এই কষ্ট—'

'তা ছাড়া টাইমে-বেটাইমে কত অতিথি-বিতিথি সংসারে। ঝামেলা কিছু পোহাতে হয় ছোট বউকে?'

'সংসার থেকে যে সময় সে নিয়ে নিচ্ছে তার ক্ষতি সে পূরণ করবে না টাকা দিয়ে?' বিজ্ঞানের কথা বললে বিজয়া।

আর মৃণালিনী অর্থশাস্ত্র আওড়াল : 'যে শ্রম তার করণীয় ছিল, তা আমরা, সংসারের আর সকলে ভাগ করে নিচ্ছি। তার জন্যে সংসারকে দেবে না সে পারিশ্রমিক?'

'জানেন সেদিন জয়ন্তীকে কী বলছিল কাকলি?' আরো একটু অন্তরঙ্গ হল বিজয়া।

'কী বলছিল?'

'বলছিল, ঐ তো সামান্য ক'টা টাকা, বাতাসার মত হরির লুট দিই আর কী! সহায় নেই, সম্বল নেই, বাপের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, গায়ে গয়না নেই, ব্যাঙ্কে-বাক্সে টাকা নেই, আর স্বামী—স্বামীর ঐ তো মুরোদ—এখন এ অবস্থায় একটি পয়সাও নষ্ট করতে পারব না।'

'সংসারকে দেওয়া মানে নষ্ট করা!'

'বলছে, যত পারি জমাব তিল-তিল করে। মেয়েছেলের কখন কী বিপদ ঘটে ঠিক নেই আর বিপদের দিনে বন্ধু একমাত্র টাকা।'

'কী ছোটমন স্বার্থপর মেয়ে!' রি-রি করে উঠল মৃণালিনী।

'ঐ রকম একটা গুমোট ছোট ঘরে থাকতে হলে মন খোলসা হয় কী করে?' হেমেন উঠে পড়ল : 'ছাদে নতুন ঘর উঠলে ঐটে ওকে দাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে—'

'ছাদে কেন. মাঠে থাক না। মাঠেই তো বেশি ফাঁকা, বেশি খোলসা—' ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল মৃণালিনী।

দাঁড়িয়েই ধাক্কা খেল। দেখল দরজার পাশে দেয়ালে ভূপেন কান পেতে আছে।

'এ কী, তুমি এখানে, এ অবস্থায়?'

মুখ কাঁচুমাচু করে ভূপেন বললে, 'আমার তো কিছু বলবার অধিকার নেই, তাই কেবল শুনে যাচ্ছি।'

'তোমার বলবার কী-ই বা আছে!'

'বলতে গেলেই দাবড়ি খাচ্ছি। তাই কিছু বলছি না। শুধু শুনছি। গোচরে-অগোচরে শুনছি। দেখছি আমার মনের কথাটি কেউ বলে কি না!'

'থাক। তোমার মনের কথা তো, কাউকে কিছু বলতে যেও না, যে যার খুশি চলে বেড়াক। এ জড়ভরতের মন নিয়ে সংসার করা চলে না। চোখের সামনে অন্যায়-অনাচার হবে অথচ চোখ বুজে থাকব, এ অসম্ভব। তুমি যাও—এক্ষুনি যাও—'

'যাচ্ছি। যাচ্ছি।' পায়ের চটিজুতো নিয়ে শশব্যস্ত হল ভূপেন।

'বাড়িওলার কাছে যাও। আমার মনের কথা গিয়ে সেখানে ব্যক্ত করো। বলো যেন তার নিজের খরচেই সে ঘর তোলে। যা ন্যায্য ভাড়া হয় তা আমরা দেব। আমরা দেব মানে, তুমি দেবে। আর সে ঘরে প্রশান্ত থাকবে।'

হেমেনের কাছে নীরব চোখে আশ্রয় চাইল ভূপেন।

হেমেন বললে, 'আচ্ছা, আমি দেখছি—'

দরজা খোলসা হতেই বিজয়া ডুকরে উঠল : 'ছাদের ঘরে তুমি তুলছ ছোট বউকে আর দিদি তুলছে বড় বউকে—আর আমি, আমি এ বাড়ির বউ নই, কেউ নই আমি—'

'তুমি হচ্ছ নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী—'

'কেউ নই, আমি কেউ নই।' দু' হাতে মুখ ঢাকল বিজয়া।

'তুমি পাগল না আর কিছু!' খাটের দিকে এগুল হেমেন : 'বাড়িওলার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, নিজের খরচে ভাড়াটের জন্যে ঘর তুলে দেবে। যদি অনুমতি দেয়, আমরা, ভাড়াটেরাই তুলে নেব। সেক্ষেত্রে, বলছি তোমাকে, আমি অ্যাডভান্স করব সমস্ত টাকা। তা হলে সে ঘরে তোমারই অগ্রাধিকার হবে। তখন সে ঘরে তুমি নিজে থাকো বা তোমার মনের মত লোককে থাকতে দাও সে তোমার এক্তিয়ার—'

'মনে থাকে যেন।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বিজয়া।

কিন্তু কাকলির স্বস্তির নিশ্বাসটুকু চলে গেল যখন সন্ধ্যার শেষে আফিস-ফেরত তাকে সুবীর বললে, 'কে একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—'

আমার সঙ্গে! চমকে উঠল কাকলি। কে—কে হতে পারে? দীপঙ্কর? কী আর তার বক্তব্য থাকতে পারে? তবে সমূহ কোনো বিপদে পড়েছে? বন্ধুর বাড়িতে এসে বন্ধুকে না খুঁজে তার স্ত্রীকে খোঁজা? বন্ধুর স্ত্রীকেই যদি তার দরকার তবে খোদ বন্ধুর বাড়িতে কেন? কাকলির আফিস কি তার অজানা? না হয় টেলিফোন?

তবে কি বরেন? তার এমন কাঁচা মাথা? যেখানে কাকলিই যায় আগ বাড়িয়ে সেখানে তার কেন

ব্যগ্র হওয়া? তবে কি দীপঙ্করের মাইনে বাড়িয়ে দিতে রাজি হয়েছে? এত অল্পেই রাজি হয়েছে? রাজি হয়েছে তো বাড়ি বয়ে এসে খবর দেবার কী দরকার? কী নগদ লাভ তাতে বরেনের?

না, বরেনও নয়।

'কেমন দেখতে লোকটাকে?'

'সুবিধে নয়।' এক কথায় সারতে চাইল সুবীর। কিন্তু তাতে ছোট বউদিরও অসুবিধে ঘটাল মনে করে একটু বিস্তৃত হল: 'ময়লা শার্ট আর ফুল প্যান্ট পরনে, চুলগুলি উস্কখুস্ক, পায়ে জুতো আছে কি নেই লক্ষ্য করিনি—'

কে এই কিম্ভূত? তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল কাকলি।

সদরের কাছে, বাইরে ঝাপসা-ঝাপসা হলেও চিনতে এক পলক দেরি হল না।

'এই যে কাকলি। কেমন আছিস?' দেবনাথ এগুল এক পা।

প্রথম প্রশ্নটা কী করবে কাকলি ভেবে ঠিক করতে পারল না। হঠাৎ কী মনে করে? নিজে এসেছ, না কেউ পাঠিয়ে দিয়েছে? কেমন আছ সকলে? বাবা-মা? পত্রালি-দেবল?

একটা অকারণ কান্না গলার কাছে দলা পাকাতে লাগল।

'তোর সঙ্গে খুব একটা জরুরি কথা আছে।' কোথায় কথাটা বলা যায় চারদিকে ত্রস্ত চোখে তাকাতে লাগল দেবনাথ।

মন্দ কি। বাড়ির মধ্যে নিজের ঘরেই নিয়ে যাই। সুকান্ত এখনো ফেরেনি, আজকাল কাকলিকে অনেক সময় দিয়ে বেশ দেরি করেই ঘরে আসে। ফাঁকা খাটে পা ছড়িয়ে বসে বিশ্রাম করতে পারবে। যেন অনেক পথ হেঁটেছে, অনেক রাত্রি ঘুমোয়নি। একটা খিদে-পাওয়া শুকনো চেহারা। মন্দ কি যদি ভগলুকে দিয়ে কিছু খাবার আনানো যায়।

'এসো না, ভেতরে এসো—' ঘরে নিয়ে এল কাকলি। বললে, 'বোসো।'

'শোন, বসব না। যে কাজের জন্যে আসা তোর কাছে। আমাকে দু' শো-টা টাকা দে।'

'টাকা?' কাকলি পাথর হয়ে গেল।

হ্যাঁ, সর্বত্র জানাজানি হয়ে গেছে তুই চাকরি করছিস তার তা বেশ ভালো মাইনের চাকরি। দু' শো টাকা তোর কাছে কিছুই নয়। যার ভবিষ্যৎ আছে, তার আবার টাকার জন্যে ভাবনা। বেশ যদি দু' শো না পারিস, অন্তত এক শো দে। আজ রাত্রের মধ্যে যদি এক শো টাকা না পাই, তা হলে কাল সকালেই হাতকড়া পরব দেখিস। খবরের কাগজে বেরুবে অপযশ। সইতে পারবি নে। বাবার সেকেন্ড স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে, খবর পড়ে আরেকবার পড়বেন।

সেকেন্ড স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে! কেমন আছেন এখন? ভালো নয়। ডান হাতটা খসে গিয়েছে। পেনসনের পেমেন্ট অর্ডার বা ব্যাঙ্কের চেক কিছুই সই করতে পারছেন না। টাকার সমূহ খুব টানাটানি যাচ্ছে। নিত্যি আর কত ধার চলবে? কেউ এমন নেই যে, টাকার একটা বিলি-ব্যবস্থা করে! আমাকে তো দেখছিসই, আর তুই, তোরা তো বিতাড়িত।

'এই অনটনের সময় এক শো-টা টাকা তুমি নষ্ট করবে? বাবার বোধ হয় ভালো চিকিৎসা-পথ্যও চলছে না—'

তা হয়তো মিথ্যে নয়। কিন্তু আমাকে টাকাটা নষ্ট করতে না দিলে শেষ পর্যন্ত বাবার প্রাণটুকুই না নষ্ট হয়। তুই বোন, তোকে বলতে পারব না, কিন্তু মুহূর্তের ভুলে যে অপরাধ করে ফেলেছি, খেসারত না দিলে তার থেকে আর ত্রাণ নেই। বেশি দেরি করিস নে। ওরা না আবার এর মধ্যে থানায় গিয়ে এত্তেলা দেয়।

'তোমার মাথার অসুখ এখন কেমন আছে?'

'ভালো আছে। দেখছিস না কেমন সুস্থ ও সংলগ্নভাবে কথা কইছি।'

কিন্তু মনে হচ্ছে টাকার জন্যে যে গল্প ফেঁদেছ সেটা সত্যি নয়। গল্প যদি ফাঁদতেই পারি, তবে প্রমাণ হচ্ছে, মাথা সুস্থ আছে। যদি তাই থাকে, সুস্থ মাথায় মিথ্যে সাজাব কেন? গল্প মিথ্যে হলেও টাকার দরকারটা মিথ্যে নয়। আর কোনোদিন চাইব না। খুব বিপদে না পড়লে চাইতাম না তোর কাছে।

আমাকে টাকা দেওয়া মানেই হয়তো জলে ফেলা, কিন্তু ও টাকা জলে না ফেললে ডুবে মরব, ডাঙা পাব না।

'দিচ্ছি। আরেকটু বোসো। তোমাকে চা এনে দি। তারপর মায়ের কথা শুনি।'

'মায়ের কথা আরেকদিন শুনিস। এখন টাকাটা দে—'

একটা এটাচি কেস কিনেছে কাকলি। সেটা খুলে ভাঁজ-করা দশটা দশ টাকার নোট দিয়ে দিল দেবনাথকে।

দেবনাথ তক্ষুনি বেরিয়ে গেল। কি ভাবল, যেতে-যেতে, সিঁড়ির কাছে একটু থামল। দ্রুত আঙুলে গুনে নিল সত্যি টাকাটা এক শো কিনা।

এটাচি বন্ধ করে গুছিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বাইরে এল কাকলি। দেবনাথকে আর ধরতে পেল না। পিছনে অনুস্রিয়মাণ একটা ছায়া অনুভব করে সে একবার শুধু বলল, 'আবার আসব', তারপর মিলিয়ে গেল রাস্তায়।

'তোমার আফিসের কেউ বুঝি?' মৃণালিনী কাছেই ছিল, তেরছা চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করল।

এ আবার কিরকম প্রশ্ন! কাকলি চুপ করে রইল।

'আফিসের লোকের সঙ্গে তো আফিসেই দেখা হচ্ছে। তা আবার বাড়িতে কেন?' আরো কী যেন বলতে চাচ্ছিল মৃণালিনী, প্রস্ফুট হল না।

'ও আমার দাদা।' বললে কাকলি।

'আজকাল তো হাটে-বাজারে দাদার ছড়াছড়ি। বলি কোন ধরনের দাদা?'

গা জ্বলে যাচ্ছিল কাকলির, তবু বললে সংযতস্বরে, 'মায়ের পেটের ভাই।'

'মায়ের পেটের ভাই!' হাঁ করল মৃণালিনী : 'তা এরকম চেহারা?'

চুপ করে রইল কাকলি।

'টলছিল মনে হচ্ছিল। ঠিক করে পা ফেলতে পারছিল না সিঁড়িতে—'

চোখ তুলে তাকাল কাকলি : 'দাদার শরীরটা ভালো নয়।'

'কী নিয়ে গেল?'

'টাকা।'

'টাকা!' যেন শক্তিশেলে টঙ্কার পড়ল : 'কত নিল?'

এও আবার জিজ্ঞাস্য নাকি? দোনামনা করতে লাগল কাকলি।

'বলি, দিলে কত?'

'এক শো।'

'অ্যাক শো। এত টাকা হঠাৎ দরকার পড়ল দাদার?'

'বাবার খুব অসুখ।'

'তা তোমার বাবার কি টাকার অভাব হয়েছে? ব্যাঙ্কেই তো তার কত টাকা। তুমিই তো দশ হাজার টাকা তাকে দান করে এলে। আবার সে টাকা চায় কোন মুখে?'

'স্ট্রোক হয়ে পড়ে গিয়েছেন। ডান হাত অবশ হয়ে গিয়েছে।' কণ্ঠস্বর ভিজে এল কাকলির : 'চেক সই করতে পারছেন না।'

'তা হলে যদ্দিন সই করতে না পারেন মাস-মাস এমনি পাঠাবে নাকি বাপের বাড়ি?'

'কি করে বলি!' কাকলি পাশ কাটাতে চাইল।

'কি করে বলি মানে? তুমি চাকরি করছ তোমার বাপের বাড়ির জন্যে?'

কষ্টে একটু হাসবার চেষ্টা করল কাকলি। বললে, 'ছেলেরা যে চাকরি করে কার জন্যে? তার বাপের বাড়ির জন্যেই করে। শ্বশুরবাড়ির জন্যে নয়। মেয়েদের বেলায় অন্য নিয়ম হবে কেন? স্বাধীন ভারতে তারতম্যকরণ চলবে না। মেয়েরাও তাই বাপের বাড়িরই করবে, শ্বশুরবাড়ির নয়।'

'ছেলে আর মেয়ে এক কথা হল?' খিঁচিয়ে উঠল মৃণালিনী : 'ছেলে রোজগার করে তার বাপের

বাড়িতে থেকে আর মেয়ে, তুমি—তুমি রোজগার করছ তোমার শ্বশুরবাড়িতে থেকে। যেখানে থেকে রোজগার, সে সংসারেরই অধিকার সে রোজগারে।'

'থাকার কথাটা অবান্তর। আপনার ছেলে যদি আজ আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত তা হলেও তার টাকাটা বাপের বাড়িই দাবি করত। ছেলের টাকা যদি তার বাপ-মা নিতে পারে মেয়ের টাকাই বা তার বাপ-মা নিতে পারবে না কেন?'

'তোমার বাপ-মা তো তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—'

গলার কাছে একটা দলা উঠেছিল, সেটা গিলে ফেলল কাকলি। বললে, 'কিন্তু রক্তের সম্পর্ক কি তাড়িয়ে দেওয়া যায়?'

'তোমার বাপ-মায়ের যদি জেদ থাকে, তুমি তাদের মেয়ে, তোমারই বা জেদ থাকবে না কেন?'

কাকলি মৃদু রেখায় হাসল। বললে, 'কিন্তু শত হলেও, বাপ-মা যদি দুরবস্থায় পড়ে তা হলে মেয়ে তাদের সাহায্য করবে না?'

'তোমার বাপ-মায়ের এমন কিছু দুরবস্থা হয়নি।'

'তেমনি আমার শ্বশুরবাড়িরও তেমন কিছু অভাব নেই।'

'নেই? তুমি যদি চোখের মাথা খেয়ে বসে থাকো তার কী করব? ঘরে-ঘরে দোরে-জানলায় পর্দা নেই, খাবার জায়গায় ফ্যান নেই, নিজস্ব একটা আমার রেডিও হল না। অনুরোধের আসরটা শুনতে পাই না, উকিলের বাড়ি একটা টেলিফোন নেই, আজকাল সভায়-সমিতিতে কাউকে ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে চাল করে ফোন-নম্বর বলে, আমার আর সে ভাগ্য হল না, ঠিকানা বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে গেল। চতুর্দিকে আত্মীয়স্বজনের কত ফোন আর আমার সেই আদ্যিকালের গ্রামোফোন! তারপর একটা রেফ্রিজারেটর কেনার শখ—তারপর মোটর গাড়ি—সে তো চ্যাটায়ে-শোয়া স্বপ্ন।'

পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে যেতে চাইল কাকলি।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে মৃণালিনী বললে, 'তা হলে তুমি পরের জন্যে, বাপের বাড়ির জন্যে চাকরি করছ?'

থামল কাকলি। বললে, 'রাগ করবেন না, আমি চাকরি করতে চাইনি, আপনারাই আমাকে উদ্বাস্ত করে-করে চাকরি করতে পাঠিয়েছেন। আমি আগেই বুঝেছিলাম চাকরি ডেকে আনা মানে খাল কেটে কুমির ডেকে আনা। আমি চাইনি খাল কাটতে। আপনারা—'

'তাই বলে তুমি মাইনের টাকা তছনছ করবে? টাকা এ সংসারে থাকবে না, যাবে অদানে-অব্রাহ্মণে?'

'চাকরি আমার। মাইনেটাও আমার।' আরো দু' ধাপ উঠে গিয়েছিল, আবার থামল কাকলি। বললে, 'তাই আমি বুঝব টাকাটা কোথায় থাকবে বা কোথায় যাবে। থাকলেই বা কতটা থাকবে, গেলেই বা কতটা যাবে। উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেব, না দান-খয়রাত করব তারও বুঝ আমার আর আমার টাকার।'

'তাই যদি হয়, তা হলে এ চাকরি তুমি ছেড়ে দাও, বউমা। তোমাকে আর করতে হবে না চাকরি।'

'তা আর হয় না।' বাকি সিঁড়ির ধাপগুলি পেরিয়ে গেল কাকলি।

'আর যদি করতেই হয়, এ বাড়িতে বসে হবে না। বাড়ির বাইরে গিয়ে করো।'

এ প্রশ্নের উত্তর দিল কাকলি। বলল, 'তা দেখা যাবে।'

বাড়িতে পুরুষেরা ফিরলে তুমুল করল মৃণালিনী। মাইনের টাকা, ঘরের টাকা কিনা বাপের বাড়ি পাচার করে দিচ্ছে। বাপের বাড়ির জন্যেই নাকি চাকরি করা। বাপের হাত না সারা পর্যন্ত মাস-মাস নাকি অমনি পাচার করবে।

'অসহ্য!' হেমেন বললে, 'আমারই বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া। এ প্রিপশচারাস!'

'আমি বলে দিয়েছি চাকরি ছেড়ে দাও। করতে হবে না চাকরি। ঝাঁকের কই ঝাঁকে এসে মেশো।'

'অ্যাবসার্ড। সেই ছাগলের পালের সঙ্গে মানুষ হচ্ছিল বাঘের বাচ্চা, ঘাস খেত আর ভ্যা-ভ্যা করত—যেই একদিন মাংস খেল, রক্তেব স্বাদ পেল, জলে নিজের হাঁড়িমুখ দেখল, আর ফিরল না ঘাসখেকোদের দলে, বনে চলে গেল।'

'আমিও তাই তাকে বনে চলে যেতেই বলেছি।' বীরদর্পে বললে মৃণালিনী, 'বলেছি অমন চাকরি করতে হয় বাড়ির বাইরে বসে করো।'

এটা যেন চূড়ান্ত হয়েছে, সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু, নতুন বন্ধুতা হয়েছে, বিজয়া এল দিদির সমর্থনে। বললে, 'এ আর আপনাকে মুখ ফুটে বলতে হবে না, রক্তের টানে, মাংসের টানে নিজেই বেরিয়ে যাবে একদিন।'

'হ্যাঁ, টাকাই শক্তির রক্তমাংস।' হেমেন দার্শনিক হল।

সুকান্ত একটু বা ভয় করছিল কাকলি বুঝি মায়ের শেষ কথাটা নিয়ে তোলপাড় করবে, কিন্তু ধার-কাছ দিয়েও গেল না। যেমন আজকাল বেশির ভাগ সময়, বিশেষ এই মুখোমুখি হবার সময়, সে চুপ করে থাকে তেমনি চুপ করে রইল। মেঝেতে পাততে লাগল বিছানা।

সুকান্তই খোঁচা মারল। বললে, 'মা যে তোমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন তা শুনেছ?'

'শুনেছি।' কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল কাকলি : 'বাপের বাড়ি তাড়িয়েছে, শ্বশুরবাড়ি তাড়াবে এ আর বিচিত্র কী! কিন্তু মা শুধু একলা বললে চলবে কেন?'

'তার মানে?'

'তার মানে মায়ের বরপুত্রকেও বলতে হবে। তুমি যেদিন বলবে সেদিন চলে যাব।'

'কেন, বাবার বলতে লাগবে না? যিনি এ বাড়ির মালিক, যার নামে টেনান্সি—'

'না। শ্বশুরবাড়িতে রাক্ষস-খোক্কস শুধু দু' জন। স্বামী আর শাশুড়ি। যারা চাকরি করতে পাঠাবে অথচ মাইনের ওপরে স্বাধীনতা দেবে না। নাচতে নামাবে অথচ দড়ি ধরে থাকবে।'

'তাই তো করে। দেখ নি বাঁদরনাচ? বাঁদরে নাচে কিন্তু নাচওয়ালার মুঠোতে দড়ি ধরা।'

'দেখেছি। আর রোজগারটা যে নাচে তার নয়, যে নাচায় তার। ওর বাঁদর নাচিয়ে রোজগার, তোমার বউ নাচিয়ে রোজগার।'

'বেশ, এখন তুমি না সরো, তোমার এই এটাচিটা তো সরাবে?'

'আই অ্যাম সরি! তাড়াতাড়িতে তখন ওটা রেখে গেছি তোমার টেবলে।' নিজের মনে কাজই করতে লাগল কাকলি : 'জানি, ওটার ওপর তোমার ভীষণ রাগ।'

'শুধু ওটার উপরে নয়, জগৎসংসারের উপরে। কি, সরালে?'

'সরাচ্ছি। হাতের কাজটা আগে সারি—'

'না, আগে সরাও। না সরাবে তো ছুঁড়ে ফেলে দেব বাইরে।'

'ওরে বাবা, ওটার মধ্যে আমার টাকা, আমার ব্যাঙ্কের চেকবই, পাশবই—' ছুটে গিয়ে এটাচিটা বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরল কাকলি : 'তার চেয়ে তোমার জগৎসংসারকে ছুঁড়ে ফেলো।'

'তুমি এরই মধ্যে ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টও খুলে ফেলেছ নাকি?'

'স্বভুজবীর্যে উপার্জন করছি, কেন খুলব না?' এটাচিটা সরকারি জায়গা খাটের নিচে চালান করে দিলে কাকলি। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তবু তো এখনো—'কী জানি কথাটা—তবু তো এখনো তেল মাখিনি।'

'তার মানে?'

'তবু তো এখনো একখানা গয়নার অর্ডার দিইনি।'

'তারপর ঐ কাঠামোর উপর আবার গয়না চাপাবে নাকি?'

'এখন তো কাঠামোই ঠেকবে। তবু দু' একখানা ঠেকিয়ে দেখই না ঝকমক করে কিনা। দিয়েছ? দেবার মুরোদ আছে? নিজের কিছু জোগাড় নেই, পরের জন্যে বেগার খাটো। নিজের কানে সোনা নেই, পরের কানে টেলিফোন। নিজের বলতে একখানা ঘর নেই, পরের জন্যে রেফ্রিজারেটর। আমার ভাতে নুন না জুটুক ওঁরা ঘি খাবেন।'

'তোমার তেজ খুব বেড়েছে।' চেয়ারটা সশব্দে টেনে বসল সুকান্ত।

'তা তেজের দোষ কী! তখনই বলেছিলাম প্রদীপের আগুনকে মশালের আগুন কোরো না।

নাড়াবুনে আছি ডেকো না কীত্তুনে হতে। এখন তো কীর্তনের শুরু। চাকরির গোড়া। তারপর ভরা *কীত্তনে খোল ফাটবে, খঞ্জনী ভাঙবে, ধুলট উড়বে। ভরা চাকরিতেও কোনো দিশপাশ থাকবে না।* কীত্তুনের মুখে এক বুলি হরেকৃষ্ণ, চাকুরের মুখেও এক বুলি, উন্নতি আর উন্নতি আর উন্নতি।'

'তুমি ভাবছ স্পর্ধায় বা কৃতিত্বে কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না কোনো দিন—'

'যারা জীবনে এক প্রবন্ধ লিখেই বিদগ্ধ অন্তত তাদের কেউ নয়।' নিচে টাঙানো মশারির মধ্যে প্রবেশ করল কাকলি। বললে, 'তোমার জগৎসংসার যখন এখনো নিটুট আছে, তখন আমি উদ্বাস্তুর মত কী করে আর ফুটপাথে শুই। শুই হর্ম্যতলে।'

সেদিন আবার নতুন রূপ ধরল কাকলি।

আফিসে বেরুবার আগেই, ঘরের মধ্যে, সুকান্তর সামনে, কপালে সিঁথিতে সিঁদুর আঁকল।

'এ আবার কী অভিনয়।' ব্যঙ্গের সুর আনল সুকান্ত।

'কাল আফিসে চাউর করে দিয়েছি ঝট করে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। চাকুরি-মেয়ে তো শাঁসালো ক্যাপিটাল। ও কি আর না-খাটানো থাকে? সবাই বলছে, নেমন্তন্ন কই? গাছতলায় বসে চাঁদ সাক্ষী করে বিয়ে, তার আবার নেমন্তন্ন। পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি। নেমন্তন্ন ইত্যাদি সামাজিক কাজ এড়াবার জন্যেই তো রেজেস্ট্রি বিয়ে। কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। তাই একটা জলজ্যান্ত প্রমাণ নিয়ে যাচ্ছি। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হবে?'

'তোমার কৌমার্যের মোচন হলে তোমার চাকরির ক্ষতি হবে না?'

'এখন তো ঘাটে পৌঁছেই গিয়েছি, নৌকো এখন থাকল আর গেল।' কাকলি নিজের মুখ আয়নায় অনেকক্ষণ দেখল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। বললে, 'বিবাহ দ্বারা কৌমার্যমোচন দুর্নীতি নয়। বরং উল্টো, উন্নতির সহায়। কি, কেমন লাগছে কাঠামোকে? রানী-রানী লাগছে?'

'আমার লাগলেই বা কী, না লাগলেই বা কী—'

'হ্যাঁ, পাঁচজনের লাগা নিয়ে কথা। শোনো, আমি অভিনয় করছি—'

'চিরকালই তো করেছ।'

'সেটা তো একটা গেঁয়ো বোকা মেয়ের অভিনয় করেছিলাম। এবার করছি রানীর অভিনয়। স্টেজে রানী সাজছি আমি।'

'স্টেজে?' সর্বশরীরে আড়ষ্ট হয়ে রইল সুকান্ত।

'এখুনি কাঠ হয়ে যাবার কী হল! আমাদের আফিসে আমাদের ডিপার্টমেন্টে সংস্কৃতি আছে। সব আফিসে সব ডিপার্টমেন্টেই আছে, ছেয়ে আছে। আর সংস্কৃতি মানেই নাটক। আর নাটক মানেই কুশীলবদের দহরম-মহরম। রিহার্সেলের হল্লোড়। কিন্তু উপায় নেই।'

'উপায় নেই?'

'দেখি না তো। উন্নতি করতে হবে চাকরিতে। উন্নতি করতে হলে রানী সাজা অত্যাবশ্যক।'

'আর রাজা কে?'

'আমার আফিসের এক কর্তা। তাই তাক বুঝে বিয়েটা স্থাপিত করলাম।'

'তাকে বিমর্ষ করলে বোধ হয়।'

'কে জানে, হয়তো বা নিশ্চিন্ত করলাম।'

'তোমার মত আফিসের আর সব মেয়েই কি এমনি উন্নতি করছে?'

'সব মেয়েরই কি রানী হবার চেহারা?'

'তবে আর সব মেয়ের পার্ট কে করছে?'

'ঐ যে আছে একদল গৃহস্থ মেয়ে, টাকা নিয়ে ঘুরে ঘুরে থিয়েটার করে বেড়ায়, তারা।'

'গেরস্থ না হাফ-গেরস্থ।'

'সে খোঁজে আমার কী দরকার? আমি যা বলছি—'

'তুমি ওসব বর্ডার-লাইনের মেয়েদের সঙ্গে প্লে করবে? মিশবে? চলাফেরা করবে?'

'কে কোন লাইনে, বর্ডারে না সেন্টারে, তাতে আমার কী মাথাব্যথা! আমি রানী সাজতে এসেছি রানী সেজে যাব।'

'তার মানে তুমিও তোমার আফিস-বসের হাত ধরে বর্ডার-লাইনে এসে দাঁড়াবে।'

'দাঁড়াই তো দাঁড়াব। শোনো যা বলছি, আফিস-টাইমের পর রিহার্সেল, তাই বাড়ি ফিরতে রাত হবে। বেশি ব্যস্ত হোয়ো না', ব্যঙ্গ ঢালল কাকলি : 'থানা হাসপাতাল কোরো না।'

'এবার তো খোঁজবার ক্ষেত্র বেড়ে যাবে। বসের রুমস, হোটেল, ময়দান—'

'যাই বলো আমি চটছি না। যে সংস্কৃতিমান সে ঝগড়া করে না, সীন করে না—'

'সে বেনের দোকানে মেকি চালায়।'

'কী চালায় জানি না। কিন্তু উপায় নেই, কিছু একটা চালাতেই হবে। সংস্কৃতির উন্নতিতেই চাকরির উন্নতি—'

'তুমি করো উন্নতি। আর উন্নতির ঠেলায় বর্ডার-লাইন ক্রস করে যাও। গণ্ডি পেরিয়ে চলে যাও লঙ্কায়। আর তা হলে, ফিরে এসো না।'

'আসব না।' ব্যাগ ঝুলিয়ে নেমে গেল কাকলি।

তেত্রিশ

'কী, ফিরে এলে?' রাত করে বাড়ি ফিরলে, কাকলিকে জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'এখনো তো গণ্ডি পেরোইনি।'

'পেরিয়েছ কি না-পেরিয়েছ তার বিচার করবে কে? তুমি?' সুকান্ত মুখিয়ে উঠল।

'তবে কি তুমি?' পাল্টা নিক্ষিপ্ত হল কাকলি।

'বেশ, তুমি আমি কেউ নই, বিচারক সমাজ।' নাটুকেভাবে বললে সুকান্ত।

খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি : 'যেমন বিচারক গাঁয়ের পঞ্চায়েত। একজন তার প্রতিবেশীর পাঁঠা কেটেছে, প্রতিবেশীর অভিযোগে গ্রাম্য পঞ্চায়েত লোকটাকে ধরে ৩০২ ধারায় চার্জ করেছে, ফর মার্ডারিং এ গোট। কাটা পাঁঠাটাকে পাঠিয়েছে হাসপাতালে, পোস্ট মর্টেম করতে। তেমনি ধারা বিচার আর কী! জনতার বিচার! আর একতাল অন্ধ মূর্খতার নামই জনতা।'

'সমাজ মূর্খ?' গলায় ঠিক-ঠিক স্বর ফুটছে না তবু জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'যে সমাজ ছেলেধরা সন্দেহ করে ভিখিরিকে পিটিয়ে মারে, দৈবাৎ রাস্তায় চাপা দিলে যে সমাজ গাড়িটাকে পুড়িয়ে দেয়, শুধু চাপা-দেওয়া গাড়িটাকে নয়, পিছনের নিরীহ গাড়িটাকেও—যে সমাজ পরীক্ষায় প্রশ্ন কঠিন এলে চেয়ার-টেবল ওল্টায়, জলের কুঁজো জানলার কাঁচ ভাঙে, যারা ভীরু নয় যারা পরীক্ষা দিতে চাচ্ছে, তাদের খাতা ছেঁড়ে, গার্ডদের মাথা ফাটায়, তাদের তুমি অভিনন্দন করবে?'

'না। সমাজ তাদের সমর্থন করে না। তারা অপকর্মী। সমাজের বিচারে তারা নিন্দনীয়।'

'সে সমাজ কোথায়? রাখো।' দ্বিতীয় চেয়ার হয়েছে ঘরে—কাকলিই কিনেছে—সেটা জানলার কাছে টেনে নিয়ে বসল কাকলি : 'যে সমাজ ঘুমোয় তার আবার বিচার কী! সে অন্ধ আর মূর্খ না হোক, সে ক্লীব। ক্লীবত্ব আরো জঘন্য। যাদের অপকর্মী বলছ, তাদেরও মস্ত সমাজ। আর তাদের ধারণায় তাদের বিচারই ঠিক। তারা যা করছে, সেইটেই করণীয়। সুতরাং গণ্ডির রেখা টানবে কে? কে ঠিক-ঠিক মাপ-জরিপ করে দাগ দিয়ে বলবে, ঢেউ, এই পর্যন্ত, আর নয়!'

চেয়ারটা ঘোরাল সুকান্ত। 'তা হলে তোমার মতে চরম বিচারক কেউ নেই?'

'না। কেউ নেই।' জোর দিয়ে বললে কাকলি। পরমুহূর্তে হেলান দেবার ভঙ্গিতে ক্লান্ত শরীরে একটু নম্রতা এনে বললে, 'বলতে পারতাম বিবেক চরম বিচারক। কিন্তু আমার বিবেক আর তোমার বিবেকে মিল হবে না। স্ট্যালিনের কাছে হিটলার পাজি, হিটলারের কাছে স্ট্যালিন। চার্চিলের বিচারে গান্ধী আধা-

ন্যাংটা ফকির, আর আমাদের বিচারে, ভারতবাসীর বিচারে? আমাদের বিচারে গান্ধী সমস্ত পৃথিবীর রাজা—রাখালরাজা। তাই দয়া করে চরম বিচারের কথা বোলো না। সব খামখেয়াল।'

'খামখেয়াল?'

'অন্তত নির্দিষ্ট করে চেয়ো না গণ্ডির রেখা টানতে। যে প্রকাণ্ড, তার গণ্ডিও প্রকাণ্ড। তাই, দেখতে পাচ্ছ না', হাসল কাকলি : 'মানুষ ছোট বলে তার বেলায় যা পাপ, দেবতারা প্রকাণ্ড বলে তাদের বেলায় তা লীলাখেলা।'

'তুমিও বুঝি তেমনি কলির দেবতা হয়ে উঠছ! চালিয়েছ লীলাখেলা?'

'যদি চালিয়ে থাকি', ব্যঙ্গে প্রখর হয়ে উঠল কাকলি : 'উইথ ইয়োর পারমিশন স্যার, ইউথ ইয়োর কনাইভেন্স। তুমি আর সমাজের হয়ে মোক্তারি করতে এসো না। তোমার সমাজ বারে-বারে মেয়েদের গণ্ডি বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমেই লিখতে পড়তে বললে, পর্দা ঘোচালে, বাড়িয়ে দিলে বিয়ের বয়েস। বললে, ঐটুকু পড়ায় কী হবে, কলেজে এসো, কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়। বাড়িয়ে দিল এলেকা। ডাক্তারি, ইনজিনিয়ারিং, ব্যারিস্টারি—কী, দেয় নি বাড়িয়ে? ডেকে নিয়ে আসে নি বিজ্ঞানের ল্যাবরেটারিতে, খেলার মাঠে, সভামঞ্চে, পার্লামেন্টে—রাজাসনে? কোথায় গণ্ডি? বলে নি, পাইলট হও, সমুদ্র পার হও সাঁতরে, প্যারাসুট নিয়ে লাফ দাও অন্ধকারে? গণ্ডি নেই, গণ্ডি মুছে গিয়েছে।'

'না, যায় নি।' সরোষে উঠে দাঁড়াল সুকান্ত : 'কোথাও না কোথাও আছে তার শেষ রেখা।'

'আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। দি লিমিট। উটের পিঠে শেষ খড়।'

'কী সেটা?'

'বলব?' দৃষ্টি ধারালো করল সুকান্ত।

'শুনতেই তো চাচ্ছি।'

'সেটা হচ্ছে শারীরিক শুচিতা। সমস্ত প্রগতির সেইটে অন্তত শেষ সীমা। যে সীমা অমান্য করা যায় না, ইহজীবনে যা আর লঙঘন করবার নয়। কী, মানো?

'হয়তো মানি। কিন্তু সেখানেও কথা থাকবে। শুচিতার রেখাটারই বা কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ সে বিচারও তর্কের ব্যাপার। আর শোনো,' উঠে দাঁড়াল কাকলি : 'আইন আজ মেয়েদের শুধু সম্পত্তিতেই অংশ দেয় নি, বিয়ে খণ্ডে দোবারও স্বত্ব দিয়েছে। শুধু রেজেস্ট্রি করা বিয়ে নয়, মন্ত্র-পড়া আগুন-সাক্ষী-রাখা বিয়ে। আর বিয়ের বিচ্ছেদের পর দিয়েছে আবার তাকে বিয়ে করার অধিকার। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ যে অশুচিতা এক বিয়ের উপসংহার তাই আবার আরেক বিয়ের ভূমিকা। সুতরাং দাঁড়াচ্ছে, আইনই গণ্ডি, দি টার্মিন্যাল পয়েন্ট। যতক্ষণ না আইন ভাঙছি ততক্ষণ তাই আছি গণ্ডির মধ্যে।'

'কে থাকতে বলছে? ভাঙো আইন। ডিঙোও গণ্ডি। তারপর রসকষওয়ালা শাঁসালো কোনো আফিসবাবুর কণ্ঠলগ্ন হও গে।' সুকান্ত দাউ-দাউ করে উঠল।

'কী আকাট আহাম্মকের মত কথা!' চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল কাকলি : 'একটা অ্যাকাডেমিক ডিসকাশন হচ্ছে, তার মধ্যে যত ছোট মনের নোংরামি। ইতর, স্টুপিড কোথাকার—'

আর দাঁড়াল না কাকলি। নিচে নেমে গেল।

নিচেটা প্রায় খালি। বাড়ির সবার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে। যে যার ঘরে গিয়ে শামিল হয়েছে এরই মধ্যে। ঠাকুর-চাকরদের খেয়ে নিতে হুকুম দিয়ে দিয়েছিল মৃণালিনী, কিন্তু কী মনে করে তারা তখনো গড়িমসি করছিল। ছোট বউমা বাড়িতে যখন পৌঁছে গিয়েছেন, তখন তার আগেই নিজেরা খায় কি করে?

'আমার ভাত তো টেবলের উপর ঐ ঢাকা আছে—'

'হ্যাঁ, মা-ই বেড়ে ঢেকে রেখেছেন।' বললে ঠাকুর।

'তবে তোমরা বসে পড়ো গে। আমি স্নান সেরে পরে খাব। আমার জন্যে কারু অপেক্ষা করতে হবে না।'

উপরের বাথরুমটা কে যেন অতিরিক্ত সময় আটকে রেখেছে, হয়তো বা তাকেই জব্দ করবার জন্যে। নিচেরটা হেমেনের ভয়েই হয়তো যুগপৎ আক্রান্ত হতে পারে নি। নিচেরটা খোলা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কাকলি।

স্নান সেরে খেতে বসল। কেউ ধারে কাছে দাঁড়িয়ে নেই, জেগে নেই। জয়ন্তীটা পড়ছে দেখে এসেছে। তাকেও একবার কেউ নামতে বলল না। রাত আর এখন এমন বেশি কি! দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট।

ঢাকাটা তুলল কাকলি। থালাতে এলানো ক'টা ভাত, শিয়রে নুন, পাশে ন্যাতনেতে দু'খানা কুমড়ো ভাজা। একটা বাটিতে ট্যালটেলে ডাল, আরেকটাতে ফিনফিনে ঝোল তাতে এক টুকরো লিকলিকে মাছ। তৃতীয় বাটিতে এক হাতা জোলো দুধ, আঙুল ডুবিয়ে দেখল একটা সরুঙ্গে কলা পর্যন্ত নেই, জিভে ঠেকিয়ে দেখল, না বা এক ফোঁটা চিনি।

কোনোরকমে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খেয়ে টোপ ঢাকা দিয়ে উঠে পড়ল কাকলি।

রিহার্সেল যেদিন থাকে, সেদিনই দেরি হয় ফিরতে।

সেদিন ফিরে দেখল ঠাকুর-চাকরও অনুপস্থিত। রান্নাঘরের পাট তোলা।

কাকলি আর টোপ তুলল না। সোজা উঠে গেল উপরে।

সকালবেলায় প্রথমেই আবিষ্কার করল মৃণালিনী। নিচে সুকান্ত মুখ ধুতে এসেছিল, তাকে শুনিয়ে বললে, 'রাত্রে যে খাবে না তা আগে থেকে বলে গেলেই তো পারে। গৃহস্থ বাড়ির ভাতডাল শুধু শুধু নষ্ট করবার কী দরকার।'

সেই ঝগড়া উপরে নিয়ে গেল সুকান্ত।

'ভাতডাল নষ্ট করার দরকার কী! খাবে না তা আগে বলে গেলেই তো পারো।'

'তুমিও তো কতদিন বাড়িতে ফিরে বলো, খাব না। তখন তো ভাতডাল নষ্ট হতে দেখি না।' পালটা কথা শোনাল কাকলি।

'আমি যে খাই না তা হঠাৎ শরীর খারাপ হয় বলে—'

'তেমনি আমার শরীরও তো খারাপ হতে পারে।'

'তোমার শরীর খারাপ? কই, লক্ষণ তো কিছু দেখি না।'

'মনের থেকে রুচি চলে যাওয়াও শরীর খারাপ হওয়া।'

'তবে তো আগে থেকেই বলে যাওয়া যায় এ বাড়ির খাওয়াতে আমার রুচি নেই। তা হলে দু' মুঠো আহার্য বাঁচে গৃহস্থের।'

'গৃহস্থের অনেক কিছুই বাঁচবে।' কাকলি চোখ বেঁকাল : 'কিন্তু এক বেলা খাই নি কি না, তা নিয়ে তুমি কথা বলতে আসো কেন? মা নিজে বলতে পারেন না? মুখোমুখি নিতে পারেন না কৈফিয়ত?'

'তোমার সামনে এগোবে এমন সাহস কী! তুমি এখন ফার্মের একজন অফিসার।' ব্যঙ্গ ঝরাল সুকান্ত : 'তারপর চুড়োর উপর ময়ূরপুচ্ছ, চাকরির উপর সংস্কৃতি ধরেছ।'

'কী আশ্চর্য, তোমার কিছুই ধরতে হয় না।' কাকলি উত্তোর দিল : 'তুমি নিজেই পুচ্ছধর।'

সেদিন আফিস যাবার মুখে কাকলি মৃণালিনীর উদ্দেশে ফেলে দিল কথাটা : 'আজ আমার জন্যে ভাত রাখতে হবে না। খাব না বাড়িতে।'

এবং এমনি একদিন নয়, একাধিক দিন।

আবার এই নিয়ে অশান্তি।

'তোর বউ যে রাত্রে প্রায়ই খায় না এর মানে কী?' মৃণালিনী আবার সুকান্তের এজলাসে হাজির হল।

তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছে সুকান্ত। অসহিষ্ণু গলায় বললে, 'মানেটা কী তা তুমি নিজে বউকে জিজ্ঞেস করলেই পারো। আমাকে জ্বালাতন করো কেন?'

মৃণালিনী স্তম্ভিত হবার ভাব করল : 'তুই স্বামী, পুরুষ, তুই অনাচারী বউকে শায়েস্তা করবি নে? বসে বসে শুধু লেজ নাড়বি?'

'আমাকে কী করতে বলো?'

'যার বাইরে রাত্রের খাওয়া জোটে, তার বাইরে রাত্রের শোওয়াও জুটবে। বলতে পারিস নে মুখের উপর? রাতের প্রায় আদ্ধেক যে খেয়ে বেড়িয়ে বাইরে কাটাতে পারে, তার আর বাড়িতে ফেরা কেন? পারিস না বলতে? মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারিস নে?'

'ও-ই বা কী করবে?' অলক্ষ্যে কাকলির পক্ষ নিয়ে বসল সুকান্ত : 'থিয়েটারের রিহার্সেল দিতে গিয়ে রাত হয়ে যায়। আফিসের সংস্কৃতি তো, তাই নাটক পঞ্চাঙ্ক। অনেক লোককে প্রোভাইড করতে হবে বলে অনেক চরিত্রওলা ঘটোৎকচ বই। আর ওর পার্ট লাস্ট সিন পর্যন্ত—'

'সেই লাস্ট সিনটা তাড়াতাড়ি ঘটে যাক। এক্ষুনি-এক্ষুনি।'

সুকান্ত চুপ করে রইল।

'আমরা বউকে চাকরি করতেই পাঠিয়েছিলাম, থিয়েটার করতে নয়।'

কথা কইল না সুকান্ত।

'আবার থিয়েটার থেকে সার্কাসে যায় না সিনেমায় যায় তার ঠিক কী! আঙুল ফুলে কলা গাছ বরং সহ্য হয়, এ আঙুল ফুলে অশ্বত্থ গাছ।'

সুকান্ত তবু নির্বিবাদ।

'এ বউকে দিয়ে আমাদের সুরাহাটা কী হল? না ঘরে না ঘাটে কোনো কাজে লাগল না। মাইনের টাকা বাপের বাড়ি পাঠাল।'

'কেন, মাঝে মাঝে তো এদিকেও খরচ করে।' না বলে পারল না সুকান্ত :'খাবার টেবলটা কিনে দিল, তোমাকে নেটের মশারি—'

'যেন বকশিশ দিল সংসারকে। কেন এক থোকে সব টাকা তুলে দেবে না? আমাকে না দিক, তোকে, স্বামীকে? তুই সুবিধে করে দিয়েছিস বলেই তো ওর এত স্বাধীনতা। কিন্তু তোকেই বা কী মান্যটা করে শুনি? এমন একটা ভাব দেখায় উনিই আকাশে-ওড়া পাখি আর তুই একটা কীটপতঙ্গ।'

নিশ্চল নিষ্পন্দ সুকান্ত।

'বাইরে খাওয়া-দাওয়ার পাট সেরে শোয়ার ঠাট বজায় রাখতে বাড়ি ফেরে। কিসের ঠাট-বজায়? চাকরিকে সমর্থন করবি বলে কদাচারকে প্রশ্রয় দিবি? কক্ষনো না। যে বানের জল থেকে তুলে এনেছিস সেই বানের জলে ভাসিয়ে দে।'

চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরল মৃণালিনী। বললে, 'অল্প আগুনে শীত হরে, বেশি আগুনে পুড়িয়ে মারে। বউ এখন বেশি-আগুন হতে চলেছে। সংসার পুড়িয়ে একেবারে ছারখার করে দেবে। হাতের থাবড়াতে নিববে না আর, জল ঢেলে নেবাতে হবে।' ঢোঁক গিলল মৃণালিনী : 'আর সে জল চোখের জল।'

সেদিন, রাত্রে সদর বন্ধ করতে গেল সুকান্ত।

'একি, এখুনি বন্ধ করছিস?' জিজ্ঞেস করল হেমেন : 'ছোট বউমা ফিরেছে?'

'না।'

'তবে এখুনি এত তৎপর?'

'আজ ফিরবে না।'

'যাবে কোথায়?'

'কী জানি কোথায় যাবে।' নিজেই এখন কোথায় যায় সুকান্ত পথ খুঁজতে লাগল।

'কেন, ঠিকানা জেনে রাখিস নি?'

'যে রাত করে বাড়ি ফেরে তার ফেরা না-ফেরা সমান।' উপরে পালিয়ে গেল সুকান্ত।

'যে চোরকে চুরি করতে বলে নিজে গৃহস্থ সাজে সে চোরের চেয়েও বেশি।' হেমেন নিষ্ঠুরের মত বললে, 'সে বাটপাড়। আর চোরের ধনের দিকেই বাটপাড়ের নজর।'

খানিক পরেই কড়া নাড়ল কাকলি।

হেমেন দরজা খুলে দিল। বললে, 'আর কদ্দিন চলবে রিহার্সেল?'

'আজ স্টেজ রিহার্সেল হয়ে গেল। তাই', কুণ্ঠিত মুখ করল কাকলি, 'তাই বেশ একটু দেরি হল আজ—'

'তা হোক। আসল প্লে কবে?'

'এই শুক্রবার হয়তো।'

'যাক, ঝামেলা যাবে তা হলে। খাটনির খাটনি—চেহারা কাহিল হয়ে গেল।' ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখল বিছানা পাওয়া মাত্রই বিজয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। গলা নামিয়ে বললে, 'আর, থিয়েটারের পাশ এনো না এ বাড়ির জন্যে। কোন দৃশ্যে কে কী দেখবে আর দপদপ করবে বলা যায় না। আরো শোনো।' হাসিমুখে কাকলি ফিরে দাঁড়াতে বললে, 'যদি দেখ, তোমার উপরের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে দরজা খুলে দিচ্ছে না, তা হলে যেন দরজার বাইরে আসন পেড়ে বসে থেকো না শবরীর মত, টুক করে এসে আমাকে একটু খবর দিও—'

লজ্জায় মরে গেল কাকলি। মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বললে, 'না, খুলে দেবে—' বলেই ছুট দিল উপরে।

'তুমি তো জানতাম এ বাড়ির এক্সটার্ন্যাল অ্যাফেয়ার্সের মিনিস্টার, তুমি ওদের ইনটার্ন্যাল ব্যাপারে নাক ঢোকাচ্ছ কেন?' শোয়া বিজয়া কুণ্ডলীর ভিতরে থেকেই ফোঁস করে উঠল।

'ও। তুমি ঘুমন্ত নয়? তুমি ঘুমজাগন্ত!' হেসে উঠল হেমেন। ঘরে ঢুকে বললে, 'যদি ভেতরে জায়গা পায়, তা হলে আর আমার জুরিসডিকশান নেই, সেখানে মারামারি-কাটাকাটি যাই হোক গে। কিন্তু যদি ঘরের বাইরে, দরজার বাইরে বসিয়ে রাখে, তা হলে ব্যাপারটা এক্সটার্ন্যাল অ্যাফেয়ার্সের। সে ক্ষেত্রে সেটা আমার ডিপার্টমেন্ট।'

'তোমার মুণ্ডু।' পাশ ফিরল বিজয়া।

কিন্তু না, ঘর খোলা, আলো জ্বেলে লেখা পড়া করছে সুকান্ত।

চোখ না তুলেই বললে, 'শেষ পর্যন্ত সেই ফিরেই আসতে হল!'

'নইলে যাব আর কোন চুলোয়।' ব্যাগটা ঝুলিয়ে রাখল কাকলি।

'কিন্তু যাবার সময় যেমন পাখা মেলেছিলে মনে হচ্ছিল যেন অন্য কোনো গাছে গিয়ে বাসা বাঁধবে। আসলে বাসন্তীও যা, তুমিও তাই।

'বাসন্তী—মানে, ঠাকুরঝি?'

'হ্যাঁ, শত অত্যাচার সত্বেও বাসন্তী তার স্বামীর ঘর আঁকড়ে আছে, তুমিও তেমনি শত অসুবিধে সত্বেও—'

'কথাটা অসুবিধে বলছ কেন, বলো, অত্যাচাব সত্বেও।' কাকলি তাকাল চারদিকে : 'আমার ওপর এসব কম অত্যাচার?'

কথা রদবদল করল না সুকান্ত। বললে, 'তেমন শত অসুবিধে সত্বেও তুমিও তেমনি আঁকড়ে আছ শ্বশুরবাড়ি।'

'থাকব না তো যাব কোথায়?'

'তাই বলছিলাম, তুমি আর বাসন্তী একগোত্র।'

'মোটেই নয়। বাসন্তীর অবস্থা আমার চেয়ে ঢের ভালো। তার বাপের বাড়ি আছে। রোজগেরে বাপ-কাকা আছে। দুই গণেশ-কার্তিক ভাই আছে। আমার তো ওসব কিচ্ছু নেই। আমি তো নিঃস্ব। উদ্বাস্তু।'

'কেন, তোমার তো থিয়েটার আছে, সিনেমা আছে, হোটেল আছে, রুমস আছে, রণ্ডিভূ আছে। তা তুমি শ্বশুরবাড়ি ছাড়বে কেন? যার এক চিলতে বুদ্ধি আছে, সে কখনো ছাড়ে? খাওয়া-থাকা ফ্রি, একটা স্বামীকে শিখণ্ডীরূপে সামনে রাখা, আফিসে মোটা চাকরি, আর মাইনেতে নিরঙ্কুশ আধিপত্য— অবাধ

স্বাধীনতা, স্বাধীনতা না স্বেচ্ছাচার—এমন রাজত্ব কেউ ছাড়ে? তাই যতই মুখসাপট মারো কাজের বেলায় সেই গুটিগুটি শ্বশুরালয়েই ফিরে আসো।'

'তবে তো বুঝেইছ আমার চালাকি। কিন্তু আসল চালাকিটার জন্যে সত্যি তোমাকে ধন্যবাদ।' মুখের ভাবটা প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করল কাকলি : 'সেটা হচ্ছে আমাকে যে চাকরি করতে খুঁচিয়েছ। উঃ, যদি আজ আমার চাকরি না থাকত, নিজের বলে এক মুঠো টাকা না থাকত, তা হলে আমি কোথায় গিয়ে পড়তাম।' কাকলি ঝলমল করে উঠল : 'আমি বাসন্তী হতে যাব কেন? কোন দুঃখে? আমি কি ওর মত ননম্যাট্রিক অকর্মণ্য অসার? নাই বা থাক আমার বাপের বাড়ি, আমার বিদ্যে আছে, বুদ্ধি আছে, চাকরি আছে চেহারা আছে। শত্রুতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার সবচেয়ে যে বড় অস্ত্র সেই টাকা আছে। আমি কেন দুর্বলের মত স্বামীর ঘর আঁকড়ে থাকব? আমার ছাদ যায় মাটি আছে, গাছ যায় মাঠ আছে! তোমাকে শিখণ্ডী করতে হবে কেন? যে কোনো দিন আদালতে গিয়ে তোমার স্বামিত্বকে এক কলমে কেটে দিয়ে হালকা হয়ে যেতে পারি—'

'অতি-চালাকের গলায় দড়ি পড়ে।' গম্ভীর হয়ে বললে সুকান্ত।

'পড়ুক। তবু পায়ের বেড়ির চেয়ে তা ভালো। আমকে যেতে বলছ, কেন, তুমি চলে যাও না। কত ছেলে তো বিদেশে যায়, নিরুদ্দেশ হয়, সন্নেসী হয়ে বনে বনে টহল মারে, তুমিও তাই করো না। উপদেশটা আমাকে না দিয়ে নিজের উপরেও তো খাটাতে পারো। নিজেই তো যেতে পারো বেরিয়ে।'

'মরবার জন্যেই পিঁপড়ের পাখা ওঠে। তোমারও তাই উঠেছে।'

'ও, মরব! সে তো এক নতুন রোমাঞ্চ। কিন্তু কানু হেন গুণনিধি কাকে সেদিন দিয়ে যাব না জানি। কোন কাক সেদিন এ পাকা বেলে ঠোকর মারবে!'

কাকলি ছাদে চলে গেল আর ঘর অন্ধকার করে দিল সুকান্ত।

থিয়েটার হয়ে গিয়েছে। ক'দিন পরে কাকলি এল আবার নতুন দরখাস্ত নিয়ে।

'নতুন আবার এক বিপদ উপস্থিত হয়েছে।'

'তা, আমি কী করব!' সুকান্ত বইয়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'যতক্ষণ তুমি নাকচ না হচ্ছ ততক্ষণ তোমাকেই জানাতে হবে।'

সুকান্ত ঘাড় তুলল না।

'শোনো, আমাদের জেনারেল ম্যানেজার একটা ককটেইল পার্টি দিচ্ছেন—'

'কী টেইল?' মুখিয়ে উঠল সুকান্ত।

'ককটেইল। সেদিন তুমি আমাকে ময়ূরপুচ্ছ বলেছিলে না। এ হচ্ছে কুক্কুট-পুচ্ছ। সে পার্টিতে আমার নেমন্তন হয়েছে। আমি যাব। যদি চাকরির উন্নতি চাই আমার যাওয়াই উচিত। উপরিওলার খুশিতেই উপরে তোলা।'

'তা আমি কী করব?' রীতিমত ধমকে উঠল সুকান্ত।

'ইচ্ছে করলে তুমিও যেতে পারো, যাবে? তোমারও নেমন্তন্ন হয়েছে।'

'আমার?' চেয়ারের দুটো হাতলই একসঙ্গে ধরল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, কনসর্টের নেমন্তন্ন। পুরুষ-অফিসরদের সস্ত্রীক নেমন্তন্ন, তেমনি মেয়ে-অফিসরদের ও সপতিক। হালে আমার বিয়েটা যখন এস্টাব্লিশ্‌ড্ হয়েছে তখন আমাকে বলেছে স্বামীসহ হাজির হতে। অফিসরের স্ত্রী যদি যেতে পারে, অফিসরের স্বামীই বা যেতে পারবে না কেন? কি, যাবে?'

'মুখ সামলে কথা বলো বলছি। নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে।'

'কেন, দোষ কী! কত গণ্যমান্যেরা যাবে। চলো না। নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে জীবনে। কোনোদিন গিয়েছ অমন জায়গায়? যখন যাও নি তখন চলো।'

'আমি নয়। তোমার একার জন্যেই গোল্লার পথ খোলা থাক।'

অল্পে অথচ তীক্ষ্ণে সজ্জিত হল কাকলি। যথাসময়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে। মোড় থেকে ট্যাক্সি নিলে।